হ্বিটগেনস্টাইন

জগৎ, ভাষা ও চিন্তন

সম্পাদনা
তুষার কান্তি সরকার
শেফালী মৈত্র
ইন্দ্রাণী সান্যাল

এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড
সহযোগে
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ ঃ কার্তিক ১৩৬৪.

প্রকাশক ঃ এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড
১৭ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৭০০০৭২
সহযোগে
কর্মসচিব, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা ৭০০০৩২

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

অমিতা চ্যাটার্জী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ইন্দ্রাণী স্যান্যাল অধ্যাপিকা দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

এনাক্ষী মিত্র গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

ঝুমা চক্রবর্ত্তী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, শ্রী শিক্ষায়তন কলেজ

তুষারকান্তি সরকার অধ্যাপক দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নির্মাল্য চক্রবর্ত্তী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রিয়ম্বদা সরকার অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপিকা দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

শেফালী মৈত্র অধ্যাপিকা দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

সবিতা চক্রবর্ত্তী অধ্যাপিকা দর্শন বিভাগ, জয়পুর পঞ্চানন রায় কলেজ

সৌমিত্র বসু অধ্যাপক দর্শন বিভাগ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

মুখবন্ধ

'হ্বিটগেনস্টাইন ঃ জগৎ, ভাষা ও চিন্তন' বাংলা ভাষায পাশ্চাত্য দর্শন-চর্চাব একটি প্রয়াস। আমরা মনে কবি না দর্শন-চর্চাব ভৌগোলিক সীমা ভাষাব গন্ডী দিযে ঋজুতাব সঙ্গে বেঁধে দেওযা যায়। পশ্চিমবঙ্গেব সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ভারতীয দর্শন ও পাশ্চাত্য দর্শন দুই-ই স্থান পেয়েছে। পঠন-পাঠন অবশ্য ক্রমশই বাংলা ভাষায় কবাব দাবি সোচ্চাব হচ্ছে। মাতৃভাষায দর্শন-চর্চা আমাদের মননে একজাতীয় স্বনির্ভবতা আনতে সাহায্য কবে। এই বইটি ছাত্রদেব জন্য লেখা, কিন্তু পবীক্ষাব বৈতবর্ণী পাব কবান এব উদ্দেশ্য নয। যাবা পাঠ্যক্রমেব বাইবে গিযে আবো গভীব ও ব্যাপকভাবে হ্বিটগেনস্টাইন-কে বুঝতে চাইবেন তাঁদেব জন্য এই বই।

আমরা বিশ্ববিদ্যালয মঞ্জুবী কমিশনেব উপদেষ্টামন্ডলীব কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁবাই আমাদেব পবামর্শ দিয়েছিলেন বাংলায ছাত্র এবং গবেষকদেব জন্য বই লিখতে। বিশ্ববিদ্যালয মঞ্জুবী কমিশনেব অনুদানেই এই বই প্রকাশ কবা সম্ভব হচ্ছে. আমবা এব জন্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ। নানা ব্যাপাবে পবামর্শ দিয়ে আমাদেব সহাযতা কবেছেন শ্রীপ্রদ্যুম্ন ভট্টাচায ও শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এঁদের অবদান আমবা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকাব কবি। এই বই প্রকাশেব ব্যাপাবে বিশেষভাবে সাহায্য কবেছেন আমাদেব বিসার্চ অ্যাসোশিয়েটবা। আমবা অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি শ্রীমতী সবিতা চক্রবর্ত্তীব ও শ্রীসুশান্ত ভট্টাচার্যোব কাছেও। সকলেব মিলিত শ্রমেব ফসল এই বই।

ভূমিকা

শেফালী মৈত্র

কোনো দার্শনিকের দর্শন-ভাবনাকে তাঁব সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন কবে দেখলে সে-দেখা হবে অসম্পূর্ণ। হ্বিটগেনস্টাইন ব্যতিক্রম নন। বহুবাব বাঁক নিয়েছে তাঁব জীবন, পবিবর্তিত হয়েছে তাঁব অধ্যযনেব বিষয, তাঁর উপার্জনেব উপায। অসম্ভব স্ব-চেতন মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর প্রতিটি কাজে, প্রতিটি চিন্তায়, প্রতিটি কথায়, প্রতিটি সিদ্ধান্তেব প্রেক্ষাপট হিসেবে কাজ কবে গেছে, তীক্ষ্ণ বিচাব ও প্রাসঙ্গিকতা-বোধ। তাঁব জীবনেব একটি সংক্ষিপ্ত পবিচযেব মধ্যে দিযে এই কথাগুলোব সমর্থন পাওযা যায। আব এই জীবন কাহিনীব ভেতব দিযে ফুটে উঠবে তাঁর দর্শন-বীক্ষার ক্রমবিকাশেব ছবি।

লুড্‌ভিগ হ্বিটগেনস্টাইন-এব জীবন-কাহিনী উপন্যাসেব মত ঘটনা বহুল ও বৈচিত্র্যময়। ১৮৮৯ সালে ভিয়েনাব একটি ধনী ইহুদি পরিবাবে তাঁব জন্ম। হ্বিটগেনস্টাইন-বা ছিলেন নয ভাই-বোন। প্রথম জীবনে বাডিতেই পডাশোনা কবাব পবে চোদ্দ বছব বযসে হ্বিটগেনস্টাইন-কে লিন্‌সেব একটা স্কুলে ভর্তি কবা হয়। সেখানে তিন বছব পাঠ নেবার পবে বার্লিনে শুরু হয তাঁব ইন্‌জিন্‌ইযাবিং পডা। ১৯০৮ সালে ব্রিটেনেব ম্যানচেস্টাব বিশ্ববিদ্যালযে গবেষক হিসেবে যোগ দিযে উডোজাহাজ তৈবিব গবেষণায মন দিলেন তিনি। একটি ইনজিনেব মডেলও তৈবি কবলেন। এই কাজ কবাব সময গণিতেব অনেক খুঁটি-নাটি তত্ত্বে তাঁকে মন দিতে হয, ধীরে ধীবে গণিতেব দার্শনিক ভিত্তি নিযে মৌলিক চিন্তা-ভাবনা শুরু কবে দেন।

১৯১১ সালে হ্বিটগেনস্টাইন জেনা শহবে যান জার্মান দার্শনিক গট্‌লব ফ্রেগে-র সঙ্গে দেখা কবতে। ফ্রেগে-ব পবামর্শে ইংল্যান্ডেব কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাসেল এবং হোইটহেড-এব সঙ্গে পডাশোনা কবতে আসেন তিনি এবং ১৯১২ থেকে ১৯১৩ এঁদেব কাছে অধ্যয়ন কবেন। এ সময় সেই বিখ্যাত ঘটনা ঘটে যখন হ্বিটগেনস্টাইন বাসেল-এব কাছে জানতে চান 'উইল ইউ প্লিজ টেল মি হোয়েদাব আই অ্যাম এ কমপ্লিট ইডিযট অব নট?' কাবণ বাসেল যদি মনে কবেন যে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মাথা মোটা তাহলে উনি ইন্‌জিন্‌ইয়ারিং পডায ফিরে যাবেন আর যদি তা মনে না কবেন তাহলে হ্বিটগেনস্টাইন দর্শন-চর্চা চালিযে যাবেন।

কেমব্রিজে এক বছব পডাশোনা কবাব পবে হ্বিটগেনস্টাইন নবওযে গেলেন। সেখানে নিজেব জন্য কুটীব নির্মাণ কবে তিনি একান্ত নির্জনে একটা গোটা বছব যাপন কবেন।

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব সংবাদ পেযে হ্বিটগেনস্টাইন স্বনির্বাচিত নির্বাসন ত্যাগ কবে অস্ট্রিযান আর্মিতে নাম লেখালেন। কৃতিত্বেব সঙ্গে যুদ্ধ কবাব জন্য তিনি বহু সম্মানে ভূষিত হন। ১৯১৮ সালেব নভেম্বব মাসে তিনি ইতালীব সেনাদলেব হাতে বন্দী হলেন ও ঐ বছবই আগস্ট মাসে তাঁব 'ট্র্যাকটেটস লজিকো-ফিলসফিকাস' বইটি শেষ কবেন। এই

বই-এব প্রায় সবটাই যুদ্ধক্ষেত্রে বসে লেখা। ইতালীব মন্ট কাসিনো বন্দি-শালায ঐ পাণ্ডুলিপি তাঁব সঙ্গেই ছিল। এই বন্দিশালা থেকে পাণ্ডুলিপিটি দার্শনিক কেয়েন্সেব মাধ্যমে কেম্ব্রিজে রাসেল-এর কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এর পব ১৯১৯ সালে হল্যান্ডে বসে চলে মাস্টারমশায় রাসেল ও ছাত্র হ্বিটগেনস্টাইন-এর মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা। 'ট্র্যাকটেটস' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে জার্মান ভাষায ও তার কিছুদিনের মধ্যে তার পুনঃপ্রকাশ হয় ইংরেজী অনুবাদ সহ।

'ট্র্যাকটেটস' লেখাও শেষ হল হ্বিটগেনস্টাইনও দর্শন-চর্চা ছেড়ে দিলেন। যুদ্ধ থামলে দেশে গিযে তিনি ১৯১২ সালে পাওয়া তাঁর পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি বিলিয়ে দিযে ভিয়েনার একটি শিক্ষক শিক্ষণ কলেজে ভর্তি হলেন। এখানে পড়া শেষ করে ১৯২০ সালে ভিয়েনার একটি প্রত্যন্ত গ্রামেব স্কুলে শিক্ষকতা করেন ১৯২৬ পর্যন্ত। এ সময় অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হযে বন্ধুকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন। এমন একটা চিঠি থেকে জানতে পারি যে, এই সময় কয়েকবাব আত্মহত্যা কবার কথাও তাঁর মনে এসেছিল, সেই সঙ্গে তাঁর এও মনে হল যে 'টু কিল্ ওয়ান সেলফ ইজ অলওযেজ এ ডার্টি থিং টু ডু'। তবে ছোটদেব রূপকথাব গল্প শোনাতে পাবলে কিছুটা তাঁব ভাল লাগত।

১৯২৬ সালে আবাব সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিযে হ্বিটগেনস্টাইন গেলেন কিছুদিনের জন্য বাগানের মালির কাজ কবতে। সেখান থেকে ব্যস্ত হযে চলে এলেন বোনেব জন্য বাড়ী তৈরিব কাজ তদাবকি কবতে। এই কাজে তাঁর দু বছব সময় কাটে। এ কাজেব সূত্রে ভিযেনায থাকাকালীন বেশ কিছু দার্শনিকেব সঙ্গে তাঁর পবিচয় হয, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মবিস্ শ্লিক, রুডলফ কার্ণাপ, ফ্রেডরিক ওয়াইসম্যান এবং হাবার্ট ফাইগেল। আট বছব ব্যবধানেব পরে আবাব দর্শন আলোচনায় হ্বিটগেনস্টাইন যোগ-দিলেন, ভিয়েনা সার্কেলেব তখন বমবমা অবস্থা অর্থাৎ লজিকাল পসিটিভিসম মুভমেন্ট তখন তুঙ্গে। ভিয়েনা সার্কেলেব কিছু কিছু মিটিং-এ হ্বিটগেনস্টাইন উপস্থিত থাকতেন, বিশেষ কবে যখন লজিক নিযে আলোচনা হত। মেটাফিসিক্স বা অধিবিদ্যা বর্জনেব কর্মসূচিতে শোনা যায় তাঁর তেমন উৎসাহ ছিল না।

ভিয়েনা গোষ্ঠীব কিছু দার্শনিক বন্ধুব সঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথেব লেখা পড়তে শুরু করেন। 'রাজা' নাটকটি পড়াব পব উনি ওঁব ইন্জিনিয়াব বন্ধু এঙ্গলম্যানকে লেখেন 'জানি না লেখক [ববীন্দ্রনাথ] তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখছেন কি না, কখনও কখনও মনে হয ভাবনাগুলো আইসবক্স থেকে বেবিয়ে এসেছে'। পবে অবশ্য হ্বিটগেনস্টাইন খুব ববীন্দ্রনাথ ভক্ত হযে যান।

১৯২৯ সালে হ্বিটগেনস্টাইন আবাব কেম্ব্রিজে ফিবে আসেন এবং তাঁব পূর্ব-প্রকাশিত 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থটিকে তিনি পি. এইচ. ডি ডিগ্রিব জন্য দাখিল কবেন। বাসেল এবং ম্যূব তাঁর পবীক্ষা নেওয়ার পরে তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয় ও তিনি ট্রিনিটি কলেজে রিসার্চ ফেলো হিসেবে যোগ দেন। ছুটি পড়লেই উনি ভিয়েনা ফিবে যেতেন এবং 'ভিয়েনা সার্কেল'-এব আলোচনায অংশ গ্রহণ কবতেন। ততদিনে এই সার্কেল একটি ঘরানাব রূপ

নিযেছিল। এই গোষ্ঠীব সঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতেব সাদৃশ্য থাকলেও তিনি সতর্কভাবে যে-কোনো ঘরানা থেকে দূরত্ব বজায় রাখতেন। তিনি মনে করতেন দার্শনিক হতে গেলে কোনো ধারণার সদস্য হওয়া সমীচীন নয়। 'দা ফিলসফব ইজ নট এ সিটিজেন অব এনি কম্যুনিটি অব আইডিয়াস, দিস ইজ হোয়াট মেক্স হিম এ ফিলসফব।'

হ্বিটগেনস্টাইন-এর নিজেব লেখা নোটস থেকে জানা যায় তিরিশের দশকের গোড়াব দিকে তিনি অনেক কিছু লেখেন, তাঁর জীবদ্দশায় এর কিছুই প্রকাশিত হয় নি। তাঁর লেখা বহু বই, বক্তৃতা, নোট, আমরা ইদানীং হাতে পেলেও 'ট্র্যাকটেটস' ছাড়া কোনো বই-এব মুদ্রন তিনি দেখে যান নি। এর কারণ এই নয় যে তিনি প্রকাশক পান নি। আসলে তিনি তাঁর লেখা সম্বন্ধে খুব খুঁত-খুঁতে ছিলেন, কোনো লেখাটাই তাঁর প্রকাশের যোগ্য মনে হত না।

তিরিশের দশকে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মনোযোগ পুবো-পুরি গণিতেব প্রতি নিবিষ্ট হয়। পাশা-পাশি তিনি মন সংক্রান্ত অনেক দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে আরম্ভ কবেন। বোধ, আবেগ, প্রবণতা, প্রত্যাশা, ইত্যাদিব স্বরূপ নিয়ে নানা কূট প্রশ্ন তুলতে শুরু করেন তিনি - এমন সব প্রশ্ন যা তাঁব 'ট্র্যাকটেটস' কোনও পর্বে কোথাও উত্থাপিত হয় নি।

হ্বিটগেনস্টাইন-এব দর্শন ভাবনার ক্রমবিকাশেব কথা বলতে গিযে ভাষ্যকাববা সাধারণতঃ তিনটে পর্যাযেব কথা বলেন। প্রথম পর্ব শুরু হয় 'ট্র্যাকটেটস'-এর জন্য নোট লেখা দিযে, আব শেষ হয় তিরিশের দশকের গোড়ায় যখন উনি গণিত ও মনোদর্শন নিযে চিন্তা ভাবনা শুরু কবেন। তিবিশেব দশকের গোডার দিকে তাঁব দর্শন ভাবনাকে বলা যায় হ্বিটগেনস্টাইনীয় দর্শনেব মধ্য পর্ব। মোটামুটি ১৯৩৫ থেকে সূচনা হয় অন্তিম পর্বের, যখন উনি 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' লেখেন।

১৯৩৫ এ হ্বিটগেনস্টাইন একবার সোভিযেত বাশিয়ায় যান। ঐ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস কবার কথাও উনি সেই সময ভাবেন। স্তালিনেব দৌবাত্ম্য উত্তবোত্তর না বাড়লে হয়ত সেখানে থেকেও যেতেন। ঐ বছবেই উনি নবওয়েতে ওঁব কুটীবে ফিবে যান ও সেখানে এক বছব কাটান। হ্বিটগেনস্টাইন-এব জন্মভূমি অস্ট্রিয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হলে উনি বৃটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

১৯২৯ সালে কেমব্রিজ অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েও হ্বিটগেনস্টাইন ঐ পদে যোগ দিতে পাবেন নি, কাবণ সেই সময় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাঁধল। এই নিযুক্তির পবিবর্তে উনি লন্ডনেব একটি হাসপাতালে আবদালীর কাজ নিলেন। যুদ্ধ থেমে গেলে উনি আবাব অধ্যাপনাব কাজে যোগ দেন। জীবনের অনেকটা সময় শিক্ষকতায় নিযুক্ত থাকলেও এই পেশা তাঁর কখনই ভাল লাগে নি। বিশেষ কবে দর্শনের পঠন-পাঠন যেভাবে হয় তাতে, তাঁব মতে, ইমানদাব থাকা কঠিন। যুদ্ধের পবে কেমব্রিজ মাত্র দু বছব শিক্ষকতা কবাব পর ১৯৪৭-এ পদত্যাগ করেন। তাঁর কথায় দর্শনের অধ্যাপকের জীবন যেন একটা 'লিভিং ডেথ' বা জীবন্ত মৃত্যু। কেমব্রিজ ছাডার পরে কিছুদিন উনি আয়ারল্যান্ডে সমুদ্রের ধাবে কাটান - সমুদ্রেব সিগাল

পাখির সঙ্গে সময় কাটাতে তাঁর খুব ভাল লাগত মনে হত পাখিগুলো যেন তাঁর পোষা।

১৯৪৮ সালে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' লেখা শেষ হলে পরের বছরে হুইটগেনস্টাইন আমেরিকা গেলেন - তাঁর ছাত্র নর্মান ম্যালকম-এর আমন্ত্রনে। ম্যালকম-এর স্মৃতিচারণ থেকে হুইটগেনস্টাইন-এর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যায়। আমেরিকায় থাকতেই তাঁর স্বাস্থ্য ভাঙ্গতে শুরু করে। ১৯৪৫ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে তাঁর ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ল। জীবনের শেষ দুই বছর তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে, কখনও অক্সফোর্ডে, কখনও কেম্ব্রিজে কাটান। ২৯শে এপ্রিল, ১৯৫১ সালে একষট্টি বছর বয়সে হুইটগেনস্টাইন-এর মৃত্যু হয়।

প্রথম পর্যায়ে হুইটগেনস্টাইন-এর দর্শন-ভাবনার সুস্পষ্ট পরিচয় পাই তাঁর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে। ঋজুতার সঙ্গে সংক্ষেপে দার্শনিক ধারণা কীভাবে পেশ করা যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই রচনা। মাত্র সাতটি বচনের মধ্য দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ দর্শনের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি অবশ্য অজ্ঞজনের বোধের জন্য আরো কিছু পরিপোষক বচনও ব্যবহার করা হয়েছে। বইটির মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে এই বই-এর সারাৎসার হল যা বলা যায় তা স্পষ্ট করেই বলা যায় (হোয়াট ক্যান বি সেড ক্যান বি সেড ক্লিয়াবলি). এবং যে-বিষয়ে কথা বলা যায় না তা নৈঃশব্দে নিমজ্জিত রাখতে হয় (অ্যান্ড হোয়াট উই ক্যাননট টক অ্যাবাউট উই মাস্ট পাস ওভার ইন সাইলেন্স। অর্থাৎ যা স্পষ্ট করে বলা যায় এবং যা স্পষ্ট করে বলা যায় না দু-এরই সুনির্দিষ্ট বিভাজন আছে - এই দু-এরই মাঝখানে অর্ধেক বলা অর্ধেক-না-বলার আলো-আঁধারির কোনো অর্থবহতা নেই। এ সত্ত্বেও যদি অনির্বচনীয়কে বচনে প্রকাশ করার চেষ্টা করি সে বচন হবে নিরর্থক। কবির ভাষায় তখন বলতে হবে 'অনেক কথা যাও সে বলি কোনো কথা না বলি, তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি'।

প্রশ্ন হচ্ছে দার্শনিকের এই স্বচ্ছ ভাবনার কঠিন দাবি কত দূর পূরণ করা যায়? কথ্য ভাষায় আমাদের বেশির ভাগ আলাপই কি অস্পষ্ট পদ এবং অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে ঠারে-ঠোরে, ইঙ্গিতে চালিয়ে যাই না? 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থের ভূমিকায় রাসেল মন্তব্য করেছেন যে হুইটগেনস্টাইন বচনীয় আর অনির্বচনীয়ের বিভাজন কথ্যভাষার অনুষঙ্গে করছেন না, তিনি কোনো আদর্শ ভাষা বা আইডিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজের কথা ভাবছেন। মূল 'ট্র্যাকটেটস'-এ আমরা কিন্তু এই মন্তব্যের সমর্থন পাই না। 'ট্র্যাকটেটস'-এর ৫ ৫৫৬৩ এ হুইটগেনস্টাইন লিখছেন 'ইন ফ্যাক্ট, অল অব দা প্রপসিশনস অব আওয়ার এভরিডে ল্যাঙ্গুয়েজ, জাস্ট অ্যাজ দে স্টান্ড, আর ইন পারফেক্ট লজিকাল অর্ডার .'। এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যা যে আমাদের দৈনন্দিন ভাষা তার অপরিবর্তিত রূপেই আদর্শ যৌক্তিক আকারে রয়েছে। তবে বাক্যের এই প্রকৃত যৌক্তিক আকার আপাত দৃষ্টিতে নাও ধরা পড়তে পারে—তার জন্য চাই সঠিক যৌক্তিক বিশ্লেষণ।

ফ্রেগে ও রাসেল-এর প্রভাবে হুইটগেনস্টাইন তাঁর 'ট্র্যাকটেটস'-এ বিশ্লেষণের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেন। যৌগিক বচনকে বিশ্লেষণ করতে হবে সরলতম বাক্যে বা এলিমেন্টারি

প্রপসিশনে, তার পব সরলতম বচনকে বিশ্লেষণ কবতে হবে নাম-পদে - যে নাম-পদেব সমাহাবে বচনটি গঠিত হয়েছে। খেয়াল রাখতে হবে নাম-পদগুলি যেন অস্পষ্ট বা অ্যাম্বিগুযাস না হয়। একটি নাম একটি অবজেক্টকেই সূচিত কববে আব একটি অবজেক্টের একটিই নাম হবে, না হলে, অস্পষ্টতা বচনে বাসা বাঁধবে। এবার নাম-পদ ও সম্বন্ধ-সূচক পদ বা বিলেশানস টার্ম সমাহাবে গড়ে উঠবে সরল বচন তাবপর লজিকের নিয়ম অনুসরণ কবে সবল বচন থেকে নির্মিত হবে যৌগ বচন। 'এবং', 'অথবা', ইত্যাদি লজিকের কানেকটার প্রয়োগ করে একাধিক সবল বচন সম্বন্ধ-যুক্ত হওয়াব ফলে নির্মিত হবে যৌগিক বচন। যদি প্রতি পদে-পদে লজিকের নিয়ম সঠিক ভাবে মেনে চলা হয় তবে আমবা ন্যায্যতই বলতে পাবি 'হোয়াট ক্যান বি সেড অ্যাট অল ক্যান বি সেড ক্লিয়াবলি ' কিন্তু একটু একটু করে পরীক্ষাব মাধ্যমে ভাষাব সবলতম উপাদান দিযে যদি আমবা সবল বাক্য ও পরে যৌগিক বাক্য নির্মান না করি তবে অর্থের বিপর্যয় ঘটতে পারে - সর্ষেব মধ্যে ভূত থেকে যেতে পাবে। আর তখন সেই সর্ষেরূপী ভাষার উপাদান দিয়ে যে-বাক্য গঠিত হবে তা হবে দুষ্য। ভাষার আনবিক উপাদানের সাহায্যে ক্রমান্বয়ে লজিকের নিয়ম অনুসাবে জটিলতম বাক্য নির্মানের এই প্রক্রিয়াকে বলে লজিকাল এ্যাটমিজম বা যৌক্তিক আনবিকতাবাদ।

মনে হতে পাবে কেন ভাষাব স্পষ্টতা ও তাব যৌক্তিক কাঠামো নিয়ে এত মাথা ব্যথা? এই পথে কি জগতের পরিচয় মিলবে? এমন যদি হয় যে জগৎ, 'থট্' আর ভাষা এই তিনেব স্বরূপ ভিন্ন ও অসম্পর্কিত তবে ভাষাব স্বরূপ তুলে ধরার মধ্যে দিয়ে জগতের স্বরূপ উন্মোচিত হবে না - জানা যাবে না থট্কে। হ্বিটগেনস্টাইন কিন্তু তাঁর 'ট্র্যাকটেটস'এ জগৎ, ভাষা আর থট্ এই ত্রয়ীকে মনে করেছেন এক সূত্রে গাঁথা-তিনটিই ফ্যাক্ট। তিনি ফ্যাক্ট পদটি একটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফ্যাক্টের কোনো সংজ্ঞা উনি দেন নি, দেন নি কোনো উদাহরণ। তবে বলেছেন জগতে অবজেকট সমাহার বা বস্তুকূট দিয়ে ফ্যাক্ট গডে ওঠে। অবজেকট পদটিও পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এরও কোনো উদাহরণ দেন নি। তাঁর মতে জগতে আছে ফ্যাক্ট আর ভাষায় আছে বচন। বচনও যেমন ফ্যাক্ট থট্ও তেমনি ফ্যাক্ট। বস্তুকূট, বচন ও থট্ তিনটেই ফ্যাক্ট হওয়ার দরুন এই তিনের মধ্যে গুণগত পার্থক্যের কোনো সুযোগ নেই।

অস্বস্তি তবু থেকে যায়। মনে হয় বস্তুকূট বচন আব থট-এব অনুরূপতা স্বীকারের ভিত্তি কী? এই প্রশ্নের উত্তব পেতে গেলে হ্বিটগেনস্টাইন-এর স্ট্রাকচাব বা কাঠামোব ধাবণা বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। বচন পদের সমাহারে গঠিত। তবে পদ যেমন-তেমন করে পাশা-পাশি বসালে বা যে-কোনো পদেব পাশে যে-কোনো পদ বসালেই বচন গঠিত হয না, তার জন্য চাই সুসংবদ্ধ বিন্যাস বা অন্বয়। এই অন্বয়ই হল বাক্যের কাঠামো বা স্ট্রাক্চাব। অনুরূপভাবে জগতে বস্তুকূটেরও বিন্যাস আছে; যেমন, একটা বস্তু আর একটা বস্তুর পাশে থাকলে এক বকম স্ট্রাকচার পাওয়া যায আবার ঐ বস্তুর একটা ওপরে ও একটা নীচে থাকলে আব এক রকম স্ট্রাকচার পাওয়া যায়। একটা বস্তুকূটেব স্ট্রাক্চার ও একটা বচনের স্ট্রাকচাব

যখন অনুরূপ হয় এবং ঐ বস্তুকূটের প্রতিটি বস্তুর সূচক নাম-পদ যখন ঐ বচনে থাকে তখন বচনটি ঐ বস্তুকূটের প্রতিবিম্ব বা প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়ায়। একটি বচনেব স্ট্রাক্চাব বা একটি বস্তুকূটেব স্ট্রাক্চার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তা দেখার বিষয়, বলাব বিষয় নয় 'ইট ক্যান বি শোন অ্যান্ড নট সেড'।

'সেড' এবং 'শোন্'-এব ধারণা প্রথমে খুব অপরিচিত লাগতে পাবে। হ্বিটগেনস্টাইন এখানে একটা অভিনব ধাবণার অবতাবনা করছেন। 'সেড' এবং 'শোন' দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত কোটি সূচিত করে। এ দুটি হল যথাক্রমে বাচ্য এবং অনির্বাচ্যের কোটি। অনির্বাচ্যের ধারণা ভারতীয় দর্শনের মাধ্যমে আমাদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। উপনিষদে পড়েছি সেই পরম সৎ-এর কথা যা অবাঙ-মনস-গোচরম্। হ্বিটগেনস্টাইন কিন্তু ভাষা-অন্তর্গত অনির্বাচ্যেব কথা বলছেন - কোনো আধিভৌতিক অনির্বাচ্য এটা নয়। বচনের স্ট্রাক্চাব বা কাঠামো আমবা চোখে দেখলে বা শুনলে বুঝে যাই যদিও স্ট্রাক্চাবেব স্বতন্ত্র কোনো উচ্চাবণ হয় না। যেমন ধবা যাক, 'বাম বাবনকে বধ কবেছে' এই বচনের উদ্দেশ্য কোন্টা বিধেয় কোন্টা আলাদা কবে বলা না-থাকলেও বচনেব পদগুলিব মানে জানলে এবং ভাষাব যৌক্তিক ব্যাকবণ জানলে আমবা তার অন্বয় জানতে পাবি। অন্বয় বাদ দিযে বচন হয় না, অথচ অন্বয বচনে উচ্চাব নয়। বাক্যের অন্বয় উদ্দেশ কবতে গেলে একটা মেটা লেভল বা দ্বিতীয় পর্যায়ে একমাত্র তা কবা যায়। হ্বিটগেনস্টাইন দ্বিতীয় পর্যাযেব ভাষা, অর্থাৎ, ভাষাব-মাধ্যমে-ভাষা সম্বন্ধে কথা বলাব বা মেটা-ল্যাঙ্গুযেজ স্বীকার কবাব পক্ষপাতী নন। বাসেল অবশ্য 'ট্র্যাকটেটস'-এব ভূমিকায দাবি কবেছেন যে হ্বিটগেনস্টাইন মেটা-ল্যাঙ্গুয়েজ স্বীকাব করেন।

আনবিক বচন ও আনবিক বস্তুকূটেব অনুরূপতা প্রতিষ্ঠিত হয় যুগপৎ উভয়েব স্ট্রাকচাব বা কাঠামোর অনুরূপতা ও বচনেব পদেব সঙ্গে বস্তুকূটেব বস্তুর নাম ও নামী সম্পর্কেব মধ্যে দিয়ে। স্ট্রাকচারেব অনুরূপতা অনির্বাচ্য ফলে 'শোন্' বা দৃশ্য বচন ও বস্তুকূটেব অনুরূপতা স্থাপন কবতে কেবল আনবিক বচন ও আনবিক বস্তুকূটেব স্থল বিবেচ্য। যে-বচনে বচনেব অংশ হিসেবে অন্য কোনো বচন অবস্থান কবে না, তাই আনবিক বচন। অনুরূপভাবে যে বস্তুকূটেব মধ্যে অপর কোনো বস্তুকূট অংশ হিসেবে অবস্থান করে না, তা আনবিক বস্তুকূট। যেমন সমস্ত যৌগিক বচনকে আনবিক বচনে বিশ্লেষণ কবা যায়। তেমনি সমস্ত যৌগিক বস্তুকূটকে আনবিক বস্তুকূটে বিশ্লেষণ করা যায। এবপব একটি আনবিক বস্তুকূটেব মধ্যে একটি আনবিক বচনের সমরূপীতা আছে কিনা অর্থাৎ বচনটি বস্তুকূটেব প্রতিবিম্ব বা পিক্চার কিনা তাও 'দেখা' যায় যদিও বলা যায না। এই প্রক্রিয়ায দৃশ্য জগতের একটা স্বচ্ছ ছবি ভাষাব মধ্যে ধবা পড়ে।

ভাষা বা জগৎ কোনোটাই অপরিবর্তনীয় নয়। তাহলে এমন কি ভাবা যেতে পারে যে এদের যে-কোনো একেব পবিবর্তনেব ফলে অপবটিব সঙ্গে সমরূপীতা ঘুচে যেতে পারে? এ সম্ভাবনা হ্বিটগেনস্টাইন বাতিল করেছেন। পরিবর্তনেব সম্ভাবনা স্বীকার কবেও ভাষা ও জগতেব ভবিষ্যৎ সমরূপীতা সিদ্ধ করা যায়। হ্বিটগেনস্টাইন কাঠামোব সমরূপীতাব কথা

বলেছেন। জগতেব যা কাঠামো বস্তুকূটেবও তাই কাঠামো।

এই কাঠামো বা ফর্ম প্রতিটি প্রচলিত ভাষা ও সম্ভাব্য ভাষাবই এক। লজিকের ফর্মে বা কাঠামোতে কোনো অভূতপূর্ব সংযোজন হতে পারে না। তেমনি জগতেব কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। জগৎ ও ভাষার কাঠামোর মধ্যে এমন পূর্বতঃসিদ্ধ অনুরূপীতাব দাবি করা কি সঙ্গত? 'ট্র্যাকটেটস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন এমন দাবিই কবেছেন।

অবজেক্টেব পরিচয় হ্বিটগেনস্টাইন দিয়েছেন এক অপবিবর্তনীয় ধ্রুবক রূপে। এখন দেখা যাক অবজেক্ট বলতে উনি ঠিক কী বোঝেন? এটা একটা কূট প্রশ্ন। অবজেক্ট বৈশেষিকদের স্বীকৃত দ্রব্য নয়, সাদা বাঙালায় যাকে বস্তু বলি তাও নয়। অবজেক্টকে কখনও একক রূপে পাওয়া যায় না। তা সব সময় অপরাপব অবজেক্টেব সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে থাকে। ফলে অবজেক্টেব কোনো স্বতন্ত্র নমুনা পাওযা যাবে না। হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে অবজেক্ট একটি 'কপট ধারণা' বা 'সিউডো কনসেপ্ট'। হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন অবজেকটেব ফর্ম আছে। ওঁর মতে ফর্ম মাত্রই দৃশ্য ও অনির্বাচ্য। অবজেক্টেব ফর্ম নির্ধারণ কবে দেয অপরাপর কোন্ অবজেক্টের সঙ্গে একটি অবজেক্ট সম্পর্কিত হতে পাবে আব কোন্ অবজেক্টেব সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পাবে না। একটি অবজেক্টের সব সম্ভাব্য সম্পর্ক রূপায়িত নাও হতে পাবে। অবজেক্টের সমগ্র সম্ভাব্য সম্পর্ক তাব মধ্যে পূর্বনির্ধারিত থাকে - নতুন কোনো সম্ভাবনাব সংযোজন হয় না। জগতে নতুন বস্তুকূটেব আবির্ভাব মানে অবজেক্টের পূর্বনির্ধাবিত সম্ভাবনাগুলির মধ্যে থেকে কোনো একটিব নতুন বাস্তবায়ন। একটু ভাবলেই বোঝা যাবে অবজেকটের এই ধ্রুব স্বরূপ স্বীকার কবলে এবং অবজেক্ট এভাবে বস্তুকূটেব বিন্যাসকে প্রভাবিত করলে পাশাপাশি ভাষাবও একই চেহারা পাওযা যাবে ঃ নাম-পদ বচনের অন্বয়কে প্রভাবিত করবে আব তা কবলে সরল যুক্তিব টানেই হ্বিটগেনস্টাইনকে বলতে হয 'দেয়াব ক্যান বি নো সাবপ্রাইজেস ইন লজিক'। লজিক বলতে হ্বিটগেনস্টাইন বুঝেছেন দ্বিমান যুক্তিবিদ্যা বা টু-ভ্যালুড্ লজিক। সব লজিকই শেষ অবধি এই দ্বিমান যুক্তিবিদ্যায অনূদিত হতে পারে বলে তাঁর বিশ্বাস।

আক্ষেপের বিষয় এই যে, ভাষা নিয়ে এত আলোচনাব পবেও জগতেব অর্থ, তাব রহস্য, দুর্বোধ্য থেকেই যায়। এ সবের মানে কী জানতে চাইলে হ্বিটগেনস্টাইন বলবেন 'দা সেন্স অব দা ওযার্ল্ড মাস্ট লাই আউটসাইড দা ওযার্ল্ড'। অর্থাৎ জগতের মানে জগতেব বাইবে বিবাজ কবে।

আমরা বিজ্ঞানেব সাহায্যে জগতের যে পবিচয পাই তা জগতেব খণ্ডাংশেব পবিচয মাত্র। জগৎ হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে সসীম ও অখণ্ড-লিমিটেড্ হোল। সসীম অখণ্ড জগৎ বলতে কী বুঝছেন না-জানলে জগতের মানে জানা হবে না। বিজ্ঞানেব সমস্ত সম্ভাব্য প্রশ্নেব উত্তব দেওয়াব পবেও জীবনেব রহস্য থেকেই যাবে 'দা প্রবলেমস অব লাইফ রিমেন কমপ্লিটলি আনটাচ্ড'। হ্বিটগেনস্টাইন 'ট্র্যাকটেটস'-এ যে ভাষা, যে লজিক যে ব্যবহাবেব কথা বলছেন তা সবই বিজ্ঞানের অনুষঙ্গে বলা হচ্ছে। ভাষা ও তাব যৌক্তিক কাঠামো সম্বন্ধে

এত কথা বলাব পবেও যখন জগতেব বহস্য উদঘাটিত হয় না তখন আমবা বুঝি যে ভাষা অথবা বিজ্ঞান কোনোটাই এই বহস্য ভেদ কবতে পাববে না। অন্যদিকে ভাষাকে না-বোঝা অবধি তাব সীমাবদ্ধতাও বোঝা যায় না। ভাষার সীমাবদ্ধতা বোঝাব সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝি যে জগতেব বহস্য বুঝতে গেলে বচনেব অবলম্বন অতিক্রম করে অনির্বাচ্যকে বুঝতে হবে। হ্বিটগেনস্টাইন বলছেন 'হি মাস্ট ট্রানসেন্ড দিজ প্রপজিশনস অ্যান্ড দেন হি উইল সি দা ওয়ার্ল্ড আরাইট'।

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বিখ্যাত মই-এর উপমা ব্যবহাব করেছেন - ভাষারূপী মই ব্যবহার করে আমরা যখন ভাষাতীত রহস্যেব গন্ডিতে প্রবেশ কবি তখন মই ফেলে দিলেও চলে।

অনির্বাচ্যেব কোটি খুব সমৃদ্ধ - এতে রয়েছে অধিবিদ্যক সত্য, নৈতিক সত্য ও নান্দনিক সত্য। ভাষাব সীমার বাইরেব এই কোটিকে উদ্দেশ্য কবে বলা হয়েছে 'দা মিস্টিকাল ফোকাস' বা 'রহস্যেব কোটি'। বিজ্ঞান গ্রাহ্য জগৎ হল 'সেড' বা বাচ্য এবং 'মিস্টিকাল ফোকাস' বা রহস্যেব কোটি হল 'শোন্'। চোখেব উদাহরণ দিযে বিষযটা কিছুটা সুবোধ্য কবা যায়। চোখ দিযে আমবা দেখি কিন্তু চোখ নিজেকে দেখতে পায না। তেমনি আমবা ভাষা দিয়ে জগৎকে জানি - ভাষাব আওতা দিয়ে নির্দিষ্ট হয় জগতের আওতা (দা লিমিটস অব মাই ল্যাঙ্গুয়েজ আব দা লিমিটস অব মাই ওয়ার্ল্ড)। চোখ যেমন চোখকে দেখতে পায না, তেমনই ভাষা তাব নিজেব সম্বন্ধে কথা বলতে পারে না - তাব সীমানা সম্বন্ধে কথা বলতে পাবে না - সীমানা দেখাতে পাবে মাত্র। এই কাবণেই বোধ হয হ্বিটগেনস্টাইন তাঁব 'ট্র্যাকটেটস' এর মুখবন্ধে লিখেছেন যে তাঁর এই লেখার মূল্য এই যে, ইট শোজ হাউ .. লিটল ইজ অ্যাচিভড হোয়েন দিজ প্রবলেমস আর সলভড' অর্থাৎ ভাষা আব জগতেব সম্পর্ক সুস্পষ্ট কবাব পরে আমরা বুঝি এর দ্বারা দার্শনিক সমস্যার কতটুকু সমাধান পাওয়া যায়।

আমরা জানি হ্বিটগেনস্টাইন এব দর্শন-ভাবনাকে সুস্পষ্ট পর্বে ভাগ করাব প্রচলন আছে। 'ট্র্যাকটেটস'-এর আলোচনা নিঃসন্দেহে তাঁর দর্শনের আদি পর্বেব অন্তর্ভুক্ত, যে-পর্ব 'আর্লি হ্বিটগেনস্টাইন' নামে খ্যাত। বর্তমান ভূমিকাতে অতি সংক্ষেপে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্যের একটা সরল পবিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা হল। সমস্যাব আরো গভীরে প্রবেশ করতে হলে বর্তমান সংকলনের প্রথম চারটি প্রবন্ধ বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। 'ট্র্যাকটেটস'-এব যে কোনো কূট প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা কবতে গেলেই প্রসঙ্গত ঐ গ্রন্থেরই আবো নানা প্রসঙ্গে এসে পবে। যেমন জগৎ ও বাস্তব-সত্ত্বার আলোচনা বা ওয়ার্ল্ড ও বিযালিটি আলোচনাব নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হওয়া স্বাভাবিক। এসে যাবে বস্তুব স্বরূপের আলোচনা, আসবে বস্তুকূটের আলোচনা, সেই সঙ্গে লজিকেরও নানা অনুষঙ্গ অবহেলা কবা যায় না যেমন, নেচার অব নেগেশন-এব কথা বলতেই হয়। আবার চিত্ররূপীতা বা পিকচারিং-এর প্রসঙ্গেও ঐ একই আলোচনাগুলি এসে পড়ে। ফলে, প্রথম চারটি প্রবন্ধে কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা ঘুবে ফিবে এসছে। এতে পাঠকেব সুবিধেই হবে - একই বিষয় যখন নানা অনুষঙ্গে আলোচিত

হয় তখন বিষয়গুলির নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিক ধরা পড়ে। আবার বিভিন্ন লেখকের হাতে একই সমস্যা নানা মাত্রা পায়। হয়ত সব লেখকের ভাষ্য এক নাও হতে পারে, না হওয়াই স্বাভাবিক, মনে রাখতে হবে 'ট্র্যাকটেটস' একটি ধ্রুপদী গ্রন্থ বা ক্ল্যাসিক টেক্সট। ক্ল্যাসিকের বৈশিষ্ট্যই হল যে তা নানা পাঠান্তরের সুযোগ দেয়, বারবার ভাবায়। বর্তমান সংকলনে আমরা সম্পাদকীয় ফতোয়া জারি করে সব লেখককে একস্বরে কথা বলতে বলি নি। আমরা চাই এই বই-এর পাঠককে তাঁর নিজের সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করতে, সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে নয়।

প্রথম প্রবন্ধে ঝুমা চক্রবর্তী 'ট্র্যাকটেটস'-এর মূল জগৎ-তত্ত্ব অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বোঝানর চেষ্টা করেছেন। আমরা জানি ট্র্যাকটেটস,'-এর গোড়ার সূত্রগুলি আধিবিদ্যক তত্ত্ব সংক্রান্ত - যদিও আলোচনাটি ভাষা ও যুক্তিতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিত থেকে করা।

প্রথম প্রবন্ধের অধিবিদ্যক আলোচনা থেকে আমরা চলে যেতে পারি ভাষা ও জগতের সম্বন্ধ-নিরূপণে যা সৌমিত্র বসুর প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়। একটি বাক্যের মাধ্যমে কেমন করে আমরা পৌঁছে যেতে পারি জগতের ফ্যাক্টস-এ বা বস্তুকূটে। একটি বাক্য কখন অর্থপূর্ণ হয়, কী করেই বা বাক্যের যাথার্থ্য নিরূপিত হয়। সৌমিত্র বসুর প্রবন্ধের সঙ্গে রূপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের কিয়দংশে মিল আছে। তবে রূপা কেবল চিত্ররূপীতা আলোচনা করেন নি, তিনি এই তত্ত্বের বিবর্তনের কথাও বলেছেন। অর্থাৎ 'ট্র্যাকটেটস'-পর্ব অতিক্রম করে কী করে, ও কেন, হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শন-ভাবনা পরবর্তী পর্যায়ে মোড় ঘুরে গেল তার আলোচনা।

এই পরিবর্তনের ইতিহাসে যাওয়ার আগে আমাদের আরো ভালভাবে ভাষা ও জগতের সম্পর্ক বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কেন হ্বিটগেনস্টাইন 'ট্র্যাকটেটস'-পর্বে মনে করতেন ভাষার মাধ্যমে জগৎ জানা যায়, মনে করতেন – জগৎ জানার জন্য কোনও স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় উপাত্ত প্রয়োজন হয় না। এর উত্তর পেতে গেলে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তৃতীয় প্রবন্ধের বিষয় বুঝতে হবে। ইন্দ্রানী সান্যাল একটি অত্যন্ত দুরূহ বিষয় বেছে নিয়েছেন - লজিকল স্পেস বা যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি। এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দেওয়ার পরে তিনি আলোচনাটিকে সাম্প্রতিক একটি আলোচনার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। এটি হল পসিবল ওয়ার্ল্ডস-এর আলোচনা। অধুনা এই প্রসঙ্গটি বহুল আলোচিত হলেও এই আলোচনার সূত্রপাত পাওয়া যায় হ্বিটগেনস্টাইন-এর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে ফ্রেগে ও রাসেল বিশেষভাবে প্রভাবিত করেন হ্বিটগেনস্টাইন-কে। এই প্রভাবের অন্যতম সূত্র ফ্রেগে-র থট্ বিষয়ে আলোচনা। 'ট্র্যাকটেটস'-এর ভাষা ও জগৎ বিষয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, যদি না থট্ নিয়ে আলোচনা করা হয়। অথচ বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ও অধিকাংশ ভাষ্যে থট্ এর আলোচনা স্থান পায় না। এই শোচনীয় ঘাটতি কিছুটা পূরণ করবে অমিতা চ্যাটার্জীর 'চিন্তাভাবনা' প্রবন্ধটি, এখানে আলোচিত হয়েছে ফ্রেগে-র সঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন-এর পার্থক্য কোথায়। ফ্রেগে-র দ্বারা

এত প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও কেন হ্বিটগেনস্টাইন-কে থট্ বিষযে ভিন্ন মত পোষণ কবতে হয়।

এই সংকলনেব প্রথম চাবটি প্রবন্ধগুচ্ছ বিশেষ কবে হ্বিটগেনস্টাইন-এব আদি পর্বেব আলোচনাব ওপব প্রতিষ্ঠিত। এব পব তাঁব শেষ পর্যাযেব আলোচনায প্রবেশ করাব আগে তাঁর চিন্তাব মোড আদৌ ঘুবেছিল কিনা তা নিযে আলোচনা কবেছেন তুষারকান্তি সবকার। এই বিষযটি বিতর্কিত। ট্র্যাকটেটস' পর্যাযেব আন্বীক্ষিকী ও 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এর আন্বীক্ষিকী কি সমগোত্রীয় নাকি বিজাতীয? অনেকে এই দুই পর্বের দর্শন-চিন্তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোটিতে বাখতে চান যার ফলে আমবা 'আর্লি বা আদি হ্বিটগেনস্টাইন' ও 'উত্তর বা লেটাব হ্বিটগেনস্টাইন' এই লেবেলগুলি পাই। আবাব কেউ মনে কবেন দুই পর্বে মিল রযেছে, যদিও সব ক্ষেত্রে নয। তুষাবকান্তি সবকাব অবশ্য স্ট্রং কনটিনুইটি থিসিস স্বীকাব কবেন। তাঁব মতে দুই পর্বে আদৌ কোনো ছেদ নেই।

সব সত্ত্বেও অস্বীকাব কবাব উপায় নেই যে তাঁব 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থেব মুখবন্ধে হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর এই গ্রন্থের সঙ্গে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থেব প্রতিতুলনা কবেছেন। আব এই প্রতিতুলনার কেন্দ্রে আছে তাঁর অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্ব যা শেফালী মৈত্রের প্রবন্ধেব বিষয। অগাস্টিন-কে দাঁড কবান হয়েছে 'ট্র্যাকটেটস' ঘবানাব সব অর্থতত্ত্বেব প্রতিভূরূপে, যা বলা যায় তাঁর পববর্তী পর্যায়েব দর্শন-ভাবনাব পূর্ব পক্ষ। হ্বিটগেনস্টাইন-এর দ্বিতীয় পর্যাযেব লেখাব আগে ছিল এক প্রাক্ পর্ব, যখন আদি পর্ব শেষ আব উত্তব পর্ব শুরুব মুখে। 'ট্র্যাকটেটস'-এর পর্যাযে হ্বিটগেনস্টাইন একটি আনবিক বচনকে অপবাপব আনবিক বচন থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরীক্ষা কবেছিলেন। পরবর্তীকালে এই বিচ্ছিন্ন পবীক্ষা তিনি বাতিল কবেন। এই সময় এক দিকে যেমন ভষার আনবিক বিশ্লেষণের সমালোচনা করেন অপর দিকে উনি দাবাখেলার সঙ্গে ভাষাব সাদৃশ্য প্রতিষ্ঠা কবাব চেষ্টা কবেন। হ্বিটগেনস্টাইন-এব মধ্যবর্তী পর্যায়ে তিনি ফর্মালিস্ট গাণিতিকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। এই ফর্মালিস্টদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জার্মান গাণিতিক ডেভিড হিলবার্ট (১৮৬২-১৯৪৩)। ফর্মালিস্টদের মতে দাবাব ঘুঁটি যেমন কোনো কিছুব প্রতীক নয তেমনি ভাষাব বচনও জগতেব কোনো বস্তুকূটেব প্রতিবিম্ব নয। দাবার নিয়মের অনুরূপ ভাষায় রয়েছে যৌক্তিক অন্বয বা লজিকাল সিনট্যাক্স। এই দুই-এব নিয়মেব মধ্যে বয়েছে একাধিক সাদৃশ্য, প্রথমত নিয়মগুলির কোনো ফাউন্ডেশন বা ভিত নেই, এরা কোনো কিছুবই-দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে স্বতন্ত্র। দ্বিতীযতঃ এই নিয়মগুলি ঐচ্ছিক। নিযমগুলি যেমন আছে তেমন না হযে অন্য বকম হতে পাবত। নিযম বদলেব সঙ্গে সঙ্গে খেলাব রূপ বদলে যায। দাবাব নিয়মেব সঙ্গে যৌক্তিক নিযমের একটাই পার্থক্য— ভাষাব যৌক্তিক অন্বযেব ওপব বচনেব অর্থবহতা চাপানো যায় অর্থাৎ সিনট্যাক্সের সঙ্গে সিম্যানটিক্স যুক্ত হতে পাবে যা দাবাব ক্ষেত্রে হয় না। দাবার নিয়মের কোনো অর্থবহতা নেই, এগুলি নিছক নিয়ামক বিধি। ফর্মালিস্টরা দাবার উদাহরণ ব্যবহাব করেন গণিতের ফর্মকে

প্রাধান্য দেবাব জন্য আব হ্বিটগেনস্টাইন দাবার উদাহবণ ব্যবহাব কবেন ভাষাব নিযামক বিধির অধ্রুবত্ব বোঝানোব জন্য। 'ট্র্যাকটেটস'-এব পর্যায়ে ভাষাকে গণিতেব অনুরূপ ভাবা হয়েছিল তাই অনুসৃত হচ্ছিল ক্যালকুলসের মডেল। মধ্যবর্তী পর্যায়ে ক্যালকুলসেব মডেল বজায় রেখে মনে কবা হয়েছিল যে ক্যালকুলসেব নিয়ম দাবার নিযমের মত অধ্রুব।

হ্বিটগেনস্টাইন-এব শেষ পর্যায় শুরু হয় ক্যালকুলস মডেলেব সমালোচনাব মধ্য দিয়ে। উনি ভাবতে আবম্ভ করেন ক্যালকুলসেব নিয়ম যদি আপেক্ষিক হয়, আর বদল হতে থাকে, তাহলে ক্যালকুলসও হয়ে দাঁড়ায় দাবা খেলাব মত একটা খেলা বা ক্রীড়া।

এবাব হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন ভাষাও একটা ক্রীড়া বা 'ল্যাঙ্গুযেজ গেম' সে ভাষা কথ্য ভাষাই হোক আব কৃত্রিম ভাষাই হোক। ভাষা ক্রীডায় পৃথক পৃথক পদ ব্যবহাবেব জন্য পৃথক-পৃথক প্রশিক্ষণ দবকার। প্রশ্ন হচ্ছে হ্বিটগেনস্টাইন ক্রীডা বা গেম বলতে ঠিক কী বুঝেছেন?

রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁব প্রবন্ধ 'হ্বিটগেনস্টাইন-এব বাগার্থতত্ত্ব বিবর্তন'-এ বিস্তাবিতভাবে আলোচনা কবেছেন হ্বিটগেনস্টাইন কীভাবে তাঁব আদি পর্বেব অগাস্টিনীয় বাগর্থ-তত্ত্ব থেকে ভাষা-ক্রীডাব বাগার্থ-তত্ত্বে উপনীত হলেন। এই আলোচনাব সূত্র ধবে তিনি সাম্প্রতিক বিতর্কের সঙ্গেও আমাদেব পবিচিত কবেছেন।

হ্বিটগেনস্টাইন-এব লেখা থেকে আমবা জানতে পারি যে ক্রীডাব এমন কোনও ধর্ম নেই যা দেখে বোঝা যায় ক্রীডা কী। বিভিন্ন খেলাব মধ্যে আছে পরিবাবোপম সাদৃশ্য বা ফ্যামিলি রিসেমব্লান্স। কোনো খেলাতে আছে প্রতিযোগিতা, কোনো খেলায নেই, কোনো খেলা দল-বেঁধে খেলতে হয কোনোটা বা একা, কিছু খেলায নিয়ম আছে কিছু খেলায নিয়ম নেই, কোনো খেলা নিছক মনোবঞ্জনের জন্য, কোনো খেলা তা নয। ফলে, খেলা কাকে বলে তাব কোনো আবশ্যিক ধর্ম বা নেসিসাবি কনডিশন নেই, আছে একটা জটিল পবিবারোপম সাদৃশ্য। পবিবাবোপম সাদৃশ্য নিয়ে বিস্তাবিত আলোচনা কবেছেন এণাক্ষী মিত্র। একটি পবিবাবের সদস্যদেব মধ্যে নির্দিষ্ট একরূপীতা না-থাকলেও তাদেব একই পবিবারেব সদস্য হিসেবে চেনা যায়। এক সদস্যেব সঙ্গে আব এক সদস্যেব চুলের রঙ আর নাকের গডনের মিল থাকতে পারে আবার অপর এক জনের সঙ্গে তাব উচ্চতা আব গায়েব রঙ মিলতে পাবে। এইভাবে একে অপবের সঙ্গে কিছু কিছু মিল কিছু কিছু অমিল থাকার ফলে কোনো সাধাবণ ধর্ম চিহ্নিত করা যায় না।

মনে হতে পারে হ্বিটগেনস্টাইন-ই প্রথম পরিবাবোপম সাদৃশ্যেব কথা বলেছেন। তাঁর 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থের এটা একটা কেন্দ্রীয ভাবনা হলেও সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবনা এটা নয়। আমবা এর আগে মিল, নিট্শে ও উইলিয়াম জেমস-এর লেখায় এ জাতীয ধাবণাব পবিচয় পাই। ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এব ভাষা ক্রীডার ধারণাকে মূলসূত্র হিসেবে ব্যবহাব করাব মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য দর্শনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এল। অ্যাবিস্টটলেব কাছ থেকে আমবা শিখেছি কোনো পদের সংজ্ঞা দিতে গেলে সেই পদেব

আবশ্যিক শর্ত ও অনিবার্য শর্ত জ্ঞাপন কবতে হয। সে জাযগায হ্বিটগেনস্টাইন বলছেন পদেব সংজ্ঞা পবিবাবোপম সাদৃশ্য দিযে বুঝতে হবে। একই পদ বিভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহাব হতে পাবে এবং এক এক অনুষঙ্গে তাব মানে বদল হতে পাবে যদিও প্রতিটি ব্যবহাবে পদেব অর্থেব একটা পবিবাবোপম সাদৃশ্য থাকছে। তেমনি ভাষাও ব্যবহাব হয নানা প্রযোজনে কখনও তা দিয়ে বিবৃতি দেওয়া হয, কখনও প্রশ্ন কবা হয, কখনও সাবধানতা জ্ঞাপন কবা হয, আবার কখনও আবেগ প্রকাশেব জন্য ভাষা ব্যবহার হয। এই সমস্ত ব্যবহাবে নিহিত কোনো সাধাবণ ধর্ম খুঁজতে যাওয়া বৃথা। আমবা যা পেতে পাবি তা শুধু পাবিবাবোপম সাদৃশ্য।

স্বভাবতই ভাষাকে ক্রীডারূপে দেখলে আব বলা যাবে না সে - ভাষাব একটা পূর্বনির্ধাবিত যৌক্তিক কাঠামো আছে যা সব ভাষায় অনুরূপ, অথবা বলা যাবে না একটি পদেব একটি অর্থ থাকা উচিত - ভাষায় অস্পষ্টতার কোনো স্থান নেই, বা বলা যাবে না যে, যা বলা যায় তা স্পষ্ট কবে বলা যায়। পবিবর্তে বলতে হবে ভাষাব স্বরূপ নির্ধারিত হয তাব প্রয়োগেব মধ্যে দিযে। এটাই হ্বিটগেনস্টাইন-এব বিখ্যাত 'ইউস থিওবি অব মিনিং' বা ভাষাব প্রযোগ ভিত্তিক তত্ত্ব। 'ট্রাকটেটস,'-এ ভাবা হয়েছিল প্রতিটি নাম পদ একটি অবজেক্টকে উদ্দেশ্য কবে এবং আনবিক বচন মাত্রই কোনো বাস্তব বা সম্ভাব্য বস্তুকুটেব প্রতিবিম্ব।

'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এ বলা হচ্ছে এমন মনে কবাটা একটা বিশেষ ধবণেব ভাষা-ক্রীডাব ফল, অন্য খেলা খেললে ভাষা ও জগতেব সম্পর্ক অন্য বকম দাঁড়াবে। একটা খেলায শব্দেব একবকম প্রয়োগ আব এক খেলায সেই শব্দেব প্রযোগ বদল হয়ে যেতে পাবে। আবশ্যিক প্রযোগ থাকছে না। ভাষাব যথার্থ আব অযথার্থ প্রযোগ নিরূপিত হয কোনো বিশেষ ভাষা ক্রীড়াব নিবিখে। ক্রীড়া বদল হলে যথার্থ অযথার্থেব মানও বদল হবে।

প্রশ্ন জাগতে পাবে ভাষা যদি ক্রীডা হয তাহলে তাব ব্যাকবণ, তাব যৌক্তিক কাঠামো সবই কি প্রযোগেব মধ্যে দিযে প্রতিষ্ঠিত হবে? হ্বিটগেনস্টাইন-এব মত তাই। তবে কি ভাষায 'রুল ফলোয়িং' বা নিযমানুবর্তিতা থাকবে না, থাকবে না নেসেসিটি বা আবশ্যিকতাব ধাবণা? প্রুফ বা প্রমাণ ও গাণিতিক সত্যেব পবিণতি কী হবে? হ্বিটগেনস্টাইন আমাদেব আশ্বস্ত কবে বলেন : এ সবই আগেব মত থাকবে, থাকবে ভাষাব ঋজুতাও। প্রযোগেব আপেক্ষিকতাব জোযাবে আবশ্যিকতা বিসর্জিত হবে না। উনি অ্যাবসোলিউট নেসেসিটি বা চূড়ান্ত আবশ্যিকতা ও চূড়ান্ত আপেক্ষিকতাব মাঝামাঝি একটা অবস্থান বেছে নিচ্ছেন। আবশ্যিকতাব মান কোনো ভাষা-ক্রীডা নিবপেক্ষ হয না। প্রতিটি ভাষা-ক্রীডাব নিজস্ব আবশ্যিক ব্যাকবণ ভাষা-প্রযোগেব নিযম ও প্রমাণাদি অনন্য। ঠিক খেলাব ক্ষেত্রে যেমন হয, ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিসেব নিজস্ব আবশ্যিক নিযমাবলী আছে, কোনো নিযমটাই খেলাব অনুষঙ্গ নিবপেক্ষে যে-কোনো খেলাব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয।

নিয়মানুবর্তিতাব প্রসঙ্গ অবশ্য অত্যন্ত জটিল ও বিতর্কিত। সাম্প্রতিক বিতর্কেব একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি আমবা পাই প্রিযম্বদা সবকাবেব প্রবন্ধে। রুল ফলোযিং সম্বন্ধে আলোচনা

করতে গিয়ে তাঁকে অবশ্যই আনতে হয়েছে স্কেপ্‌টিক বা সংশয়বাদীর নানা আপত্তি। রুল ফলোয়িংকে স্কেপটিসিসম-এর অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে আলোচনা করলে সাম্প্রতিক বিতর্কের মূল জায়গা ধরা যাবে না।

শুধুই যে রুল ফলোয়িং-এর আলোচনাক্রমে সংশয়বাদীর নানা কূটপ্রশ্নের মুকাবিলা করতে হয় তা নয়। সংশয় ও ধ্রুবত্ব বা সার্টেন্‌টির প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আসে হ্বিটগেনস্টাইন-এর উত্তর পর্বের লেখায়। নির্মাল্য চক্রবর্ত্তী তাঁর নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধে বুঝিয়েছেন হ্বিটগেনস্টাইন কীভাবে সংশয়বাদকে খণ্ডন করেছেন।

সংশয়বাদকে খণ্ডন করলেও হ্বিটগেনস্টাইন 'ট্র্যাকটেটস' উল্লিখিত যৌক্তিক কাঠামোর ধ্রুবত্ব আর স্বীকার করেননি।

'ট্র্যাকটেটস' থেকে সরে গিয়ে তিনি স্বীকার করছেন এক এক ভাষা-ক্রীড়ার এক-এক নিয়ম। আশঙ্কা হতে পারে ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন আপেক্ষিকতাকে স্থান দিলে আমরা ছাড়পত্র পেয়ে যাব স্ব-স্ব ব্যক্তিগত ভাষা তৈরি করার। এভাবে কি আমরা আবদ্ধ হয়ে যাব না যার যার নিজের ভাষার গণ্ডির ভেতরে? আমরা একে অপরের ভাষা বুঝব কিসের 'ভিত্তিতে', ভিত ও ভিত্তির ধারণা 'ট্র্যাকটেটস'-এ যেমন প্রকট 'ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থে ঠিক তেমনই পাই তার অভাব। এই পর্যায়ে হ্বিটগেনস্টাইন-এর ঝোঁকটা যেন ভিত বা ভিত্তিকে সম্পূর্ণ নাকচ করার দিকে। ভাষ্যকারদের মধ্যে অবশ্য মতান্তর রয়েছে। আমরা আগেই বলেছি ঃ কেউ বলেন হ্বিটগেনস্টাইন এর লেখার পর্যায় বিভাগ আপাত, প্রকৃত নয়, তিনি আগাগোড়া একই দার্শনিক মতবাদ পোষণ করে আসছেন, আলোচনার টানে নতুন-নতুন প্রসঙ্গ এসে গেছে এই যা। আর একদল ভাষ্যকারের মতে আদি-পর্বের লেখা আর শেষ-পর্বের লেখায় রয়েছে মৌলিক পার্থক্য। এই বিতর্ক তীব্র ভাবে দানা বেঁধে উঠেছে হ্বিটগেনস্টাইন-এর ফর্ম অব লাইফ বা যাপনের প্রেক্ষাপটের ধারণাকে কেন্দ্র করে; যা সবিতা চক্রবর্ত্তীর প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর লেখায় যাপনের প্রেক্ষাপটের উল্লেখ বিরল হলেও ধারণাটি তাঁর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই নিরিখে তাঁর ভাষা-ক্রীড়ার ধারণাটি বুঝতে হয়। প্রতিটি ভাষা-ক্রীড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে একটা যাপনের প্রেক্ষাপট। হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেন আমরা যা বিশ্বাস করি, যে আদর্শ স্বীকার করি, যে ভাবে কাজ করি তার মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে, আছে একটা প্যাটার্ন বা নক্সা। ইতিহাসের কোনো একটা সময়ে দাঁড়িয়ে মানুষ সেই সময়ের জ্ঞানের, বিশ্বাসের, মূল্যবোধের সমন্বিত নক্সা সম্বন্ধে সচেতন থাকে - এই সচেতনতা সে তার পরিবেশ থেকে পায় এবং এটা তার যাপনের ভেতর দিয়ে প্রকাশ পায়। একটি ভাষা-ক্রীড়ার অংশ-গ্রহণ করা মানে যথেচ্ছাচার নয় - এর মানে সেই খেলার নিয়ম বা রুল পালন করা। শুধু তাই নয়, সেই ক্রীড়ার যাপনের প্রেক্ষাপটও জানতে হবে। যাপনের প্রেক্ষাপট না-জেনে ভাষা-ক্রীড়ায় অংশ-গ্রহণ করা যায় না। হ্বিটগেনস্টাইন-এর সেই বিখ্যাত উক্তি মনে রাখতে হবে 'ইফ এ লায়ন কুড টক, উই কুড নট আন্ডারস্ট্যান্ড হিম' - সিংহকে বুঝতে গেলে

তাব যাপনের প্রেক্ষাপট জানতে হবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে নানা ভাষা-ক্রীডা আমরা বুঝতে পাবি যদি তাদের যাপনেব প্রেক্ষাপট বুঝি। কিন্তু 'সব ভাষার একই যৌক্তিক কাঠামো অতএব সব ভাষা বুঝি' এটা বলা যাবে না। প্রথমত, সব ভাষার যৌক্তিক কাঠামো এক নয়, দ্বিতীয়ত, যৌক্তিক কাঠামো জানলেই ভাষা জানা হয় না, চাই যাপনের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে পরিচিতি। আগের প্রশ্নে আমরা ফিরে যেতে পাবি 'ভাষা যদি ক্রীডা হয় তবে পরস্পরের ভাষা-ক্রীডা বোঝার 'ভিত্তি' কী? এর উত্তরে বলতে হবে প্রতিটি ভাষার নিজস্ব নিয়মাবলী আছে - এগুলি জানতে হবে আর জানতে হবে সেই ভাষাব যাপনের প্রেক্ষাপট। দর্শন এখানে আমাদের বিশেষ কাজে লাগে না। দর্শন কেবল একটা ভাষা-ক্রীড়ার বর্ণনা দিতে পাবে 'ইট [ফিলসফি] ক্যান ইন দা এন্ড ওনলি ডেসক্রাইব ইট, ফর ইট্ ক্যান নট গিভ ইট এনি ফাইন্ডেশন আইদাব। ইট্ লিভস এভবি থিং অ্যাজ ইট ইজ'। ভাষাব অনুষঙ্গে এই যদি দর্শনেব কাজ হয়ে থাকে তবে অপবাপব অনুষঙ্গে তার কাজ কী?

দর্শন-চর্চার কোনো একটা বিশেষ পদ্ধতি আছে বলে হিটগেনস্টাইন মনে কবেন না। পৃথক পৃথক সমস্যাব জন্য পৃথক-পৃথক পদ্ধতি ব্যবহাব কবতে হয়। দর্শন আমাদেব সামনে সব কিছু স্পষ্ট করে তুলে ধবে, ব্যাখ্যা দেওয়াব চেষ্টা করে না বা কোনো নিষ্কর্ষে পৌঁছতে চায় না। সবই যখন সামনে বাখা হয়ে যায় তখন আর ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি কিছু লুকোনো থাকে তা নিয়ে দার্শনিকেব কোনো আগ্রহ থাকাব কথাই নয়। দর্শন কখনও বলে না 'এমনটি হতেই হবে' - 'বাট ইট মাস্ট বি লাইক দিস'। যা সকলে স্বীকাব করে দর্শন সে কথাটাই বলে। দার্শনিক সমস্যার সমাধান বলে দেয় না, সমস্যা যাতে আব দেখা না দেয় তাব ব্যবস্থা কবে। প্রায়শঃ দেখা যায দার্শনিক নিজেব জন্য অনেক সমস্যা তৈবি কবে ও সেই সমস্যাব জালে আবদ্ধ হয। এমনই একটি সমস্যা হ'ল (গ্রীক যুগ থেকে যা দার্শনিকদেব ভাবাচ্ছে) স্বনির্দেশক কূটাভাসেব অর্থ ও যাথার্থ্য নিরুপণের সমস্যা। মধুমিতা চট্টোপাধ্যায বিভিন্ন কূটাভাসেব উদাহবণ বিশ্লেষণ কবে দেখিয়েছেন একটি আপাত সমস্যাকে কীভাবে হিটগেনস্টাইন চিহ্নিত কবেন ও নির্মূল কবেন। আমবা বুঝতে পাবি হিটগেনস্টাইন-এব সেই উচ্চাবণেব প্রকৃত অর্থ যখন উনি 'ফিলসফিকল ইনভেস্টিগেশনস' - এ বলেন, 'দা অ্যাসপেকটস অব থিংস দ্যাট আব মোস্ট ইম্পর্টান্ট ফব আস আব হিডেন বিকজ অব দেয়াব সিমপ্লিসিটি অ্যান্ড ফ্যামিলিযাবিটি' (১২৯)। হিটগেনস্টাইন বলেন 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয দর্শনে তোমাব উদ্দেশ্য কী?' আমি বলব, 'বোতলে আবদ্ধ মাছিটিকে বোতল থেকে বেরুনোর পথ-দেখানো-টু শো দা ফ্লাই দা ওয়ে আউট অব দা ফ্লাই বটল'।

হ্বিটগেনস্টাইন ঃ জগৎ ও বাস্তব-সত্তা

ঝুমা চক্রবর্ত্তী

প্রাচীনকাল থেকে অতি আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত দার্শনিকরা যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেছেন তার অধিকাংশই তিনটি মূল বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, বাস্তব-সত্তা, ভাষা এবং চিন্তন (রিয়ালিটি, ল্যাঙ্গুয়েজ এবং থট)। হ্বিটগেনস্টাইন-এর দার্শনিক চিন্তাও এর ব্যতিক্রম নয়। হ্বিটগেনস্টাইন-এর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ট্র্যাকটেটস লজিকো ফিলসফিকস', - এ তাঁর বক্তব্য গড়ে উঠেছে ভাষা, চিন্তন এবং বাস্তব-সত্তা এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে। এই তিনটি বিষয়ই একে অপরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আমাদের চিন্তায় বাস্তব-সত্তা যেভাবে ধরা পড়ে তারই একটি নির্ভরযোগ্য রূপ প্রকাশিত হয় ভাষায়।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থ অবলম্বন করে জগৎ (ওয়ার্ল্ড) এবং বাস্তব-সত্তার (রিয়ালিটি) সম্পর্ক নিরূপণ করা এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। এই বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে গেলে ভাষা এবং জগৎ সম্পর্কে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য জানা প্রয়োজন। বর্তমান আলোচনাটি মূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত। দর্শনের যে কোনো সমস্যা আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের পরিভাষা সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রবন্ধের প্রথম ভাগে জগৎ ও বাস্তব-সত্তার অনুষঙ্গে পরিভাষাগত সমস্যা এবং তার সম্ভাব্য সমাধানের উপায় আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয়ভাগে 'ট্র্যাকটেটস' অবলম্বনে ভাষা এবং জগৎ সম্পর্কে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মূল বক্তব্যটি আলোচিত হবে। তৃতীয় ভাগের উপজীব্য বিষয় জগৎ এবং বাস্তব-সত্তার আলোচনা।

[এক]

'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থটি অবলম্বন করে স্টেট অব এফেয়ার্স, ফ্যাক্ট, ইত্যাদি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যার সম্মুখীন হই। এই সমস্যা কেবলমাত্র মূল জার্মান ভাষা থেকে বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, ইংরেজী অনুবাদের ক্ষেত্রেও এই সমস্যা দেখা দেয়। হ্বিটগেনস্টাইন জগৎ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'টাটসাখে' 'সাখফেরহাল্ট', প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার করেছেন। 'টাটসাখে' বা 'বস্তুস্থিতি' নিয়ে বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না কিন্তু 'সাখফেরহাল্ট' শব্দটির ব্যবহারের অসঙ্গতি, নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে 'সাখফেরহাল্ট' বলতে হ্বিটগেনস্টাইন অনুকায় বস্তুস্থিতি বা আণবিক বস্তুকৃত (অ্যাটমিক ফ্যাক্ট) বুঝিয়েছেন।[১] ('ট্র্যাকটেটস' ২.০১, ২.০১১, ২.০১২, ২.০১২১৩, ২.০১৪১, ২.০২৭২, ইত্যাদি, দ্রষ্টব্য।) তবে কিছু কিছু জায়গায় অস্তিত্বহীন পরিস্থিতি বা নন এক্সিসটেন্ট

সাখফেরহাল্ট -এর কথাও বলেছেন হ্বিটগেনস্টাইন। (যেমন, 'ট্র্যাকটেটস' ২.০৬, ২.০৬২, ২.১১, ৪.১, ৪.২৫, ৪.২৭, ৪.৩ দ্রষ্টব্য।) স্বাভাবিকভাবে 'সাখফেরহাল্ট' - এর ইংরেজী প্রতিশব্দ কী হবে বা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে হ্বিটগেনস্টাইন-বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

স্টেনিয়ুস, এবং পিয়ার্স ও ম্যাকগিনিস-এর মতে 'সাখফেরহাল্ট' শব্দটির দ্বারা বোঝান হচ্ছে যে যৌক্তিক বিচারে সাখফেরহাল্ট নিরংশ, অযৌগ তথা সরল। ম্যাক্স ব্ল্যাক এই প্রসঙ্গে বলেছেন 'হ্বিটগেনস্টাইন স্পিক্স অব টাটসাখে অ্যাজ বিয়িং কম্পোজড অব (রেস্টেটস) সাখফেরহাল্ট। ('ট্র্যাকটেটস' ৪.২২১১) সিন্স এ টাটসাখে ইজ এ (কমপ্লেক্স) ফ্যাক্ট, দিস স্পিক্স ইন ফেভার অব রিগার্ডিং সাখফেরহাল্ট অ্যাজ এ ফ্যাক্ট।'

যে সমস্ত বচন বিশ্লেষণাতীত তাদের প্রতিকল্প বা কাউন্টারপার্ট বোঝাতে 'সাখফেরহাল্ট' শব্দটি হ্বিটগেনস্টাইন ব্যবহার করেছেন। 'সাখফেরহাল্ট' - কে স্টেট অব এফেয়ার্স বা পরিস্থিতি অর্থে ব্যবহার করলে 'সাখফেরহাল্ট' এর এই দিকটি ধরা পড়ে না। অধ্যাপক স্টেনিয়ুস এই অসুবিধের কথা মনে রেখেই 'সাখফেরহাল্ট' অনুবাদ করতে গিয়ে 'অ্যাটমিক স্টেট অব এফেয়ার্স' অর্থাৎ 'অনুকায় পরিস্থিতি' এই শব্দজোট প্রয়োগ করেছেন।

'সাখফেরহাল্ট'-এর অনুবাদ হিসেবে আবার 'অ্যাটমিক ফ্যাক্ট' অর্থাৎ 'অনুকায় বস্তুস্থিতি' এই শব্দজোট প্রয়োগ করলে কিছু সুবিধে নিশ্চয়ই আছে, একথা স্বীকার করতেই হয়। শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'হ্বিটগেনস্টাইনস ট্র্যাকটেটস-এ প্রিলিমিনারি' গ্রন্থে এই সুবিধেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে -

প্রথমতঃ এই প্রয়োগ রাসেল এবং হ্বিটগেনস্টাইন-এর চিন্তার মধ্যে সমতা আনতে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ হ্বিটগেনস্টাইন নিজেই এই প্রয়োগের পক্ষপাতী। 'অ্যারিস্টটেলিয়ান সোসাইটি প্রোসিডিংস'-এ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে হ্বিটগেনস্টাইন নিজেই 'এলিমেন্টারি প্রপসিশন'-এর পরিবর্তে 'অ্যাটমিক প্রপসিশন' ব্যবহার করেছেন। 'সাখফেরহাল্ট' এই অ্যাটমিক প্রপসিশনকেই বোঝায়। ম্যাক্স ব্ল্যাক এই প্রসঙ্গে বলেছেন 'হ্বিটগেনস্টাইন হিমসেল্ফ অ্যালাউড 'অ্যাটমিক ফ্যাক্ট' টু স্ট্যান্ড ইন দা রিভাইজড ইমপ্রেশন (১৯৩৩) অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন দা ওরিজিনল ইংলিশ এডিশন, দোও অন হুইচ হি হ্যাড অ্যান অপারচুনিটি টু করেক্ট। ইট ইজ ইমপ্লজিবল টু সাপপোজ দ্যাট হি ডিড নট আন্ডারস্ট্যান্ড দা ডিফারেন্স বিটউইন মেকিং সাখফেরহাল্ট স্ট্যান্ড ফর এ ফ্যাক্ট অ্যান্ড মেকিং ইট স্ট্যান্ড ফর এ পসসিবিলিটি অব দ্যাট হিজ নলেজ অব ইংলিশ ওয়াজ আনইকোয়েল টু দা টাস্ক অব মেকিং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করেকশনস।"

তৃতীয়তঃ এই ব্যবহার বেশি প্রচলিত

এইসব যুক্তির ভিত্তিতে আমরা 'সাখফেরহাল্ট' এর ইংরেজী অনুবাদ হিসেবে 'অ্যাটমিক ফ্যাক্ট'-কেই গ্রহণ করেছি। 'অ্যাটমিক ফ্যাক্ট'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অনুকায়

বস্তুস্থিতি' শব্দটি ব্যবহার করছি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে 'টাটসাখে' বা 'ফ্যাক্ট'-এর বাংলা প্রতিশব্দ রূপে 'বস্তুস্থিতি' এবং 'সাখফেরহাল্ট'-এর বাংলা রূপে 'অনুকায বস্তুস্থিতি' বর্তমান প্রবন্ধে গৃহীত হয়েছে।

ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড রিয়ালিটি বা জগৎ ও বাস্তব-সত্তা বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে সমস্ত বাংলা বর্তমান প্রবন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে তার একটা তালিকা দেওয়া হল।

১।	অবজেক্ট	---	বস্তু
২।	নেম	—	নাম
৩।	স্টেট অব এফেয়ার্স	---	পরিস্থিতি
৪।	অ্যাটমিক স্টেট অব এফেয়ার্স	-	অনুকায পরিস্থিতি
৫।	ফ্যাক্ট	—	বস্তুস্থিতি
৬।	অ্যাটমিক ফ্যাক্ট	—	অনুকায বস্তুস্থিতি
৭।	প্রপসিশন	---	আনবিক বচন
৮।	এলিমেন্টারি প্রপসিশন	—	আনবিক বচন
৯।	মেটিরিয়াল প্রপার্টি	--	স্বরূপ ধর্ম
১০।	ফর্মাল প্রপার্টি	---	আকারগত ধর্ম
১১।	ফর্ম	---	আকার
১২।	লজিকাল স্পেস	--	যৌক্তিক দেশ
১৩।	ওয়ার্ল্ড	—	জগৎ
১৪।	রিয়ালিটি	—	বাস্তব সত্তা

[দুই]

'ট্র্যাকটেটস'-এর গোড়াতেই হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন জগৎ হল বস্তুস্থিতি ফ্যাকটস-এর সমষ্টি নিছক বস্তুর নয়। (ওয়ার্ল্ড ইজ এ টোট্যালিটি অব ফ্যাকটস নট অব থিংস 'ট্র্যাকটেটস' ১.১)। যদিও জগতের মৌলিক উপাদান হল বস্তু তবুও এই বস্তুকে স্বতন্ত্র ভাবে পাওয়া বা বর্ণনা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে রাসেল এবং হ্বিটগেনস্টাইন দুজনেই জগতের গঠন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অযৌগ মৌলিক পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। রাসেল যৌক্তিক পরমাণু বা লজিকাল অ্যাটম-কে অন্তিম মৌল বলে স্বীকার করেছেন। আর হ্বিটগেনস্টাইন-এর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে বস্তু বা অবজেক্টই জগতের দ্রব্য বা সাবস্টেন্স। তাঁর মতে অবজেক্ট-এর সন্নিবেশে গড়ে ওঠে বস্তুস্থিতি। বস্তুস্থিতি অনুকায হতে পারে বা যৌগ হতে পারে। যৌগ বস্তুস্থিতির অংশ অপরাপর বস্তুস্থিতি। অনুকায বস্তুস্থিতির মধ্যে অপর কোনো বস্তুস্থিতি সন্নিবিষ্ট থাকে না - থাকে শুধু বস্তুর সন্নিবেশ।

বর্ণনার অনুষঙ্গে অনুকায বস্তুস্থিতি হল বর্ণনার ন্যূনতম একক, স্মলেস্ট ডেসক্রিপটিভ ইউনিট। এরপর বিশ্লেষণ অগ্রসর হলে আমরা বর্ণনার কোটি ছাড়িয়ে উদ্দেশ্যর কোটি বা

বেফারেন্সে পৌঁছে যাব। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে বর্ণনা বচনের মাধ্যমেই সম্ভব, নামেব মাধ্যমে নয় এবং উদ্দেশ - বা রেফাবেন্স নামেব মাধ্যমেই সম্ভব, বচনের মাধ্যমে নয। আনবিক বস্তুস্থিতি বিশ্লেষণ কবা যায - আনবিক বস্তুস্থিতি বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় তাব অবযবী বস্তু। ফলে আনবিক বস্তুস্থিতি নিবংশ নয যদিও বর্ণনার ন্যূনতম একক হিসেবে আনবিক বস্তুস্থিতি নিবংশ - কাবণ এব পব আব অংশ বিভাজন এগুলে বস্তুস্থিতি বর্ণনাব ন্যূনতম একক হওযাব ক্ষমতা হাবাবে।

হ্বিটগেনস্টাইন তাঁব 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে বস্তু কথাটি পাবিভাষিক অর্থে ব্যবহাব কবেছেন। খুব সচেতনভাবেই তিনি বস্তুব কোনো দৃষ্টান্ত দেননি। বস্তু স্বরূপ কী এ ব্যাপারে বিস্তাবিত আলোচনায় না গিযে আমবা হ্বিটগেনস্টাইন-এর বস্তুবিষয়ক মূল সিদ্ধান্তগুলিব ওপব আলোকপাত কবব। জগৎ এবং বাস্তব সত্তাব সম্পর্ককে বোঝাব জন্য যতটুকু প্রাসঙ্গিক ততটুকুই আলোচিত হবে।

বস্তুর মূল বৈশিষ্ট্য হল

(ক) প্রতিটি বস্তু গঠনগতভাবে নিবংশ বা সবল।

(খ) এই বস্তুগুলি কখনই স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পাবে না। বস্তুগুলি পবস্পবেব সঙ্গে সংযুক্ত হযে থাকে। (এই সন্নিবিষ্ট বস্তু সমাহাব হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে পবিস্থিতি। এই প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে আমবা এমন কোনো বস্তু কল্পনাই করতে পাবি না যা অন্য কোনো বস্তুব সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত হওযাব সম্ভাবনা বহিত। 'ট্র্যাকটেটস'-এব ২.০১২১ সূত্রে উনি বলেছেন, 'জাস্ট অ্যাজ উই আব কোযাইট আনেব্‌ল টু ইমাজিন স্পেশিযাল অবজেক্টস আউটসাইড স্পেস অব টেম্পোবাল অবজেক্টস আউটসাইড টাইম, সো টু দেযাব ইজ নো অবজেক্ট দ্যাট্ উই ক্যান ইমাজিন এক্সক্লুডেড ফ্রম দা পস্‌সিবিলিটি অব কম্বাইনিং উইথ আদার্স'।

(গ) যেহেতু বস্তুগুলি নিরংশ এদের নামকবণ সম্ভব কিন্তু বর্ণনা সম্ভব নয। ('অবজেক্টস ক্যান ওনলি বি নেমড, 'ট্র্যাকটেটস' ৩.২২১)।

(ঘ) প্রতিটি বস্তুব অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক বা অনিবার্য।

(ঙ) প্রতিটি বস্তুই অবশ্য সৎ এবং অপবিবর্তনশীল। বাস্তব জগৎ এবং সম্ভাব্য জগতে একই বস্তু উপস্থিত, কেবল বাস্তব জগৎ ভিন্ন অন্যান্য জগতে এই বস্তুসমূহেব ক্রম বা সম্বন্ধগুলি ভিন্ন ভিন্ন। (অবজেক্টস আব হোয়াট ইজ আনঅলটাবেব্‌ল আান্ড সাবসিস্টান্ট, দেযাব কনফিগাবেশন ইজ হোযাট ইজ চেঞ্জিং অ্যান্ড আনস্টেব্‌ল, ট্র্যাকটেটস' ২.০২৭১)

(চ) বস্তুব ধর্ম বিষয়ে বলতে গিযে হ্বিটগেনস্টাইন বস্তুব দুবকম ধর্মেব কথা উল্লেখ কবেছেন। বাস্তবিক ধর্ম (মেটিবিযাল প্রপাবটি) এবং আকাবগত ধর্ম (ফর্মাল প্রপাবটি)। একটি বস্তু যখন অন্যান্য বস্তুব সঙ্গে সম্মিলিত হয, তখন তার মধ্যে বাস্তবিক ধর্মেব প্রকাশ ঘটে। যথার্থ অর্থে বাস্তবিক ধর্ম কোনো একটি বস্তুব ধর্ম নয বস্তুসন্নিবেশেব ধর্ম। এই দিক থেকে দেখলে এ জাতীয় ধর্ম যে আগন্তুক

ধর্ম বা বস্তুর বাহ্য রূপ তা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু আকারগত ধর্ম হল বস্তুর স্বরূপ ধর্ম। কোন্ বস্তুর সাথে কোন্ বস্তু সম্মিলিত হতে পাবে তা বস্তুর আকারগত ধর্ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। বস্তুর স্বরূপের মধ্যে নিহিত আছে এই জাতীয় সম্ভাব্য সম্মেলনের পরিসর। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আকারগত ধর্ম ভিন্ন হতে পাবে।

বস্তুর স্বরূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে হিটগেনস্টাইন বলেছেন যে বস্তুকে জানতে হলে বস্তুর বাহ্য ধর্মের জ্ঞান না থাকলেও তার আভ্যন্তরীণ বা আকারগত ধর্মের জ্ঞান থাকা দরকার। বস্তুর আভ্যন্তরীণ বা আকারগত ধর্মের জ্ঞান থাকা মানেই বস্তু কী কী ভাবে কোন্ কোন্ পরিস্থিতিতে সম্মিলিত হতে পারে তা জানা, অর্থাৎ বস্তুর আকার বা ফর্মকে জানা। (ইফ্ আই অ্যাম্ টু নো অ্যান অবজেক্ট দো আই নিড্ নট নো ইট্স এক্সটার্নাল প্রপারটিজ, আই মাস্ট নো অল ইট্স ইনটার্নাল প্রপারটিজ, 'ট্র্যাকটেটস', ২.০১২৩) ইফ্ আই নো অ্যান অবজেক্ট, আই অল্সো নো অল ইট্স পস্সিবল অকারান্সেস্ ইন স্টেটস অব এফেয়ার্স এ নিউ পস্সিবিলিটি ক্যাননট বি ডিসকভার্ড লেটার, 'ট্র্যাক্টেটস', ২.০১২৩)।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে। আমরা যদি বস্তু সমষ্টিকে পেয়ে যাই তাহলে সম্ভাব্য সব পরিস্থিতিকেও আমরা পেয়ে যাব। কারণ বস্তুকে জানা মানেই তার সমস্ত সম্ভাব্য সন্নিবেশকে জানা। যেমন আমরা জানি যে রঙ দেশের সঙ্গে যুক্ত হতে পাবে কিন্তু কালের সঙ্গে নয়। ফলে একটি বস্তুতে যদি রঙের আকার নিহিত থাকে তা হলে আর একটি বস্তুর (যার মধ্যে দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা, ইত্যাদি দৈশিক আকার আছে) সঙ্গে সম্মিলিত হতে পাবে। অথচ রঙের সঙ্গে শব্দের সাযুজ্য ঘটতে পাবে না। একটা বস্তুর আকার জানলে আমরা গোড়াতেই অনুমান করতে পারি বস্তুটি কোন্ কোন্ সম্ভাব্য পরিস্থিতিতে অংশ নিতে পাবে। যেহেতু বাস্তব এবং সম্ভাব্য জগতে একই বস্তু বর্তমান ও অপরিবর্তনশীল এবং যেহেতু বস্তুর আকার থেকে আমরা বস্তুটির সম্ভাব্য সন্নিবেশ জানতে পারি সেহেতু জগতে বস্তুর পরিচয় থেকে আমরা সমস্ত সম্ভাব্য পরিস্থিতিকেও পেয়ে যাই। তাই 'ট্র্যাকটেটস'-এর ২.০১২৪ সূত্রে হিটগেনস্টাইন বলেছেন ইফ্ অল অবজেক্টস আর গিভেন, দেন অ্যাট দা সেম টাইম অল পসসিবল স্টেটস অব এফেয়ার্স আর অল্সো গিভেন।

বস্তুর আলোচনা প্রসঙ্গে 'পরিস্থিতি' পদটি অনেকবার উল্লেখ করতে হয়েছে। হিটগেনস্টাইন পরিস্থিতি বলতে বুঝিয়েছেন এমন একটি সম্ভাব্য বস্তুসন্নিবেশকে - বস্তুসন্নিবেশটি বিদ্যমান হতে পাবে অবিদ্যমানও হতে পারে - যা একটি আণবিক বাক্যের দ্বারা বর্ণিত হয়, পক্ষান্তরে বস্তুস্থিতি বলতে বুঝিয়েছেন একটি অস্তিত্ববান পরিস্থিতি। (হোয়াট হজ দা কেস এ ফ্যাক্ট- ইজ দা এক্সিস্টেন্স অব স্টেটস অব এফেয়ার্স, 'ট্র্যাকটেটস', ২)। কিন্তু বস্তুস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার আগে পরিস্থিতির সঙ্গে বস্তুর মূল পার্থক্যগুলোর প্রতি মনোযোগ দিলে উভয় বিষয়ে আমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে।

(ক) একটি বস্তু অন্য বস্তুর সাথে সম্মিলিত না হয়ে থাকতে পারে না। অর্থাৎ বস্তু কোনো অবস্থাতেই অসম্পর্কিত থাকতে পাবে না। প্রতিতুলনায় দেখতে পাচ্ছি প্রতিটি আণবিক পরিস্থিতিই কিন্তু অসম্পর্কিত। কোনো একটি সৎ আণবিক পরিস্থিতি বা অসৎ আণবিক

পবিস্থিতি থেকে অন্য একটি পরিস্থিতি সৎ না অসৎ তা নির্ধারণ কবা যায না।

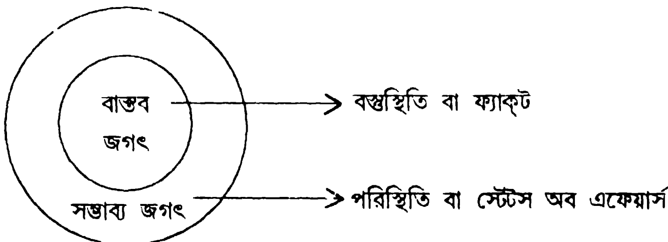
(খ) বস্তু অবিভাজ্য ও সরল। তাই বস্তুর বর্ণনা সম্ভব নয। পবিস্থিতি যেহেতু একাধিক বস্তুর সম্মেলন তাই পরিস্থিতি কখনও আকার বিহীন হতে পাবে না। পবিস্থিতিব বর্ণনা সম্ভব। একটি অনুকায পরিস্থিতি একটি আণবিক বাক্য দ্বারা বর্ণনীয়।

(গ) পবিস্থিতিব অস্তিত্ব অস্থায়ী (কনটিন্‌জেন্ট) কিন্তু বস্তুব অস্তিত্ব আবশ্যিক। প্রত্যেকটি সম্ভাব্য জগতে বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার্য। কিন্তু প্রতিটি সম্ভাব্য জগতে পবিস্থিতিগুলি ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ বস্তুর সন্নিবেশের ক্রম ভিন্ন।

আমবা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে বস্তুস্থিতিই হল বর্ণনার দিক থেকে বাস্তব জগতের অবিভাজ্য একক এবং একটি অস্তিত্বময পরিস্থিতিই হল বস্তুস্থিতি। এইভাবে বস্তুস্থিতিকে বুঝলে জগৎ সম্পর্কে আমবা বলতে পাবি যে জগৎ হল সৎ পবিস্থিতিব সমাহাব। (দা টোট্যালিটি অব এক্‌সিস্‌টিং স্টেটস অব এফেযার্স ইজ দা ওযার্ল্ড, 'ট্রাকটেটস', ২.০৪)

এই প্রসঙ্গে মনে বাখতে হবে যে বস্তুগুলি যে সকল সম্বন্ধে বযেছে তার থেকে অন্যবকম সম্বন্ধে থাকতে পাবত। আমবা আগেই আলোচনা কবেছি যে বস্তু এক হলেও তাব সন্নিবেশ বিবিধ। যেমন 'ক' বস্তুব সঙ্গে 'খ' বস্তুব সন্নিবেশ হয়ে এক ধবণেব বস্তুস্থিতি সৃষ্টি কবতে পাবে। আবাব ক এবং গ মিলে একটি পৃথক বস্তুস্থিতি সৃষ্টি কবতে পারে। জগতে এই প্রতিটি সন্নিবেশ বাস্তবায়িত হয় না যদিও প্রতিটি সন্নিবেশ সম্ভাব্য সন্নিবেশ। সম্ভাব্য সন্নিবেশেব ফলে সম্ভাব্য পবিস্থিতি উৎপন্ন হয়। এই সম্ভাব্য পবিস্থিতি সম্ভাব্য জগতেব অন্তর্গত। আমবা যখন সামগ্রিকভাবে সাখফেবহাল্ট বা পবিস্থিতিব পরিসংখ্যান কবি তখন প্রকৃত ও সম্ভাব্য উভয় পরিস্থিতিব যোগফল কবি। সকল বস্তু এবং তাদেব সমস্ত সম্ভাব্য সন্নিবেশ পেলে আমবা বর্তমান জগৎ ও সববকম সম্ভাব্য জগতের পবিস্থিতিব সমষ্টিকে পেয়ে যাই। এই বৃহত্তর ক্ষেত্রটিকে ভিটগেনস্টাইন বলেছেন লজিকাল স্পেস বা যৌক্তিক দেশ।[৬]

কেবলমাত্র বস্তুসমূহেব যে যে ক্রমসাপেক্ষ সন্নিবেশগুলি বাস্তবাযিত হয়েছে, সেই সেই সন্নিবেশেব সমষ্টিই হল বর্তমান জগৎ। জগৎ অন্যরকম হতে পাবতো কিন্তু এইবকম হযেছে '... জগতেব এই আপতিক অস্তিত্বকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে জগতকে বস্তুস্থিতিব সমষ্টি হিসেবেই গ্রহণ কবতে হবে, শুধুমাত্র বস্তুর সমষ্টি বললে হবে না কাবণ সমস্ত সম্ভাব্য জগতে বা (পসিবল ওযার্ল্ড)-এ একই বস্তু বর্তমান।'[৭] বর্তমান জগৎ ও সমস্ত সম্ভাব্য জগতেব সমষ্টিকে নিম্নে অংকিত চিত্রটির সাহায্যে চেনা যেতে পারে।



চিত্র নং - ১

প্রশ্ন হতে পাবে যে বস্তুস্থিতি এবং অনুকায বস্তুস্থিতিব মধ্যে পার্থক্য কী? এই জগতে যা কিছু যৌগিক তা হল বস্তুস্থিতি। এই বস্তুস্থিতিগুলিব মধ্যে এমন কিছু বস্তুস্থিতি আছে যা সরল। যে বস্তুস্থিতির অংশ অপব কোনো বস্তুস্থিতি নয় তাই সবল বস্তুস্থিতি।[৮] অনুকায বস্তুস্থিতির প্রত্যেকটি দিক বা অ্যাস্পেক্ট বুঝতে হলে আমাদেব ভাষা বিশ্লেষণের সাহায্য নিতে হবে যেমন নিতে হয়েছিল হ্বিটগেনস্টাইন-এব অন্যান্য অধিবিদ্যক ধারণা বোঝাব ক্ষেত্রে। হ্বিটগেনস্টাইন-এব 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে জগতেব আধিবিদ্যাগত বর্ণনা এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এমন ওতোপ্রতোভাবে জডিত, যে একটিকে অপবটি ছাড়া চেনা যায় না। ঠিক যেমন জগৎ বর্ণনার অনুষঙ্গে সরল বা অনুকায় বস্তুস্থিতিগুলো বাস্তব জগতেব অবিভাজ্য একক তেমনি ভাষার ক্ষেত্রে, বর্ণনাব অনুষঙ্গে, আণবিক বচনই হল অবিভাজ্য একক। আনবিক বচনগুলো হল অনুকায বস্তুস্থিতিব প্রতিকল্প। (কাউন্টাবপার্ট)। অনুকায বস্তুস্থিতিগুলি বর্ণিত ও চিত্রিত হয আণবিক বচনেব মাধ্যমে। অ্যাটমিক ফ্যাক্টস আব ডেসক্রাইব্ড অ্যান্ড পিকচার্ড বাই এলিমেন্টাবি প্রপসিশনস।

এই আণবিক বচনেব সুরূপ কী ? দৈনন্দিন জীবনে আমবা যে সমস্ত বচন ব্যবহাব কবি তা অধিকাংশই যৌগ বচন। হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে এই যৌগ বচনগুলিকে বিশ্লেষণ কবতে কবতে আণবিক বচনে বা মৌলিক বচনে উপনীত হওযা সম্ভব, ঠিক যেমন যৌগ বস্তুস্থিতিকে বিশ্লেষণ কবতে কবতে অনুকায় বস্তুস্থিতিতে উপস্থিত হওযা যায়। এই আণবিক বচনগুলি নামপদের সমাহাবে গঠিত অনুরূপভাবে অনুকায় বস্তুস্থিতি বস্তুব সমাহাবে গঠিত। এই নামগুলি বৈশিষ্ট্য কী ? জগতেব মূল উপাদান, বস্তুব যেমন পবিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, নামেবও তেমনি বচন থেকে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব নেই। হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর 'নোটস অন লজিক'-এ লিখেছেন যে নামেব কোনো সংজ্ঞা বা নামকবণ সম্ভব নয়। নামগুলি হল সবলতম চিহ্ন (প্রিমিটিভ সাইনস) যা পরস্পবেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সবল বা আণবিক বচন গঠন কবে। এই আণবিক বা সবল বচনগুলি এক একটি অনুকায় বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত কবে।

প্রশ্ন কবা যেতে পারে যে নামেব অর্থ কীভাবে সুনির্দিষ্ট হবে? হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে নামেব কোনো তাৎপর্য বা (সেন্স) নেই আছে কেবল উদ্দেশ বা (বেফারেন্স)। নাম বস্তুর সূচক, বস্তুব পবিচয় নয। যেহেতু সরল বস্তু সকল প্রকার বর্ণনা বিবহিত তাদেব দেখান যেতে পাবে মাত্র, তাদেব সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। (দে ক্যান ওনলি বি শোন, দে ক্যান নট বি সেড্) শুধু মাত্র বচনের সন্নিবেশে নাম অর্থবহ হযে ওঠে। (ওনলি প্রপসিশনস হ্যাভ সেন্স), ওনলি ইন দা নেক্সাস্ অব এ প্রপসিশন ডাজ এ নেম হ্যাভ মিনিং, 'ট্র্যাকটেটস', ৩.৩) বিষয়টিকে আবও ভাল কবে বোঝা দরকাব। হ্বিটগেনস্টাইন সেন্স বা অর্থ এবং বেফারেন্স বা উদ্দেশের মধ্যে পার্থক্য কবে বলেছেন যে একটি নামপদ একটি বস্তুকে উদ্দেশ করে মাত্র, বস্তুটির কোনো অর্থ জ্ঞাপন করে না। অর্থাৎ বস্তুর কোনো গুণ, ধর্ম, ইত্যাদিব পবিচয় আমবা নামপদের মাধ্যমে পাই না। নামপদ উচ্চাবণেব মাধ্যমে শুধু জানি কোন্

বস্তুটিকে উদ্দেশ করা হচ্ছে। একটি বস্তুর পরিচয় পেতে গেলে অপরাপর বস্তুর সঙ্গে এই বস্তুটির সম্বন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তার পরিচয় পেতে পারি। এর জন্য চাই একটি নামপদের সঙ্গে অপরাপর নামপদের অন্বয় অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ একটি বচন। বচনই একমাত্র পারে জগতের বর্ণনা দিতে। কিন্তু বচন বস্তুর বর্ণনা দেয় না কারণ বস্তু কখনও এককভাবে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয় না। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বস্তু সর্বদা অপরাপর বস্তুর সমাবেশে থাকে - সেই সমাবেশ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একটি বস্তু সমাবেশের ভেতর থাকলেও তার নামকরণ সম্ভব কিন্তু সমাবেশ ব্যতিরেকে বর্ণনা কখনই সম্ভব নয়। এর জন্য চাই বচন। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন যে নামপদের কেবলমাত্র বাচনিক অবস্থান সম্ভব, বচন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অবস্থান সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে বচনের অর্থ এবং নামের অর্থের মধ্যে একটি মূল পার্থক্য হল এই যে একটি বচন কোনো বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত না করেও অর্থবাহী হতে পারে কিন্তু একটি নামের উদ্দেশ না থাকলে নামটি নাম নয়। কারণ নাম হল বস্তুসূচক, নামের উদ্দেশ হিসাবে বস্তু না থাকলে নামে কোনো অর্থই নেই।

এখন দেখা যাক্ কোনো বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত না করেও একটি বাক্য কীভাবে অর্থবাহী হয়? একটি বাক্য যখন একটি বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করে তখন সেই বাক্যটি সৎ। কিন্তু এরকম হতেই পারে যে একটি বাক্য বস্তুর সন্নিবেশের যে ক্রমকে চিত্রিত করেছে সেই ক্রমে বস্তু এই জগতে নেই কোনো সম্ভাব্য জগতে আছে। একটি উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটি বোঝা যাক্। 'সাদা বাঘ আছে' এই বাক্যটি একটি বস্তুস্থিতিকে বর্ণনা করছে বা চিত্রিত করছে। কারণ বাস্তব জগতে সাদা বাঘ আছে। যেহেতু এই বাক্যটি একটি সৎ পরিস্থিতিকে চিত্রিত করছে সেহেতু এই বাক্যটি যথার্থ। আবার 'সবুজ বাঘ আছে' এই বাক্যটি একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে চিত্রিত করছে। আমাদের বাস্তব জগতে সবুজ বাঘ না থাকলেও এমন হওয়াটা অকল্পনীয় নয়, ফলে এমন জগতের কথা আমরা ভাবতে পারি যেখানে এই পরিস্থিতি বর্তমান। এমন কল্পনীয় জগৎ মাত্রই সম্ভাব্য জগৎ। এই বাক্যটি একটি অসৎ পরিস্থিতিকে চিত্রিত করছে বলে বাক্যটি অযথার্থ, অবশ্য অযথার্থ হলেও বাক্যটির তাৎপর্য্য বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না।

জগৎ, যৌক্তিক দেশ, ভাষার সঙ্গে জগতের সম্পর্ক, ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা না থাকলে জগৎ এবং তত্ত্ব বিষয়ক আলোচনাটি বুঝতে অসুবিধে হবে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি হ্বিটগেনস্টাইন-এর 'ট্র্যাকটেটস'-এ জগতের আধিবিদ্যক বর্ণনা এবং ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের এমন অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, যে একটিকে অপরটি ছাড়া বোঝা যায় না।।

[তিন]

দ্বিতীয় পর্বে আমরা ভাষা এবং জগতের সম্পর্কে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মূল বক্তব্যের ওপর আলোকপাত করেছি। হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনে জগৎ এবং বাস্তব-সত্তার সম্পর্ক বোঝার জন্য যতখানি প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে ততটুকু আলোচিত হয়েছে।

জগৎ এবং বাস্তবসত্তার আলোচনা কবতে গিয়ে আমাদেব নানাবিধ সমস্যাব সম্মুখীন হতে হয়। এর কারণ, হ্বিটগেনস্টাইন-এর বাস্তব-সত্তা এবং জগতেব আলোচনায় এক ধরনের আপাত অসংগতি লক্ষ্য করা যায়।

জগৎ সম্বন্ধে আলোচনাব শুরুতেই হ্বিটগেনস্টাইন আমাদেব বলেছেন -

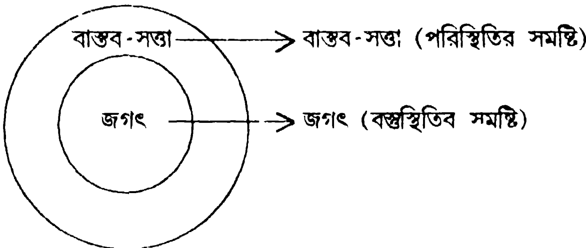
(ক) জগৎ সমগ্র বস্তুস্থিতির সমষ্টি - এটাই ঘটনা (দা ওয়ার্ল্ড ইজ অল দ্যাট ইজ দা কেস - 'ট্র্যাকটেটস', ১)

(খ) জগৎ হল বস্তুস্থিতির সমষ্টি, নিছক বস্তুর নয়। (দা ওয়ার্ল্ড ইজ দা টোট্যালিটি অব ফ্যাক্টস নট অব থিংগস - 'ট্র্যাকটেটস' - ১.১১)।

(গ) জগৎ হল সৎ পরিস্থিতিব সমষ্টি (দা টোট্যালিটি অব একসিসটিং স্টেটস অব এফেযার্স ইজ দা ওয়ার্ল্ড 'ট্র্যাকটেটস' - ২.০৪)

কেবলমাত্র এই তিনটি সূত্রেব ওপব মনযোগ দিলে মনে হয় যে জগৎ সৎ পবিস্থিতিব সমষ্টি। আমবা জানি যে বস্তুস্থিতি হল সৎ পবিস্থিতি বা অস্তিত্বশীল পবিস্থিতি। এই অর্থে বলা যায় যে জগৎ বস্তুস্থিতির সমষ্টি।

বাস্তব-সত্তাব সঙ্গে আমাদেব প্রথম পবিচিতি ঘটে ২.০৬ সূত্রে, যেখানে উনি বলছেন যে বাস্তব-সত্তা হল সৎ এবং অসৎ পবিস্থিতিব সমষ্টি, (দা এক্সিস্ট্যান্ট) অ্যান্ড নন এক্সিসট্যান্ট স্টেট অব এফেযার্স ইজ বিয়ালিটি) যদি জগৎ বর্ণিত হয় শুধু মাত্র সৎ পবিস্থিতিব সমষ্টি হিসেবে এবং বাস্তব-সত্তা বলতে হ্বিটগেনস্টাইন লেখেন সৎ এবং অসৎ পবিস্থিতির সমগ্র, তাহলে বাস্তব-সত্তা হল জগতের তুলনায় ব্যাপক। বাস্তব-সত্তা এক্ষেত্রে সৎ পবিস্থিতি অতিবিক্ত অসৎ পবিস্থিতিকেও অর্ন্তভুক্ত করে। জগৎ এবং বাস্তব-সত্তার সম্পর্ক নিম্নে অংকিত চিত্রটিব সাহায্যে বোঝা যেতে পাবে।



চিত্র নং - ২

এইভাবে যদি আমরা জগৎ এবং বাস্তব-সত্তার সম্পর্ক বুঝি তাহলে কোনো অসুবিধে হয় না। অসংগতি বা বিবোধ - তখনই প্রকট হয় যখন আমবা ২.০৬৩ সূত্রে ব্যাখ্যা খুঁজি। এখানে হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে জগৎ হল বাস্তব-সত্তার সমষ্টি (দা সাম টোটল অব রিয়ালিটি

ইজ দা ওয়ার্ল্ড) 'ট্র্যাকটেটস', ২.০৬৩-এর সঠিক ব্যাখ্যা নিয়ে হিটগেনস্টাইন-এর ভাষ্যকারদের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ২.০৬৩ সূত্রটির ক্ষেত্রে সকলেই একমত হবেন যে বাস্তব সত্তা এখানে কোনো অর্থেই জগতের তুলনায় ব্যাপকতর নয়। জেমস্ গ্রিফিন এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, 'দা ওয়ার্ড "সাম টোটাল" (গেসাস্ট) ডাজ নট লিভ ইভেন এ স্মল পস্‌সিবিলিটি দ্যাট রিয়ালিটি মাইট বি ওয়াইডার দ্যান দা ওয়ার্ল্ড। দাস্ দা ওয়ার্ল্ড অ্যাজ দা সাম্ টোটাল অব রিয়ালিটি ইজ দা সাম অব ফ্যাক্টস (বোথ পসিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ, ২.০৬৩)'[৯] কে বুঝতে হলে গ্রিফিন-এর মতে জগতকে কোনো একটি বিশেষ অর্থে সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টি হিসেবেও বুঝতে হবে। গ্রিফিন মনে করেন যে হিটগেনস্টাইন একই সঙ্গে বলতে চাইছেন যে -

(ক) জগৎ হল সৎ পরিস্থিতির সমষ্টি।

(খ) বাস্তব-সত্তা হল সৎ ও অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টি।

(গ) জগৎ ও বাস্তব-সত্তা সমব্যাপী (কোএক্সটেনসিভ)

'ট্র্যাকটেটস'-এর ১.১২ এবং ২.০৫ সূত্রের সাহায্যে গ্রিফিন এই আপাত অসংগতি সমাধানের চেষ্টা করেছেন। ১.১২ এবং ২.০৫ সূত্রটি হল যথাক্রমে -

(১) বস্তুস্থিতির সমগ্র নির্ধারণ করে কোন্‌টা ঘটনা এবং কোন্‌টা ঘটনা নয়। (ফর দা টোট্যালিটি অব ফ্যাক্টস ডিটারমিনস হোয়াট ইজ দা কেস অ্যান্ড অলসো হোয়াট এভাব ইজ নট দা কেস)

(২) অস্তিত্বশীল পরিস্থিতির সমষ্টি নির্ধারণ করে দেয় কোন্ কোন্ পরিস্থিতি অস্তিত্বহীন (দা টোট্যালিটি অব এক্‌সিস্‌টিং স্টেটস অব এফেয়ার্স অলসো ডিটারমিনস হুইচ্ স্টেটস অব এফেয়ার্স ডু নট এক্‌সিসট)।

গ্রিফিন-এর মতে সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতির মধ্যে একটি গুণগত পার্থক্য আছে। জগৎ হল সৎ পরিস্থিতির সমষ্টি এবং যে অর্থে একটি সৎ পরিস্থিতি জগতের অংশ (পার্ট অফ দিস্ ওয়ার্ল্ড), সেই একই অর্থে অসৎ পরিস্থিতিকে জগতের অংশ বলা যায় না। কিন্তু অসৎ পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য হল যে আমরা সৎ পরিস্থিতির সমগ্র পেয়ে গেলেই অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টিকে পেয়ে যাই। অন্য ভাবে বলা যায় যে S ইজ P জানলে আমরা যে ~ (S ইজ P) কেও পেয়ে যাই।

প্রশ্ন হতে পারে যে কেন নঞর্থক বচনের অনুরূপ একটি পরিস্থিতির অস্তিত্ব জগতে স্বীকৃত হল না। আসলে নঞর্থক বচনের অনুরূপ পরিস্থিতি বাস্তব জগতে স্বীকার করলে ' ~ ' এর উদ্দেশ বা রেফারেন্স হিসেবে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে P এবং ~~ P-এর তাৎপর্য এক হবে না কারণ ~~P তে আরও দুটি বাড়তি বস্তুর সন্নিবেশ

ঘটে যা P তে নেই। ভিটগেনস্টাইন তাঁর আধবিদ্যার ধারণার এরকম যৌক্তিক পরিণতি কখনই মেনে নিতে পারেন নি। তিনি এই প্রসঙ্গটি নিয়ে সূত্র ৪.০৬১ এবং ৫.৪৪(৪) এ আলোচনা করেছেন।

(ক) নাথিং ইন রিয়ালিটি করেসপন্ডস টু দা সাইন '~' ('ট্র্যাকটেটস' ৪.০৬২১)

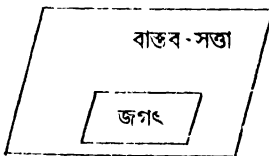
(খ) অ্যান্ড ইফ্ দেয়ার ওয়ার অ্যান অবজেক্ট কল্ড '~' ইট উড ফলো দ্যাট '~~P সেড সামথিং ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট P সেড জাস্ট বিকজ দা ওয়ান প্রপসিশন উড দেন বি অ্যাবাউট P অ্যান্ড দা আদার উড নট ('ট্র্যাকটেটস' ৫.৪৪)।

পিচার ৫.৪৪ সূত্রটিকে খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন। পিচার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন যে দা রিজন হি স্পার্নস ইট ইজ দিস্ ইফ্ '~' ওয়ার দা নেম অব অ্যান অবজেক্ট দেন দা ডবল নেগেশন অব এ প্রপসিশন (ই জি ~~P) উড বি এ হোললি ডিফারেন্ট প্রপসিশন ফ্রম দা ওরিজিনল P ফর ইট উড ডেসক্রাইব এ স্টেট অব এফেয়ার্স উইথ টু মোর অবজেক্টস ইন ইট দ্যান দা স্টেট অব এফেয়ার্স দ্যাট দা ওরিজিনাল প্রপসিশন ডেসক্রাইবস।[৬]

এই অর্থে সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতি পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয় - একটি অপরটির পরিপূরক। গ্রিফিন এর মতে যখন ভিটগেনস্টাইন বাস্তব-সত্তাকে সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টি বলেছেন তখন তিনি সদর্থক ও নঞর্থক এই দুই প্রকার পরিস্থিতির অবিচ্ছেদ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই ভাবে বুঝলে জগৎকে শুধু মাত্র সৎ পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতির সমষ্টি হিসেবে বুঝতেও কোনো অসুবিধা হয় না, কারণ সৎ পরিস্থিতির সেট-কে পেলেই আমরা অসৎ পরিস্থিতির সেট টিও পেয়ে যাই; এক্ষেত্রে যেমন একটি দৃষ্টিকোণ থেকে জগতকে সৎ পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতির সমগ্র বলা যায়, তেমনি আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তব-সত্তাকে সদর্থক এবং নঞর্থক বা সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টি বলা যেতে পারে এবং জগতকে বাস্তব-সত্তার সমগ্র হিসেবে বুঝলে কোনো অসংগতি থাকে না।

গ্রিফিন-এর সমাধান গ্রহণ করলে আমরা জগৎ এবং তত্ত্বের মধ্যে দুরকম সম্পর্ক পাই।

(ক) একটি অর্থে জগতের তুলনায় বাস্তব-সত্তা অতিব্যাপ্ত।

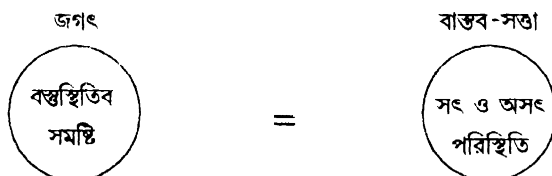


বাস্তব-সত্তা হল সৎ ও অসৎ পরিস্থিতির সমগ্র।

জগত হল শুধুমাত্র বস্তুস্থিতির সমষ্টি।

চিত্র নং ৩

(খ) আরেকটি অর্থে জগৎ এবং বাস্তব-সত্তা সমব্যাপী।



(জগৎ বা বস্তুস্থিতির সমষ্টি মানেই সৎ ও অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টি — সৎ পরিস্থিতি পেলেই অসৎ পরিস্থিতি নিরূপণ করা যায়।)

(বাস্তব-সত্তা = সৎ ও অসৎ পরিস্থিতি)

চিত্র নং ৪

কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সমস্যা হয়। যদি বাস্তব সত্তাকে কেবলমাত্র সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টি হিসেবে বুঝি তাহলে 'ট্র্যাকটেটস'-এর ২.২১ সূত্রটি তাৎপর্য্য হারায়, সেখানে হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে 'এ পিক্চার এগ্রিজ উইথ রিয়ালিটি অর ফেলস টু এগ্রি, ইট ইজ করেক্ট অর ইনকরেক্ট, ট্রু অর ফলস' অর্থাৎ কোনো চিত্র হয় বাস্তব সত্তাকে ঠিক মত চিত্রিত করে, নয় করে না, সেই অনুসারে চিত্রটি হয় সঠিক বা বেঠিক, সৎ অথবা ভ্রান্ত।

এক্ষেত্রে বাস্তব-সত্তাকে সৎ পরিস্থিতির সমষ্টি বলে বুঝতে হবে। কিন্তু আমরা তো জানি যে কেবলমাত্র বাস্তব জগতই হল সৎ পরিস্থিতির সমষ্টি। তাহলে জগৎ = বাস্তব-সত্তা বলতে আমরা কী বুঝব? জগৎ' এবং 'বাস্তব-সত্তা' উভয় পদকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করব, না জগৎ এবং বাস্তব-সত্তাকে শুধু মাত্র বস্তুস্থিতির সমষ্টি বলব? ব্যাপক অর্থে বাস্তব-সত্তা সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টি এবং এক অর্থে জগৎও তাই কারণ সৎ পরিস্থিতির সঙ্গে অসৎ পরিস্থিতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বর্তমান। সংকীর্ণ অর্থে জগৎ কেবল মাত্র সৎ পরিস্থিতির বা বস্তুস্থিতির সমষ্টি এবং ২.২১ সূত্রকে বুঝতে হলে বাস্তব-সত্তাকে কেবলমাত্র সৎ পরিস্থিতির বা বস্তুস্থিতির সমষ্টি হিসেবেই বুঝতে হবে।

বাস্তব-সত্তাকে কেবলমাত্র বস্তুস্থিতির সমগ্র হিসেবে বুঝলে আমরা দেখব যে আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগৎ বাস্তব সত্তার তুলনায় ব্যাপকতর। ৫.৬ সূত্রে হ্বিটগেনস্টাইন লিখছেন যে 'আমার ভাষার সীমা হল আমার জগতের সীমা' (দা লিমিটস অব মাই ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস দা লিমিটস অব মাই ওয়ার্ল্ড) এই ক্ষেত্রে জগতের পরিধি কেবলমাত্র বাস্তব ঘটনাসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা সবরকম সম্ভাব্যতাকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই ক্ষেত্রে যা যা ঘটেছে, তা ছাড়াও যা ঘটেনি অথচ ঘটতে পারতো সবকিছুই জগতের অন্তর্ভুক্ত। হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনে যৌক্তিক দেশের এলাকা এবং ব্যাপক অর্থে জগতের এলাকা এক। এই অর্থে জগৎকে গ্রহণ করলে জগৎ বাস্তব-সত্তা অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক (বাস্তব-সত্তা বলতে

যদি বস্তুস্থিতির সমষ্টিকে বুঝি)। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা জগৎ এবং বাস্তব-সত্তার মধ্যে তিন ধরণের সম্পর্ক পাই।

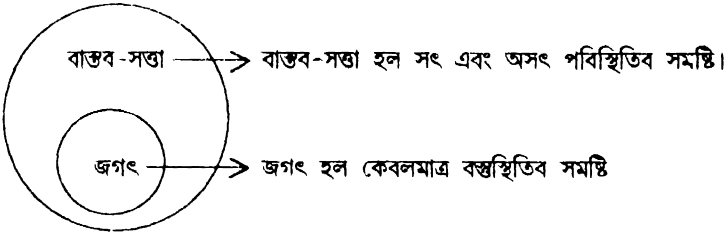
(ক) বাস্তব-সত্তা হল জগতের তুলনায় ব্যাপক।

(খ) জগৎ এবং বাস্তব-সত্তা সমব্যাপী।

(গ) জগৎ বাস্তব-সত্তার তুলনায় অধিকতর ব্যাপক।

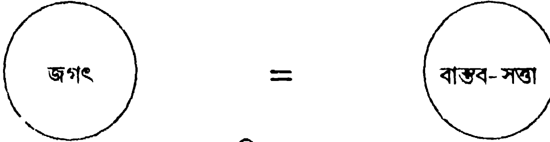
জগৎ ও বাস্তব-সত্তার সম্পর্ক নিম্নে অংকিত তিনটি চিত্রের সাহায্যে দেখান যেতে পারে।

(ক) বাস্তব সত্তা হল জগতের তুলনায় ব্যাপক -



চিত্র নং - ৫

খ) বাস্তব-সত্তা এবং জগৎ সমব্যাপী



চিত্র নং - ৬

এখানে জগৎ এবং বাস্তব-সত্তা উভয়ই হল বস্তুস্থিতির সমষ্টি। যেহেতু সৎ পরিস্থিতির সমষ্টি বা সেট-কে পেলেই অসৎ পরিস্থিতিকেও পেয়ে যাই সেইহেতু জগৎ (যা বস্তুস্থিতির সমষ্টি) কে পেলেই সৎ + অসৎ পরিস্থিতির সমগ্র অর্থাৎ বাস্তব-সত্তা পেয়ে যাই।

গ) জগৎ হল বাস্তব-সত্তার তুলনায় ব্যাপকতর



চিত্র নং - ৭

বাস্তব-সত্তা যদি বস্তুস্থিতির সমষ্টি হয় তাহলে জগত হল বাস্তব-সত্তার তুলনায় ব্যাপক। এক্ষেত্রে যৌক্তিক দেশের এলাকা এবং জগতের এলাকা এক।

মনে রাখতে হবে যে গ্রিফিন-এর সমাধান গ্রহণ করলে আমরা ৫.৬ সূত্রটির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাব না। কারণ যদিও একটি সৎ পরিস্থিতির 'সেট' পেলেই তার অনুরূপ অসৎ পরিস্থিতির সেট-টি আমরা পেয়ে যাব, তবুও সব রকম সম্ভাব্য পরিস্থিতিকে পাব না। কারণ পরিস্থিতিগুলি দু ধরণের।

(ক) সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতি (পসিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ ফ্যাক্টস)

(খ) অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন পরিস্থিতি (এক্সিসট্যান্ট অ্যান্ড নন এক্সিসট্যান্ট স্টেটস অব এফেয়ার্স)

সম্ভাব্য পরিস্থিতির এলাকা অসৎ পরিস্থিতির পরিধি অপেক্ষা ব্যাপকতর। বাস্তব কী কী সন্নিবেশ ঘটেনি অথবা ঘটতে পারতো তার সবই সম্ভাব্য পরিস্থিতির এলাকার অন্তর্ভুক্ত।

এই প্রসঙ্গে শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে পরিস্থিতির এই দু'ধরণের শ্রেণীবিভাগ (সৎ/অসৎ এবং অস্তিত্বশীল/অস্তিত্ববিহীন) সম্পর্কে সতর্ক থাকলেই হ্বিটগেনস্টাইন-এর জগৎ এবং বাস্তব সত্তা সম্পর্কিত সূত্রগুলির একটি সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। পিচার এবং স্টেনিয়াস দুজনেই এই দু'ধরণের পরিস্থিতির সম্পর্কে সর্তক ছিলেন না বলেই তাঁরা জগৎ ও বাস্তব সত্তার সম্পর্কের গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে সক্ষম হন নি।

শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে বাস্তব সত্তা কথাটি সাধারণ অর্থে গৃহীত হয়েছে। বাস্তব সত্তা বলতে হ্বিটগেনস্টাইন বস্তুস্থিতির সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই বোঝেন নি। ২.২১ সূত্রে হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে একটি বচনকে আমরা মিথ্যা তখনই বলব যখন সেই বচনটি বাস্তব সত্তার যথাযথ বর্ণনা দেয় না। (এ ফল্স প্রপসিশন ইজ ওয়ান হুইচ ডাস্ নট এগ্রি উইথ রিয়ালিটি)। বাস্তবসত্তাকে এই অর্থে গ্রহণ করলে ২.০৬ সূত্রটি বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না যেখানে উনি বলেছেন যে বাস্তব সত্তা হল সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতির সমষ্টি। (দা এক্সিসট্যান্ট অ্যান্ড নন-এক্সিসট্যান্ট স্টেট অব এফেয়ার্স ইজ রিয়ালিটি)। কারণ একই বাস্তব-সত্তা P এবং ~P উভয় প্রকার বচনের প্রতিরূপ (কাউন্টারপার্ট) কিন্তু বাস্তব-সত্তাকে এই অর্থে গ্রহণ করলে ২.০৬৩ সূত্রটির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে অসুবিধে হয় (২.০৬৩) হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন দা সাম্ টোটল অব রিয়ালিটি ইজ দ' ওয়ার্ল্ড)। শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলছেন যে ২.০৬৩ সূত্রটির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে হলে 'জগৎ' শব্দটিকে দুটি অর্থে গ্রহণ করতে হবে। ওঁর মতে হ্বিটগেনস্টাইন ৫.৬ সূত্রে জগৎকে ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন, যেখানে ভাষার সীমা এবং জগতের সীমাকে এক করে দেখা হয়েছে। এই অর্থে যা কিছু আমরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারি অর্থাৎ যা কিছু আমরা বর্ণনা করতে পারি তার সবই জগতের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু চক্রভাসিক এবং বিরুদ্ধ বচন (টটোলজিকল অ্যান্ড কনট্রাডিক্টরি স্টেটমেন্টস্) কোনো কিছুকে চিত্রিত বা বর্ণিত করতে পারে না তাই

তাবা জগতেব অন্তর্ভুক্ত নয়। ব্যাপক অর্থে জগতকে গ্রহণ করলে তা শুধু মাত্র সৎ এবং অসৎ পরিস্থিতিরই সমষ্টি নয়, তা সবরকম সম্ভাব্য পরিস্থিতির সমগ্র। যেহেতু একটি মিথ্যা বচন একটি সম্ভাব্য পরিস্থিতিব বর্ণনা করে সেই অর্থে এটি জগতেবও বর্ণনা কবে। জগতকে এই অর্থে গহণ কবলে জগৎ হবে বাস্তব এবং সম্ভাব্য বর্ণনাব সমষ্টি। এক্ষেত্রে জগৎ হল বাস্তব সত্তা অপেক্ষা ব্যাপক। কিন্তু একটি মাত্র অর্থে জগতকে গ্রহণ কবলে ২.০৬৩ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয। ২.০৬৩ সূত্রটি হল - দা সাম্ টোটল অব বিয়ালিটি ইজ দা ওয়ার্ল্ড। জগৎ শব্দটিকে যেমন ব্যাপক অর্থে ব্যবহাব কবা হয়েছে তেমনি জগৎ শব্দটির একটি সংকীর্ণ অর্থও আছে। এক্ষেত্রে জগৎ এবং বাস্তব সত্তা সমার্থক। জগৎ কেবলমাত্র বস্তুস্থিতিব সমষ্টি।

নিঃসন্দেহে শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায-এব সমাধান অধিকতব গ্রহণযোগ্য কাবণ গ্রিফিন-এব বক্তব্য স্বীকার করলে আমরা দুটি সূত্রেব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাই না। সূত্র দুটি হল ২.২১ এবং ৫.৬। যেখানে হ্বিটগেনস্টাইন বলছেন 'এ পিক্চাব এগ্রিজ উইথ বিয়ালিটি অব ফেল্স টু এগ্রি; ইট ইজ কাবেক্ট অব ইনকারেক্ট টু অব ফল্স'। অর্থাৎ বাস্তব-সত্তাকে ঠিক মত চিত্রিত করতে পারলেই আমবা একটি চিত্রকে সত্য বলব নচেৎ সেটি ভ্রান্ত। গ্রিফিন-এব মত অনুসাবে আমবা বাস্তব সত্তাকে যদি সৎ এবং অসৎ পবিস্থিতিব সমষ্টি হিসেবে গ্রহণ কবি তাহলে ২.১১ সূত্রটিকে বোঝা যাবে না। আবার জগৎ যদি শুধু মাত্র বস্তুস্থিতির সমষ্টি হয় তাহলে 'দা লিমিট্স অব মাই ল্যাঙ্গুয়েজ মিনস দ্যা লিমিট্স অব মাই ওযার্ল্ড' ৫.৬ 'ট্রাকটেটস'-এব এই সূত্রটি বুঝতে অসুবিধে হয়। শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়েব ব্যাখ্যাব সাহায্যে এই সমস্যাব একটা সমাধানেব সূত্র পাওযা যায়।

টীকা

১। অ্যাটমিক ফ্যাক্ট বা অনুকায বস্তুস্থিতি হল বাস্তব, অগ্রুব। হ্বিটগেনস্টাইন-এব ভাষায় Atomic fact is an actual arrangement of objects

2 Eric Stenius, p 32

3. Max Black, p 42

4 S N Ganguly, p 27

5 Max Black, p 41

6 T L P, 2 06, 2 063

7 Objects are what is unalterable and subsistent their configuration is changing and unstable T L P. 2 0271

8 S N Ganguly, p 27 'A fact which has no parts that are facts are called by Mr Wittgenstein a sachverhalt This is something he calls an atomic fact.'

9 James Griffin, p 36.

10 George Pitcher, p 56

11 James. Griffin, p 38. '.. negative facts are such that once we have a set of positive facts we have a set of negative facts as it were automatically. In this sense we can speak of negative facts being inseparable from positive facts. Thus, when Wittgenstein says that the world is the sum of positive facts, this may be taken to mean that the world is completely constituted by existent states of affairs. When he says that the world includes both positive and negative facts, this may be taken to refer to their inseparability. And since the world's being completely constituted by existent states of affairs and positive and negative facts being inseparable do not rule one another out, Wittgenstein's three claims need not be incompatible.

বাক্যের চিত্ররূপতা তত্ত্ব

সৌমিত্র বসু

আমাদের জানা ভাষায় যখন কোনো বক্তা কিছু বলেন বা কোনো লেখক কিছু লেখেন তখন সেই বক্তা বা লেখকের বক্তব্য বুঝতে সাধারণতঃ আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না। মনে হতে পাবে যে অসুবিধে না হওয়াই তো স্বাভাবিক। কারণ ভাষাটা যদি জানাই থাকে তাহলে তো যে কোনো বাক্যের অন্তর্গত প্রতিটি পদের অর্থও জানা থাকবে এবং বাক্য যেহেতু এই পদগুলি দিয়েই গঠিত সেহেতু পদের অর্থ জানা থাকলে বাক্যের অর্থও তো বুঝতে পারাই স্বাভাবিক। একটু লক্ষ্য করলেই কিন্তু বোঝা যাবে যে বাক্য শুনে বাক্যার্থ বুঝতে পাবার এই ব্যাখ্যাটা সঠিক নয়। যদিও বাক্যের উপাদান বলতে পদকেই বোঝা হয়, কেবলমাত্র পদের অর্থ জানা থাকলেই বাক্যের অর্থ বোঝা যায় না। যেমন, 'ভারত', 'পাকিস্তান', 'জিতলে' ও 'হাবরে' এই চারটি শব্দের অর্থ জানা থাকলেও 'ভারত পাকিস্তান হারবে জিতলে' এই পদ সমষ্টির কোনো অর্থ বোঝা যায় না। এ থেকে বোঝা যায় যে কেবলমাত্র পদের সমষ্টিই বাক্য নয়। বাক্য গঠনের কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, সেই নিয়ম অনুসরণ না করে পদের সমাবেশ ঘটালে সেই পদসমষ্টি অর্থ প্রকাশক হয় না। কিন্তু যেখানে বাক্য গঠনের নিয়ম অনুসবণ করে পদ সমাবেশ ঘটান হয়েছে সেখানেও শুধুমাত্র পদের অর্থ বোঝা গেলেই যে বাক্যের অর্থও বোঝা যাবে এমনও নয়। যেমন, 'ভারত জিতলে পাকিস্তান হারবে' এবং 'ভাবত হাবলে পাকিস্তান জিতবে' এই দুটি বাক্যতে একই শব্দ রয়েছে অথচ দুটি বাক্য একই অর্থকে প্রকাশ করছে না। অতএব শব্দের অর্থ বুঝলেই বাক্যেব অর্থও বোঝা হয়ে যায় - এ ধারণা ঠিক নয়। একথা অবশ্য বলা হতে পারে যে শুধুমাত্র শব্দের অর্থের উপরে বাক্যার্থ নির্ভর করে না, বাক্যে শব্দগুলির সংস্থান কীভাবে করা হয়েছে অর্থাৎ শব্দগুলি কীভাবে সাজান হয়েছে তার উপরে বাক্যের অর্থ নির্ভর করে। সুতরাং শব্দসংস্থান ভিন্ন প্রকারের হলে একই শব্দ ব্যবহার করা সত্ত্বেও বাক্যের অর্থ ভিন্ন হতে পারে। কাজেই একটি বাক্য সেই অর্থই প্রকাশ করবে যা ঐ বাক্যের অন্তর্গত শব্দগুলির নির্দিষ্ট সংস্থান প্রকাশ করে। ব্যাকরণগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাক্যার্থ সংক্রান্ত এই ব্যাখ্যাটি সঠিক। কিন্তু দার্শনিকের পক্ষে এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব না-ও হতে পাবে। কারণ দার্শনিকেবা আরও মৌলিক প্রশ্নের উত্তরে আগ্রহী। আলোচ্য ক্ষেত্রে কোনো দার্শনিক জিজ্ঞাসা করতে পারেন, 'শব্দের একটি নির্দিষ্ট সংস্থান একটি নির্দিষ্ট বাক্যার্থকে প্রকাশ করে কীভাবে'? বা 'বাক্যের উপাদানগুলির সংস্থানের সঙ্গে বাক্যার্থের উপাদানগুলির সংস্থানের কী ধরণের সম্পর্ক?' বৈয়াকরণ আমাদের বলে দেন কোন্ সংস্থানযুক্ত বাক্য অর্থ প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু ওই অর্থের সাথে ওই সংস্থানেব সম্পর্ক কী তা তিনি বলে দেন না। বর্তমান প্রবন্ধে আমবা

বাক্য ও বাক্যার্থের সম্পর্ক বিষয়ে দার্শনিক লুড্‌ভিগ্ হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতামত আলোচনা করব। জানতে চাইব-একটি নির্দিষ্ট সংস্থানযুক্ত বাক্যে এমন কী বৈশিষ্ট্য থাকে যার ফলে বাক্যটি তার অর্থকে উপস্থাপিত করতে পারে?

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে বাক্য ও বাক্যার্থের সম্পর্ক চিত্র ও চিত্রিতের সম্পর্কের অনুরূপ। বাক্যার্থে বর্ণিত পরিস্থিতির একপ্রকার চিত্র হল বাক্য। বাক্যের এই চিত্ররূপতার জন্যই বাক্য তার অর্থকে উপস্থাপিত করতে পারে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর ভাষায় বলা যায় : 'বাক্য হল বাস্তব সত্তার চিত্র' ('টি. এল. পি.' ৪.০১)। বাক্যকে চিত্রের ধর্মবিশিষ্ট বলে কেন মনে করা হচ্ছে সে প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন - 'একটি বাক্যের অর্থ বুঝলেই আমি জানতে পারি বাক্যটি কোন্ পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করছে। এবং বাক্যের অর্থটি আমার কাছে ব্যাখ্যা করে বলে না দিলেও আমি বাক্যটি বুঝতে পারি' ('টি এল পি' ৪.০২১)। একটি চিত্র দেখে যখন আমরা চিত্রিত পরিস্থিতিকে বুঝে থাকি তখন যেমন চিত্রটিকে বোঝার জন্য অতিরিক্ত কোনো বর্ণনা বা ব্যাখ্যার দরকার হয় না তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও একটি বচনের অর্থকে বোঝার জন্য অর্থটিকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করে বলার দরকার হয় না। বাক্যের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য হ্বিটগেনস্টাইন বাক্যকে বাক্যার্থের চিত্র বলে অভিহিত করেছেন। বলা বাহুল্য সাধারণ অর্থে চিত্র বলতে আমরা যা বুঝে থাকি তার সাথে চিত্রিত পরিস্থিতির যে ধরণের সাদৃশ্য থাকে, বাক্যরূপ চিত্রের সাথে বাক্যার্থরূপ পরিস্থিতির সে রকম সাদৃশ্য থাকে না। একটা টেবিলে বই রেখে যদি তার একটা ছবি আঁকা হয় তাহলে সেই ছবিটার সাথে 'টেবিলের উপরিস্থিত বই' নামক পরিস্থিতির যে ধরনের সাদৃশ্য থাকবে, 'টেবিলের উপরে বই আছে' - এই বাক্যের সাথে উক্ত পরিস্থিতির সে ধরণের সাদৃশ্য থাকবে না। কিন্তু একটি পরিস্থিতির চিত্র তো সাধারণতঃ তাকেই বলা হয় যার সাথে পরিস্থিতিটির এ ধরণের সাদৃশ্য থাকে। তাহলে সাদৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও কেন বাক্যকে বাক্যার্থের চিত্র বলা হবে? হ্বিটগেনস্টাইন কি তাহলে বলতে চাইছেন যে বাক্য শুনে আমাদের মনে বাক্যার্থরূপে যা উপস্থাপিত হয় তা বস্তুতপক্ষে বাক্যে বর্ণিত পরিস্থিতির মানস-চিত্র বা মানস-প্রতিরূপ বলেই বাক্যকে পরিস্থিতির চিত্র বলা হবে? উল্লেখ্য অন্যান্যদের সঙ্গে ডেভিড হিউম এবং বার্ট্রান্ড রাসেল বাক্যার্থের মানস প্রতিরূপতাবাদের সমর্থক ছিলেন। বাক্যার্থ সম্পর্কিত এই তত্ত্বানুসারে কোনো একটি শব্দ যে বস্তুকে বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করা হয় সেই বস্তুটির মানস প্রতিরূপ বা মানস-চিত্রটি সেই শব্দের অর্থ এবং এ ধরণের শব্দার্থের দ্বারা গঠিত বাক্যার্থও বর্ণিত পরিস্থিতির মানস -প্রতিরূপস্বরূপই হয়ে থাকে। এভাবে দেখলে 'অর্থ'-কে একটি মানসিক বিষযরূপে গণ্য করতে হয়। রাসেল-এর মতে যুক্তিবিজ্ঞানীরা অর্থ সম্পর্কে খুব কম আলোচনা করেছেন কারন বস্তুতপক্ষে অর্থসংক্রান্ত সমস্যা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।[১] হ্বিটগেনস্টাইন কিন্তু অর্থকে সম্পূর্ণভাবে একটি মানসিক বিষয়ে পর্য্যবসিত করার পক্ষপাতী ছিলেন না। বরং যুক্তিবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বাক্য ও বাক্যার্থের সম্বন্ধ বিষয়ক সমস্যাটি বিশ্লেষণ করতে চেয়েছিলেন। ফলতঃ বাক্যার্থের মানস প্রতিরূপতাবাদকে তিনি গ্রহণ করলেন

না। বস্তুতপক্ষে শুধুমাত্র মানস প্রতিরূপতাবাদই নয়, বাক্যার্থ সম্পর্কে প্রচলিত দার্শনিক মতগুলির কোনোটিকেই তিনি গ্রহণ করলেন না এবং সম্পূর্ণ নতুনভাবে বাক্যার্থের ধারণাকে ব্যাখ্যা করলেন। তাঁর মতে, বাক্য হল বস্তুস্থিতি বা ফ্যাকট-এর অভিধায়ক এবং বাক্যের দ্বারা অভিহিত এই বস্তুস্থিতিটিই হল বাক্যার্থ। বাক্যার্থ সম্পর্কিত এই ধারণার বিশ্লেষণ আমারা একটু পরেই করব। আপাততঃ আমাদের পক্ষে যা প্রাসঙ্গিক তা হল এই যে, হ্বিটগেনস্টাইন বাক্যার্থ বলতে বস্তুস্থিতিকেই বুঝিয়েছেন, বস্তুস্থিতির মানসচিত্র বা মানস প্রতিরূপকে নয়, এবং তাঁর মতে প্রতিটি যথার্থ ঘোষক বাক্যই কোনো না কোনো বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করে। কিন্তু, আগের অমীমাংসিত প্রশ্নই আবার ফিরে আসে, 'কোন্ অর্থে একটি বাক্যকে বস্তুস্থিতির চিত্র বলা যেতে পারে?' 'কীভাবে বাক্যের পক্ষে বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করা সম্ভব?' 'হ্বিটগেনস্টাইন কি প্রচলিত অর্থেই "চিত্র" শব্দটি ব্যবহার করেছেন?'

প্রচলিত অর্থে 'চিত্র' বলতে যদি কেবলমাত্র শিল্পীর আঁকা কোনো ঘটনার ছবিকে বোঝান হয়, অথবা ফটোগ্রাফকে বোঝান হয় তাহলে এ কথা অবশ্যই বলতে হবে যে হ্বিটগেনস্টাইন এই অর্থে বাক্যকে বাক্যার্থের চিত্র বলে উল্লেখ করেন নি। হ্বিটগেনস্টাইন ব্যাপক অর্থে 'চিত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই অর্থে যেমন ফটোগ্রাফ চিত্র পদবাচ্য হবে তেমনই গানের স্বরলিপিকেও গানের চিত্র বলে গ্রহণ করা যাবে। 'চিত্র' শব্দটির এই ব্যাপক অর্থটিকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন 'চিত্র হল তত্ত্বার অনুকৃতি' বা 'এ পিক্চার ইজ এ মডেল অব রিয়ালিটি' ('টি এল পি' ২.১২)। কয়েকটি শর্ত পূরণ করলে একটি বিষয়কে অপর বিষয়ের অনুকৃতি বা চিত্র বলে গণ্য করা যায়। শর্তগুলি হল -

(১) চিত্রের প্রতিটি উপাদানের সাথে চিত্রিত পরিস্থিতির প্রতিটি উপাদানের অনুরূপতার সম্বন্ধ থাকতে হবে;

(২) চিত্রের উপাদানগুলির সাথে চিত্রিত পরিস্থিতির বস্তুগুলির সূচক-সূচ্য সম্পর্ক থাকতে হবে;

(৩) চিত্রের উপাদানগুলির মধ্যে এমন সম্পর্ক থাকতে হবে যাতে একটি সুনির্দিষ্ট সংস্থান গঠিত হয়;

(৪) চিত্র ও চিত্রিতের মধ্যে স্বাধর্ম্য বা অভিন্নতা থাকেতে হবে।

এই শর্তগুলি আরও একটু ব্যাখ্যা করে বলা প্রয়োজন। কোনো পরিস্থিতিকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত করতে হলে পরিস্থিতিটিতে যে যে বস্তু রয়েছে সেগুলিকে উপস্থাপিত করার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বা অংশ চিত্রটিতে থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, চিত্রের উপাদান বা অংশের সংখ্যা চিত্রিতের উপাদানের তুলনায় বেশি বা কম হওয়া চলবে না। অর্থাৎ চিত্র ও চিত্রিতের উপাদান সংখ্যা সমান হতে হবে। চিত্রের প্রতিটি উপাদানের সাথে চিত্রিতের কেবলমাত্র একটি অংশেরই অনুরূপতার সম্বন্ধ থাকবে এবং চিত্রে এমন কোনো উপাদান থাকবে না যার সাথে চিত্রিতের কোনো অংশেরই অনুরূপতার সম্পর্ক নেই। কিন্তু দুটি বিষয়ের

মধ্যে উপাদানগত অনুরূপতা থাকলেই একটি অপরটির চিত্র বলে গণ্য হয়, এমন নয়। যতক্ষন না একটি বিষয়ের উপাদানগুলিকে অপর বিষয়ের উপাদানের সূচকরূপে উপস্থাপিত করা হচ্ছে ততক্ষণ একটি অপরটির চিত্র হয়ে উঠতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, চিত্রের (অথবা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে, যে বিষয়টিকে চিত্র বলে গণ্য করতে চাওয়া হচ্ছে তার) উপাদানগুলিকে চিত্রিত পরিস্থিতির উপাদানের উপস্থাপক হতে হবে। চিত্রের উপাদানের সাথে চিত্রিতের উপাদানের এই সূচক-সূচ্য সম্পর্ক বা উপস্থাপক-উপস্থাপ্য সম্পর্ককে হিটগেনস্টাইন 'চিত্রতার সম্পর্ক' বা 'পিক্চারিং রিলেশন' বলে উল্লেখ করেছেন।[২] এই চিত্রতার সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এই যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চিত্রের কোন্ উপাদান চিত্রিতের কোন্ উপাদানকে উপস্থাপিত করবে তা চিত্রকরের ইচ্ছার দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। যদিও ফটোগ্রাফ বা হুবহু প্রতিকৃতির ক্ষেত্রে চিত্রের উপাদানগুলি আকৃতিগত সাদৃশ্যবশতঃ স্বাভাবিক ভাবে চিত্রিতের উপাদানকে উপস্থাপিত করে, অধিকাংশ চিত্রের ক্ষেত্রেই তা হয় না, অধিকাংশে চিত্রের ক্ষেত্রেই চিত্রতার সম্পর্ক চিত্রকরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। চিত্রতার সম্পর্কের এই বৈশিষ্ট্যটি স্বীকার না করলে হিটগেনস্টাইন-স্বীকৃত অধিকাংশ অনুকৃতিকেই চিত্র বলে গণ্য করা যায় না।

একটি চিত্রের উপাদানগুলি যতক্ষণ না পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধে[৩] পরস্পরের সাথে যুক্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত উপাদানগুলির সন্নিবেশটিকে চিত্রপদবাচ্য বলা যায় না। এই কারণেই একটি দেশের নদী, পাহাড়, শহর, প্রভৃতির নামের তালিকাকে ঐ দেশের মানচিত্র বলে গণ্য করা যায় না। একইভাবে একটি গানে কোন্ কোন্ স্বর কতবার ব্যবহৃত হয়েছে তার তালিকাকে ঐ গনের স্বরলিপি বলা যায় না। কিন্তু যদি নদী, শহব, পাহাড়ের অবস্থানগত সম্পর্ককে চিহ্নিত করা হয় তাহলে আমরা একটি দেশের মানচিত্র পাই, এবং গানে ব্যবহৃত স্বরগুলির পারস্পরিক ক্রমিক সম্পর্ককে যদি উপস্থাপিত কবা হয় তাহলে ঐ গানেব স্বরলিপিরূপ চিত্রকে পাওয়া যায়। হিটগেনস্টাইন-এর মতে, চিত্রের উপাদানগুলি নির্দিষ্ট সম্পর্কযুক্ত হলে চিত্রের সংস্থান তৈরি হয়। চিত্রের সংস্থান চিত্রিতের সংস্থানকে উপস্থাপিত করে।

একই ঘটনাকে নানান মাধ্যম ব্যবহার করে চিত্রিত করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি লরি ও মোটির গাড়ীর দুর্ঘটনাকে একটি সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে যেমন উপস্থাপিত করা যায়, তেমনি, হিটগেনস্টাইন-এর 'নোটবুকস'-এ বর্ণিত দৃষ্টান্ত অনুসারে, খেলনা-লরি এবং খেলনা-মোটরগাড়ীর মাধ্যমেও দুর্ঘটনাটি চিত্রিত করা যায়। মাধ্যম ভেদে চিত্রের উপাদানের বিন্যাসও ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় এই যে, উপাদান ও তার বিন্যাস। ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য দুটি মাধ্যমেই একই বিষয়কে চিত্রিত করা সম্ভব হতে পারে। সুতরাং দুটি মাধ্যমেরই উপাদানগুলি বিষয়গত সংস্থানটিকে উপস্থাপিত করতে সক্ষম। উপাদানগুলির মধ্যে এই সংস্থানটিকে উপস্থাপিত করার সম্ভাবনা আছে বলেই তাদের ব্যবহাব করে সংস্থানটি উপস্থাপিত করা সম্ভব হতে পারে। চিত্রের সংস্থানকে উপস্থাপনা করার এই

সম্ভাবনাকেই হ্বিটগেনস্টাইন 'চিত্রগত আকার' বা 'পিক্‌টোরিয়াল ফর্ম' বলে অভিহিত করেছেন।

উপরে বর্ণিত খেলনা-লবি ও খেলনা-মোটরগাড়ীর মাধ্যমে দুর্ঘটনাকে উপস্থাপিত করার দৃষ্টান্তে চিত্র এবং চিত্রিত উভয়ের উপাদানের মধ্যেই ত্রৈমাত্রিকতা আছে বলে চিত্রের উপাদানগুলির পক্ষে চিত্রিতের সংস্থানকে উপস্থাপিত করা সম্ভব হয়। আলোচ্য ক্ষেত্রে চিত্রের উপাদানগুলির ত্রৈমাত্রিকতা থাকার অর্থই হল উপাদানগুলির বিশেষ সংস্থানের সম্ভাবনা থাকা। অতএব এই ত্রৈমাত্রিকতাই আলোচ্য ক্ষেত্রে চিত্রের চিত্রগত রূপ। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে যদি কেবলমাত্র চিত্রের উপাদানে ত্রৈমাত্রিকতা থাকে অথচ চিত্রিতের উপাদানে ত্রৈমাত্রিকতা না থাকে তা হলে চিত্রটি কোনো একটি বস্তুস্থিতির সংস্থানকে উপস্থাপন কবলেও ত্রৈমাত্রিকতাকে সে ক্ষেত্রে ঐ চিত্রের চিত্রগত আকার বলা যাবে না। অর্থাৎ চিত্রের যে কোনো ধর্মকে চিত্রের আকার বলে গন্য করা যাবে না। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, 'কোনো বাস্তবসত্তাকে সঠিক বা বেঠিক ভাবে চিত্রিত কবার সময় চিত্র ও বাস্তব-সত্তাব যে সাদৃশ্য অবশ্যই থাকতে হবে, তা-ই হল ঐ চিত্রের চিত্রগত আকাব'। ('টি. এল পি ' ২.১৭) এ প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন আবও বলেন যে, 'একটি চিত্র যে কোনো বাস্তবসত্তাকেই উপস্থাপিত করতে পারে যার চিত্রগত আকার তাব চিত্রগত আকারের সাথে এক' ('টি. এল. পি ' ২.১৭১)। যেমন, হ্বিটগেনস্টাইন উদাহরণ দিযে বলেন, 'যে কোনো দৈশিক চিত্র দৈশিকতা যুক্ত বাস্তব সত্তাকে চিত্রিত কবতে পারে, বর্ণযুক্ত চিত্র বর্ণযুক্ত বাস্তব সত্তাকে উপস্থাপিত করতে পারে।' প্রদত্ত উদাহবণগুলি থেকে একথা মনে করলে ভুল হবে যে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে কেবলমাত্র দৈশিকতা ধর্মযুক্ত চিত্রেব পক্ষেই দৈশিকতা ধর্মযুক্ত বাস্তব সত্তাকে উপস্থাপিত করা সম্ভব অথবা বর্ণযুক্ত বাস্তবসত্তাকে চিত্রিত কবার জন্য বর্ণযুক্ত চিত্রই প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি যে একই বস্তুস্থিতিকে একাধিক মাধ্যমের দ্বাবা চিত্রিত করা যেতে পারে; যে মাধ্যমের উপাদানগুলি দৈশিক ধর্মযুক্ত তার ক্ষেত্রে দৈশিকতাযুক্ত বাস্তবতার যে চিত্র আমরা পাব তাব চিত্রগত-আকাব হবে দৈশিকতা। কিন্তু ঐ একই বাস্তবতার চিত্র যদি এমন কোনো মাধ্যম অবলম্বন করে তৈরি করা হয় যে মাধ্যমেব উপাদানগুলিব দৈশিকতা নেই তাহলে ঐ একই বাস্তবতার চিত্রেব চিত্রগত আকার ভিন্ন হয়ে যাবে। অর্থাৎ মাধ্যম ভেদে চিত্রের চিত্রগত আকার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু চিত্রেব ।চিত্রিত পরিস্থিতির মধ্যে কোনো না কোনো প্রকার চিত্রগত আকারজনিত স্বাধর্ম্য বা অভিন্নতা থাকতেই হবে। কোনো কিছুর পক্ষে কোনো কিছুর চিত্র হওয়ার জন্য এটি একটি অপরিহার্য্য শর্ত।

মাধ্যম ভেদে চিত্রগত আকারের ভিন্নতাব সম্ভাবনা স্বীকার করে নিলে যে প্রশ্নেব সম্মুখীন আমাদের অনিবার্য্যভাবে হতেই হয় তা হল : বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে, ভিন্ন ভিন্ন চিত্রগত আকার সম্বলিত চিত্রে যখন একই পরিস্থিতিকে চিত্রিত করা হয় তখন তাদের মধ্যে কি কোনো স্বাধর্ম্য থাকে? না যদি থাকে, তবে তাদের আমরা একই পরিস্থিতির চিত্র বলে বুঝি কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, 'বাস্তব-সত্তাব সাথে যে স্বাধর্ম্যবশতঃ

বিভিন্ন চিত্রগত আকাবের চিত্র একই বাস্তব সত্তাকে উপস্থাপিত করে সেই স্বাধর্ম্যটি হল চিত্রের ন্যাযিক আকার। কোনো চিত্রের উপাদানগুলি, তা সে যে মাধ্যমেরই উপাদান হোক্ না কেন, কোনো একটি বস্তুস্থিতিকে আদৌ চিত্রিত করতে পারবে না যদি না ঐ উপাদানগুলির ন্যায়িক আকার এবং বস্তুস্থিতির উপাদানগুলির ন্যায়িক আকার অভিন্ন হয়। কোনো বস্তু একটি বস্তুস্থিতির উপাদান হতে পারবে কি পারবে না তা নির্ভর করে বস্তুর ন্যায়িক আকারের উপর। অনুরূপে, হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে, কোনো চিত্রের উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়ে একটি বস্তুস্থিতিকে উপস্থাপিত করতে পারবে কি না তা নির্ভব কববে উপাদানের ন্যায়িক আকাবের উপর। যদি চিত্রের উপাদানের ন্যায়িক আকাব এবং বস্তুর ন্যায়িক আকার অভিন্ন হয় তাহলেই চিত্রের উপাদানগুলিকে ব্যবহাব করে ঐ বস্তুগুলির দ্বারা গঠিত বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করা যাবে।

ন্যায়িক আকার সম্পর্কে এতক্ষণ যা বলা হল তা থেকে বোঝা যায যে চিত্রেব চিত্রগত আকাব যেমনই হোক না কেন ন্যায়িক আকারকে বাদ দিয়ে কোনো চিত্র হতে পারে না। এই কারণেই হ্বিটগেনস্টাইন বলেন যে, প্রতিটি চিত্রেরই ন্যায়িক আকাব থাকে বলে যে সব চিত্রের অপরাপর চিত্রগত আকার রয়েছে সেগুলিকে দৈশিক, কালিক, ইত্যাদি চিত্র বলে উল্লেখ কবার সঙ্গে সঙ্গে 'ন্যায়িক চিত্র' বা 'লজিকাল পিক্‌চার' বলেও গণ্য করা যেতে পারে। অবশ্য 'ন্যায়িক চিত্র' এই পারিভাষিক নামটিকে হ্বিটগেনস্টাইন কেবলমাত্র সেই সব চিত্রের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করার পক্ষপাতী যে সব চিত্রের চিত্রগত আকার এবং ন্যায়িক আকার অভিন্ন।[৪] কোন্ ধরণের চিত্রের ক্ষেত্রে ন্যাযিক আকাবই চিত্রগত আকার হয় সে সম্পর্কে আমবা একটু পবেই আলোচনা কবব।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে বস্তুস্থিতির ন্যায়িক চিত্র হল 'চিন্তা' বা 'থট্' এবং 'বাক্যের মাধ্যমে চিন্তা প্রত্যক্ষ যোগ্য রূপে প্রকাশিত হয়'। ('টি. এল. পি' ৩.১)। হ্বিটগেনস্টাইন-এর এই মন্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে তাঁব মত অনুসাবে কোনো একটি ভাষায় লিখিত বা কথিত শব্দ সমষ্টিই বাক্য। অর্থাৎ কোনো ভাষায় যদি কিছু লেখা হয বা বলা হয় তাহলে লিখিত যে শব্দসমষ্টিকে আমবা চোখে দেখতে পারছি বা যাকে আমবা কানে শুনতে পারছি তা যদি আমাদের চিন্তাকে প্রকাশ করে তাহলে সেই দৃশ্য বা শ্রুত শব্দ সমষ্টি বাক্য বলে গণ্য হবে। ব্যাকরণগত দিক থেকে এবং প্রচলিত ধারণা অনুসারে বাক্য বলতে এই জাতীয় শব্দবিন্যাসকেই বোঝান হয়ে থাকে। হ্বিটগেনস্টাইনও 'বাক্য'কে এই অর্থেই গ্রহণ করেছেন মনে করলে (যা নাকি উপরে লিখিত মন্তব্য থেকে মনে হওয়াই স্বাভাবিক) হ্বিটগেনস্টাইন-এর বাক্য সংক্রান্ত ধাবণাকে সঠিক ভাবে বোঝা হবে না। শুধুমাত্র প্রত্যক্ষযোগ্য শব্দবিন্যাসকে বাক্য বলে গ্রহণ করা হলে কোনো দুটি শব্দ বিন্যাসে যদি ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থাকে তাহলে তাদেব সবসময়ই দুটি ভিন্ন বাক্য বলে গণ্য করতে হবে। হ্বিটগেনস্টাইন কিন্তু তা কবেন না। বাংলা ভাষায় লেখা বাক্য 'টেবিলের ওপব বইটি আছে' এবং ইংরেজী ভাষায় লেখা বাক্য 'দা বুক ইজ অন দা টেবিল'। একই বাক্যকে উপস্থাপিত কবছে বলে হ্বিটগেনস্টাইন

মনে করেন যদিও প্রাত্যক্ষিক শব্দ-বিন্যাসেব দিক থেকে বাক্য দুটি পৃথক। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত কবতে হলে বাক্যেব প্রত্যক্ষযোগ্য রূপটিকে বাক্যের বহিরঙ্গ বলে গণ্য কবতে হবে। বাক্যের এই বহিরঙ্গটিকে হ্বিটগেনস্টাইন-এর পবিভাষায় বলা হয় 'বাচনিক চিহ্ন' বা 'প্রপসিশনল সাইন'। বাক্য ও তাব অর্থ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে এই বাচনিক চিহ্নের মাধ্যমেই। এই বাচনিক চিহ্নের উপাদান হল প্রত্যক্ষযোগ্য শব্দগুলি। এই উপাদানগুলিকে যখন ঐ বাক্যের বাক্যার্থ যে বস্তুস্থিতি তার উপাদানেব সাথে চিন্তার মাধ্যমে যুক্ত কর। হয়, অর্থাৎ বাচনিক চিহ্নের উপাদানের সাথে যখন বস্তুস্থিতিরূপ বাক্যার্থের উপাদানগুলির মধ্যে সূচক-সূচ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং বাচনিক চিহ্নেব উপাদানগুলির পাবস্পবিক নির্দিষ্ট সম্বন্ধের দ্বাবা গঠিত বাচনিক চিহ্নের যে সংস্থান সেই সংস্থানটিব সাথে বস্তুস্থিতিব সংস্থানেব অনুরূপতা যখন স্থাপিত হয় তখন বাচনিক চিহ্নটি বাচনিক সংকেতে পরিণত হয়। এই বাচনিক সংকেতকেই হ্বিটগেনস্টাইন বাক্য বলে অভিহিত করেন। যে ধবণেব চিন্তার মাধ্যমে বাচনিক চিহ্নের উপাদান ও সংস্থানের সাথে বস্তুস্থিতির উপাদান ও সংস্থানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তাকে হ্বিটগেনস্টাইন-এব পরিভাষায বলা হবে অভিক্ষেপণ বা প্রজেক্শন। বাচনিক চিহ্ন যখন অভিক্ষেপণেব দ্বাবা বস্তুস্থিতিব সাথে সম্বন্ধ যুক্ত হয তখন তাকে বলা হয় বাচনিক সংকেত বা বাক্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে যে বাক্য সম্পর্কে হ্বিটগেনস্টাইন-এব ধাবণাটি দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। হ্বিটগেনস্টাইন - পূর্ব দর্শন আলোচনায় অনেক সময়ই 'বাক্য' বলতে শব্দসমষ্টিব দ্বারা প্রকাশিত এমন এক 'বহস্যময়' বিষয়কে বোঝান হত যার সাথে ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজ এবং বাস্তব সত্তাব বা বিয়ালিটি-র সম্পর্কটি ঠিক কী রকমেব তা পরিষ্কাব করে বোঝা যেত না। বিখ্যাত দার্শনিক জি. ই ম্যুরের মতে বাক্য এবকমই একটি অস্পষ্ট ও বহস্যময়তায় ঢাকা বিষয়। হ্বিটগেনস্টাইন-এব বাক্য-সম্পর্কিত তত্ত্বটি এই রহস্যময়তা থেকে বাক্যকে মুক্ত কবতে সক্ষম হয়েছে।

বাক্য বলতে হ্বিটগেনস্টাইন কী বোঝেন সে সম্পর্কে যে আলোচনা আমরা করেছি তা থেকে বোঝা যায় যে -

(ক) বাক্যমাত্রই কতগুলি উপাদানে বিশ্লেষণযোগ্য

(খ) বাক্যের প্রতিটি উপাদানের সাথে বাক্যার্থের উপাদানেব সূচক-সূচ্য সম্পর্ক বা উপস্থাপক-উপস্থাপ্য সম্বন্ধ থাকে

(গ) বাক্যেব উপাদানগুলি একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধের দ্বাবা আবদ্ধ থাকে অর্থাৎ বাক্যের একটি সংস্থান থাকে

(ঘ) বাক্যেব সংস্থানের সাথে বস্তুস্থিতিরূপ বাক্যার্থেব সংস্থানের সমরূপতা থাকে।

একটু লক্ষ্য কবলেই বোঝা যাবে যে এই সব বৈশিষ্ট্য যুক্ত হওয়ার ফলে চিত্র হওয়ার জন্য প্রযোজনীয় চাবটি শর্তেব মধ্যে হ্বিটগেনস্টাইন-স্বীকৃত-বাক্য তিনটি শর্তকে স্পষ্টতই

পূরণ করছে। এখনও পর্যন্ত বাক্য সম্পর্কে আমরা যা বলেছি তাতে চিত্র হওয়ার প্রথম শর্তটি অর্থাৎ চিত্রের উপাদানের সাথে চিত্রিতের উপাদানের অনুরূপতার শর্তটি বাক্য পূরণ করে কি না তা স্পষ্ট নয়। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে বাক্যের সাথে বাক্যার্থের এই অনুরূপতা সবসময় থাকে না। আমরা বাচনিক চিহ্নের যে উদাহরণ দুটি একটু আগে উল্লেখ করেছি সেগুলি এই ধারণাকে সমর্থন করে বলে মনে হতে পারে। 'টেবিলের ওপরে বইটি আছে' এবং 'দা বুক ইজ অন দা টেবিল' এই দুটি বাচনিক চিহ্নে তো উপাদান (শব্দ) সংখ্যা এক নয়, অথচ এরা একই বাক্যের অভিব্যক্তি এবং এদের অর্থও এক। মনে হতেই পারে যে যদি বাংলা ভাষায় লেখা বাক্যটির সাথে বস্তুস্থিতির উপাদানের অনুরূপতা থাকে তাহলে ইংরেজী বাক্যটির সাথে অনুরূপতা থাকবে না কারণ এই দুটি বাচনিক চিহ্নের মধ্যেই তো পারস্পরিক উপাদানগত অনুরূপতা নেই। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে আমাদের যা মনে হচ্ছে তা হ্বিটগেনস্টাইন-এর সমর্থন পাবে না। হ্বিটগেনস্টাইন দাবি করেন, 'একটি বাক্য যে পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে সেই পরিস্থিতিটি যতগুলি উপাদানে বিভাজ্য, বাক্যটিও ততগুলি উপাদানেই বিভাজ্য হবে।' ('টি এল পি' ৪.০৪) সুতরাং দুটি ভাষায় যদি একই বাক্য গঠন করা হয় তাহলে তাদের উপাদান সংখ্যাও সমান হবে। প্রশ্ন হতে পারে, হ্বিটগেনস্টাইন-এর এই মতটি কি মেনে নেওয়া যায়? আমরা যেখানে স্পষ্টতঃ দেখতে পাচ্ছি দুটি বাচনিক চিহ্নের উপাদান সংখ্যা ভিন্ন সেখানে তাদের সম-উপাদানত্ব মানা যায় কীভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য বাক্য ও বাক্যার্থের উপাদানের অনুরূপতা সম্পর্কে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য আর একটু ব্যাখ্যা করা দরকার। হ্বিটগেনস্টাইন যখন কোনো পরিস্থিতির উপাদানের কথা বলেন তখন পরিস্থিতির উপাদান বলতে পরিস্থিতিটি ন্যায়িক আকারের দিক থেকে যে সব উপাদানে বিশ্লেষণযোগ্য সেই সব উপাদানকেই বুঝিয়ে থাকেন। অনুরূপে বাক্যের উপাদান বলতেও বাক্যের ন্যায়িক উপাদানকেই বোঝান হয়। একটি পরিস্থিতিকে যদি বুঝতে হয় তাহলে পরিস্থিতিটিকে যে সব উপাদানে বিশ্লেষণ করতেই হয় সেগুলিই ঐ পরিস্থিতির ন্যায়িক উপাদান এবং একটি বাক্যের অর্থকে বুঝতে গেলে বাক্যটির যে সব উপাদান স্বীকার করতেই হয় সেগুলি বাক্যের ন্যায়িক উপাদান। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝা যেতে পারে। কোনো একটি চিত্রে দুটি রেখার দ্বারা যদি চিত্রিত পরিস্থিতির একটি উপাদানকে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে তাহলে চিত্রটিকে ঐ পরিস্থিতির চিত্র বলে বুঝতে ঐ দুটি রেখাকে চিত্রের একটি উপাদান বলেই গণ্য করতে হবে, দুটি রেখাকে দুটি ভিন্ন উপাদান বলে গণ্য করা যাবে না। এভাবেই চিত্রের ন্যায়িক আকারের দ্বারা চিত্রের উপাদান নির্ণীত হয়। একই ভাবে দুটি ভাষায় লিখিত দুটি বাচনিক চিহ্ন যদি একই বাক্যের প্রকাশক হয় তাহলে বাক্যের ন্যায়িক আকার অনুসারে ঐ চিহ্নগুলির উপাদান সংখ্যা নির্ণীত হবে এবং সেক্ষেত্রে বাক্যের সাথে বাক্যার্থের উপাদানের অনুরূপতা থাকবে। এই কারণেই বাক্য ও বাক্যার্থের উপাদানের অনুরূপতার কথা বলতে গিয়ে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন 'বাক্য ও বাক্যার্থের' মধ্যে সমান ন্যায়িক

(গাণিতিক) বহুধাত্ব (মাল্টিপ্লিসিটি), থাকতে হবে' ('টি. এল পি' ৪.০৪), না হলে বাক্য বাক্যার্থের উপস্থাপক হবে না।

এতক্ষণ পর্যন্ত বাক্যের স্বরূপ ও চিত্রের স্বরূপ সম্পর্কে যে আলোচনা করা হল তা থেকে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে চিত্র বলে গণ্য হওয়াব জন্য প্রয়োজনীয় সব কটি শর্তই বাক্যের পক্ষে পূরণ করা সম্ভব বলে হিটগেনস্টাইন দাবি করবেন। হিটগেনস্টাইন-এর মতে, প্রতিটি বাক্যই কতকগুলি নামপদের দ্বারা গঠিত একটি যৌগিক সংস্থান। অর্থাৎ বাক্যের উপাদান হল নামপদ। প্রতিটি নামপদ বাস্তব সত্তার সংঘটক বস্তুগুলির একটিকে সূচিত করে। এই নামপদেব বিন্যাসে গঠিত যে বাক্য তা অভিক্ষেপণিক সম্পর্কে বা প্রজেকশন রিলেশনের দ্বারা অনুরূপ উপাদান সংস্থানযুক্ত বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত কবে। হিটগেনস্টাইন মনে করেন এভাবে বাক্য বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত কবে বলেই বাক্যের অর্থ আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব হয়।

এখানে দুটি প্রশ্নের অবতারণা করা প্রাসঙ্গিক হবে। প্রথমতঃ, নামপদ যে অর্থে একটি বস্তুকে উদ্দেশ বা বেফাব করে বাক্যও কি সেই একই অর্থে বা একই প্রকারে তার অর্থকে উপস্থাপিত করে? দ্বিতীযত, বাক্যের আকাবের সাথে বস্তুস্থিতির আকারের সমরূপতা (যা না থাকলে বাক্যেব পক্ষে চিত্র হয়ে ওঠা সম্ভব নয়) বলতে হিটগেনস্টাইন ঠিক কী বলতে চেয়েছেন?

হিটগেনস্টাইন-এব মতে একটি নামপদ যে বস্তুটিকে সূচিত করে, অর্থাৎ নামপদটি যে বস্তুর নাম, সেই বস্তুটিই ঐ নামপদের অর্থ। প্রশ্ন হল বাক্যকেও কি এভাবে বাক্যার্থের 'নাম' রূপে বিবেচনা করা যায়? প্রাথমিকভাবে মনে হতে পারে যে বাক্য যে পরিস্থিতি বা বস্তুস্থিতিকে উপস্থাপিত করে তার নাম হিসেবে বাক্যকে গণ্য কবা যেতেই পাবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে বাক্যেব অর্থ বলতে বাক্যের দ্বারা উপস্থাপিত কোনো একটি 'প্রকৃত বস্তুস্থিতিকে' বুঝতে হবে। ঠিক যেমন 'টেবিল' বা 'বই' শব্দেব দ্বাবা টেবিল ও বই নামক বস্তুকে বোঝান হচ্ছে তেমনই 'টেবিলেব ওপব বইটি আছে' বললে ঐ সব বস্তুব বিন্যাসে গঠিত একটি প্রকৃত বস্তুস্থিতিকে বোঝায় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে বাক্যকে প্রকৃত বস্তুস্থিতির নাম রূপে গণ্য করা সম্ভব নয়। নামপদেব সাথে বাক্যেব স্বরূপগত পার্থক্যেব জন্যই এটা সম্ভব হবে না। কোনো একটি নামপদ হয কোনো বস্তুকে সূচিত কববে অথবা করবে না। যদি সেটা বস্তুকে সূচিত কবে তাহলেই সেই নামপদকে অর্থযুক্ত বলে গণ্য করা যায়, অন্যথায় নামপদটি হবে অর্থহীন। (এখানে মনে রাখা দবকার হিটগেনস্টাইন অর্থহীন নামপদকে নামপদ বলে স্বীকাবই করবেন না।) কিন্তু বাক্যকে যদি নামপদের সমগোত্রীয় বলে গন্য কবা হয় অর্থাৎ বাক্য ও বাক্যার্থেব সম্পর্ককে যদি নামপদ ও তার অভিধেয়েব সম্পর্কেব অনুরূপ বলে মনে করা হয় তাহলে মিথ্যা বাক্যকে অর্থহীন বাক্য বলে স্বীকার করতে হবে। কারণ, মিথ্যা বাক্যের ক্ষেত্রে বাক্যেব দ্বারা সূচিত কবা যায এমন কোনো প্রকৃত বস্তুস্থিতিব অস্তিত্ব থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু মিথ্যা বাক্যও

অর্থযুক্ত বাক্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুতরাং বাক্য ও বাক্যর্থের সম্পর্ককে নাম ও বস্তুর সম্পর্কেব অনুরূপ বলে স্বীকাব কবা যায না। প্রশ্ন হতে পারে, বাক্য যদি তাব অর্থরূপ প্রকৃত বস্তুস্থিতিকেই উপস্থাপিত না করে তাহলে বাক্যের অর্থ বস্তুতপক্ষে কী? এই প্রশ্নের উত্তবে হিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য অনুসরণ করে বলা যায় সম্ভাব্য বস্তুস্থিতিই হল একটি বাক্যেব অর্থ। অন্যভাবে বলা যায একটি বাক্য শুনলে আমরা বুঝতে পাবি বাক্যটি সত্য হলে প্রকৃত বস্তুস্থিতিটি কী ধবণের হবে। হিটগেনস্টাইন-এর ভাষায়, 'একটি বাক্যের অর্থ বুঝতে পারলেই জানা হয়ে যায় যে ঐ বাক্যটি সত্য হলে প্রকৃত বস্তুস্থিতিটি কি ধরনের হবে।' ('টি. এল. পি ' ৪.০২৪) যে ধরনেব বস্তুস্থিতি অস্তিত্বশীল হলে একটি বাক্য সত্য হয় সেই বস্তুস্থিতিই ঐ বাক্যের অর্থ। একটি বাক্য প্রকৃতপক্ষে সত্য না মিথ্যা তা না জেনেও আমবা বাক্যটি শুনে বলে দিতে পাবি যে কোন্ পবিস্থিতিতে বাক্যটি সত্য হবে। অতএব বাক্যেব অর্থ তার সত্যমূল্যেব ওপব নির্ভরশীল নয। কিন্তু তা বলে বাক্যের অর্থের সঙ্গে তাব সত্যমূল্যের কোনো সম্পর্ক নেই একথা মনে কবলে ভুল হবে। হিটগেনস্টাইন-এর মতে প্রতিটি বাক্যই হয় সত্য হবে অথবা মিথ্যা হবে। বাক্যে যেভাবে বস্তুস্থিতিকে উপস্থাপিত কবা হয়েছে বাস্তবিক পক্ষে সেই আকারেব বস্তুস্থিতি যদি জগতে থাকে তাহলে বাক্যটি সত্য হবে, নচেৎ মিথ্যা হবে।

বাক্য যদি নামপদেব সমন্বযে গঠিত হয এবং নামপদগুলিব অনুরূপ বস্তু না থাকলে যদি নামপদটি অর্থহীন হয তাহলে যে বাক্যেব অন্তর্গত নামপদ অর্থহীন সেই বাক্যও অর্থহীন হওয়া উচিত। কিন্তু এমন অনেক বাক্য আমবা গঠন কবি যে বাক্যেব নামপদটি জগতে কোনো বস্তুকেই বোঝায না অথচ বাক্যটিব অর্থ আমরা বুঝে থাকি, অর্থাৎ কোন্ পরিস্থিতিতে বাক্যটি সত্য হবে তা আমবা বুঝতে পাবি। এ ধবণেব বাক্যেব উদাহরণ কি তাহলে হিটগেনস্টাইন-এর বাক্য সংক্রান্ত তত্ত্বেব অসারতা প্রমাণ করে? এ ধবণেব একটি বাক্যেব উদাহরণ নিযে বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পাবে। 'ফ্রান্সের বর্তমান বাজা জ্ঞানী ব্যক্তি' - এই বাক্যটিব অন্তর্গত নামপদ 'ফ্রান্সেব বর্তমান বাজা'। এই নামপদের দ্বাবা সূচিত হয এমন কোনো বস্তুই জগতে নেই। অথচ বাক্যটিব অর্থ আমবা বুঝতে পারি। প্রশ্ন হল. হিটগেনস্টাইন-এর বাক্য তত্ত্বের দ্বাবা এই বাক্যটির (ফ্রান্সেব বর্তমান বাজা জ্ঞানী) চিত্ররূপতা কীভাবে ব্যাখ্যা কবা যাবে?

এই সমস্যাব সমাধানেব জন্য হিটগেনস্টাইন বার্ট্রান্ড বাসেল-এব বর্ণনা সংক্রান্ত মতবাদটিকে ব্যবহাব কবেছেন। রাসেল-এব মত অনুসবণ কবে বলা যেতে পারে যে এই বচনটি প্রকৃতপক্ষে একটি যৌগিক বচন। এই বচনটিকে বিশ্লেষণ কবলে যে তিনটি বচন পাওযা যাবে তা হল -

১ এমন একজন আছেন যিনি বর্তমানে ফ্রান্সে বাজত্ব কবছেন;
২ তিনি ছাড়া আব কেউ বর্তমানে ফ্রান্সে রাজত্ব কবছেন না,
৩ তিনি জ্ঞানী ব্যক্তি।

মূল বচনটিকে এই তিনটি বচনে বিশ্লেষণ করলে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, 'ফ্রান্সের বর্তমান রাজা' বস্তুতপক্ষে এই বাক্যের নামপদ নয়। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, বাক্যের আপাতদৃষ্ট আকার বা অ্যাপরান্ট ফর্ম সবসময় তার ন্যায়িক আকারের প্রতিফলন নয়। এই কারণে যৌগিক বাক্যগুলির চিত্ররূপতাকে বুঝতে হলে সেই বাক্যগুলির অঙ্গীভূত মৌলিক বাক্যগুলির চিত্ররূপতাকে বোঝা প্রয়োজন। একটি যৌগিক বাক্যকে নিয়ে যদি তার অন্তর্গত উপাদানগুলির সাথে ঐ বাক্যার্থের উপাদানের অনুরূপতা খোঁজার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেই অনুরূপতা পাওয়া না যেতে পারে। এই কারণে যৌগিক বাক্যগুলিকে মৌলিক বাক্যে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। একমাত্র মৌলিক বাক্যই যথাযথ ভাবে বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করতে পারে, কেন না বস্তুস্থিতি স্বরূপত মৌলিক। যৌগিক বাক্যের মাধ্যমে যৌগিক বস্তুস্থিতিকে চিত্রিত করা হলেও মনে রাখতে হবে ঐ যৌগিক বস্তুস্থিতিটি প্রকৃতপক্ষে মৌলিক বস্তুস্থিতিরূপ বাক্যার্থের ন্যায়িক সমন্বয়ের ফল।

এখানে আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্নটি উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রশ্নটি হল মৌলিক বাক্যের সঙ্গে সম্ভাব্য বস্তুস্থিতির আকারগত স্বাধর্ম্য কীভাবে সম্ভব হয়? বাক্যের যে লিখিতরূপ আমাদের প্রত্যক্ষে আমরা পাই তার সাথে বস্তুস্থিতির আকারের সাদৃশ্য থাকা তো আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। কাজেই উভয়ের স্বাধর্ম্য যদি স্বীকার করা হয় তাহলে সেই স্বাধর্ম্য কীভাবে সম্ভব হয় তারও ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতানুসারে, মৌলিক বাক্য এবং তার বাক্যার্থ অর্থাৎ সম্ভাব্য বস্তুস্থিতির মধ্যে কেবলমাত্র ন্যায়িক আকারগত সাদৃশ্যই থাকে। অর্থাৎ যে কোনো মৌলিক বাক্যের চিত্রগত আকার তার অর্থরূপ সম্ভাব্য বস্তুস্থিতির ন্যায়িক আকারের সাথে অভিন্ন। বাক্যের এই আকারগত দিকটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই বাচনিক চিহ্নকে 'প্রকৃত বস্তুস্থিতি' 'এ প্রপসিশনাল সাইন ইজ এ ফ্যাক্ট' ('টি এল পি' ৩.১৪) বলে অভিহিত করেছেন। বাচনিক চিহ্নের অন্তর্গত উপাদান বা শব্দগুলির বিন্যাস দেখে প্রাথমিক ভাবে মনে নাও হতে পারে যে এই উপাদানগুলির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্বন্ধ বা বিধিবদ্ধতা রয়েছে। কিন্তু এই বিধিবদ্ধতা না স্বীকার করলে কোনো শব্দ বিন্যাসকেই বাক্য বলে মানা যায় না। বস্তুস্থিতি তৈরি করার জন্য যেমন বস্তুগুলির মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সম্বন্ধ থাকা দরকার তেমনি বাক্য হতে গেলেও বাচনিক চিহ্নের উপাদানগুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে পরস্পরের সাথে সম্বদ্ধ হতে হয়। এই সম্বন্ধতার দিকটিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্যই হ্বিটগেনস্টাইন বাচনিক চিহ্নকেও একটি বস্তুস্থিতি বলে উল্লেখ করেন। অবশ্য যে অর্থে তিনি জগৎকে বস্তুস্থিতির সমন্বয় বলে অভিহিত করেন সেই অর্থে বাক্যকে বা বাচনিক চিহ্নকে বস্তুস্থিতি বলেন নি। যাই হোক, বাক্যের উপাদানগুলি পরস্পর সম্বদ্ধ হয়ে বাক্যের যে আকারটি তৈরি হয় তার সাথে বাচনিক চিহ্নগুলির আপাতদৃষ্ট আকারের কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও যেহেতু বাচনিক চিহ্ন বাক্যকে প্রকাশ করে সেহেতু, উভয়ের মধ্যে ন্যায়িক আকারের সাদৃশ্য হ্বিটগেনস্টাইন স্বীকার করবেন। শুধু তাই নয়, বাক্যের ন্যায়িক আকারের সাথে বাক্যার্থের ন্যায়িক আকারের অভিন্নতাও তিনি মানবেন।

বস্তুস্থিতির ন্যায়িক আকারের সাথে বাক্যেব ন্যায়িক আকারের অভিন্নতা কীভাবে সম্ভব হতে পারে সে বিষয় আলোচনা করতে হলে প্রথমে হ্বিটগেনস্টাইন-স্বীকৃত বস্তু ও বস্তুস্থিতি সম্পর্কে দু-একটা কথা বলা প্রয়োজন। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে, বস্তু মাত্রই নিবংশ। কিন্তু কোনো একটি বস্তু কোন্ কোন্ বস্তুস্থিতির উপাদান হতে পাবে তা পূর্ব নির্দ্ধারিত। কোনো বস্তুস্থিতির যে ন্যায়িক আকার থাকে তা বস্তুর ন্যায়িক আকারের দ্বারাই নির্দ্ধাবিত হয়। সুতরাং কোন্ বস্তুস্থিতিতে উপাদানরূপে কোন্ বস্তু থাকবে তা আকস্মিক ভাবে স্থিব হয় না। ইচ্ছেমত যে কোনো বস্তুকে যে কোনো বস্তুস্থিতির উপাদান বলে স্বীকার বা বর্জন কোনোটাই করা যায় না। ভাষায় বস্তুর সূচক হল নামপদ। যেহেতু একটি সম্ভাব্য বস্তুস্থিতিতে কোন্ বস্তু উপাদান রূপে উপস্থিত থাকতে পারবে তা পূর্ব নির্দ্ধারিত, সেহেতু ঐ বস্তুর নামটি কোন্ কোন্ বস্তুস্থিতির বর্ণনায় বাক্যেব উপাদানরূপে ব্যবহৃত হতে পারবে তাও পূর্বনির্দ্ধাবিত বলে স্বীকার করতে হবে। এভাবে বস্তুব ন্যায়িক আকারেব দ্বারা নামের ন্যায়িক আকাব নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। ফলতঃ নামগুলি পবস্পর সম্বন্ধ হয়ে যখন কোনো বস্তুস্থিতির বর্ণনা প্রস্তুত কবে তখন সেই বর্ণনাত্মক বাক্যের ন্যায়িক আকাবের সাথে সম্ভাব্য বস্তুস্থিতিটির ন্যায়িক আকাব অভিন্ন না হয়ে পারে না। বাক্যের ন্যায়িক আকার বস্তুস্থিতিব ন্যায়িক আকারকেই প্রদর্শিত কবে।

এখানে আপত্তি হতে পারে যে, কোন্ শব্দটিকে কোন্ বস্তুর নাম হিসেবে ব্যবহার করা হবে এবং কোন ধরণের নিয়মের দ্বারা নামগুলিকে যুক্ত করে বাক্য গঠন কবা হবে তা তো নির্দ্ধারিত হয় ভাষাগত প্রথার দ্বারা, কাজেই বাস্তব সত্তার ন্যায়িক আকারের সাথে ভাষাব ন্যায়িক আকাবেব অভিন্নতা থাকবে একথা কী কবে বলা যায়? এই ধরণের কোনো স্পষ্ট উত্তর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে দেওয়া হয় নি। কিন্তু এই গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন বাক্যেব স্বরূপ এবং বাক্য ব্যবহারেব উদ্দেশ্য নিয়ে যা কিছু বলেছেন তাব উপব ভিত্তি করে এই আপত্তিব উত্তর আমরা দিতে পারি। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে ভাষা হল চিন্তার প্রত্যক্ষযোগ্য রূপ। অর্থাৎ আমরা যখন আমাদেব চিন্তাকে অন্যের কাছে উপস্থাপিত কবতে চাই তখন ভাষা ব্যবহার করি। সুতরাং আমাদের ভাষার গঠনের মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে ভাষার মাধ্যমে চিন্তাকে আমবা প্রকাশ করতে পারি। চিন্তা প্রকাশ করা মানে চিন্তার বিষয়টিকে বা অবজেক্ট অব থট-কে প্রকাশ করা, হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে চিন্তার মাধ্যমে আমরা বস্তুস্থিতিকে আমাদেব সামনে উপস্থাপিত করি। এই কারনে 'চিন্তা'কে তিনি 'বাস্তব সত্তার ন্যায়িক চিত্র' বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ তাঁর মতে চিন্তার ন্যায়িক আকার এবং বাস্তব সত্তার (সম্ভাব্য বস্তুস্থিতিগুলি যার উপাদান) ন্যায়িক আকাব অভিন্ন। এখন যদি এই চিন্তাকে যথার্থভাবে অন্যের কাছে উপস্থাপিত কবার জন্য ব্যবহার কবা হয় তাহলে ভাষার নিয়মগুলি লোকব্যবহার বা প্রথা দ্বাবা নির্দ্ধারিত করা হলেও নিতান্ত খামখেয়ালী ভাবে তা নির্দ্ধারণ করা হয় বলে মনে করলে ভুল হবে। চিন্তাকে উপস্থাপিত করতে গেলে তার আকারকে বাদ দিয়ে তা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ভাষার নিয়ম তৈরির ক্ষেত্রে একটি শৃঙ্খলা থেকেই

যায় এবং তা আরোপিত হয় চিন্তার আকারের দ্বারা। ভাষায় প্রকাশিত চিন্তা অবশ্যই চিন্তার সঙ্গে অভিন্ন ন্যায়িক আকার সম্পন্ন হতে হবে, না হলে ভাষা চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারবে না। যেহেতু চিন্তার ন্যায়িক আকার এবং বাস্তব সত্তার ন্যায়িক আকার অভিন্ন সেহেতু ভাষার নিয়মগুলি অনুসরণ করে চিন্তাকে প্রকাশ করার সময় বাক্যের ন্যায়িক আকারও বস্তুস্থিতিরূপ বাক্যার্থের ন্যায়িক আকারের সাথে অভিন্ন হবে।

বাক্য ও বাক্যার্থের সম্পর্ক বিষয়ে চিত্ররূপতার তত্ত্ব উপস্থাপনা করার সময় হ্বিটগেনস্টাইন একথা বলতে চান নি যে বাক্যের সাথে চিত্রের কিছু কিছু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য আছে। বরং বাক্য সর্বাংশেই একধরণের চিত্র - একথাই তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বাক্য একধরণের চিত্র বলেই বাক্যেব পক্ষে কোনো অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়' ('টি.এল.পি.' ৪.০৩)। যে কোনো চিত্রে একথা যেমন সত্য যে চিত্রটিকে যদি চিত্র বলে বোঝা যায় তা হলে তা কোন্ অর্থ প্রকাশ করেছেন, তা বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না, ঠিক তেমনই যদি একটি শব্দ সমষ্টিকে বাক্য বলে বুঝতে পারা যায় তা হলে তার অর্থও বোঝা হয়ে যায়। 'একটি বাক্য যে পরিস্থিতিকে উপস্থাপিত করে সেই বাক্যের সাথে সেই পরিস্থিতির একটি স্বরূপগত সম্পর্ক থাকে বলেই এটা সম্ভব হয়। ('টি.এল.পি ' ৪.০৩) উভয়ের ন্যায়িক আকারের অভিন্নতাই এই স্বরূপগত সম্পর্ককে সম্ভব করে। চিত্র হওয়ার সুবাদে বাক্য তাব অর্থকে যখন উপস্থাপিত করে তখন সেই অর্থকে বুঝিয়ে বলার জন্য অন্য কোনো বাক্যকে ব্যবহার করার দরকার হয় না শুধু নয়, অন্য বাক্যের দ্বারা একটি বাক্যের অর্থকে বলা যায়-ই না। এই কারণে হ্বিটগেনস্টাইন বলেন 'বাক্য তার অর্থকে প্রদর্শিত করে। ('টি.এল.পি.' ৪.০২২)

বাক্যকে চিত্ররূপে স্বীকার করার অন্যতম ফলস্বরূপ হ্বিটগেনস্টাইন-কে একথাও স্বীকার করতে হয় যে স্বতঃসিদ্ধরূপে সত্য বা স্বতঃসিদ্ধরূপে মিথ্যা বাক্যকে প্রকৃত অর্থবোধক বাক্য বলে গণ্য করা যায় না। কারণ, 'কোনো চিত্রই এমন হতে পারে না যে বস্তুস্থিতির সাথে মিলিয়ে দেখার আগেই তাকে সত্য বলা যাবে' ('টি. এল. পি'. ২.২২৫)। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে কোনো চিত্রকেই সত্য বা মিথ্যা বলা যায় না। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ বাক্যগুলির ক্ষেত্রে সত্যতা বা মিথ্যাত্ব অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে কেবলমাত্র আকারগত তথ্যের ওপর নির্ভর করেই নির্দ্ধারিণ করা যায় বলে এ ধরণে বচনের চিত্ররূপতা হ্বিটগেনস্টাইন স্বীকার করবেন না। এই ধরণের বাক্যকে তিনি 'ছদ্মবাক্য' বা 'সিউডো স্টেটমেন্ট' বলেন। কারণ যথার্থ বাক্যের আকার এদের থাকলেও এরা যথার্থ বাক্য নয়।

দার্শনিকেরা অনেক সময়ই দাবি করেছেন যে দার্শনিক তত্ত্বগুলি জগৎ সম্পর্কিত শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিতে পারে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর চিত্ররূপতা সম্পর্কিত তত্ত্ব দার্শনিকদের এই দাবিকে নাকচ করে দেয়। একটু আগেই আমরা দেখলাম যে হ্বিটগেনস্টাইন-এর চিত্ররূপতার তত্ত্বকে স্বীকার করলে কোনো স্বতঃসিদ্ধ সত্য বাক্যকেই জগৎ সম্পর্কিত সত্যের উপস্থাপক বলে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং হ্বিটগেনস্টাইন বলবেন যে দর্শন কখনোই জগৎ সম্পর্কে

আমাদের কোনো জ্ঞানই দেয় না। প্রশ্ন হতে পারে, হ্বিটগেনস্টাইন কি তাহলে দর্শন শাস্ত্রের যাবতীয় প্রাসঙ্গিকতাকেই অস্বীকার করবেন? এ বিষয় হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য খুব পরিষ্কার তাঁর মতে আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে যে সমস্ত অস্পষ্টতা থাকে তা দূর করাই হল দর্শনের কাজ। ভাষার বহিরঙ্গ অনেক সময়ই চিন্তার মূল আকারকে এমন ভাবে আবৃত করে রাখে যার দরুন আমারা প্রায়শঃ চিন্তার স্বচ্ছতাকে হারিয়ে ফেলি। ভাষা বিশ্লেষণ করে চিন্তার মূল আকারকে ধরতে সাহায্য করাই দর্শনের কাজ। দর্শন চর্চার অর্থই হল এই কাজ করা 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে বাক্যের চিত্ররূপতা সংক্রান্ত তত্ত্বের দ্বারা হ্বিটগেনস্টাইন এই কাজটিই করার চেষ্টা করেছেন।

টীকা

যে পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে -

Contradiction	=	স্বতঃসিদ্ধভাবে মিথ্যা
Elementary Proposition	=	মৌলিক বাক্য
Fact	=	প্রকৃত বস্তুস্থিতি
Model	=	অনুকৃতি
Object	=	বস্তু
Pictorial form	=	চিত্রগত আকার
Picturing relation	=	চিত্রতার সম্পর্ক
Proposition	=	বাক্য
Propositional sign	=	বাচনিক চিহ্ন
Propositional symbol	=	বাচনিক সংকেত
Reality	=	বাস্তব সত্তা
Pseudo-Proposition	=	ছদ্ম বাক্য
State of affairs	=	বস্তুস্থিতি
Structure	=	সংস্থান
Tautology	=	স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য

১ Russell, Bertrand, 'On propositions What they are and what they mean' in R Marsh (ed), *Logic and Knowledge*, London 1956, p 290

২ দ্রষ্টব্য : 'টি. এল পি' ২.১৫১৪

৩ 'সম্বন্ধ' বলতে হ্বিটগেনস্টাইন উপাদানগুলির অতিরিক্ত কোনো পদার্থকে বোঝান না। উপাদানগুলির একেক রকম বিন্যাসকেই এক এক রকম সম্বন্ধ বলে অভিহিত করা হয়। যেমন টেবিল এবং বই-এর একরকম বিন্যাসকে বোঝানোর জন্য আমারা বলব 'বইটি টেবিলের বাঁদিকে আছে' আবার অন্য ধরণের বিন্যাসকে বোঝানোর জন্য বলব 'বইটি টেবিলের ডানদিকে আছে', ইত্যাদি।

৪. 'যে চিত্রের ন্যায়িক আকারই চিত্রগত আকার তাকে বলে ন্যায়িক চিত্র'। ('টি. এল. পি.' ২.১৮১)

যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি

ইন্দ্রাণী সান্যাল

লুডভিগ্ হিটগেনস্টাইন-এর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থের ধারণাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো লজিকাল স্পেস বা যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধারণা। সমগ্র 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে 'যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি' শব্দজোটটিব উল্লেখ কয়েকবাব মাত্র লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু তাব থেকে এইরকম ভাববাব কোনো অবকাশ নেই যে হিটগেনস্টাইন-এব আলোচ্য গ্রন্থটিতে 'যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি' ধারণাটির দার্শনিক তাৎপর্য নগণ্য। হিটগেস্টাইন-এব দর্শনকে অনেক সময়ে 'যৌক্তিক পবমাণুবাদ' আখ্যা দেওযা হযে থাকে, অধিকাংশ প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে হিটগেনস্টাইন পবমাণুবাদী এবং এটাই তাঁর প্রধান পবিচয়। অবশ্য হিটগেনস্টাইন স্বয়ং কখনই তাঁর মতবাদকে পবমাণুবাদ আখ্যা দেননি। হিটগেস্টাইন-এর দর্শনের যৌক্তিক পরমাণুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীব প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে বির্তকেব অবকাশ থাকলেও তাঁব দর্শনে যে পবমাণুবাদেব আভাস পাওয়া যায় তা মনে কবা নিতান্ত অসঙ্গত হবে না। 'ট্র্যাকটেটস'-এ যৌক্তিক পরমাণুবাদ এবং আধিবিদ্যক সত্তাবিষযক পরমাণুবাদ উভয়ই সমর্থিত হয়েছে এই বকমও বলা হয়ে থাকে। হিটগেনস্টাইন পূর্বতসিদ্ধ যুক্তিব সাহায্যে সবল বা অবিভাজ্য বস্তুর অস্তিত্ব সিদ্ধ কবেছেন এবং এখানেই বাসেল এবং হিটগেনস্টাইন-এর মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়।

বাসেল স্বীকৃত যৌক্তিক পরমাণুবাদ অনুসাবে বাক্যেব বিশ্লেষণ সেইরকম স্তরে গিয়ে থামবে যেখানে বাক্যভুক্ত শব্দের অর্থেব পরিচিতি মূলক জ্ঞান আছে ও সেই বস্তুগুলি সরল বস্তু। কিন্তু 'ট্রাকটেটস'-এ সরলবস্তুব অস্তিত্ব সমর্থন কবতে এমন ধরণেব অভিজ্ঞতাবাদী দাবি লক্ষ্য কবা যায় না। হিটগেনস্টাইন-এব কাছে সবল বস্তুর মানদণ্ড পবিচিতিমূলক জ্ঞান থাকা নয়। তাঁব মতে বাক্যের নির্দিষ্ট অর্থ শেষ পর্যন্ত নির্ভর কবে সবলবস্তুব অস্তিত্বেব উপর। কিন্তু এই বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি 'ট্র্যাকটেটস'-এ একটি সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে যেখানে সবল খণ্ডগুলিব চাইতে অখণ্ডেব গুরুত্ব অনেক বেশি। এই দাবি 'ট্র্যাকটেটস' প্রসঙ্গে কবা যেতে পাবে যে এখানে একটি অভগ্ন, অচূর্ণিত, সম্পূর্ণেব ধাবণা প্রধান হযে উঠেছে। তবে এই সম্পূর্ণ দ্রব্য না গুণ, যান্ত্রিক না জৈবিক - এ সমস্ত অধিভৌতিক প্রশ্নের উত্থাপন কিংবা মীমাংসা 'ট্র্যাকটেটস'-এব উদ্দেশ্য ছিল না। 'ট্র্যাকটেটস'-এর পটভূমির মধ্যে থেকে এই ধরনেব প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধারণাটি ব্যাখ্যা করলে ক্রমশঃ স্পষ্ট হবে কেন বলা হচ্ছে যে হিটগেনস্টাইন-এব দর্শনে সমগ্রের ধাবণা যথেষ্ট প্রাধান্য

পেয়েছে। এই প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য মূলত হ্বিটগেনস্টাইন-এর যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধারণাটি পবিষ্কার করা।

বিংশ শতাব্দীব প্রথমার্ধে দর্শন আলোচনার ধারা পরিণতি পেল ভাষাদর্শনে, সেই সময়ের অন্যতম দার্শনিক হ্বিটগেনস্টাইন। ভাষা দার্শনিক হ্বিটগেনস্টাইন ভাষার সঙ্গে জগতেব এক নিবিড় সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন। ভাষা বলতে হ্বিটগেনস্টাইন বাক্য বা বচন সমূহেব সামগ্রী বুঝিয়েছেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে ভাষার একটি সার্বিক যৌক্তিক আকার আছে, কিন্তু ভাষাব বহিবঙ্গের আড়ালে সেই অন্তরঙ্গ রূপ প্রায়শ গোপন থাকে। ভাষা বিশ্লেষণেব মাধ্যমে ভাষার অর্ন্তবর্তী যৌক্তিক কাঠামো স্পষ্ট হবে। ভাষার আকার বিশ্লেষণই দার্শনিক সমস্যা সমাধানেব একমাত্র উপায়। ভাষার আকারেব সঙ্গে জগতের সাংগঠনিক আকাবের স্বারূপ্য আছে। ফলে ভাষাব আকাব জানতে পারলে জগতের আকার জানা যাবে।

ভাষার সমস্যা

ভাষাব সমস্যা নানা ভাবে আলোচনার বিষয় হতে পাবে। আমরা যখন ভাষা ব্যবহার কবে কোনো কিছু বোঝাবাব অভিপ্রায করি, তখন আমাদের মনের মধ্যে ঠিক কী ধরনেব ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয সেটা আমরা বোঝাবার চেষ্টা করতে পারি। ভাষা সংক্রান্ত এই সমস্ত প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়। আমরা যখন শব্দ ব্যবহার কবে অথবা বাক্য ব্যবহাব কবে কোনো বস্তু বা বিষয়কে নির্দেশ করি তখন সেই নির্দিষ্ট বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে ভাষাব সম্পর্ক কী ধবনেব তা আলোচিত হতে পারে। এই ধবণেব সমস্যাকে বলা যায পদ দ্বারা বোধিত অর্থেব দ্যোতনা সংক্রান্ত সমস্যা। ভাষার যৌক্তিক সমস্যাটির ধরণ অন্যরকম। ভাষার কোনো অঙ্গ, ধবা যাক্ বাক্য, কোনো অবস্থার প্রতীক হলে প্রতীকরূপী ভাষা এবং অবস্থাব কী ধরণেব সম্পর্ক হতে পাবে এটি আলোচনা করা হয়। হ্বিটগেনস্টাইন এই ধরনেব ভাষা সমস্যা নিয়ে মূলত আলোচনা কবছেন। ভাষার কাজ বর্ণনা কবা এবং বর্ণনাব মাধ্যমে জগৎকে উপস্থাপিত করা বা চিত্রিত করা। ভাষা এবং জগৎ হ্বিটগেনস্টাইন-এব কাছে চিত্র এবং চিত্রিত, চিত্র এবং চিত্রিতেব অনুরূপতা 'ট্র্যাকটেটস'-এর অন্যতম পূর্বশর্ত। বাক্যেব অবয়ব-সংগঠন এবং বাক্যার্থরূপ বস্তু সম্মেলনেব সাংগঠনিক অবয়ব সমরূপ। ভাষার অন্তবর্তী যুক্তিবিজ্ঞানেব যে অনন্য রূপ আছে তা বোঝার প্রয়াস 'ট্র্যাকটেটস'।

আলোচ্য প্রবন্ধটিব প্রথম অংশে যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধাবণাটি 'ট্র্যাকটেটস'-এব প্রথম ভাগে যেভাবে আধিবিদ্যক ধারণারূপে উপস্থাপিত হয়েছে সেই ভাবেই আলোচিত হয়েছে। প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অংশে হ্বিটগেনস্টাইন-এর যুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কে ধাবণা আলোচনা করা হয়েছে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর যুক্তিবিজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণা পরিষ্কার করে তুলে ধরতে না পাবলে যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধারণা অপূর্ণ থেকে যাবে। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে হ্বিটগেনস্টাইন-এর

যুক্তিবিজ্ঞানেব ধাবণার পাশাপাশি তুলনামূলক ভাবে ফ্রেগে এবং রাসেল-এর প্রসঙ্গও এসেছে।

বস্তু, সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তি, যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি

'ট্র্যাকটেটস'-এর ১.১৩ বাক্যটিতে আমবা সর্বপ্রথম 'যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি' শব্দজোট পাই এখানে বলা হয়েছে - যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিতে বিধৃত আছে এমন অস্তিত্বশীল বস্তু সংযুক্তিগুলি হল জগৎ। এখানে একটি সুবিশাল আধাবেব রূপকে যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধারণার অবতারণা করা হয়েছে। যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি এবং জগতের সম্পর্ক হ্বিটগেনস্টাইন কী ভাবে বুঝেছেন তা অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তোরঙ্গে যেমন বস্ত্রাদি থাকে, সিন্দুকে যেমন ধনসম্পদ থাকে, কলসে যেমন জল থাকে, অনুরূপ ভাবে কি যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিতে জগৎ থাকে বলা যায়?

'ট্র্যাকটেটস' শুরু হয়েছে জগৎ কী এই আলোচনা দিযে। আপাতদৃষ্টিতে প্রশ্ন জাগতে পারে হ্বিটগেনস্টাইন-এব সাথে এরিস্টটল, স্পিনোজা, ডেকার্ত, ইত্যাদিব দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য কোথায়? হ্বিটগেনস্টাইন জগৎকে বলেছেন বিদ্যমান বস্তু সংযুক্তিব সামগ্রী, কখনই নিছক বস্তুব সামগ্রী নয়। প্রতিটি বস্তুব মধ্যে আছে নিহিত সম্ভাবনাবাশি যাব বলে কোনো একটি বস্তু অপব একটি বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। প্রতিটি বস্তুই স্বরূপত কোনো একটি বস্তু সংযুক্তির সম্ভাব্য অংশ। হ্বিটগেনস্টাইন বস্তুর স্বরূপ বা বস্তু সংযুক্তিব সম্ভাব্য অংশ বোঝানোব জন্য পাবিভাষিক অর্থে 'বস্তুর যৌক্তিক আকাব' ভাবাংশ ব্যবহার করেছেন। বস্তুগুলি সরল কিন্তু তাদের পারস্পরিক সংযুক্তিব ফল জটিল। বস্তুনিষ্ঠ যৌক্তিক আকারের ভিন্নতাবশত বস্তুগুলি পরস্পর থেকে ভিন্ন হতে পারে কারণ যে কোনো বস্তু যে কোনো বস্তু সংযুক্তির অংশ হতে পারে না। এই বস্তুগুলিই জোগান দেয জগতের অপরিবর্তনীয় চিরস্থায়ী আকার। বস্তুগুলি সংযুক্ত হয়ে যে বস্তুসংযুক্তি গঠিত হয় সেখানে বস্তুগুলি একে অপরের সঙ্গে শৃঙ্খলের মত নির্দিষ্ট ক্রমে বিন্যস্ত থাকে। বস্তু সংযুক্তি মাত্রই সম্ভাব্য, কিন্তু কিছু বস্তু সংযুক্তি তদতিবিক্ত বাস্তব। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে বাস্তব বস্তুসংযুক্তির সামগ্রী হল জগৎ। অপরদিকে যাবৎ সম্ভাব্য বস্তু সংযুক্তি মিলে যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি - যে বস্তুসংযুক্তি সম্ভাব্য এবং বাস্তব এবং যে বস্তুসংযুক্তি সম্ভাব্য কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি এই উভয় নিয়েই যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি। যেহেতু হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে প্রতিটি বস্তুর স্বরূপ সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তির অংশ হওয়া তাই বলা যেতে পারে প্রতিটি বস্তুই সম্ভাব্য সংযুক্তিতে থাকবে। সুতরাং প্রতিটি বস্তু সম্ভাব্য সংযুক্তি সামগ্রীতে থাকবে, এর অর্থ এটা বলা যে প্রতিটি বস্তুই যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিতে বিধৃত থাকে হ্বিটগেনস্টাইন কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে একটি বস্তুর সম্ভাব্য-বস্তুসংযুক্তি-সামগ্রীতে থাকা ব্যাপারটা বুঝিয়েছেন। কোনো একটি কণিকা দৃষ্টিগোচর হতে গেলে দর্শনগ্রাহ্য সীমানার মধ্যে থাকতে হবে; কণিকাটি লাল হতে পারে, নীল হতে পাবে, অর্থাৎ কণিকাটি যে লাল হবেই এমন কোনো কথা নেই অথবা কণিকাটি যে নীল হবে এমন কোনো কথা নেই -

কিন্তু কণিকাটিব কোনো না কোনো বর্ণ থাকতেই হবে। একটি বস্তুর ক্ষেত্রে বলা যায় যে বস্তুর স্বরূপই এমন যে বস্তুটি সম্ভাব্য বস্তু সংযুক্তির অংশ, প্রকৃত প্রস্তাবে বস্তুটি ক খ বস্তুসংযুক্তির অংশ হতে পারে আবার নাও পারে, বস্তুটি ক গ বস্তু সংযুক্তির অংশ হতে পাবে আবাব নাও হতে পাবে। বস্তুটি কোন্ বস্তুসংযুক্তিতে থাকছে সেটি বস্তুব স্বরূপ নয়। কিন্তু বস্তুটি স্বরূপত যা ঐটিকে তাই হতে গেলে বস্তুটিকে কোনো না কোনো সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তিব অংশ হতেই হবে।

এখন পর্যন্ত আমরা (১) বস্তু, (২) সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তি এবং (৩) যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি এই তিনটি সম্পর্কে যা যা দেখতে পাচ্ছি তা এইবকম - বস্তুগুলি কোনো না কোনো সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তিব অন্তর্ভূক্ত এবং সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তি যৌক্তিক পবিব্যাপ্তিব অর্ন্তভুক্ত। এই ক্ষেত্রে যৌক্তিক পবম্পবাব নিযম প্রয়োগ করে এইবকমও বলা যায যে বস্তুগুলি যৌক্তিক ব্যাপ্তির অন্তর্ভুক্ত। অর্ন্তভুক্তি সাধাবণত স্থূলভাবে বোঝা হযে থাকে। একটা পাত্র তাব চাইতে বড, একই আকাবেব অপব একটি পাত্রেব মধ্যে খাপ খেযে যায আবাব সেই মাঝাবি পাত্রটি তাব চাইতে বড একই আকাবেব অপব একটি পাত্রেব মধ্যে খাপ খেযে যায। এইবকম স্থূলভাবে বস্তু, বস্তুসংযুক্তি-সামগ্রী এবং যৌক্তিক পবিব্যাপ্তিব সম্পর্ক এখানে বোঝানো হচ্ছে না।

বস্তু ও যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি

বস্তুব সঙ্গে যৌক্তিক পবিব্যাপ্তিব সম্পর্ক তবে কীভাবে বোঝা যেতে পাবে? বস্তুব স্বরূপ সম্পর্কে বলা হযেছে (২ ০১৩) প্রতিটি বস্তু যেন সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তিব যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিব কোনো একটা স্থান অধিকাব কবে আছে। বস্তু বা বস্তুসংযুক্তি বহিত শূন্যস্থান কল্পনা কবা যায কিন্তু এই যৌক্তিক স্থান বিবহিত বস্তু কল্পনা কবা যায় না। বস্তু কখনই স্বরূপ বিবর্জিত হযে থাকতে পাবে না। কোনো বস্তুব স্বরূপ পোশাক-আশাকেব মত নয যে খুলে বেখে দেওয়া যায। সুতবাং যে কোনো বস্তুব মধ্যে সেই বস্তুটিব যাবৎ সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তি নিহিত আছে, এবং এইবকম সকল বস্তু যদি প্রদত্ত হয তাহলে সমস্ত সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তিও প্রদত্ত হযেছে বলতে হবে। সেই কাবণে বস্তুগুলিকে কখনই যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি নিবপেক্ষ বলে কল্পনা কবা যায না। বস্তুব স্বরূপ বস্তুব সত্তাব সাথে অত্যন্ত নিবিডভাবে জডিত। এই অবিচ্ছেদ্যতা বোঝাবাব জন্য ভিটগেনস্টাইন বলেছেন, যে আমরা বস্তুগুলিকে যৌক্তিক পবিব্যাপ্তিব বাইবে কল্পনা করতে পাবি না। যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি আছে কিন্তু বস্তু নেই এই ধবণেব কল্পনা নিঃসন্দেহে কষ্ট কল্পনা, কিন্তু এই ধবণেব কল্পনা তাঁব কাছে মনে হযেছে প্রথমোক্ত কল্পনাব চাইতে কম কষ্টসাধ্য। বস্তুগুলি যাবৎ সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তি-গণ্ডী এবং বিস্তাবেব দিক থেকে বিবেচনা কবলে সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তির বস্তুচ্যুত হয়ে বিস্তাব কোথাও নেই। এখানে লক্ষণীয যে কীভাবে অংশগুলিব মধ্যে দিযে ভিটগেনস্টাইন সমগ্রকে তুলে ধবেছেন।

জগৎ ও যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি

বাস্তব জগতেব চাইতে ব্যাপক, বহু বিস্তৃত এক অতিজগতেব কল্পনা কারোব মনে আসতে পারে। কিন্তু ভিটগেনস্টাইন কথিত যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি সম্পর্কে এই রকম ধাবণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি জগতেব চাইতে বিস্তৃত কোনো পবম জগৎ নয় যেখানে বাস্তব জগৎ যেমন আছে তেমনই আবও দশটি, শতটি, সহস্রটি, লক্ষটি, অথবা অসংখ্য, সম্ভাব্য জগৎ আছে। যদি বিস্তৃতিব দিক থেকে ভাবা হয়, তাহলে নির্দ্বিধায় বলা যেতে পাবে যে জগৎ এবং যৌক্তিক পবিব্যাপ্তির বিস্তৃতি সমান। জগৎ এবং যৌক্তিক পবিব্যাপ্তিব একেব চাইতে অপবেব প্রসাবণেব সীমা অতিব্যাপক বা অব্যাপক কোনোটাই নয। কাবণ জগৎ আমবা জেনেছি সমগ্র অস্তিত্বশীল বস্তুব সংযুক্তি, কিন্তু সেই সকল অস্তিত্বশীল সংযুক্তভুক্ত বস্তুব মধ্যে আবাব নিহিত থাকে অসংখ্য সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তি। তাহলে যে সকল সম্ভাব্য বস্তু-সংযুক্তি সম্ভাব্য রূপেই মাত্র আছে, সেই সম্ভাবনাগুলিও বাস্তব সংযুক্তি-ভুক্ত বস্তুনিষ্ঠ স্বীকাব কবতে হয়। যদি সকল সম্ভাব্য-বাস্তব এবং সম্ভাব্য-অবাস্তব বস্তুসংযুক্তি যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি হয় তাহলে যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি বস্তু সকলেব বাইবে আব কোথায় নিষ্ঠ হতে পাবে? যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি জগতেব স্বরূপ। বাস্তবিক জগৎ যা হযেছে তা আপতিক। জগৎটি যেবকম হযেছে সেইবকম না হয়ে অন্যবকম হতে পাবত। কিন্তু জগৎ যেমন হযেছে তা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয। বাস্তব জগতেব বস্তুসংযুক্তি আপতিক। ভিটগেনস্টাইন বলছেন অল দ্যাট্ হ্যাপন্‌স অ্যান্ড ইজ দা কেস ইজ এক্সিডেন্টাল। ('টি এল পি.' ৬.৪১) ; এখানে লক্ষ্য বাখতে হবে যে, ভিটগেনস্টাইন এখানে আবশ্যিক নয এই অর্থে 'এক্সিডেন্টাল' শব্দটি ব্যবহাব কবেছেন। এখানে কোনো বকম স্ববিরোধেব আশংকা অমূলক। জগতে অসম্ভব কখনও সম্ভব হয না, যা সম্ভব তাই হয। জগতেব সম্ভাবনা গুচ্ছই তাব সাব বা স্বরূপ। সম্ভাবনা বলাব অর্থ যা যৌক্তিকভাবে সম্ভব। অর্থাৎ বলা যায যে যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি জগতেব সাব বা স্বরূপ। এই যৌক্তিক পবিব্যাপ্তি জগতেব অনড যৌক্তিক আকাব স্বরূপ।

সম্ভাব্য জগৎ

প্রশ্ন জাগতে পারে যে এই যৌক্তিক পবিব্যাপ্তিব আধিবিদ্যক স্থান কী? আধুনিক কালে, বিশেষ করে সল ক্রিপ্‌কে-কে অনুসবণ কবে 'সম্ভাব্য জগৎ' এব ধাবণাটিব বহুল প্রচার হয়েছে। দার্শনিক মহলে 'সম্ভাব্য জগৎ' এব সঠিক অর্থ কী এই ব্যাপারে কোনো মীমাংসা হয়নি। ভিটগেনস্টাইন কখনও 'সম্ভাব্য জগৎ' এই শব্দটি 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে ব্যবহার কবেন নি, কিন্তু ভিটগেনস্টাইন-এর যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিব ধাবণাটিকে সম্ভাবনা সমূহের জগৎ বা সম্ভাব্য জগৎ এই ধাবণাটির কাছাকাছি এনে বোঝা যায়। ডেভিড লুইসের কাছে সম্ভাবনাব জগৎ এবং বাস্তব জগৎ উভয়ই সমান বাস্তব। তিনি মনে কবেন যে অসংখ্য জগৎ আছে এবং আমরা

যে জগতে বাস করি সেটি সেই অসংখ্য জগতেব মধ্যেই একটি। প্রতিটি সম্ভাবনার জগৎ বাস্তব, দূবদূরান্তের গ্রহের মত। বলা যেতে পারে যে এই প্রতিটি সম্ভাবনার জগৎ আর কিছুই নয় কেবল এক একটি জগৎ কেমন হতে পারে তারই বিবৃতি। একটি জগতের সম্ভাবনা বা জগৎটি কেমন হতে পারে, অপর একটি জগতের সম্ভাবনা বা জগৎটি কেমন হতে পারে, তার থেকে ভিন্ন। কোন্ জগৎটি বাস্তব বলে বিবেচিত হবে সেটা নির্ভর করে বক্তার উপর। ক বক্তা রূপে যে সম্ভাবনার জগৎটিকে 'এই' বলে সূচিত করতে পারে সেই জগৎটি ক বক্তা সাপেক্ষে বাস্তব জগৎ বলে বিবেচিত হয়। আবার খ যখন বক্তা, সে 'এই জগৎ' বলে যে সম্ভাব্য জগৎটিকে নির্দেশ কবে তখন সেটি - সেই সম্ভাব্য জগৎটি-খ বক্তা সাপেক্ষে বাস্তব জগৎ বলে বিবেচিত হয়। লুইস এইভাবে অহেতুক আধিবিদ্যক বস্তুব সংখ্যাধিক্য ঘটিয়েছেন। লুইসের প্রসঙ্গ এখানে কী ভাবে এলো? 'ট্র্যাকটেটস'-এর ব্যাখ্যাকারেরা অনেকেই মনে করেন যে বাস্তব জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে হিটগেনস্টাইন বস্তুবাদ সমর্থন করেছেন। এই পর্বে হিটগেনস্টাইন সম্পর্কে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অযৌক্তিক বলা যায় না। কিন্তু কেউ যদি এমন দাবি করেন যে ময়েগলিশকাইট বা সম্ভাব্য সম্পর্কেও হিটগেনস্টাইন বস্তুবাদী এবং যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধারণাটি নিছক রূপক মাত্র নয় তাহলে প্রথমেই প্রশ্ন জাগবে সম্ভাবনার জগৎ সম্পর্কে হিটগেনস্টাইন-এর বস্তুবাদিতা প্রকৃতপক্ষে কী ধরণের? সম্ভাবনাব জগৎ সম্পর্কে কেউ বাস্তববাদী মানেই ডেভিড লুইসের মত বাস্তববাদী হতে হবে এমন নয়। হিটগেনস্টাইনকে আমরা কোনো মতেই লুইসের মত বাস্তববাদের দলভুক্ত করতে পারি না। সম্ভবনার জগৎ বা সম্ভাব্য জগৎ যাঁরা স্বীকাব কবেন তাঁদের প্রধান বিরোধী হবেন তাঁরাই যাঁবা সম্ভাব্য জগৎ বলে কোনো কিছুই স্বীকার করেন না। এই দ্বিতীয় দলে যাঁরা আছেন তাঁদের আমরা বলতে পারি সম্ভাবনা-বিরোধী এবং প্রখবভাবে বাস্তববাদী। এদের দলে ডেভিড লুইস পড়েন না কারণ তিনি সম্ভাব্য জগৎ স্বীকার করেন। এই দুই ধরণেব শ্রেণীকরণের বাইরেও আমবা দার্শনিকদের সাজাতে পারি। সম্ভাব্য জগৎ স্বীকার করা মানে এমন নয় যে সম্ভাবনাব জগৎ মৌলিক বা বুনিয়াদস্বরূপ এমনই স্বীকাব করতে হবে। সম্ভাব্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েও বহু দার্শনিক এমন কথা বলেন যে একমাত্র জগৎ যা আছে তা বাস্তব জগৎ এবং সেই একমাত্র বাস্তব জগৎ থেকে কোনোভাবে (এবং দার্শনিক ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) আহৃত, উদ্ভুত বা নিসৃত হয়ে সম্ভাব্য জগৎ আছে। এইবকম বললে এখানে কোনোবকম স্ববিরোধিতার অবকাশ নেই। এই দলের দার্শনিকেরা যে সবাই সম্ভাব্য জগতেব স্বরূপ সম্পর্কে একই কথা বলবেন এমন ভাববার সুযোগ রেসার, ক্রিপ্কে, জেফ্রি, এডাম্স্ বা এই ধরণেব মতাবলম্বী অন্যের কেউ-ই দেন নি। রেসারেব মতে সম্ভাব্য জগৎ আমাদের বোধশক্তি-সঞ্জাত বা কল্পনা প্রসূত। এই মতানুসারে সম্ভাব্য জগৎ বুদ্ধিগত বলা যেতে পারে। কল্পনাশক্তি তার প্রক্রিয়াব সাহায্যে বাস্তব জগৎ সম্বন্ধীয় ধাবণাগুলি পবিবর্তিত, পরিমার্জিত

এবং পবিবর্ধিত করে সম্ভাব্য ব্যক্তি বা বিশ্বেব ধারণা গঠন করে। কল্পনাশক্তি লাগামছাড়া ভাবে যা কিছু সম্পর্কে যে কোনো সম্ভাবনা জুড়ে দিতে পারে না। কল্পনাশক্তি যুক্তি, বিজ্ঞান এবং অধিবিদ্যার নিয়ম সাপেক্ষে সম্ভাব্য জগৎ গডতে পারে। হিটগেনস্টাইনকে আমরা লেসারের দলভূক্ত কবতে পারি না।

এমন দার্শনিক আছেন যাঁরা সম্ভাব্য জগৎ স্বীকার করেও মনে করেন যে সম্ভাবনাব জগৎ আমাদেব ভাষার ফল। এই মতানুসারে সম্ভাব্য জগৎ ভাষাগত। এক একটি সম্ভাব্য জগৎ সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ বাক্যসমূহের সংগ্রহ ব্যতীত আর কিছু নয়। সর্বাধিক সঙ্গতিপূর্ণ বাক্য সমূহ বলতে বোঝানো হয় এমনই একটি সংগ্রহকে যেখানে সম্পূর্ণ সংগ্রহে কিছুমাত্র অসঙ্গতি না ঘটিয়ে কোনো একটি বাক্যও যোগ কবা যাবে না। এইভাবে সম্ভাব্য জগৎকে বাক্যাবলীর সম্ভাব্য বিন্যাসের সাথে সমান করে দেখাবাব কৌশল কার্ণাপের লেখায় পাওয়া যায়। সম্প্রতি কালে বিচার্ড জেফ্রি এই ধবণের সংগ্রহের নাম দিয়েছেন 'সম্পূর্ণ উপন্যাস' এবং ববার্ট এডাম্স্ নাম দিয়েছেন 'জগৎ-কথা'। হ্বিটগেনস্টাইন এই ধরণেব বিকল্পবাদ (এরসাট্‌সইজম্) সুপষ্টভাবে ব্যক্ত না কবলেও হ্বিটগেনস্টাইন-এব যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধাবণা মূলত ভাষা থেকেই আহৃত।

যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি ও যুক্তিবিজ্ঞান

হ্বিটগেনস্টাইন সম্পর্কে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে তিনি ভাষার দার্শনিক বিচার দ্বারা জগতের বর্ণনায় পৌঁছেছেন। তার কারণ এই যে হ্বিটগেনস্টাইন যুক্তি বিজ্ঞান এবং জগতের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক মেনে নিয়েছেন। যৌক্তিক আকার ও জাগতিক আকার যে সম-আঙ্গিক এটাই হ্বিটগেনস্টাইন প্রতিষ্ঠা করতে চান। জাগতিক আকার বা জগতেব স্বরূপ যে যৌক্তিক পবিব্যাপ্তিব সমান এমন কথা আগেই বলা হয়েছে। হ্বিটগেনস্টাইন-এব যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিব ধারণাটি ভাষা থেকে সঞ্জাত এইবকম বললে মনে হতে পারে জগতের আকার বা স্বরূপ ভাষা থেকে সঞ্জাত। সেক্ষেত্রে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বাস্তব জগৎ সম্পর্কে মতবাদ বস্তুবাদ বলে গৃহীত হতে পারে কিনা সেই প্রশ্ন না উঠেও পাবে না। সুতরাং হ্বিটগেনস্টাইন সম্পর্কে তিনি ভাববাদী নাকি বস্তুবাদী এই বির্তকের সদুত্তর দিতে হলে তাঁর যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধাবণাটিব সাথে ভাষার সম্পর্ক কেমন ধরণেব সেটি পরিষ্কার করতে হবে। যুক্তিব পরিব্যাপ্তির ধারণাটিকে স্পষ্ট করতে আমাদেব বুঝতে হবে হ্বিটগেনস্টাইন যুক্তি বিজ্ঞান বলতে কী বোঝেন। হ্বিটগেনস্টাইন রচিত 'ট্র্যাকটেটস লজিকো ফিলসফিকাস' অথবা 'ফিলসফিকাল ট্রিটীজ অন লজিক' যুক্তি বিজ্ঞান বিষয়ে দার্শনিক প্রবন্ধ মূলত যুক্তি বিজ্ঞানের ভিত্তিরই অনুসন্ধান। হ্বিটনেগস্টাইন স্বয়ং তাঁর পরবর্তী লেখা 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ 'ট্র্যাকটেটস'র প্রসঙ্গে তাঁব বিরোধিতা আলোচনা কালে 'ট্র্যাকটেটস'-এর মূল ভাব খুব সুন্দবভাবে পরিস্ফুট

করেছেন - যুক্তি বিজ্ঞান হল একধরণের পূর্বতসিদ্ধ সম্ভাবনার বিন্যাস, এই সম্ভাবনার বিন্যাস জগৎ এবং ভাষা উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান বা সাধারণ। এই সম্ভাবনাব বিন্যাস পূর্বতসিদ্ধ হয়েও সমস্ত বাস্তবতার মধ্যেও উপস্থিত থাকে। বাস্তবতাব অনিশ্চয়তা বা অসচ্ছতা কোনোভাবেই যুক্তি বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করতে পাবে না। হুইটগেনস্টাইন যুক্তি বিজ্ঞানেব স্পষ্টতা ও দ্ব্যর্থহীনতাকে তুলনা করেছেন বিশুদ্ধতম স্ফটিকের স্বচ্ছতাব সঙ্গে। যুক্তি বিজ্ঞানের আলোচনা বস্তুত ভাষার স্বরূপ আলোচনা। 'ট্র্যাকটেটস' পর্বের হুইটগেনস্টাইন সকল ভাষার, এমন কী বলা যায় যে সকল সম্ভাব্য ভাষার অন্তরঙ্গ যৌক্তিক আকাবের সমরূপতা খুঁজে পেতে চান।

যুক্তিবিজ্ঞান ও জগৎ

যুক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কে বলতে গিয়ে হুইটগেনস্টাইন বলেছেন যে, যুক্তি বিজ্ঞান হল 'দ্য গ্রেট মিরাব', সুবিশাল দর্পণ (৫.৫১১, ৬.১৩)। সুতবাং বলা যায় যে যুক্তি বিজ্ঞান জগৎকে প্রতিবিম্বিত কবে কিন্তু জগৎ যুক্তি বিজ্ঞানকে প্রতিবিম্বিত করে না। হুইটগেনস্টাইন দর্পণেব রূপকের সাহায্যে যুক্তি বিজ্ঞান এবং জগতেব সম্পর্ক বুঝিয়েছেন, কিন্তু হুইটগেনস্টাইন-এব কাছে যুক্তি বিজ্ঞান এবং জগতেব এই সম্পর্কেব প্রকৃতি কীবকম সেই ব্যাপাবে বিভিন্ন ব্যাখ্যাকাবের মধ্যে মতপার্থক্য লক্ষ্য কবা যায়। অনেকে মনে কবেছেন যে হুইটগেনস্টাইন জগৎ এবং যুক্তি বিজ্ঞান - এই দুইয়ের মধ্যে জগৎকেই প্রাধান্য দিযেছেন। এক্ষেত্রে কাবণ স্বরূপ বলা হযে থাকে যে, যুক্তি বিজ্ঞানকে দর্পণরূপে জগৎকে প্রতিবিম্বিত করতে সফল হতে হলে যুক্তি বিজ্ঞানেব অপেক্ষায জগতেব পূর্ববর্তিতা স্বীকাব কবতে হয। সুতবাং এইবকম ধাবণা হতে পাবে যে ভাষায় বা যুক্তি বিজ্ঞানে যা যা বর্ণনা করা যায় বা বর্ণনাযোগ্য হয় তা সেইবকম হতে পাবে কারণ জগৎ তদ্রূপ। কেউ কেউ এইবকম ভাবতে পাবেন যে আমবা জগতের সাবসত্তা কেমন তা জানতে পাবছি ভাষাব স্বরূপ পর্যালোচনা কবে এবং ভাষার স্বরূপ যেবকম সে-টি সেরকম হযেছে কাবণ জগতের স্বরূপ সেবকম হয়েছে বলেই। অপবদিকে জগতের অপেক্ষা যুক্তি বিজ্ঞানের পূর্ববর্তিতা স্বীকারেব সপক্ষে তর্ক আছে। যুক্তিবিজ্ঞানের পূর্ববর্তিতা স্বীকাবেব স্বপক্ষে যাবা তর্ক কবেন তাঁদেব মধ্যে সকলেই যে জগৎ সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দিয়েছেন এমন নয়। যাঁবা জগৎ সম্পর্কে বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী বিসর্জন দিয়েছেন, তাঁদের যুক্তি হল যে ভাষাব মাধ্যমে জগৎ গ্রাহ্য হয়, সুতরাং ভাষার আকারই জগতের আকাবকে আকারিত কবে। হুইটগেনস্টাইন-এর যুক্তি বিজ্ঞান সম্পর্কে দর্পণেব রূপকেব ব্যবহাব হুইটগেনস্টাইন-এব দর্শনেব ব্যাখ্যাকাবদের মধ্যে যে এই ধবণের তীব্র মতভেদ সৃষ্টি কবেছে তা বলাই বাহুল্য। বহুক্ষেত্রে মনে হয় যে দর্পণের রূপকটি খুব বেশি দূর পর্যন্ত টানা হয়েছে। দর্পণের রূপকের ব্যবহার সম্ভবত জগৎ এবং যুক্তি বিজ্ঞান

এই দুইয়ের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষা কোন্‌টির পূর্ববর্তিতা স্বীকার্য এই প্রশ্নের মীমাংসা নয়। হ্বিটগেনস্টাইন যে দর্পণের রূপক ব্যবহার করেছেন তার কারণ এক হতে পারে যে তিনি জগৎ এবং যুক্তি বিজ্ঞানের মধ্যে যে একধরণের আনুরূপ্য আছে সেটি বোঝাতে চান। যুক্তি বিজ্ঞানের সীমানা এবং জগতের সীমানা সমান। ভাষা আমরা জেনেছি বাক্য বা বচনের সমাহার, সুতরাং যুক্তি বিজ্ঞান যা ভাষার অন্তরঙ্গ রূপ, যুক্তিবাক্যের সমাহার হবে।

যথার্থ বাক্য

যুক্তিবিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে কী ধরণের বাক্য বা বচন নিয়ে ব্যাপৃত থাকে তা আলোচনা সাপেক্ষ। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে ভাষায় যেগুলি বাক্য বলে গৃহীত তার মধ্যে কতকগুলি যথার্থ বাক্য, কিন্তু কতকগুলি তথাকথিত বাক্য. হ্বিটগেনস্টাইন যেভাবে যথার্থ বাক্যের মানদণ্ড স্থির করেছেন সেই মানদন্ড অনুযায়ী এই দ্বিতীয় প্রকারের বাক্যগুলি যাথার্থ্য দাবী করার অনুপযোগী। এখানে যথার্থ বাক্য বলতে (ভ্যালিড প্রপজিশন) ন্যায়তসিদ্ধ বা বৈধ বাক্য বোঝানো হচ্ছে না, স্বীয় বৈশিষ্ট্যসূচক বাক্য বোঝানো হচ্ছে। হ্বিটগেনস্টাইন এই ধরণের কোনো নামকরণ অবশ্য করেন নি। যে বাক্যগুলি তত্ত্বকে উপস্থাপন করে এবং যে বাক্যগুলি দ্বারা জগতের বর্ণনা দেওয়া যায় সেইগুলি হ্বিটগেনস্টাইন-এর কাছে জগৎ বর্ণনার ব্যাপারে সমধিকগ্রাহ্য। এই ধরণের বাক্যগুলি আপতিক বাক্য, অর্থাৎ এইগুলি সত্য হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে। কিন্তু যে বাক্যগুলি যথার্থ বাক্য বলে গণ্য হচ্ছে না, অর্থাৎ যেগুলি বাক্য নামধারী মাত্র, সেই বাক্যগুলি হয় স্বতঃসত্য বাক্য অথবা স্বতঃমিথ্যা বাক্য।

স্বতঃসত্য বাক্য ও স্বতঃমিথ্যা বাক্য

স্বতঃসত্য অথবা স্বতঃমিথ্যা বাক্যের কথা বলতে গিয়ে হ্বিটগেনস্টাইন 'স্বতঃসত্য' বা 'স্বতঃমিথ্যা' এই সমস্ত শব্দের প্রচলিত অর্থের থেকে সরে আসছেন না। মনে রাখতে হবে হ্বিটগেনস্টাইন 'ট্র্যাকটেটস' রচনাকালে সত্যাপেক্ষক বচনের যুক্তিজালে আবদ্ধ। এই যুক্তিবিজ্ঞান অনুসারে একটি যৌগিক বচনের সত্যমূল্য নির্ভর করে সেই বচনের অঙ্গ মৌলিক বচনগুলির সত্য মূল্যের উপর। স্বতঃসত্য বচনগুলির অঙ্গ মৌলিক বচনগুলির সত্যমূল্য যাই হোক না কেন, সত্য অথবা মিথ্যা, বাক্যগুলি সমগ্রক্ষেত্রেই সত্য হবে। দ্বিতীয়ত, স্ববিরোধী বচনগুলি তার অঙ্গ মৌলিক বচনগুলির সত্যমূল্য নিরপেক্ষভাবে সর্বদা মিথ্যা। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে স্বতঃসত্য বচন অথবা স্ববিরোধী বচন কোনোটাই প্রকৃত বচন নয় কারণ এই ধরণের বচনগুলি কোনো কিছুকে উপস্থাপন করে না। তবে জগতে অস্তিত্বশীল অথবা অনস্তিত্বশীল কোনো বস্তু-সংযোগের বর্ণনা এই ধরণের বচনগুলি দিতে পারে না। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে যেহেতু এই ধরণের বাক্যগুলি চিত্র নয় কোনো কিছুকে উপস্থাপন করে না, তাই এই গুলি শূন্যার্থ (উইদ আউট সেন্স) কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন ৪.৪৬১১

সংখ্যক বাক্যে বলেছেন যে স্বতঃসত্য অথবা স্বতঃমিথ্যা বাক্যগুলি নিরর্থক নয়।

এইখানে একটি প্রশ্ন না জিজ্ঞাসা করে পাবা যায় না : হিটগেনস্টাইন কীভাবে বলতে পারেন যে স্বতঃসত্য বা স্ববিবোধী বচনগুলি শূন্যার্থ কিন্তু নিরর্থক নয়? স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে হিটগেনস্টাইন-এর কাছে 'শূন্য অর্থ হওযা' এবং 'নিরর্থক হওয়া' এই দুটি পর্যায়বাচক শব্দ নয়। 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে অবশ্য হিটগেনষ্টাইন কোথাও স্পষ্ট করে এই দুটি শব্দেব পার্থক্যেব কথা বলেন নি।

শূন্যার্থ ও নিরর্থক

একভাবে 'শূন্য অর্থ' এবং 'নিরর্থক' এই দুটি শব্দেব পার্থক্য কবতে পারি। যে কোনো ভাষায তা লৌকিক অথবা কৃত্রিম যাই হোক না কেন, সেই ভাষার সুগঠিত সঙ্কেত বা ফর্মূলা গঠনের নিয়ম থাকে। সেই নিয়মগুলি বিশেষভাবে সেই ভাষার অন্বয় বা সিন্ট্যাক্স-এর নিয়ম। সেই ভাষার ব্যাকবণ অগ্রাহ্য করে কোনো সংকেত বা ফর্মূলা গঠিত হলে তা অন্বয় বিবোধী বলে গণ্য হয এবং সেই সঙ্কেত সুগঠিত সঙ্কেত বলে গৃহীত হওযাব যোগ্য হয় না। কোনো ভাষাব সুগঠিত সঙ্কেত যেগুলি নয় সেইগুলি সেই ভাষায নিবর্থক বলে ধরা হয়। এইভাবে নিবর্থক হওযাব ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

স্বতঃসত্য বাক্যগুলি বা স্বতঃমিথ্যা বাক্যগুলি যে সত্যাপেক্ষক যুক্তিবিজ্ঞানের ব্যাকবণ-বিরোধী এমন কথা হিটগেনস্টাইন বলেন না। এই কাবণে হিটগেনস্টাইন বলেন যে স্বতঃসত্য বা স্বতঃমিথ্যা বচনগুলি নিরর্থক নয়। স্বতঃসত্য বচনগুলি সম্পর্কে এবং স্বতঃমিথ্যা বচনগুলি সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে এইগুলি কোনো কিছু বর্ণনা কবে না। যে বাক্যগুলি কোনো কিছু বর্ণনা কবে না সেই বাক্যগুলি যে নিবর্থক হবে এমন নয। কাবণ যে বাক্যগুলি কোনো কিছু বর্ণনা কবে না অর্থাৎ শূন্য অর্থ, সেইগুলির ব্যবহাব আছে।

স্বতঃসত্য এবং স্বতঃমিথ্যা বাক্য শূন্য অর্থ, কিন্তু এই দুই ধরণেব বাক্য একই উপায়ে শূন্য অর্থ বলা যাবে কিনা এই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। 'শূন্যার্থ' এই শব্দটি স্বতঃসত্য এবং স্বতঃমিথ্যা বাক্যভেদে দ্ব্যর্থক কিনা এই বিষযে হিটগেনস্টাইন-এর কাছ থেকে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। পরবর্তীকালেব হিটগেনস্টাইন-এর বক্তৃতাব সংকলন, যা 'ম্যুব নোটস্' নামে পরিচিত তাতে এই ব্যাপাবে কিছুটা আলোকপাত আছে। স্বতঃসত্য বাক্য কোনো কিছুকে বর্ণনা করে না এটা বলাব তাৎপর্য কী? ধবা যাক 'q ⊃ q' একটি স্বতঃসত্য বচন। 'q ⊃ q' এই স্বতঃসত্য বচনটিকে যদি কোনো আপতিক বচনেব সাথে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে সমগ্র বাক্যটিব সত্যমূল্য সেই আপতিক বাক্যেব সত্যমূল্যের সাথে সমমানেব হবে। 'q ⊃ q' এই বাক্যটি থেকে উপবে বর্ণিত উপায়ে আমবা একটি বাক্য পাই যেমন, p. ('q ⊃ q') = p। সুতরাং এখানে স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে আপাতিক

বাক্যটির অতিরিক্ত কোনো কিছু স্বতঃসত্য বাক্য বর্ণনা করে না। সেই অর্থে বলা যেতে পারে যে স্বতঃসত্য বাক্য কোনো কিছু বর্ণনা করে না।

কিন্তু এই একইভাবে স্বতঃমিথ্যা বাক্য কোনো কিছু বর্ণনা করে না, বলা যাবে না। কারণ একটি স্বতঃমিথ্যা বচনের সঙ্গে যদি একটি আপতিক বচনকে সংযুক্ত করা হয়, তাহলে সেই সংযৌগিক বচনের সত্যমূল্য স্বতঃমিথ্যা বচনের সমমান হবে। অতএব এটা বোঝা যায় যে একেবারে একইভাবে একটি স্বতঃসত্য বাক্য শূন্যার্থ হয়েছে এবং আরেকটি স্বতঃমিথ্যা বাক্য শূন্যার্থ হয়েছে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। হ্বিটগেনস্টাইন এখানে বলতে পারেন না যে স্বতঃমিথ্যা বাক্য কোনো কিছু বর্ণনা করে না কারণ $p\ (q.\sim q) = p$। সুতরাং শূন্যার্থ হওয়া ব্যাপারটির সাধারণ অর্থ দিতে হলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে না।

বাক্য ও যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি

যে বাক্যগুলির অর্থ আছে এবং যে বাক্যগুলি শূন্যার্থ তাহলে সেইগুলির মধ্যে কী ভাবে পার্থক্য করা যায়? প্রথমে বোঝা যাক্ হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে একটি বাক্যের অর্থ থাকা মানে কী? এখানে হ্বিটগেনস্টাইন-এর যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি অর্থপূর্ণ বাক্যের যুক্তির পরিব্যাপ্তিতে একটি নির্দিষ্ট স্থান বা ব্যাপৃতি আছে। কোনো একটি বাক্য যুক্তির পরিব্যাপ্তিতে কোন্ স্থান অধিগ্রহণ করবে সেটা নির্দ্ধারিত হয় সেই বাক্যের সম্ভাব্য সত্যমূল্য দিয়ে। যে কোনো সম্ভাব্য সত্যমূল্য নয়, সেই সম্ভাব্য সত্যমূল্যগুলো দিয়ে যেগুলি বাক্যটির সত্য হওয়ার সহায়ক। যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিতে বাক্যগুলির প্রসারের বিন্যাস স্বীকার করা হয়। একটি বাক্য যে যে সত্যমূল্য আরোপে সত্য হয় তার মধ্যেই যে বাক্যটি বাস্তবিক সত্য অর্ন্তভুক্ত থাকে। যুক্তির পরিব্যাপ্তির ক্ষেত্রে একটি বাক্যের প্রসার বা বিস্তৃতির সীমা কতখানি হবে সেটা নির্ধারিত হয় সেই বাক্যটির সত্য সম্ভাবনার সমষ্টি দিয়ে এবং সমগ্র সত্য সম্ভাবনার মধ্যে থেকে কোনো একটি সম্ভাবনা অথবা সবগুলিই সম্ভাবনা বাস্তবায়িত হয়। তাই হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে একটি বাক্যের দ্বারা যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিতে ততখানি অধিগৃহীত হয় যতখানি সেই বাক্যটি বস্তুসংযুক্তির জন্য অবাধ বা উন্মুক্ত করে রাখে। একটি আপতিক বাক্যের প্রসারক্ষেত্র সেই বাক্যটির সকল সম্ভাব্য সত্যমূল্যের সমান, তাই বলা যেতে পারে যে, যে কোনো আপতিক বাক্য কিছু কিছু সম্ভাবনাকে তার প্রসারক্ষেত্র থেকে বাদ দেয়। কোনো বাক্য যদি তথ্যজ্ঞাপক হয় তবে সেই বাক্য জগতের সম্ভাব্য সকল বস্তু-সংযোগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না, অপর দিকে কোনো বাক্য যদি যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির কোনো দেশ বর্জন না করে, তাহলে সেই বাক্য কিছু বলে না। যেমন একটি স্বতঃসত্য বাক্যের ক্ষেত্রে যেহেতু সকল সম্ভাবনাই সম্ভাব্য সত্যমূল্যের সমষ্টি, তাই এই ধরণের বাক্যের প্রসার ক্ষেত্র ও যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি সমান হয়। এই জন্য স্বতঃসত্য বাক্যগুলির

কোনো বর্ণনামূলক আধেয় নেই এবং এই বাক্যগুলি সকল সম্ভাব্য বস্তুসংযুক্তির সাথে সুসঙ্গত। যুক্তিবিজ্ঞানের বাক্যগুলি যেহেতু স্বতঃসত্য, এইজন্য হিটগেনস্টাইন মনে করেন যে যুক্তিবিজ্ঞানেব সকল বাক্যই একই কথা বলে, অর্থাৎ তারা কিছুই বলে না। যুক্তিবিজ্ঞানেব বাক্যগুলি সম্পর্কে বলা যায় যে এগুলি কোনো সম্ভাবনাকেই বাদ দেয় না।

স্বতঃসত্য বচন

স্বতঃসত্য বচনের স্বরূপ বুঝলে কেন হিটগেনস্টাইন বলছেন যে স্বতঃসত্য বচনগুলি কিছুই বলে না, আবার বলেছেন যে স্বতঃসত্য বাক্যগুলি নিবর্থক নয় সেটা পবিষ্কাব হয়। স্বতঃসত্য বচনগুলি যেহেতু সমস্ত যৌক্তিক দেশ পবিব্যাপ্ত কবে থাকে, সেই হেতু ঐ বাক্যগুলি যৌক্তিক পরিব্যাপ্তিব বিশেষ কোনো ক্ষেত্রেব বর্ণনা দেয় না - এবং এই অর্থে স্বতঃসত্য বাক্যগুলি জগতের কোনো কিছু বর্ণনা কবে না এবং এই বাক্যগুলির বর্ণনামূলক আধেয কিছু নেই। যুক্তিবিজ্ঞান তাই বলা যায না যে জগতেব বর্ণনা দেয়। যুক্তিবিজ্ঞান বলে না যে জগতে কোন্ বস্তু সংযুক্তি আছে বা কোন্ বস্তু সংযুক্তি নেই। যুক্তিবিজ্ঞানেব বাক্যগুলি স্বতঃসত্য, এই বাক্যগুলি জগতে যা কিছু ঘটছে সে সব কোনো কিছুবই উপব নির্ভব কবে না। যে সমস্ত বাক্য আপতিক তাবা জগৎ সম্পর্কে দাবি করে এবং সেই দাবির সত্যত্ব বা মিথ্যাত্ব জগতেব দ্বাবা নির্ধারিত হয়। আপতিক বাক্যগুলি যেন জগৎকে আঁকডিযে থাকে। কিন্তু যেগুলি স্বতঃসত্য বচন সেগুলি জগতে কোনো চিহ্ন বাখে না। স্বতঃসত্য বচন জগৎ সম্পর্কে কোনো কিছু বলে না। জগতে কী কী ঘটেছে বলার মানে যে যে বস্তু সংযুক্তি ঘটেনি কিন্তু সম্ভাব্য ছিল, সেই সমস্ত সম্ভাবনাগুলি বাতিল কবা। কোনো সম্ভাবনা সম্পর্কে সদর্থক অথবা নঞর্থক উত্তর দিতে হলে সম্ভাবনার বাইরে যেতে হবে এবং তবেই এই ধবণেব উত্তব দেওয়া যাবে। তাহলে যুক্তি বিজ্ঞানকে সম্ভাব্যের সীমানা অতিক্রম কবতে হবে। যুক্তি বিজ্ঞানেব ক্ষেত্রে সমগ্র সম্ভাবনা আবশ্যিক ভাবে সম্ভাব্য। সুতবাং যুক্তিবিজ্ঞানেব পক্ষে সম্ভাব্যেব সীমানা অতিক্রম কবা সম্ভব নয়। স্বতঃসত্য বচনগুলি নিবর্থক নয় কারণ আপতিক বচনগুলিব মতই আমরা বলতে পাবি স্বতঃসত্য বচনগুলির বিষয়বস্তু আছে, কাবণ স্বতঃসত্য বাক্যগুলি জগতেব পরিকাঠামো দেয়। যার মধ্যে সমস্ত ধরণেব বস্তুসংযুক্তি - যা নিছক সম্ভাব্য কিংবা বাস্তব অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

ফ্রেগে, রাসেল ও হিটগেনস্টাইন

'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে লক্ষ্য কবলে দেখা যায যে যৌক্তিক সত্যেব ধাবণা স্বতঃসত্যেব ধাবণাব উপব দাঁডিযে আছে এবং অপরদিকে স্বতঃসত্যের ধারণা সত্যাপেক্ষকের ধারণার উপব দাঁড়িয়ে আছে। 'ট্র্যাকটেটস'-এর অনুসন্ধানের বিষয় ছিল যুক্তিবিজ্ঞানের যথাযথ স্বরূপ। হিটগেনস্টাইন যুক্তিবিজ্ঞানেব ভিত্তিটি কী তাই খুঁজছিলেন। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধান যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তি খোঁজার

মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ববং তিনি যুক্তিব ভিত্তিকে জগতেব ভিত্তিতে ব্যাপ্ত কবেন। 'ট্র্যাকটেটস'-এব মূল বক্তব্য যথাযথ অনুধাবন কবতে হলে দর্শনের ইতিহাসেব প্রেক্ষাপটে বুঝলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে যুক্তি বিজ্ঞান এবং অধিবিদ্যার দুরূহতম সমস্যা তাঁকে ভাবিত করেছে। কিন্তু এই সমস্যাগুলি তাঁব কাছে উত্থাপিত হয়েছে ফ্রেগে এবং বাসেল-এর বচনার মধ্যে দিয়ে, বাসেলেব সঙ্গে হুইটগেনস্টাইন-এব নানা বিষয় আলোচনার মধ্যে দিয়ে এবং কিছুটা হুইটগেনস্টাইন-এর কেমব্রিজ থাকাকালীন ম্যুর-এব মাধ্যমে। হুইটগেনস্টাইন রাসেল এবং ফ্রেগে-ব সমালোচনা করে যুক্তিবিজ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করলেও বহুক্ষেত্রে তিনি ফ্রেগে এবং বাসেল-এর কিছু কিছু মতবাদ গ্রহণও কবেছেন। প্রথমত, বলা যায় যে জগৎ সম্পর্কে ফ্রেগে রাসেল এবং ম্যুর-এব যে বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তা হুইটগেনস্টাইন-এর আধিবিদ্যক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও ছিল। দ্বিতীযত, ভাষা সম্পর্কে হুইটগেনস্টাইন যে অগাষ্টিনীয় চিত্র এঁকেছেন তার উৎস ফ্রেগে, বাসেল, ইত্যাদি দার্শনিকেরা। তৃতীয়ত হুইটগেনস্টাইন-এর ভাষা এবং জগতেব নিবিড় সম্পর্কে বিশ্বাস সম্ভবত ফ্রেগে এবং বাসেল-এরই প্রভাব। চতুর্থত, এই পর্যায়ে হুইটগেনস্টাইনও বাক্যেব অর্থ সম্পূর্ণভাবে যে দুটি সত্য এবং মিথ্যাব-নির্দিষ্ট মেরুব মধ্যে অবস্থিত - এই বিশ্বাস কবতেন।

যুক্তিবিজ্ঞানের স্বরূপ

কিন্তু যুক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে হুইটগেনস্টাইন ফ্রেগে এবং বাসেল-এব মত গ্রহণ করেন নি। হুইটগেনস্টাইন-এর 'ট্র্যাকটেটস' এক অর্থে বাসেল এবং ফ্রেগেব বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা। রাসেল এবং হোযাইটহেড রচিত 'প্রিন্‌কিপিয়া ম্যাথেমেটিকা' গ্রন্থে দেখানো হয় যে গণিতকে বিশ্লেষণেব মাধ্যমে শুদ্ধ যৌক্তিক ধাবণায় রূপান্তরিত কবা যায়। অথবা এইভাবেও বলা যায় যে কতকগুলি অবিশ্লেষণযোগ্য যৌক্তিক ধারণা থেকে সমস্ত গণিত নিঃসৃত কবা যায়। রাসেল বিশ্বাস কবতেন যে তাঁদের পরিকল্পিত যুক্তিবিজ্ঞানই যৌক্তিক নিখুঁত ভাষা যাব মধ্যে দিয়ে ঘটনাব যৌক্তিক আকাব ও কাঠামো প্রতিবিম্বিত হয়। ফ্রেগে-ব মতে স্বতঃসত্য বাক্যগুলি, যেগুলি যুক্তিবিজ্ঞানেব প্রাথমিক নিয়ম সেগুলি জ্ঞানেব যৌক্তিক উৎস দ্বারা সমর্থিত। সেই স্বতঃসত্য বাক্যগুলি প্রতিপাদনেব যোগ্য নয় এবং এই বাক্যগুলি আবশ্যিকভাবে সত্য। কোনো একটি যৌক্তিক নিয়ম সম্পর্কে যদি প্রশ্ন জাগে কেন সেই যৌক্তিক নিযমটিকে আদৌ নিযম হিসেবে স্বীকাব কবা হবে তবে সেই যৌক্তিক নিয়মটিকে আব একটি যৌক্তিক নিযমে রূপান্তরিত কবতে পারলে প্রথম যৌক্তিক নিয়মটি গ্রহণের সপক্ষে উত্তব হবে। কিন্তু যদি এমন কোনো ক্ষেত্র থাকে যেখানে সেই যৌক্তিক নিয়মটিকে অপব কোনো যৌক্তিক নিয়মে রূপান্তর করা যায় না, সেক্ষেত্রে ফ্রেগের মতে যুক্তিবিজ্ঞান ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। ফ্রেগের মত অত জোর দিয়ে যৌক্তিক বাক্যেব স্বতঃসিদ্ধতার কথা বাসেল বলেন নি।

'প্রিন্‌কিপিয়া' পর্যায়ে রাসেল মনে করতেন যে বাক্যগুলি মৌলিক বাক্যরূপে গৃহীত হয়েছে, সেইগুলি কোনো প্রমাণ ছাড়াই ঐ রূপে গৃহীত হয়েছে। রাসেল মনে করতেন যে কতকগুলি বাক্যের স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করা এবং তদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য বাক্যগুলি বর্জন করার পেছনে একধরণের আরোহী যুক্তি দেওয়া যায় - যে বাক্যটি মূলবাক্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তার কারণ এই যে সেই বাক্যটি থেকে বহুসংখ্যক অসন্দিগ্ধ বাক্য নিঃসৃত হয়। যুক্তি বিজ্ঞানের স্বতঃসত্য বাক্যগুলি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদনের যোগ্য নয় এবং প্রমাণের যোগ্য নয় এমন বাক্য স্বতঃজ্ঞাত হবে। অপরদিকে হুইটগেনস্টাইন রাসেল-এর মত কতকগুলি স্বতঃসত্য বা স্বয়ং প্রমাণিত বচন থেকে সমগ্র যুক্তি বিজ্ঞান নিষ্কাষণের ঘোরতর বিরোধী। হুইটগেনস্টাইন মনে করেন যে স্বতঃসত্য বচনগুলি একসাথে গেঁথে কোনো তন্ত্র গঠনের প্রয়োজন নেই এবং সেই তন্ত্রে কতকগুলি বাক্যকে যুক্তিবাক্য এবং কতকগুলি বাক্যকে সিদ্ধান্ত হিসেবে গ্রহণের কোনো যুক্তি নেই। 'প্রিন্‌কিপিয়া ম্যাথেমেটিকা'-র তন্ত্রীকরণ পদ্ধতি হুইটগেনস্টাইন-এর সমর্থন পায় নি।

ফ্রেগে কিংবা রাসেল কেউ-ই যৌক্তিক বাক্যের স্বরূপ সঠিকভাবে তুলে ধরতে সফল হননি। ফ্রেগে এবং রাসেল উভয়েই ধরে নিয়েছেন যে যৌক্তিক বাক্যের বিষয়বস্তু আছে, ফ্রেগের মতে যৌক্তিক বাক্যগুলি বিমূর্ত বিষয়গুলি একে অপরের সঙ্গে কীভাবে সম্বন্ধ যুক্ত হয়ে আছে তাই বর্ণনা করে এবং রাসেলের মতে যৌক্তিক বাক্যগুলি জগতের সবচাইতে সার্বিক বস্তুগুলির সম্বন্ধ বর্ণনা করে। সুতরাং ফ্রেগে এবং রাসেল উভয়ই ভেবেছিলেন যে যৌক্তিক বাক্যগুলি অর্থপূর্ণ। এখানে ফ্রেগে এবং রাসেল-এর সাথে হুইটগেনস্টাইন-এর পার্থক্য। রাসেল-এর মতে 'যুক্তিবিজ্ঞান সেই সকল বস্তু এবং সেই সকল গুণ নিয়ে ব্যাপৃত থাকে যা জগতের আপতিকতার উপর নির্ভরশীল নয়।

হুইটগেনস্টাইন মনে করেন যে ফ্রেগে এবং রাসেল-এর আলোচনা থেকে যৌক্তিক বাক্য এবং যুক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা হয় না। যৌক্তিক বাক্য সম্পর্কে ফ্রেগে এবং রাসেল-এর মত এই যে এই বাক্যগুলি স্বতঃসত্য বাক্যের সামান্যীকরণ। অপরদিকে স্বতঃসত্য বাক্যগুলিকে যৌক্তিক সত্যের নিদর্শন রূপে গ্রহণ করা হয়। এই মত যৌক্তিক বাক্য এবং যৌক্তিক সত্যের সম্বন্ধটিকে রীতিমত কঠিন করে তোলে। হুইটগেনস্টাইন যৌক্তিক বাক্যগুলিকে সামান্যীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে বোঝার প্রয়াস প্রত্যাখ্যান করেন। হুইটগেনস্টাইন মনে করেন যে একটি যৌক্তিক বাক্যের চিহ্ন এই নয় যে এই বাক্যটি সকল সম্পর্কে সত্য। এক্ষেত্রে হুইট্‌গেনস্টাইন-এর যুক্তিটি খুব সবল। যৌক্তিক বাক্য সার্বিক নাও হতে পারে কারণ কোনো স্বতঃসত্য বাক্যে নাম থাকতে পারে এবং সেটি সামান্য বাক্য নয়।

রাসেল এবং ফ্রেগে-র সাথে হুইটগেনস্টাইন-এর যুক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। রাসেলকে যদি যুক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ বিষয়ক মতবাদে প্লেটোর দলে

ফেলা যায়, তাহলে বলা যায় যে হুইটগেনস্টাইন বহুলাংশে এরিষ্টটলের দলে। তবে রাসেল এবং ফ্রেগে-র সাথে হুইটগেনস্টাইন একমত যে যুক্তি বিজ্ঞান বিষয় নিরপেক্ষ। হুইটগেনস্টাইন-এর মতে যদি যাবৎ আণবিক বাক্যগুলি পাওয়া যায় তাহলে জগতের একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দেওয়া যায়। কারণ সবগুলি মৌলিক বাক্য পেয়ে গেলে ঐগুলি থেকে ক্রমশঃ জটিল বাক্যগুলি পাওয়া যায়। এবং সেক্ষেত্রে যাবৎ সম্ভাব্য বাক্য পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো হুইটগেনস্টাইন মৌলিক বাক্যগুলি থেকে অপর বাক্যগুলি পাওয়ার পদ্ধতির নাম দিয়েছেন 'অপারেশন' বা চালনা (৫.২৩)। ধরা যাক p একটি মৌলিক বাক্য, যেটির সত্য কিংবা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা আছে যেহেতু 'ট্র্যাকটেটস' সমর্থিত দ্বিতত্ত্বের নীতি অনুসারে সত্যতা এবং মিথ্যাত্ব বাক্যমাত্রেরই মান। এই ক্ষেত্রে p-বাক্যটি থেকে হুইটগেনস্টাইন কথিত 'ট্রুথ-অপারেশন' বা সত্যচালনা প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রদত্ত p বাক্যটির সত্যাপেক্ষক রূপে আরও চারটি বাক্য, যেগুলি মৌলিক নয়, পাওয়া যেতে পারে। নিম্নলিখিত ছকটি p বাক্য এবং উক্তবাক্যের সত্যাপেক্ষক f (p) এর সম্বন্ধ ব্যক্ত করছে -

p	$f_{১}(p)$	$f_{২}(p)$	$f_{৩}(p)$	$f_{৪}(p)$
T	F	T	F	T
F	T	F	F	T

'ট্র্যাকটেটস'-এর ৫.১০১ সংখ্যক বাক্য অবলম্বনে p এবং q এইরকম দুটি মৌলিক বাক্যের ক্ষেত্রে p এবং q বাক্য দুটির সত্যাপেক্ষক f (p,q) রূপে যে ষোলোটি বাক্য পাওয়া যায় তার পরিলেখ নিম্নলিখিত ছকটি তুলে ধরছে -

p	q	$f_{১}(p,q)$	$f_{২}(p,q)$	$f_{৩}(p,q)$	$f_{৪}(p,q)$	$f_{৫}(p,q)$	$f_{৬}(p,q)$	$f_{৭}(p,q)$	$f_{৮}(p,q)$
T	T	T	F	T	T	T	F	F	F
T	F	T	T	F	T	T	F	T	T
F	T	T	T	T	F	T	T	F	T
F	F	T	T	T	T	F	T	T	F

p	q	$f_{৯}(p,q)$	$f_{১০}(p,q)$	$f_{১১}(p,q)$	$f_{১২}(p,q)$	$f_{১৩}(p,q)$	$f_{১৪}(p,q)$	$f_{১৫}(p,q)$	$f_{১৬}(p,q)$
T	T	T	T	T	F	F	F	T	F
T	F	F	F	T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	F	F	T	F	F	F
F	F	T	F	F	T	F	F	F	F

একই ভাবে দেখানো যাবে যে যদি ৩টি মৌলিক বাক্য হয় তাহলে চালনা-প্রক্রিয়াব সাহায্যে লব্ধ বাক্যের সংখ্যা দাঁড়ায ২৫৬-তে।

এখানে লক্ষ্য কবলে দেখা যাবে হিটগেনস্টাইন-এব চিন্তার মৌলিকতা। প্রথম সাবিটি স্বতঃসত্যতাব সাবি। স্বতঃসত্যতা যা যৌক্তিক বচনের বৈশিষ্ট্য হিটগেনস্টাইন এইভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ফ্রেগে-র মত তিনি বলেন না যে স্বতঃসত্য বচনগুলি স্বযং প্রকাশিত অথবা বাসেল-এব মত যে যুক্তি বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ (এ্যাক্সিযম)গুলি মৌলিক। হিটগেনস্টাইন যে ভাবে স্বতঃসত্য বচনগুলিকে প্রতিষ্ঠিত কবেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে এই বাক্যগুলি আণবিক বাক্য, মাত্র যেগুলি যথার্থ বাক্য, তাব থেকেই নিঃসৃত। মনে হতে পাবে যে আণবিক বাক্যগুলিব সাথে কতকগুলি যৌক্তিক ধ্রুবক থাকলেই আমবা সমস্ত জটিল বাক্যগুলি পেযে যেতে পাবি। কিন্তু এইধরণেব ব্যাখ্যা হিটগেনস্টাইন-এর পক্ষে গ্রহণীয হবে না। কাবণ এইভাবে বললে মনে হতে পাবে যে যৌক্তিক ধ্রুবকগুলি মৌলিক বাক্যেব অতিবিক্ত আবও কিছু মৌলিক বাক্যগুলিতে সংযোজিত করে। হিটগেনস্টাইন-এব মতে মৌলিক বাক্যগুলিব অতিরিক্ত কোনো কিছুব যৌক্তিক ধ্রুবকগুলি মৌলিক বাক্যগুলিতে সংযোজিত কবতে পাবে না।

ফ্রেগে-ব মতে যৌক্তিক ধ্রুবকগুলি যৌক্তিক বস্তুব নাম। বাসেল-এব মতও এই ধবণেব, বাসেল যৌক্তিক বস্তুব পবিচিতিমূলক জ্ঞান, কখনও বা যৌক্তিক সংজ্ঞাব কথা বলেছেন। হিটগেনস্টাইন মনে কবেন যে যৌক্তিক বস্তু বাস্তব জগতে নেই। এখানে যুক্তি হিসেবে হিটগেনস্টাইন বলেছেন যে যৌক্তিক ধ্রুবকগুলির পবস্পবেব সাহায্যে লক্ষণ দেওযা যায়, তাই যৌক্তিক বস্তু স্বীকাব করা যায় না। হিটগেনস্টাইন-এর মতে সমস্ত যৌক্তিক ধ্রুবকগুলি আণবিক বাক্যগুলিব সাথেই প্রদত্ত আছে। আণবিক বাক্যগুলি যেহেতু আপতিক বাক্য, ঐ বাক্যগুলিব স্বরূপেব মধ্যেই আছে সত্য অথবা মিথ্যা হওযা এবং বাক্যগুলিব স্বরূপেব মধ্যেই আছে ঘোষিত হওয়া। নিষেধেব ধাবণা পাওয়া যেতে পাবে সত্যত্ব এবং মিথ্যাত্ব এই দ্বিতত্ত্বের ধারণা থেকে এবং যে কোনো দুটি বাক্য একই সাথে ঘোষিত হতে পাবে, তার থেকেই এসেছে সংযোজকেব ধাবণা। এইভাবে ক্রমশ একটি মৌলিক বাক্য থেকে উক্ত বাক্যটির নিষেধ বাক্যেব ধাবণা, একাধিক মৌলিক বাক্য থেকে সংযৌগিক বাক্যেব ধাবণা গড়ে ওঠে। আবও জটিলতাব দিকে চালিত হযে একটি সংযৌগিক বাক্যেব নিষেধক বাক্যে আসা যায়। কোনো একটি সংযৌগিক বাক্যেব নিষেধক বাক্য যে বিকল্প নিষেধক বাক্যেব · থে সমমান আমবা ডি মবগ্যান সূত্রানুসাবে জেনেছি। এইরূপ ~ (p.q) আকাবেব বাক্য যুক্তি বিজ্ঞানী শেফাব প্রচলিত দণ্ড অপেক্ষককেব সাহায্যে, যেটি এই ধবণের '/' চিহ্ন দ্বাবা গঠিত, p / q এই আকাবে ব্যক্ত কবা হয। শেফার দণ্ড প্রতীকটিকে, একটি স্বতন্ত্র অপেক্ষকের মর্যাদা দেন এবং একটিমাত্র যোজক চিহ্ন দিয়ে ব্যক্ত করেন। শেফাবেব অপব শিক্ষা যে

রাসেল হোয়াইটহেড, ইত্যাদি স্বীকৃত অন্যান্য অপেক্ষকগুলি, যথা বৈকল্পিক অপেক্ষক, সাকাল্পক অপেক্ষক, দণ্ড অপেক্ষককে রূপান্তর করা যায়, হিটগেনস্টাইন গ্রহণ করেন। হিটগেনস্টাইন এর যৌক্তিক ধ্রুবকগুলির অনুরূপ কোনো যৌক্তিক বস্তু স্বীকারের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে যৌক্তিক ধ্রুবকগুলি রূপান্তরযোগ্য।

'ট্র্যাকটেটস' লক্ষ্য করলে দেখা যায় হিটগেনস্টাইন-এর যুক্তি বিজ্ঞানের ধারনা তার সমকালীন অন্যান্য দার্শনিকদের মতবাদ থেকে অনেক ভিন্ন। হিটগেনস্টাইন-এর যুক্তি বিজ্ঞানের স্বরূপ অনুসন্ধান, বলা যেতে পারে, স্বতঃসত্য বচনের স্বরূপের অনুসন্ধান। যুক্তি বিজ্ঞান বাস্তব জগতের মধ্যেই অন্তর্বর্তী। ঘটনার সন্নিবেশ নিয়ে যে জগৎ, সেই জগতের মধ্যেই আছে যুক্তির আকার। জগতের সার কতকগুলি মৌলিক সম্ভাবনা সমূহ, যার মধ্যে কতকগুলি বাস্তব কতকগুলি অ-বাস্তব, এছাড়া তৃতীয় কোনো সম্ভাবনা নেই। যুক্তিবিজ্ঞান সেই কাঠামো বা আকারটিকে প্রকাশ করে যেটি কতকগুলি সরলবস্তুর সম্ভাব্য সংযুক্তির আকার দ্বারা নির্ধারিত। এইখানেই যুক্তিবিজ্ঞান এবং যৌক্তিক পরিব্যাপ্তির যোগ। যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি আধিবিদ্যক ধারণারূপে 'ট্র্যাকটেটস'-এর প্রথম অংশে উপস্থাপিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে এটা দেখাবার চেষ্টা করা হয়েছে যে যৌক্তিক পরিব্যাপ্তি এবং যুক্তিবিজ্ঞান এই দু'টি পরস্পর সাপেক্ষ ধারণা। আলোচ্য প্রবন্ধে সমালোচনার অংশ বাদ রাখা হয়েছে। হিটগেনস্টাইন-এর যুক্তিগুলি কল্পনায় অনুভব করে হিটগেনস্টাইনকে ধাপে ধাপে বোঝার এবং বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র।

গ্রন্থপঞ্জী

Carruthers Peter, *Tractarian Semantics*, Basil Blackwell, Oxford, 1989

——, *The Metaphysics of the Tractatus*, Cambridge University Press Combridge 1990

Hacker, P M S, *Wittgenstein's Place in Twentieth Century Analytic Philosophy*, Blackwell Publishers Ltd, Oxford 1996

Pears David, *The False Prison — A Study of the Development of Wittgenstein's Philosophy*, Vol I, Clarendon Press, Oxford 1978

Sanyal Indrani, 'Modality and Possible Worlds' in *Foundations of Logic and Language — Studies in Philosophical and Non-standard Logic*, Ed P K Sen, Allied Publishers Ltd., Calcutta 1990

Stenius E, *Wittgenstein's Tractatus*, Blackwell, Oxford 1960

Wittgenstein Ludwig, *Tractatus Logico philosophicus*, translated by D F Pears and B F McGuinness, Routledge Kegan Paul, London 1961

——, *Note Books 1914 - 1916*, ed by G H von Wright and G E M Anscombe, Tr by G E M Auscombe, Blackwell, Oxford, 1961

Wittghenstein, Ludwig. *Proto Tractatus — An Early Version of Tractatus Logico-Philosophicus,* ed by B F McGuinness, T Nyberg and G H von Wright, translated by D F Pears and B F McGuinness, Routledge and Kegan Paul, London 1971

চিন্তাভাবনা

অমিতা চ্যাটার্জী

হ্বিটগেনস্টাইন বিশেষজ্ঞরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শন ভাষা, ভাবনা ও জগৎ বিষয়ক জিজ্ঞাসার ত্রিবেনীসঙ্গম। কিন্তু ভাষা, জগৎ ও জগৎ-ভাষা সম্বন্ধ অবলম্বনে শত শত প্রবন্ধ রচিত হলেও কোনো অজ্ঞাত কারণে ট্র্যাকটেটস'-ভিত্তিক (এরপরে নিয়মিতভাবে 'টি এল পি' বলে গ্রন্থটির উল্লেখ করব) নিবন্ধাবলীতে হ্বিটগেনস্টাইনীয় ভাবনাতত্ত্ব প্রায় অনালোচিতই থেকে গিয়েছে।[১] তবে ভাবনা সংক্রান্ত আলোচনা বিহনে হ্বিটগেনস্টাইনীয় দর্শন ব্যাখ্যা পরিপূর্ণতা পায় না। এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের পরিসরে আমি এই ত্রুটিটুকু সংশোধন করার চেষ্টা করব।

প্রবন্ধের শুরুতেই পরিভাষা ও প্রতিশব্দ সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। হ্বিটগেনস্টাইন মূল গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন জার্মান ভাষায়। কিন্তু সাধারণ জার্মান ভাষা সাহিত্যের প্রয়োজনে সুসমৃদ্ধ হলেও হ্বিটগেনস্টাইন-এর মৌলিক দর্শন-ভাবনা প্রকাশের উপযোগী ছিল না। সচরাচর এরকম ক্ষেত্রে দার্শনিক পারিভাষিক প্রয়োগের দ্বারা আপন ভাব প্রকাশক্ষম ভাষা তৈরি করে নেন। হ্বিটগেনস্টাইনও তাই 'টি এল পি' তে বহু প্রচলিত শব্দ নতুন অর্থে ব্যবহার করলেন। পিয়ার্স ও ম্যাক্গিনেস তার যথাসম্ভব নির্ভরযোগ্য অনুবাদ করেছেন। বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর ভূমিকা সম্বলিত এই অনুবাদটি সহজলভ্য হওয়ায়, সেটিকেই বর্তমান প্রবন্ধের আকর হিসেবে গ্রহণ করে মূল দার্শনিক ধারণাগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছি। সাধারণতঃ ভাষান্তরে কিছু অর্থহানির সম্ভাবনা থাকে। তবুও দুটি ভাষার দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান পেরিয়েও হ্বিটগেনস্টাইন-এর প্রকৃত ভাবনা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেছি। যে বাংলা প্রতিশব্দগুলি ঘুরে ফিরে বারবার আসবে সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা টীকাতে দেওয়া হল, বাকী থাকবে যা, তা প্রবন্ধের মধ্যে যথাস্থানে সংযোজিত হবে।[২]

শিরোনাম থেকেই বোঝা যায় বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় চিন্তা (গেডাঙ্কে/থট)। বাংলাভাষায় 'ভাবনা' ও 'চিন্তা' সমার্থক শব্দ। এ পর্যন্ত 'ভাবনা' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করছিলাম তাই পারিভাষিক প্রয়োগের জন্য 'চিন্তা' শব্দটিই বেছে নিলাম। 'চিন্তা' বলতে আমি চিন্তন ক্রিয়ার বিষয় অর্থাৎ চিন্তাবস্তুকে বোঝাব এবং চিন্তন ক্রিয়ার কর্তাকে বলব 'চিন্তক'।

'টি. এল পি.'তে সর্বসাকুল্যে সাতটি মূলবাক্য আছে। তার মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ মূলবাক্য দুটিই চিন্তা সম্পর্কে। এই তথ্যটিই বোধহয় চিন্তার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যথেষ্ট। বাক্য দুটি হল -

বস্তুস্থিতিব যৌক্তিক চিত্রই চিন্তা। ('টি এল পি' - ৩)[৫]
একটি তাৎপর্য্যযুক্ত বচনকেই বলে চিন্তা। ('টি এল. পি.' - ৪)[৬]

এই দুটি বাক্যেব কোনোটিকেই বিচ্ছিন্নভাবে বোঝা সম্ভব নয়। পূর্বাপব বাক্যগুলিব প্রেক্ষাপটে এগুলি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। বস্তু না বুঝে বস্তুস্থিতি, চিত্র না বুঝে যৌক্তিক চিত্র, তাৎপর্য্য অথবা বচন না বুঝে তাৎপর্য্যযুক্ত বচন বোঝা যায় কি? যায় না। তাই অতি সংক্ষেপে এই বাক্য দুটির পটভূমি বর্ণনা কবব।

'টি এল. পি '-ব প্রথম বাক্যটি পডলেই চমকে উঠতে হয়।[৭] প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে বহু দার্শনিকই জগৎ বর্ণনা কবেছেন কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন-এর বর্ণনাটি সত্যিই অভিনব। সাধাবণতঃ সবাই মনে করেন ফুল. পাখী, গাছপালা, আকাশ, পাহাড নদীনালা, মৃগ, মানুষ, টেবিল. চেযাব, ইত্যাদিব সমাহাবই জগৎ। শুধু তা-ই নয, আকাশেব নীল, সূর্য্যেব তাপ, বাতাসেব শব্দ, চন্দনেব সৌবভ, খাবাবেব স্বাদ, বাঘেব ভয, আহ্লাদীব হাসি, 'রুদালী'র কান্না, ঘুটেকুডানিব দুঃখ, কবিব আনন্দ, আবও কত বিচিত্র 'বস্তু' যে জগতে আছে তাব ইযত্তা নেই। সুতবাং জগৎ বর্ণনা কবতে চাইলে এ সমস্ত বস্তুব একটা দীর্ঘ তালিকা দিলেই চলে। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন বললেন যে কেবলমাত্র বস্তু তালিকা দিলে জগৎ বর্ণনা হয় না। জগতে বস্তুগুলিব বিন্যাস আছে। প্রতিটি বস্তু অপবাপব বস্তুর সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধে বর্তমান। এই বিশেষ বস্তু সন্নিবেশকেই বলে বস্তুস্থিতি এবং জগৎ বস্তুস্থিতিব সমষ্টি, বস্তুসমষ্টি নয। জগৎকে বস্তুসমাহাব বললে অসুবিধে কোথায়? অসুবিধে এইখানে, সেক্ষেত্রে বাস্তব জগৎ ও অবাস্তব জগতে আব কোনো পার্থক্য থাকে না। কেননা, এই বস্তুসমূহেব ভিন্ন সন্নিবেশে গডে উঠতে পাবত অন্য একটি জগৎ, যা বাস্তব নয। মনে কবা যাক সেই আজব দেশেব বর্ণনা -

'আকাশ সেথা সবুজ ববণ, গাছের পাতা নীল
ডাঙায় চলে কই কাতলা, জলে ভাসে চিল।'

এই দেশেও তো বস্তুগুলি একই আছে, কেবল পাল্টে গেছে তাদেব বিন্যাস। আসলে হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবতেন যে বস্তুকুট জগতেব উপাদান তা অবশ্য-সৎ কিন্তু বস্তুসমূহেব বিন্যাসরূপ জগৎ আপতিক। জগতেব বর্ণনা দিতে গেলে তাই বস্তুনামেব তালিকা যথেষ্ট নয, জগতেব অন্তর্গত প্রতিটি বস্তুস্থিতিকে বাক্যাকাবে অনন্যভাবে বর্ণনা কবা চাই, যে বাক্য সত্য অথবা মিথ্যা হবাব যোগ্য। একটি বাক্য যদি যথার্থভাবে বস্তুস্থিতিকে ধবতে সক্ষম হয, তবে সে বাক্য সত্য। কোনো বাক্য যা বলে তদনুরূপ পবিস্থিতি যদি বাস্তবে না থাকে, তবে সে বাক্য মিথ্যা। জগৎকে বস্তুস্থিতিব সমাহাব বলে হ্বিটগেনস্টাইন যেমন অস্তিত্বশীল পবিস্থিতিগুলিকে ধবতে চাইছেন, তেমনি একই সঙ্গে বাদ দিতে চাইছেন অস্তিত্বহীন বা অবাস্তব পবিস্থিতিগুলিকে, যেগুলি ঘটা অসম্ভব ছিল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটে নি।

জগতেব উপকবণ বস্তুগুলিব আবও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন, বস্তু অপরিবর্ত্তনীয়, নিবংশ, অতএব অবিভাজ্য। এই কাবণেই বস্তুব নামকবণ সম্ভব অথচ বাক্যেব দ্বাবা বর্ণনা

সম্ভব নয। কিন্তু পরিস্থিতি আণবিক হলেও সাংশ - তাব অংশরূপে উপস্থিত থাকে কোনো না কোনো বস্তু , তাই মৌলিক বাক্যেব দ্বারা পবিস্থিতি বর্ণিত হয। প্রতিটি পবিস্থিতি পরস্পব নিবপেক্ষ অথচ বস্তুগুলি সর্বদাই পরিস্থিতি নির্ভব।[৬] বস্তুগুলির পবিস্থিতি-নির্ভবতাব অপরদিক হল এদেব অনিবার্য্য পরস্পব-সাপেক্ষতা। আমাদেব ভাষার শব্দগুলি যেমন বাক্যেব পবিপ্রেক্ষিতেই সার্থক, ঠিক তেমনি বস্তুর সত্তা অবশ্যই পবিস্থিতি নির্ভব।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কোনো বস্তুই 'বিচ্ছিন্ন দ্বীপ' নয়, বস্তুগুলি একে অপরেব সাহচর্য্যে সৎ। এখন প্রশ্ন ওঠে, যে কোনো বস্তু কি অপব যে কোনো বস্তুব সঙ্গে যে কোনো রকম সংযোগে একটি পবিস্থিতি নির্মাণ কবতে পাবে? পাবে না। এমন অবাধ সংযোজনের স্বাধীনতা হ্বিটগেনস্টাইন বস্তুগুলিকে দেন নি, বরং সীমিত কবে দিয়েছেন তাদেব সংযোগ-সম্ভাবনা, এদের বেঁধেছেন যৌক্তিক শৃঙ্খলে। তিনি বলেছেন বস্তুগুলি সমস্ত সম্ভাব্য অবস্থায় থাকতে পারে, তবে এই সম্ভাবনা সীমাহীন নয। কেবলমাত্র যৌক্তিক দেশেব (লজিকাল স্পেসের) পবিসরেই বস্তু তাব সঙ্গী বস্তুব সঙ্গে মিলতে পাবে।[৭] যৌক্তিক দেশ বলতে তিনি বুঝেছেন সম্ভাব্য বস্তুবিন্যাস সমূহকে।

এবাবে প্রশ্ন করা যেতে পাবে, বস্তুবিন্যাসেব সম্ভাবনা নিয়ন্ত্রিত হয় কী ভাবে? হ্বিটগেনস্টাইন বলেন বস্তুর স্বরূপ বা আন্তর-ধর্মেব মধ্যেই নিহিত আছে সকল বস্তুবিন্যাসেব সম্ভাবনা। কেননা, বস্তুর স্বরূপ শুধু এইটুকুই নয় যে এক বস্তুকে অপব বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হতেই হবে, কোন্ বস্তু অপব কোন্ বস্তুব সঙ্গে মিলিত হতে পাববে সে সম্ভাবনাও বস্তুর স্বরূপেব অন্তর্গত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে হ্বিটগেনস্টাইন বস্তুব দু'রকমের ধর্মেব কথা বলেছেন - আন্তর/স্বরূপ ধর্ম এবং বাহ্য/বাস্তবিক ধর্ম। একটি বস্তু যে বাস্তবে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে সেটিই তার বাহ্য ধর্ম। একটু ভাবলেই বোঝা যায় বাহ্য ধর্মগুলি আসলে বস্তুব ধর্ম নয়, বস্তুবিন্যাসের ধর্ম। যেহেতু বিশ্বে বস্তুব সন্নিবেশ সতত পবিবর্তনশীল, বস্তুব বাহ্য ধর্মগুলিও আপতিক অতএব বস্তুস্বরূপেব অঙ্গ নয।

বিভিন্ন বস্তুব সন্নিবেশেব ফলে যে সমস্ত পবিস্থিতির উদ্ভব হয় তাব মধ্যে সবগুলি বাস্তব জগতে ঘটে না। বাস্তবে অঘটিত সম্ভাব্য পরিস্থিতিগুলি নির্মাণ কবে বিভিন্ন কল্পিত জগৎ। বাস্তব জগৎ ও সমস্ত কল্পিত জগতেব সমাহাবকেই বলা হয় যৌক্তিক দেশ। যৌক্তিক দেশস্থিত সম্ভাব্য পবিস্থিতিগুলির আকাব নির্ভর কবে বস্তুগুলিব স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যর উপব। স্বরূপতঃ কোনো কোনো বস্তুর পারস্পরিক মিলন অসম্ভব হওযায কিছু কিছু পবিস্থিতি কল্পনাতেই আনা যায় না। আমি যে আজবদেশেব বর্ণনা দিয়েছিলাম সেখানে আকাশেব বং নীল না হয়ে সবুজ হয়েছিল, তা না হযে লাল অথবা হলুদও হতে পাবত কিন্তু মিষ্টি কিংবা সুগন্ধি হতে পাবত না। কল্পিত জগৎ যত বিচিত্রই হোক না কেন সে জগতেও গোলাকাব বর্গক্ষেত্র (রাউন্ড স্কোয়ের) অথবা সোনার পাথববাটি অলীকই থেকে যাবে কাবণ এ জাতীয় বস্তুবিন্যাস সম্ভাব্যতার সীমাকে অতিক্রম করে যায়।[৮]

এ তো গেল বস্তুস্থিতির সাতকাহন, এবারে আসা যাক চিত্রের ধাবণায়। বিশ্বেব (রিয়ালিটি)

অনুকৃতিকেই হ্বিটগেনস্টাইন চিত্র বলেন ('টি. এল. পি.' ২.১২)। সুতরাং কোনো একটি অনুকৃতিকে চিত্র হয়ে উঠতে হলে কতগুলি শর্ত পূরণ হওয়া প্রয়োজন। শর্তগুলি বোঝার সুবিধের জন্য একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। লেখা বন্ধ কবে চোখ তুলেই সামনেব দেয়ালে দেখতে পেলাম একটি পর্বতমালার চিত্র। তার একটি শিখরকে ছুঁয়ে আছে প্রভাত সূর্য্য, সানুদেশে চিবসবুজ বৃক্ষের বন। এক মুহূর্তে বুঝতে পারলাম এটি সূর্য্যোদয়কালে দার্জিলিং থেকে দেখা কাঞ্চনজঙ্ঘার অনবদ্য চিত্র। কেমন করে বুঝলাম এ চিত্র কার্শিয়ং-এর অথবা ঘুম-পাহাড়েব নয়? অবশ্যই চিত্রিত বস্তুগুলির বিন্যাসে। কার্শিয়ং-এব চিত্র হলে ভোরের আলোমাখা কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখতে পেতাম অপরাপর পর্বতশিখরের সঙ্গে ভিন্ন পরিবেশে এবং পরিবর্তিত হত সানুদেশের বৃক্ষবিন্যাস। এই কারণেই হ্বিটগেনস্টাইন লিখেছেন উপাদানগুলি সুনির্দিষ্টভাবে সন্নিবিষ্ট হলে একটি চিত্র হয়ে ওঠে," চিত্রকে বস্তুস্থিতি বলাবও এটিই কাবণ।

চিত্র বিশ্বের অনুকৃতি বলে প্রতিটি চিত্রই কোনো না কোনো পবিস্থিতি উপস্থাপন করে। চিত্র ও চিত্রিত পরিস্থিতিব মধ্যে এক-এক-সাজুয্য (ওয়ান-টু-ওয়ান কোবিলেশন) বর্তমান। কারণ চিত্রের উপাদানগুলি চিত্রিত বস্তুগুলিব প্রতিরূপ ভিন্ন আব কিছু নয়। চিত্রের দিক থেকে অগ্রসব হলে দেখা যাবে যে চিত্রের প্রতিটি অংশেব সঙ্গে চিত্রিত পবিস্থিতির একটি বিশেষ অংশেরই সম্বন্ধ আছে। আবাব চিত্রিতেব দিক থেকেও বলা যায় প্রতিটি চিত্রিত বস্তুব একটি মাত্রই চিত্রসন্নিবিষ্ট প্রতিরূপ আছে। চিত্রের অংশসংখ্যা ও চিত্রিতেব অংশসংখ্যাও সমান হওয়া চাই। চিত্র ও চিত্রিতের মধ্যেকাব এই এক-এক-সাজুয্যেব সম্বন্ধকেই হ্বিটগেনস্টাইন চিত্রসংক্রান্ত সম্বন্ধ বলেন এবং এই সম্বন্ধের দ্বারাই একটি চিত্র জগৎকে ছুঁতে পারে। তাই চিত্রিত পরিস্থিতিটিই একটি চিত্রেব তাৎপর্য্য।

চিত্রে উপস্থাপিত অংশগুলির পাবস্পরিক সম্পর্ক আবার চিত্রের বস্তুসংস্থানের প্রতিরূপ। চিত্রেব উপাদানগুলিব নির্দিষ্ট বিন্যাসকে বলা হয চিত্রেব গঠন (স্ট্রাক্চার অব এ পিকচার) এবং চিত্রেব গঠনগত সম্ভাব্যতাই চিত্রের আকাব (ফর্ম অব এ পিকচাব)। 'টি. এল. পি.' ২.১৫১-এ হ্বিটগেনস্টাইন চিত্রের আকারের ধাবণাকে আরেকটু স্পষ্ট কবেছেন এইভাবে - চিত্রগত উপাদানবিন্যাস ও পরিস্থিতিগত বস্তুবিন্যাসের মধ্যে আনুরূপ্যেব সম্ভাবনাকেই চিত্রেব আকার বলে বুঝতে হবে। একটি চিত্র যে পবিস্থিতিব আকাব ধাবণ করে সেই পরিস্থিতিকেই বর্ণনা কবতে পারে। যেমন একটি রঙীন ছবি একটি বর্ণময় পবিস্থিতিব ত্রিমাত্রিকতাব বর্ণনা দেয়। তবে মনে রাখতে হবে, কোনো চিত্রই চিত্রের আকারের বর্ণনা দিতে সক্ষম নয়; চিত্রের আকাব চিত্রেব মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় মাত্র।

একটি চিত্রেব সঙ্গে চিত্রিত পরিস্থিতির যতটুকু সাদৃশ্য থাকলে চিত্রটিকে চিত্র বলা চলে - চিত্র ও চিত্রিতের সেই সাধারণ আকারটিই চিত্রের যৌক্তিক আকার (২.১৮), বিশ্বের যৌক্তিক আকারও বটে। যে চিত্রেব চিত্রগত আকাব যৌক্তিক আকাব সেই চিত্রকে যৌক্তিক চিত্র বলা হয়।

চিত্র কিন্তু যৌক্তিক আকারেব দ্বারা সত্য কিংবা মিথ্যা হয না। চিত্র একটি পবিস্থিতিকে যৌক্তিক দেশেব গন্ডীর মধ্যে উপস্থাপিত কবে মাত্র। অর্থাৎ যে কোনো চিত্রেব দ্বাবা বর্ণিত পরিস্থিতি বাস্তবে ঘটে না যদিও তা যৌক্তিক দেশে থাকে। বাস্তবে না থেকে যৌক্তিক দেশে থাকার অর্থ সম্ভাবনাব আকাবেই থেকে যাওযা। একটি চিত্র যে পবিস্থিতিব বর্ণনা কবে সেটি যদি বাস্তবে ঘটে থাকে তবে সেটি সত্য হয। আব যদি কোনো চিত্র অবাস্তব পরিস্থিতিব বর্ণনা কবে তবে সেটি মিথ্যা।

চিত্রেব স্বরূপ কী এবং চিত্র কীভাবে একটি পরিস্থিতি বর্ণনা করে সে কথা বলাব ঠিক আগেই হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন আমবা বস্তুস্থিতিব চিত্র আঁকি।[১০] অর্থাৎ চিত্রেব বিশ্ববর্ণনাব ক্ষমতা আছে একথা সত্যি, কিন্তু সে ক্ষমতা কাজে লাগে যখন আমবা চিত্রেব সাহায্যে জগৎকে ধরাব চেষ্টা করি। আমাদেব সঙ্গে বিশ্বেব সেতুবন্ধন কবে যে যৌক্তিক চিত্র, তাই চিন্তা বা থট্। যে পরিস্থিতিব চিত্র আমবা আঁকতে পাবি সেটিই চিন্তনযোগ্য।[১১] চিত্রেব মত চিন্তাও বাস্তবানুগ হলে সত্য হয। কিন্তু আমাদেব চিন্তা কখনই বস্তুস্থিতিব দ্বাবা গন্ডীবদ্ধ থাকে না, আমবা অবলীলাক্রমে আকাশ কুসুমের চিন্তা কবি। কেবলমাত্র যা কিছু অযৌক্তিক তা আমাদেব চিন্তায় ভাসে না যেমন, গোলাকাব বর্গক্ষেত্র। 'টি এল পি '-ব তৃতীয বাক্যেব সবলার্থ এইটুকুই।

চিন্তা কবা মানে চিত্রমাধ্যমে বিশ্ববীক্ষণ, এ তত্ত্বটি ততটা অদ্ভুত ঠেকবে না যদি আমবা মনে রাখি হ্বিটগেনস্টাইন-এব কাছে যৌক্তিক চিত্রায়ণেব অর্থ হল, সাধাবণতঃ, বাক্যেব সাহায্যে ছবি আঁকা। অর্থাৎ যখনই আমবা চিন্তা কবি তখনই হয অবন ঠাকুবেব মত ছবি লিখি অথবা কোনো কথক ঠাকুবেব মত ছবি বলি। কাবণ বাক্যেব কাযা নির্মিত হয ভাষাব অন্তর্গত চিহ্নেব ধ্বনি বা বেখ দ্বাবা। তাই হ্বিটগেনস্টাইন অনেক সময়ই বাক্য বোঝাতে 'বাচনিক চিহ্ন' ব্যবহাব কবেছেন। বাক্যেব সাহায্যে বিশ্ববর্ণনা যে একবকম ছবি আঁকা সে কথা তিনি তাঁব 'নোটবুক'-এ লিখে বেখে গেছেন বাক্য ও চিত্রেব সাদৃশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে। অতি সংক্ষেপে হ্বিটগেনস্টাইন এর মূল বক্তব্য উল্লেখ কবছি।

ক একটি বাক্য পডলে বা শুনলে যেমন সেই বাক্যেব অর্থ অনুধাবন কবা যায, ঠিক তেমনই একটি চিত্র দেখলেই বোঝা যায তাব তাৎপর্য্য কী, অর্থাৎ চিত্রটি কোন্ পবিস্থিতি বর্ণনা কবছে।

খ একটি বাক্যের অর্থ জানলেই বাক্যটি সত্য না মিথ্যা জানা যায না। অন্যভাবে বললে, কোনো বাক্য সত্য কি মিথ্যা তা না জেনেও বাক্যেব অর্থ বোঝা সম্ভব। চিত্রেব ক্ষেত্রেও তাৎপর্য্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে আমবা জানতে পাবি না চিত্রটি সত্য না মিথ্যা, চিত্রে বর্ণিত পরিস্থিতিটি বাস্তব না অবাস্তব।

গ বিশ্বেব কোন বস্তু বোঝাতে কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হবে - তা নির্ভর কবে বক্তা বা লেখকেব অভিপ্রায়েব উপব। ঠিক একইভাবে চিত্রকবের অভিপ্রায নিরূপণ

করে চিত্রের কোন্ অংশকে পবিস্থিতির কোন্ অংশের প্রতিরূপ হিসেবে গ্রহণ করা হবে।

ঘ প্রতিটি চিত্রে চিত্রেব উপাদানগুলিব সংস্থান যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, প্রতিটি বাক্যে তেমনই বাক্যান্তর্গত চিহ্নগুলির বিন্যাস বা বাক্যের অন্বয় একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

'টি.এল পি'-র চতুর্থ সূত্রটি আলোচনা করার আগে স্থিব করা প্রয়োজন হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে আসলে চিত্র কোন্‌টি, বাচনিক চিহ্ন না বচন? 'টি. এল. পি.' ৪.০১ অনুসারে বচনকেই চিত্র বলা উচিত[১২] এবং স্বপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায় 'টি. এল পি.' ৩.১২-তে সেখানে উনি স্পষ্ট কবে বলছেন 'বাচনিক চিহ্ন অভিক্ষেপন সম্বন্ধেব সঙ্গে মিলে বচন হয়'।[১৩] একটি ভাষার অন্তর্গত চিহ্নগুলির বিশেষ অন্বয় থেকে গঠিত হয় একটি বাক্য বা বাচনিক চিহ্ন; সেই বাচনিক চিহ্ন একটি নির্দিষ্ট অভিক্ষেপণ সম্বন্ধের যোগে পরিস্থিতি বর্ণনার উপযুক্ত হলে আমরা পাই একটি বচন ও সেই বচন স্থান কাল-পাত্র যোগে হয়ে ওঠে তাৎপর্য্য-মন্ডিত। কয়েকটি উদাহবণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক্। 'গেল ফুল জল পাতা' নিঃসন্দেহে বাংলাভাষাব অন্তর্গত কিছু চিহ্নের সমষ্টি কিন্তু যথাযথ অন্বয়ের অভাবে এই চিহ্ন সমষ্টিকে বাচনিক চিহ্ন অথবা বচন বলা যাবে না। এর সঙ্গে আমরা মিলিয়ে দেখতে পারি আরেকটি চিহ্ন বিন্যাসকে - 'রোম সম্রাট সীস্থার একটি মৌল সংখ্যা'। বাংলা ব্যাকরণেব বাক্যবিন্যাসরীতি অনুসারে তৈবি হলেও হ্বিটগেনস্টাইন এটিকে বচন বলবেন না কাবণ এই বিন্যাস যুক্তিবৈজ্ঞানিক নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। বচনের মাধ্যমে যেহেতু আমাদের চিন্তা প্রকাশিত হয় এবং চিন্তা যেহেতু বস্তুস্থিতিব যৌক্তিক চিত্র, সেহেতু বচনেব বিষয় সম্ভাব্যতাব গন্ডী অতিক্রম করতে পারবে না। কিন্তু যদি বলা হয় 'মিহির সেন সাতটি সাগর সাঁতরে পাব হয়েছেন' তাহলে আমরা এটিকে বচন বলতেই পাবি। এইস্থলে বিভিন্ন চিহ্নের অন্বয বিশ্বকে ধরার উপযোগী হয়ে উঠেছে; অর্থাৎ এই বিন্যাসে ফুটে উঠেছে বিন্যস্ত চিহ্নগুলির জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হওয়াব সম্ভাবনা, নির্দিষ্ট হয়েছে একটি অভিক্ষেপণ পদ্ধতি যার ফলে আমরা সহজেই বুঝিতে পারছি যৌক্তিক দেশস্থিত কোন্ পবিস্থিতির বর্ণনা কবছে বাচনিক চিহ্নটি, অতএব এটি একটি বচন। এই বচনটি কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য প্রকাশ করতেই পারে যদি বচনের অংশগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির অন্তর্গত ভিন্ন বস্তুকে বোঝায়। যেমন মিহিব সেন শ্রীমতী সেনের স্বামী হলে বচনটির তাৎপর্য্য যা হবে, তিনি আমাব পাড়াব ডাকহরকরা হলে বচনটিব তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই তা হবে না। অর্থাৎ একটি বচন তখনই তাৎপর্য্যযুক্ত হয়ে ওঠে যখন বচনের অন্তর্গত নামপদগুলির বাচ্য অনন্যভাবে নির্দিষ্ট করা হয়। বাচ্য নির্দিষ্ট হওয়াব আগে কিন্তু বচনটি কোন্ পরিস্থিতির চিত্র আমাদের পক্ষে তা বলা সম্ভব হয় না কারণ বচনের মধ্যে তাৎপর্য্যের আকার নিহিত থাকলেও উপাদান থাকে না।[১৪] 'টি এল. পি '-র চতুর্থ সূত্রে এ রকম তাৎপর্য্যযুক্ত বচনকেই হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন চিন্তা (থট্, গেডাঙ্কে)।

'তাৎপর্য্য', 'বচন' ও 'চিন্তা' এই তিনটি শব্দই দর্শনের ইতিহাসে বিভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক দর্শনে বিশেষতঃ গটলব ফ্রেগে-র দর্শনে এই শব্দগুলি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ফ্রেগে-র দর্শন যেহেতু আধুনিক ভাষাদর্শনের ভিত্তিপ্রস্তরস্থানীয় এবং ফ্রেগে-র প্রয়োগকে কেন্দ্র করে দর্শনের জগতে বহু বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে সেহেতু ফ্রেগে-কে উপেক্ষা করে বর্তমানে 'তাৎপর্য্য', 'বচন' বা 'চিন্তা' সংক্রান্ত আলোচনা করা সম্ভব নয়। সুতরাং এবারে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ফ্রেগে-র মত এবং ফ্রেগে-র মতের সঙ্গে হুইটগেনস্টাইন-এর মতের সাদৃশ্য/বৈসাদৃশ্য বিচার করে দেখা যাক্।

ফ্রেগে 'বাচ্য' ও 'তাৎপর্য্য-এর পার্থক্য নিরূপণ করেছিলেন অভেদবাক্যের অন্তর্গত তাদাত্ম্য সম্বন্ধের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে। ফ্রেগে লক্ষ্য করেছিলেন যে আমরা সাধারণতঃ দু-ধরণের অভেদ-বাক্য প্রয়োগ করি যেমন, (১) 'শুকতারা = শুকতারা', (২) 'শুকতারা = সন্ধ্যাতারা'। (১) এবং (২) এর মধ্যে বিস্তর ফারাক। কান্টের অনুসরণে বলা যায় প্রথমটি একটি বিশ্লেষক বাক্য এবং দ্বিতীয়টি সংশ্লেষক। প্রথমটির বৈধতা নির্ণয় অভিজ্ঞতা অনপেক্ষ, দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে তা অভিজ্ঞতা নির্ভর। প্রথমটি আমাদের কাছে কোনো নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে না, দ্বিতীয়টি নতুন তথ্য জ্ঞাপক। ফ্রেগে-র কাছে প্রশ্ন ছিল - 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' দুটি নামই শুক্রগ্রহকে বোঝায় সুতরাং নামদুটির বাচ্য অভিন্ন, তাহলে বাচ্য অতিরিক্ত এমন কী আছে যা নামদুটির জ্ঞানীয় বস্তুতে পার্থক্য ঘটায় যার ফলে দুটি অভেদবাক্যেও পার্থক্য দেখা যায়? সেই বাচ্যাতিরিক্ত অর্থকেই ফ্রেগে বলেছেন নামের তাৎপর্য্য - যা কিনা বাচ্যকে বিশেষ প্রকারে উপস্থাপিত করে। যেমন 'শুকতারা' নামটির তাৎপর্য্য হবে 'ভোরের আকাশে যে তারাটি দেখা যায়' এবং 'সন্ধ্যাতারা' নামটির তাৎপর্য্য 'গোধুলি গগনে যে তারাটি দেখা যায়' এবং এই দুই তাৎপর্য্যই আমাদের টেনে নিয়ে যায় একই বাচ্যে। তাৎপর্য্যের মাধ্যমেই শব্দের বাচ্য নির্দ্ধারিত হয়। সেই কারণে শব্দের সঙ্গে তার তাৎপর্য্যের সম্পর্ক অতি নিবিড় - নিশ্চয়ই বাক্যের সঙ্গে তাৎপর্য্যের সম্পর্ক থেকে নিবিড়তর।

ফ্রেগে যে কেবল শব্দেরই তাৎপর্য্য স্বীকার করেছিলেন তা নয়। বাক্যের ক্ষেত্রেও (বিশেষতঃ ঘোষক বাক্যের ক্ষেত্রে) তিনি বাচ্য ও তাৎপর্য্যের পার্থক্য করেছেন। ফ্রেগের কাছে একটি ঘোষক-বাক্যের বাচ্য হল <u>সত্য</u> বা <u>মিথ্যা</u> - আরও স্পষ্ট করে বললে দুটি চিরন্তন 'বস্তু' (অবজেক্ট)[১৫] যার দ্বারা বাক্য সত্যমূল্য বা মিথ্যামূল্য পায়, আর বাক্যের তাৎপর্য্য হল যে পথে বাক্য 'সত্য' বা 'মিথ্যা'তে পৌঁছায় অর্থাৎ বাক্যের বিষয় বা চিন্তা, ফ্রেগে যাকে গেডাঙ্কে বলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ বিবেচনা করা যাক্ দুটি বাক্য -

(১) শুকতারা সূর্য্যালোকে আলোকিত একটি জ্যোতিষ্ক।

(২) সন্ধ্যাতারা সূর্য্যালোকে আলোকিত একটি জ্যোতিষ্ক।

দুটি বাক্যেরই বাচ্য কিন্তু এক - 'সত্য' অথচ স্পষ্টতঃই এদের তাৎপর্য্য ভিন্ন। প্রথম বাক্যটি

সত্যমূল্য পায় শুকতারা সূর্য্যালোকে আলোকিত একটি জ্যোতিষ্ক বলে এবং দ্বিতীয়টি সত্যমূল্য পায় সন্ধ্যাতারা সূর্য্যালোকে আলোকিত একটি জ্যোতিষ্ক বলে। সুতরাং এই দুটি বাক্যের বিষয়ই তাদের তাৎপর্য্য।

ফ্রেগে-র মতে তাৎপর্য্য (শব্দের অথবা বাক্যের) বিষয়ীগত নয়, বরং বিষয়গত। তাৎপর্য্য বিষয়গত কারণ এর সত্তা নৈর্ব্যক্তিক যদি নাও হয়, আর্ন্তব্যক্তিক (ইন্টার-পারসোনাল) তো বটেই। তিনি নিজেই একথা বোঝাতে একটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। মনে করা যাক্ কোনো এক ব্যক্তি দূরবীণের সাহায্যে চাঁদ দেখছেন। এখানে চাঁদ বাচ্যের সঙ্গে তুলনীয় যেহেতু চাঁদই পর্য্যবেক্ষণের বিষয় যার প্রতিবিম্ব পড়েছে দূরবীণের কাঁচে এবং সেই প্রতিবিম্বের আবার প্রতিবিম্বন হচ্ছে পর্য্যবেক্ষকের চক্ষুস্থিত রেটিনায়। দূরবীণের কাঁচে চাঁদের যে প্রতিরূপ ধরা পড়ছে তা আপেক্ষিক কারণ তার আকৃতি নির্ভর করে দর্শকের দৃষ্টিকোণের উপর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও দূরবীণস্থ প্রতিরূপকে বিষয়ীগত বলা যায় না, কেননা বিভিন্ন পর্য্যবেক্ষকের কাছে ঐ এক প্রতিরূপই ধরা পড়ে। তাৎপর্য্যও ঠিক চাঁদের দূরবীণস্থ প্রতিরূপের মত, বহু ব্যক্তির কাছে একইভাবে এটি গৃহীত হয়।[১৬] চিন্তা অর্থাৎ বাক্যের তাৎপর্য্যও একই কারণে বিষয়গত। ফ্রেগে লিখেছেন, চিন্তা জড়বস্তুর মত বহির্জগতে থাকে না, আবার ধারণার মত অন্তর্জগতেও থাকে না। চিন্তার বাস একটি তৃতীয় জগতে। এই তৃতীয় জগতের অধিবাসীদের কিছু সাদৃশ্য আছে ধারণার সঙ্গে, ধারণার মত এগুলি ইন্দ্রিয়-অগ্রাহ্য আবার অন্যদিকে বহির্বস্তুর সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য আছে মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্বে। যেমন, পিথাগোরাস-এর উপপাদ্য বিষয়ক চিন্তা - যার সত্যতা ব্যক্তি নির্ভর নয়। কোনোদিন কোনো মানুষ এই উপপাদ্যটি সত্য বলে না জানলেও এটি সত্যই থাকে।[১৭]

সুতরাং সংক্ষেপে চিন্তা বিষয়ে ফ্রেগে-র মত দাঁড়াল এইরকম - চিন্তা বাক্যের তাৎপর্য্য। চিন্তাকে বিষয়ীগত বলা যাবে না কারণ (ক) চিন্তা আন্তর্ব্যক্তিক; (খ) দুই বা ততোধিক চিন্তার মধ্যে যে সমস্ত (বিরোধ, অনুধাবণ, ইত্যাদি) ঘটতে পারে সেগুলিও মননিরপেক্ষ, (গ) চিন্তার অস্তিত্ব অনিবার্য্য, দেশ ও কাল অতিক্রমী। চিন্তার এই বৈশিষ্ট্যগুলি স্বীকার করার ফলে ফ্রেগে-র পক্ষে মনস্তাত্ত্বিকতাবাদের (সাইকলজিসম-এর) বিরোধিতা করা সহজ হয়েছিল। সাধারণতঃ মনে করা হয় চিন্তা ধারণার মতই মানসিক। ফ্রেগে কিন্তু বিশ্বাস করতেন চিন্তন-ক্রিয়া নিঃসন্দেহে মানস প্রক্রিয়া হলেও চিন্তা কোনোভাবেই কোনো বিশেষ চিন্তকের মানসপ্রক্রিয়া বা মানস অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়। প্রচলিত প্রতিরূপবাদের বিরোধিতা করে তিনি বলেছিলেন 'চিন্তা কোনো আন্তর মানস অবস্থা নয়'। চিন্তা করার অর্থ হল চিন্তক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বশীল চিন্তার মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপন করা।

হ্বিটগেনস্টাইন কেবল বচনেরই তাৎপর্য্য স্বীকার করেন এবং বচনের অনুষঙ্গেই (কনটেক্সট অব এ প্রপজিশন) নামের অর্থ অথবা বাচ্য স্বীকার করেন।[১৮] ওঁর মতে নামের কোনো তাৎপর্য্য নেই। ফ্রেগে বাক্যের তাৎপর্য্যকে চিন্তা বলেন, অপরপক্ষে হ্বিটগেনস্টাইন-এর কাছে

তাৎপর্য্যযুক্ত বচনই চিন্তা। হ্বিটগেনস্টাইন ফ্রেগে-র মত তাৎপর্য্যের অনিবার্য্য সত্তা মানেন না কারণ 'টি এল পি.'-তে তাৎপর্য্য চিহ্ন বিন্যাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। যে কোনো চিহ্ন প্রতীক হয়ে ওঠে অভিক্ষেপণ সম্বন্ধের (প্রোজেকশন রিলেশন-এর) মাধ্যমে। কিন্তু মজার কথা হল, অভিক্ষেপণ সম্বন্ধ চিহ্ন ব্যতিরেকে থাকতে পারে না। সুতরাং, বাচনিক চিহ্নের কালাতিক্রমী অস্তিত্ব না থাকায় তাৎপর্য্যেরও অনিবার্য্য সত্তা মানার প্রশ্ন ওঠে না।

এই প্রসঙ্গে চিহ্ন ও প্রতীকের সম্পর্ক ভালভাবে বিচার করে দেখা প্রয়োজন। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন, প্রতীকের দু'টি দিক আছে - প্রতীকের প্রত্যক্ষযোগ্য দিকটিই চিহ্ন, আর প্রতীকের প্রত্যক্ষ-অযোগ্য দিকটি সম্বন্ধে ইঙ্গিত মেলে চিহ্নের প্রয়োগে। এইখানে হ্বিটগেনস্টাইন নিঃসন্দেহে ফ্রেগে-র থেকে দূরে সরে গেছেন। কেননা ফ্রেগে বলেন, প্রতীকের প্রত্যক্ষ-অযোগ্য দিকটি বাগর্থতত্ত্বের (সিমানটিক্স-এর) বিষয়। একটি চিহ্ন কোনো বস্তুর প্রতীক হয়ে ওঠে যখন বস্তুটি বিশেষভাবে উপস্থাপিত হয়। এই বস্তু উপস্থাপনের পদ্ধতিই একটি প্রতীককে অপরাপর প্রতীক থেকে পৃথক করে। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে প্রতীকের প্রত্যক্ষ-অযোগ্য দিকটি বিন্যাসতত্ত্বের (সিনট্যাক্স-এর) অন্তর্গত। তাই 'টি এল পি'-র ৩.৩২৬ সূত্রে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মন্তব্য - 'একটি প্রতীককে তার চিহ্নের মাধ্যমে চিনতে হলে আমাদের লক্ষ্য করে দেখতে হবে কীভাবে চিহ্নটি তাৎপর্য্যযুক্ত হয়ে প্রযুক্ত হয়'। পরের সূত্রেও আমরা দেখি - 'একটি চিহ্ন কখনোই তার যুক্তিবৈজ্ঞানিক আকার নির্ধারণ করতে পারে না যদি না চিহ্নটি তার যুক্তিবৈজ্ঞানিক অন্বয়গত ভূমিকায় বিবেচিত হয়।'[১৯] সোমনাথ চক্রবর্তী ওঁর 'লিপির রূপকার ভিটগেনস্টাইন,' প্রবন্ধে অতি প্রাঞ্জলভাবে এই সূত্র কটির ব্যাখ্যা করেছেন। সোমনাথের ভাষায় - '...ওপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে এটুকু অন্ততঃ বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, চিহ্ন থেকে প্রতীকে যাওয়ার পথটিতে প্রয়োগের শাসনই বেশী। .. যুক্তিবিজ্ঞানী বাক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন পদের পারস্পরিক প্রক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যে বিধিব্যবস্থা অনুমোদন করেন তাই হল যুক্তিবৈজ্ঞানিক অন্বয়। তাহলে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, 'কোনো বচনের তাৎপর্য নির্ণয়ের প্রস্তুতি হিসেবে ওই বচনের অন্তর্গত প্রতিটি অঙ্গের অন্বয়গত ভূমিকা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হতে হবে।'[২০] এইভাবে বচনের তাৎপর্য্য চিহ্ন-বিন্যাসরীতি ও প্রয়োগ-পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় চিন্তা তার অনিবার্য সত্তা হারালেও আন্তর্ব্যক্তিকতা বজায় রাখতে পারে। ফলে হ্বিটগেনস্টাইনীয় চিন্তাতত্ত্ব অফ্রেগীয় বলে পরিগণিত হলেও মনস্তাত্ত্বিকতাবাদে পরিণত হয় না।

চিন্তা বিষয়ে হ্বিটগেনস্টাইন-এর এই ব্যাখ্যা কিন্তু সর্বসম্মত নয়। কেনি ও ম্যালকম্ হ্বিটগেনস্টাইনকে মনস্তাত্ত্বিকতাবাদের অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। কেনি ও ম্যালকম-এর ব্যাখ্যা অনুসারে 'টি এল পি.'-তে চিন্তা, বাক্য ও বস্তুস্থিতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে একথা সত্য তবে এই সংযোগ স্থাপিত হয় ব্যক্তিগত চিন্তনক্রিয়ার মাধ্যমে। সুতরাং এদের মতে আন্তর্ব্যক্তিক প্রয়োগের মাধ্যমে বাক্য তার তাৎপর্য্য পায় না বরং বাক্যব্যবহারকারীর

একান্ত ব্যক্তিগত মানসক্রিয়াই বাক্যের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করে। নিজেদের বক্তব্যের স্বপক্ষে 'টি এল. পি.'-র ৩.৩৩ সূত্রটিকে তাঁরা ব্যবহার করেছেন যেখানে বলা হয়েছে চিহ্নঅভিক্ষেপণের পদ্ধতি লজিকের জন্য অপ্রয়োজনীয়। কেনি ও ম্যালকম্ বলেন হ্বিটগেনস্টাইন-এর বিবেচনায় অভিক্ষেপণ পদ্ধতি লজিকের জন্য জরুরী নয় কেননা তা প্রয়োগকর্ত্তার ব্যক্তিগত অভিপ্রায়-সাপেক্ষ এবং কারো ব্যক্তিগত অভিপ্রায় মনোবিদ্যারই বিষয় হতে পারে, লজিকের নয়।

পিটার ক্যাকথার্স[২৩] অবশ্য হ্বিটগেনস্টাইন-এর চিন্তাতত্ত্ব ব্যাখ্যায় ফ্রেগে-র মত বা মনস্তাত্ত্বিকতাবাদের মত কোনোটিকেই গ্রহণ করেন নি; তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী। তিনি বলেন অন্ততঃ 'টি এল পি'-তে চিন্তা বিমূর্ত্ত কালিক পদার্থ হিসেবেই গৃহীত হয়েছে যার রূপায়ণ হয় বাচনিক চিহ্নের তাৎপর্য্যযুক্ত প্রয়োগে, এবং এইরকম তাৎপর্য্যযুক্ত বচনগুলির অবশ্যই সত্যমূল্য থাকে। সুতরাং ব্যক্তিগত মানসক্রিয়ার দ্বারা চিহ্ন প্রতীকে পরিণত হয় না; বরং বহুজনগ্রাহ্য বাচনিক চিহ্ন ও তথাকথিত ব্যক্তিনির্ভর চিন্তা দুই-ই একই তাৎপর্য্যের প্রদর্শক। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে আমি খুঁটিয়ে দেখব 'টি এল. পি'-র চিন্তাসংক্রান্ত সূত্রগুলি কোন্ ব্যাখ্যানুসারে অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

পিয়ার্স ও ম্যাকগিনেস-এর অনুবাদ অবলম্বনে 'টি এল পি.-র মাত্র দুটি সূত্রের মনস্তাত্ত্বিকতাবাদ সম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। সূত্র দুটি নীচে দেওয়া হল।

> প্রত্যক্ষযোগ্য বাচনিক চিহ্নগুলিকে (কথ্য, লেখ্য, ইত্যাদি) আমরা সম্ভাব্য বস্তুস্থিতির অভিক্ষেপণরূপে ব্যবহার করি। অভিক্ষেপণের উপায় মানে বচনের তাৎপর্য্য চিন্তা করে দেখা। 'টি. এল পি' ৩.১১[২৪]

> একটি বাচনিক চিহ্ন যখন প্রয়োগ করা হয় এবং চিন্তা করা হয় তখন সেটি একটি বচন হয়ে ওঠে। 'টি এল পি' ৩.৫[২৫]

এই দুটি সূত্র থেকেই এ ধারণা হওয়া সম্ভব যে ব্যক্তিগত চিন্তাশক্তির প্রয়োগেই যেন বাক্যের তাৎপর্য্য ধরা পড়ে। অগডেন-এর[২৬] অনুবাদ গ্রহণ করলে কিন্তু ৩.১১ সূত্রের অর্থ দাঁড়ায় - বাচনিক চিহ্নের অভিক্ষেপণ বলতে বোঝায় বচনের সত্যশর্তবিষয়ক চিন্তা। এই অনুবাদে কিন্তু মনস্তাত্ত্বিকতাবাদের কোনো আভাস পাওয়া যায় না, কারণ এই সূত্রটি আমাদের এইটুকু বলে যে বাচনিক চিহ্নের অভিক্ষেপণের ধারণা ও সত্যশর্তবিষয়ক চিন্তা-পদ্ধতির ধারণার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। কিন্তু এই সূত্রটি আমাদের কখনই বলে না একজন ব্যক্তি কী উপায়ে একটি বাক্যের দ্বারা পরিস্থিতিকে ধরে। অর্থাৎ অগডেন-এর মতে, হ্বিটগেনস্টাইন যেন বলতে চাইছেন একটি বচনের সাহায্যে বিশ্বকে ধরা মানে অবশ্যই কোন্ কোন্ সম্ভাব্য পরিস্থিতি একটি বচনের সত্যমূল্য নির্দিষ্ট করে তা চিন্তা করা এবং সম্ভাব্য পরিস্থিতির চিন্তা

করে একটি বচনেব সত্যমূল্য নির্দিষ্ট কবাবই অর্থ বচনটির সাহায্যে বিশ্বকে ধরা। বলাই বাহুল্য যে এই সত্যমূল্য নির্দিষ্ট করার পদ্ধতি ব্যক্তিগত হবে না, হবে আন্তর্ব্যক্তিক।

প্রশ্ন করা যেতে পারে পিয়ার্স ও ম্যাকগিনেস-এব অনুবাদেব চেয়ে কেন অগডেন-এব অনুবাদ অধিকতব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে? উত্তব হল 'প্রোটোট্র্যাকটেটস'-এ[২৭] আমবা অগডেন-এর অনুবাদের পরিপোষক দুটি সূত্র পাই।

> বাচনিক চিহ্নেব প্রযোগ রীতিকেই তাব অভিক্ষেপণ পদ্ধতি বলা চলে[২৮]। 'পি টি এল পি' ৩১২
>
> বাচনিক চিহ্নেব প্রয়োগবীতি বলতে বোঝায বচনটিব তাৎপর্য্য অর্থাৎ সত্যশর্ত বিষয়ক চিন্তা[২৯]। 'পি টি এল পি'

হ্বিটগেনস্টাইন কখনই একটি বাক্যেব সত্যশর্ত নির্দ্ধারণ কবাব পদ্ধতিকে ব্যক্তিগত বলবেন না, কেননা সেক্ষেত্রে তাঁব চিত্রতত্ত্ব বাক্যেব অর্থসংক্রান্ত মতবাদ হিসেবে গুরুত্ব হাবাবে। ববঞ্চ তিনি সবসময়ই প্রচলিত প্রয়োগরীতি অনুসাবে বাক্যেব তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের উপর জোব দেবেন।

অগডেন-এর অনুবাদ অনুযায়ী ৩.৫ এবও একটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব। অগডেন বলেন ৩.৫ সূত্রটিব পাঠ হওয়া উচিত এইরকম - 'প্রযুক্ত, চিন্তিত(থট্) বাচনিক চিহ্নই চিন্তা'। অর্থাৎ বাক্য - বিশ্ব সম্পর্কেব বিশেষণ রূপে আমবা ব্যবহার কবতে পাবি দুটি বিকল্প - 'প্রযুক্ত' অথবা 'চিন্তিত'। অর্থাৎ প্রচলন অনুসাবী বাক্যপ্রয়োগই বিশ্বেব সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন কবে এবং এই প্রযোগের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় কী ভাবে আমরা বিশ্ব বিষয়ে চিন্তা কবে থাকি। অতএব প্রচলিত প্রয়োগই বাক্যেব তাৎপর্য্য প্রকাশক। এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে 'টি এল পি.'-র তৃতীয় ও চতুর্থ মূলবাক্যেব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ক্যারুথার্স এই ব্যাখ্যাব সমর্থনে 'টি এল পি'-র ৫.৫৪২ সূত্রেবও উল্লেখ করেছেন। রাসেলীয় অবধারণের সমালোচনা প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন লেখেন 'ক চিন্তা করে ক্ষ' এবং 'ক বলে যে ক্ষ' দুটিকেই 'ক বলে যে ক্ষ' এই আকাবে প্রকাশ করা চলে। সুতবাং বলা এবং চিন্তা করা দুই-ই একভাবে সত্যমূল্যেব সঙ্গে সম্পর্কিত। এখানে একটির মাধ্যমে অপরটিকে ধরাব কথা বলা হচ্ছে না। অতএব চিন্তা করা বা বলা কোনোটিকেই চিন্তক ও বস্তুস্থিতির সম্পর্করূপে বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত নয - দুটিই চিহ্নের বিন্যাসমাত্র যাব সাহায্যে কোনো না কোনো পরিস্থিতি প্রদর্শিত হয।

চতুর্থ মূলবাক্যে তাৎপর্য্যযুক্ত বচনকে চিন্তা বলা হয়েছে কিন্তু 'বচন' শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক। 'টি এল. পি.'-তে হ্বিটগেনস্টাইন কখনও দৃশ্যমান বাচনিক চিহ্ন + অভিক্ষেপণ পদ্ধতিকে বচন বলেছেন, কখনও বা সম্পূর্ণ চিহ্ন (দৃশ্যের উপব কোনো জোব নেই।) + অভিক্ষেপণ পদ্ধতিকে বচন বলেছেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বচন' প্রথম অর্থেই ব্যবহৃত হযেছে। এই

অর্থে বিভিন্ন বচনের সত্য হওয়াব শর্তগুলি এক হওযা সম্ভব এবং স্বতসত্য ও স্ববিবোধও বচনেব অন্তর্গত। আবাব পঞ্চম মূলবাক্য সংক্রান্ত উপবাক্যগুলিতে হুইটগেনস্টাইন 'বচন' যে অর্থে গ্রহণ কবেছেন সে অর্থে সত্যশর্ত এক হলে আপাত ভিন্ন বচনগুলিব অভেদ স্বীকাব করতে হয় এবং স্বতসত্য বা স্ববিরোধ বচনের মর্য্যাদা পায় না। কিন্তু চিন্তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় হুইটগেনস্টাইন-এর কোনো দ্বিধা প্রকাশ পায় নি। যে বচন তাৎপর্য্যযুক্ত তাকেই চিন্তা বলা হয়েছে আর যে বচন তাৎপর্য্যহীন তা চিন্তা নয়। যেমন 'টি এল পি.' ৬.২১ সূত্রে হুইটগেনস্টাইন বলেছেন গাণিতিক বচনগুলি কোনো চিন্তা প্রকাশ কবে না। কাবণ বচনেব তাৎপর্য্য একদিকে যেমন চিহ্ন-বিন্যাসেব সঙ্গে জড়িত অন্যদিকে সেবকম বচনটিব সত্য অথবা মিথ্যা হওয়ার শর্তাবলীর সঙ্গে জড়িত। গাণিতিক বচনগুলি স্বতসত্য এবং হুইটগেনস্টাইন-এর মতে স্বতসত্যগুলি আমাদেব কিছুই বলে না, সুতবাং এগুলি তাৎপর্য্যহীন।

চিন্তাব স্বরূপ বুঝতে হলে আবেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই হয। হুইটগেনস্টাইন কি মনে কবেছেন সব তাৎপর্য্যযুক্তবচন/চিন্তা-ই অনিবার্য্যভাবে উক্তিমূলক বা অ্যাসার্টিভ অর্থাৎ চিন্তামাত্রই কি পবিস্থিতি বিষয়ে কিছু স্বীকাব বা অস্বীকাব কবে? এ ব্যাপাবে 'টি এল. পি.'-তে আপাত-বিবোধী কিছু সূত্র পাওযা যায়। ৪.০৬৪ সূত্রটি পড়লে মনে হয হুইটগেনস্টাইন বচনের স্বীকৃতি/অস্বীকৃতি-নিবপেক্ষ সত্তা মানতেন। এই সূত্রে বলা হযেছে একটি বচন স্বীকৃত বা অস্বীকৃত হওয়ার আগেই তাব তাৎপর্য্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকে[৩০]। বচনেব কালাতীত অনিবার্য্য সত্তা স্বীকাব না কবে এমন কথা বলা যায় কি? আবাব ৪.০০১ সূত্রে তিনি বলেছেন যে বচনসমূহেব সমষ্টিই ভাষা।[৩১] কাজেই কোনো ভাষাতীত আন্তর অবস্থাকে বচন বলে তিনি স্বীকাব করতেন না মনে হয। তাই স্বীকৃতি/অস্বীকৃতির পূর্বে বচনেব তাৎপর্য্য নির্দিষ্ট হযে থাকলেও ভাষাতিবিক্ত বচনের অস্তিত্বেব কথা তিনি বলতে পারেন না।

অবধারণেব বিষয় না হয়ে, শাব্দ শবীব ধাবণ না কবেও বিমূর্ত্ত চিন্তাব অস্তিত্ব স্বীকাব কবা হুইটগেনস্টাইন-এব সার্বিক দর্শনেব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না বোধ হয়। ক্যারুথার্স এ সমস্যার সমাধানে বলেছেন হুইটগেনস্টাইন সম্ভবতঃ একবকমের প্রচলনবাদেব (কনভেনশনালিসম-এব) কথা বলতে চাইছিলেন। আমবা এতক্ষণ দেখেছি আমাদের ভাষায় চিহ্নবিন্যাসেব যে বীতি আছে তদনুসারে অন্বিত চিহ্নসমূহ তাৎপর্য্যপূর্ণ হয়ে ওঠে অর্থাৎ তাদেব সত্য/মিথ্যা হবাব যোগ্যতা আসে এবং এই অর্থে সমস্ত সম্ভাব্য বচনেবই বিন্যাস ও তাৎপর্য্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে। অর্থাৎ ভাষায় প্রকাশিত হওয়াব আগেই বিমূর্ত্ত চিন্তা প্রকাবগুলি(অ্যাবস্ট্রাকট ফর্ম অব থট) থাকে এ কথা বলতে অসুবিধে হয না। কিন্তু একই সঙ্গে মনে বাখা প্রয়োজন হুইটগেনস্টাইন-এর কাছে বিন্যাসবীতি নিরপেক্ষভাবে চিন্তাপ্রকাবেব অস্তিত্ব স্বীকার্য্য নয়। আব মানুষের অস্তিত্ব না থাকলে বিন্যাসরীতিব অস্তিত্বেব সম্ভাবনা অমূলক। সুতরাং মানবজাতিব অস্তিত্বের পূর্বেও চিন্তাব সত্তা ছিল - এই ফ্রেগীয় মত গ্রহণযোগ্য নয।

বাক্য ও বাক্যপ্রকাবেব সম্পর্কে উপমা দিয়ে ব্যাখ্যাটি স্পষ্ট করা যেতে পাবে। একটি

বিশেষ ভাষায় বাক্যগঠনের রীতি নির্দ্ধাবিত হওয়ার পরে (এই রীতিগুলি ইতিপূর্বে অনুচ্চারিত, অগঠিত বাক্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য) আমরা ভাবতেই পারি যে ঐ ভাষার সম্ভাব্য সব বাক্যগুলিই আছে, শব্দের মাধ্যমে যদি সেগুলি বাক্যকায়া কখনও ধারণ নাও করে। যেমন আমরা অনেক সময়ই বলি বাংলাভাষায় এমন কতগুলি বাক্য আছে - যেগুলি কেউ কখনও রচনা করে নি, হয়ত কোনোদিন করবেও না। এখানে কেবলমাত্র বাক্যগঠনের সম্ভাবনারই যৌক্তিক অস্তিত্ব সূচিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাভাষার বাক্যগঠনের রীতিগুলিকে বাদ দিয়েও এইরকম বাক্যের সত্তা আছে - একথা কোনোমতেই মানা চলে না। কেউ কখনো বলে না যে 'অজগর আসছে তেড়ে' 'আমটি আমি খাব পেড়ে' এই ধারণের বাক্যগুলো ২০ লক্ষ বছর আগেও ছিল। কারণ বাংলা ব্যাকরণ বা বাংলাভাষায় শব্দবিন্যাসের রীতিগুলি তখন ছিল না যেহেতু বাংলাভাষারই অস্তিত্ব সেসময় ছিল না। ভাষার যেমন ইতিহাস আছে, চিন্তারও তেমন ইতিহাস আছে; ভাষা যে অর্থে বিমূর্ত্ত, চিন্তাও সেই একই অর্থে বিমূর্ত্ত হতে পারে। তবে এভাবে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মত ব্যাখ্যা করলেও কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন, একই চিন্তা কি বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হতে পারে? একই চিন্তা বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশোপযোগী হলে চিন্তার সেই সমস্ত ভাষা নিরপেক্ষ একটি সত্তা স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন তো চিন্তার ভাষাতীত সত্তা মানেন না। বাক্যবিন্যাসরীতি ও চিন্তাবিন্যাসরীতি সমতুল্য হলে, এই দর্শনে চিন্তাকে ভাষা স্বরূপ বলে বিবেচনা করাই কি ঠিক নয়?

ফ্রেগে-র দর্শনে প্রকাশের উপায় নিরপেক্ষভাবে চিন্তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে সদা বিশ্বাভিমুখী বাচনিক চিহ্নই চিন্তা, যা কিনা অভিক্ষেপণ নিয়মের সাহায্যে পরিস্থিতি চিত্রণ করে। ভাষাতীত চিন্তার সত্তা স্বীকার করার ফলে ফ্রেগে অসুবিধের সম্মুখীন হন। কেননা তখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, ফ্রেগে-র (বেগবিফ্স্ক্রিফ্ট্) বিগ্রহলিপির তবে কি প্রয়োজন?[৩২] ভাষা বিশ্লেষণের পদ্ধতি অবলম্বন না করেও সেক্ষেত্রে সরাসরি চিন্তার সাহায্যেই আমরা জগৎকে ধরতে পারতাম। দুটি বিকল্প পথে ফ্রেগে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, হয় ফ্রেগেকে বলতে হবে যে ভাষার আলোচনা জগৎকে জানার জন্য আবশ্যিক নয় - একটি কৌশল মাত্র; নয় বলতে হবে যদিও চিন্তার ভাষাতীত সত্তা আছে, চিন্তাকে কেবলমাত্র ভাষা দিয়েই ধরা যায়, অন্যথার চিন্তা থেকে যায় চির-অধরা। কিন্তু এই দুটি উত্তরের কোনোটির স্বপক্ষেই পরিপোষক যুক্তি ফ্রেগের দর্শনে পাওয়া যায় নি।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনে কিন্তু এ জাতীয় দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত। যেহেতু ভাষাবিন্যাসরীতিকে বাদ দিয়ে চিন্তার অস্তিত্ব সম্ভাবনা উনি স্বীকার করেন নি, সেহেতু ওঁর দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু যথার্থই ভাষা ও ভাষাবিশ্লেষণ - একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

ফ্রেগে সারা জীবন ধরে মনস্তাত্ত্বিকতাবাদ নামক জুজুর ভয়ে ভীত ছিলেন। এই জুজুর ভয়েই তিনি মন-নিরপেক্ষ, ভাষাতীত, বিষয়গত চিন্তার কথা বলেছিলেন। ফ্রেগে মানতেন যে আমাদের পরস্পরের ভাববিনিময়ের জন্য চিন্তার আন্তর্ব্যক্তিক হওয়াটা জরুরী। সেই

কারণেই ওঁর মতে চিন্তা কোনোভাবে মন-নির্ভর হতে পারে না। আমাদের প্রত্যেকের মানস অবস্থা একান্ত ব্যক্তিগত, অতএব, গোপন। তাই এগুলির আন্তর্ব্যক্তিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিন্তু মানস অবস্থা গোপন বলার অর্থ কী? গোপন হওয়ার অর্থ যদি এই হয় যে অপর কারো মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না (একথা অবশ্যই মিথ্যা) তাহলেও ফ্রেগে চিন্তাকে সম্পূর্ণভাবে মন-নিরপেক্ষ বলতে পাবেন না। কারণ চিন্তা যদি ব্যক্তিমন নিরপেক্ষ হয়েও থাকে, সেই চিন্তাকে বোঝার উপায় কিন্তু ব্যক্তি নির্ভর। কে কীভাবে একটি বিষয়গত চিন্তাকে বোঝেন, পারস্পরিক ভাববিনিময়ের জন্য সেটা জানা আবশ্যক। সুতরাং এই অর্থে মানস অবস্থাকে গোপন বললে ফ্রেগে বিষয়গত চিন্তার দ্বারা ভাব বিনিময় নামক ঘটনাটি ব্যাখ্যা করতে পাবেন না। কিন্তু যদি বলা হয়, মানস অবস্থা গোপন এই অর্থে যে তা অপরের পক্ষে জানা সম্ভব হলেও অপর কেউ বস্তুতঃ একই মানস-অবস্থার অধিকারী হয় না, তাহলে ফ্রেগে-র কোনো সুবিধে হয় কি? না, হয় না। কারণ এই অর্থে চিন্তার গোপনীয়তা মেনেও চিন্তাকে আন্তর্ব্যক্তিক বলাই যায়; চিন্তার কালাতীত বিষয়গত সত্তা জানার প্রয়োজন হয় না - যেমন হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন। হ্বিটগেনস্টাইন যখন বিমূর্ত্ত চিন্তাপ্রকারের কথা বলেন তখনও তা চিহ্ন বিন্যাসের প্রচলিত রীতি নিরপেক্ষ মনে করেন না। চিহ্ন বিন্যাসের রীতির ইতিহাস থাকায় এগুলি কখনই সম্পূর্ণ মননিরপেক্ষ নয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই সমস্ত চিন্তাপ্রকার ভাব বিনিময়ের ক্ষেত্রে কোনো বাধাব সৃষ্টি কবে না। কারণ, ভাববিনিময়েব সময় প্রতি চিন্তক যে নিজস্ব চিন্তা প্রয়োগ করেন সেগুলি একই চিন্তা-প্রকারের নিদর্শন(টোকেন)। শুধু তাই নয়, প্রত্যেকের চিন্তার অঙ্গগুলি একই বিন্যাসরীতির দ্বারা গঠিত হয় বলে একই জাতীয় অভিক্ষেপণেব নিয়ম দ্বাবা প্রত্যেকে জগতেব ছবি আঁকেন। সুতরাং প্রত্যেকের চিন্তা নিজস্ব হওয়া সত্ত্বেও অপরে তা বুঝতে পারে।

চিন্তাব বিষয়গত সত্তা প্রমাণ করার জন্য ফ্রেগে আবও একটি যুক্তি দিয়েছিলেন। ফ্রেগে-ব মতে প্রত্যেক চিন্তা সত্য অথবা মিথ্যা হবাব যোগ্য। সত্যতা চিন্তার ধর্ম। কোনো চিন্তা সত্য হয় যদি তা বস্তুস্থিতির অনুরূপ হয়। সত্য যেহেতু কালাতীত, চিন্তাও সে কারণে কালাতীত। ফ্রেগে-র এই অনুমানটিতে যুক্তিগত কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বলতে হয় অনুমানটি অতিমাত্রায় জোরাল। ফ্রেগে বলেছিলেন জগতে বুদ্ধিমান চিন্তক না থাকলেও পিথাগোবাস-এব উপপাদ্য বিষয়ক চিন্তার সত্যতা অনস্বীকার্য্য। অতএব, এই চিন্তাব কালাতীত সত্তাও আছে। তবে সত্য কালাতীত স্বীকার করলেও চিন্তার অনিবার্য্য কালাতীত সত্তা স্বীকার কবাব প্রয়োজন নেই। হ্বিটগেনস্টাইন বলতেই পাবেন যে একটি চিন্তা যদি সত্য হয় তবে অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যে কালেই তা গৃহীত হোক না কেন, সেই বিশেষ কালে চিন্তাটি সত্য হবে। এই মত মানলে এইটুকুই শুধু স্বীকার করতে হয় যে বুদ্ধিমান চিন্তক থাকলেই চিন্তা ধরা পড়ে, ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং সেই প্রকাশকালে চিন্তার সত্তা স্বীকার করাই যথেষ্ট।

তবে প্লেটো অথবা ফ্রেগে-র মত হ্বিটগেনস্টাইন চিন্তাকে সম্পূর্ণরূপে ইতিহাস-বহির্ভূত, তৃতীয় জগতের অধিকারী বলে স্বীকার করেন নি - একথা বলার অর্থ এই নয় যে তিনি চিহ্নবিন্যাসরীতির আমূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা স্বীকার করতেন। যে চিহ্নবিন্যাসরীতির উপর নির্ভর করার ফলে তাৎপর্য্যযুক্ত বচনের কালাতীত সত্তা অস্বীকৃত হয় সেই চিহ্নবিন্যাসরীতি কিন্তু যুক্তিবৈজ্ঞানিক অন্বয় অতিরিক্ত কিছু নয়। আর এই যুক্তিবৈজ্ঞানিক অন্বয় নির্দিষ্ট হয় বস্তুর স্বরূপের দ্বারা। বস্তু ও বস্তুস্বরূপ অপরিবর্তনীয় বলে বস্তুগুলির সম্ভাব্য বিন্যাসরীতিও অপরিবর্তনীয়। অতএব বাচনিক চিহ্নের বিন্যাসরীতিও বস্তুবিন্যাসরীতির অনুরূপ হওয়ায় অপরিবর্তনীয়।

'টি এল. পি '-তে হ্বিটগেনস্টাইন বহুবার নানাভাবে বলেছেন যে বাক্‌বিন্যাসরীতি ও চিন্তাবিন্যাসরীতিতে কোনো পার্থক্য নেই। সুতরাং চিন্তার গণ্ডী ও ভাষার গণ্ডী ভিন্ন নয়। যে কোনো তাৎপর্য্যযুক্ত বচন কেবলমাত্র পরিস্থিতির বর্ণনা দেয়। ৫.৬১ সূত্রে বলা হয়েছে লজিক কখনও জগতের সীমা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং জগতে কী নেই তা লজিকের পক্ষে বলা সম্ভব নয়, জগতে কী আছে লজিক শুধু তাই বলতে পারে। জগতে কী নেই তা বলতে গেলে জগতের সীমা অতিক্রম করতে হয়। আমাদের চিন্তাও জগতের সীমায় আবদ্ধ। আমরা যা চিন্তা করতে পারি না, তা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারি না।[৩৩] এই সূত্র থেকেই নিঃসৃত হয় 'টি এল. পি.'-র সেই বিখ্যাত বাক্য - আমার ভাষার সীমাই আমার জগতের সীমা নির্দিষ্ট করে (৫.৬)।

চিন্তা ও ভাষার এই অবিনাভাব সম্বন্ধের মধ্যেই প্রোথিত হয়ে আছে যৌক্তিক আচরণবাদের বীজ যা হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনের উত্তর পর্বে সুস্পষ্টরূপ লাভ করেছে। দৈহিক আচরণের অতিরিক্ত কোনো আন্তর মানসপ্রক্রিয়া তিনি স্বীকার করেন নি।[৩৪] এবং বলেছেন একই পরিস্থিতির দুরকমের বর্ণনা দেওয়া সম্ভব - এক জাতীয় বর্ণনা দেওয়া হয় মানস-বিধেয় প্রয়োগে, অপরটি দেওয়া হয় আচরণবাদের ভাষায়। বর্ণনার স্তরে দৈহিক ও মানসিকের ভেদ কিন্তু সত্তার স্তরে দুই ভিন্ন জাতীয় পদার্থের অস্তিত্বের সূচক নয়।

উপসংহারে বলি হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর অনন্যসাধারণ বাচনভঙ্গিতে 'টি এল পি.'-র তৃতীয় ও চতুর্থ মূলবাক্যে চিন্তার স্বরূপ বিষয়ে যা বলেছেন তা কিন্তু আমাদের সাধারণ ভাবনার পরিপন্থী নয়। সত্যি আমরা যখন চিন্তা করি তখন আমরা কী করি? বাংলাগানের ভাষায় বলা যায় -

> 'চার দেয়ালের মধ্যে নানান দৃশ্যকে
> সাজিয়ে নিয়ে দেখি বাহির বিশ্বকে..'

হ্বিটগেনস্টাইন শুধু আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন এই চারটি দেয়াল হ'ল ভাষার চতুঃ

সীমা, ঘরটি হল যৌক্তিক দেশ, দৃশ্যগুলি নানা বস্তুর সম্ভাব্য বিন্যাসের অনুকৃতি, আর সাজানোর ছকটি যুক্তিবৈজ্ঞানিক; এবং তারই ফলে আঁকা হয়ে চলে রকম রকম ছবি, কতগুলি সত্য আর বাকী মিথ্যা অথবা কল্পনা।

টীকা

১। Peter Carruthers, *Tractarian Semantics*, Basil Blackwell, Oxford, 1989 গ্রন্থটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম।

২।

জার্মান শব্দ	ইংরেজী প্রতিশব্দ	বাংলা প্রতিশব্দ
Gedanke	Thought	চিন্তা
Sinn	Sense	তাৎপর্য্য
Gegenstand	Object	বস্তু
Tatsache	Fact	বস্তুস্থিতি
Sachverhalt	Atomic fact	আণবিক বস্তুস্থিতি
	State of affairs	পরিস্থিতি
Bedeutung	Reference	বাচ্য
Satzzeichen	Propositional Sign	বাচনিক চিহ্ন/বাক্য
Satz	Proposition	বচন
Sin voller satz	Proposition with sense	তাৎপর্য্যযুক্ত বচন

৩। *Tractatus*, ৩ 'A logical picture of facts is a thought'.

৪। " ৪ 'A thought is a proposition with a sense '

৫। " ১ 'The world is all that is the case '

" ১.১ 'The world is a totality of facts, not of things'

৬। " ২ ০১১ 'It is essential to things that they should be possible constituents of states of affairs'

৭। " ২ ০১২২ 'Things are independent in so far as they can occur in all *possible* situations, but this form of indepen dence is a form of connexion with states of affairs, a form of dependence '

৮। এই বিষয়টি আরও গভীরভাবে বুঝতে হলে 'টি এল পি ' ৩ ০৩২ এবং ৩ ০৩১ এর তাৎপর্য্য বিশদ করা প্রয়োজন।

৯। *Tractatus*, ২.১৪ 'What constitutes a picture is that its elements are related to one another in a determinate way.

" ২.১৪১ 'A picture is a fact '

১০। " ২ ১ 'We picture facts to ourselves '

১১। " ৩ ০০১ 'A state of affairs is thinkable· What this means is that we can picture it to ourselves'

১২। " ৪.০১ 'A proposition is a picture of reality'

১৩। " ৩ ১২ ' .And a proposition is a propositional sign in its projective relation to the world '

১৪। *Tractatus*, ৩.১৩ 'A proposition includes all that the projection includes, but not what is projected. A proposition, therefore, does not actually contain its sense, but does contain the possibility of expressing it . A proposition contains the form, but not the content, of its sense.'

১৫। ফ্রেগে-র অবজেক্ট বিশিষ্ট নামের বাচ্য। বিশিষ্ট নাম দু'রকম হতে পারে ব্যক্তি নাম ও নির্দিষ্ট বর্ণনাত্মক অভিধা। যে কোনো অভিধেয় পদার্থই ফ্রেগে-র মতে বস্তু হতে পারে, তার নিরংশ হওয়া জরুরী হয়। ফ্রেগীয় বস্তুর উদাহরণ দেওয়া সম্ভব — ভিটগেনস্টাইনীয় বস্তুকে কিন্তু অনুমানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে হয়।

১৬। Gotlob Frege, 'On sense and nominatum' *Readings in Philosophical Analysis*, eds Feigel and Sellars, Appleton-Century-Crofts, New York, 1949

১৭। Frege, 'Thought', *Mind*, Volume 56, 1956.
' Thoughts are neither things of the outer world nor ideas It needs no bearer'

১৮। *Tractatus*, ৩.৩ 'Only propositions have sense, only in the nexus of a proposition does a name have meaning.'

১৯। " ৩.৩২৬ 'In order to recognize a symbol by its sign we must observe how it is used with a sense.'
" ৩.৩২৭ 'A sign does not determine a logical form unless it is taken together with its logicosyntactical employment.'

২০। সোমনাথ চক্রবর্তী, 'লিপির রূপকার ভিটগেনস্টাইন', <u>তত্ত্ব ও প্রয়োগ</u> (তৃতীয় ও চতুর্থ বিশেষ সংখ্যা), ১৯৯০ পৃঃ ৪০-৪১।

২১। Anthony Kenny, *Wittgenstein*, Penguin, London, 1973

২২। Norman Malcolm *Nothing is Hidden*, Blackwell, Oxford, 1986

২৩। <u>ট্র্যাকটেরিয়ান সিমানটিক্স গ্রন্থে</u>, অষ্টম পরিচ্ছেদ।

২৪। *Tractatus*, ৩.১১ 'We use the perceptible sign of a proposition (spoken or written, etc.) as a projection of a possible situation. The method of projection is to think of the sense of the proposition.'

২৫। " ৩.৫ A propositional sign, applied and thought out, is a thought.'

২৬। C. K. Ogden, *Tractatus-Logico Philosophicus*, Routledge & Kegan Paul, London, 1922

২৭। Wittgenstein, *Proto-Tractatus*, Translated by Pears & McGuinness, Routledge & Kegan Paul, London, 1971

২৮। *Tractatus*, ৩.১২ 'The method of projection [of a propositional sign] is the manner of applying the propositional sign.'

২৯। *Tractatus*, ৩ ১৩ 'The application of a propositional sign is the thought (*das Denken*) of its truth-condition (sign).'

৩০। " ৪ ০৬৪ 'Every proposition must *already* have a sense: it cannot be given a sense by affirmation Indeed, its sense is just what is affirmed.'

৩১। " ৪.০০১ 'The totality of propositions is language.'

৩২। ফ্রেগে ভাষা বিশ্লেষণের পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন জগৎকে জানার উদ্দেশ্যে। সাধারণ ভাষার দৈন্য উপলব্ধি করে তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন বিগ্রহলিপির যার আদর্শ অন্বয়ে একদিকে সম্পূর্ণ যুক্তিবৈজ্ঞানিক কাঠামো এবং অপরদিকে সম্পূর্ণ জাগতিক কাঠামো প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এই বিগ্রহলিপি অনুসরণ করেই ফ্রেগে পৌঁছতে চেয়েছিলেন জগৎ সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণায়।

৩৩। *Tractatus*, ৫.৬১ 'Logic pervades the world, the limits of the world are also its limits So we cannot say in logic, 'The world has this in it, and this, but not that' . since it would require that logic should go beyond the limits of the world . so what we cannot think we cannot say either

৩৪। 'An "inner process" stands in need of outward criteria' § 580, Wittgenstein, *Philosophical Investigations*, Blackwell, Oxford, 1958

'ট্র্যাকটেটস' থেকে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এ উত্তরণের ধারাবাহিকতা

তুষার কান্তি সরকার

লুড্‌ভিগ্ ছিটগেনস্টাইন-এর জার্মান ভাষায় লিখিত বই 'ট্র্যাকটেটস লজিক ফিলোসফিক অভণ্ডলুঙ' প্রকাশিত হয় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয় ঐ বই এর ইংরেজী অনুবাদ 'ট্র্যাকটেটস লজিকো-ফিলসফিকাস', দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের ভূমিকা সহ। এই বইটি (সংক্ষেপে 'ট্র্যাকটেটস') দার্শনিক মহলে ছিটগেনস্টাইন-এর প্রথম যুগের দর্শন চিন্তার প্রামাণ্য দলিল হিসেবে গণ্য হয়। 'ট্র্যাকটেটস' প্রকাশিত হবার প্রায় পঁচিশ বছর পর ছিটগেনস্টাইন তাঁর 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এর প্রথম পর্ব (পার্ট ওয়ান) সম্পূর্ণ করেন এবং সেটির দ্বিতীয় পর্ব (পার্ট টু) শেষ হয় ১৯৪৭-৪৮ সালে, যদিও বইটি (সংক্ষেপে 'ইনভেস্টিগেশনস' প্রকাশিত হয় ছিটগেনস্টাইন-এর মৃত্যুর দুবছর পরে ১৯৫৩ সালে রীস্ এবং অ্যানসকোমব-এর সম্পাদনায়। সাধারণভাবে 'ইনভেস্টিগেশনস' বইটিকে ছিটগেনস্টাইন-এর উত্তর কালীন দর্শন চিন্তার আকর গ্রন্থ ব'লে গণ্য করা হয়। বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনার লক্ষ্য হল 'ট্র্যাকটেটস' থেকে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ উত্তরণের ক্ষেত্রে ছিটগেনস্টাইন-এর দর্শন-চিন্তার যে রূপান্তর ঘটেছিল তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ।

উপরে লিখিত রূপান্তর প্রসঙ্গে দার্শনিক মহলে দুটি মত প্রচলিত আছে। একটি মত অনুযায়ী এই রূপান্তর হল ট্র্যাকটেটসীয় প্রথম যুগের দর্শন চিন্তার মূল কাঠামোটি বর্জন ক'রে তার জায়গায় 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ এমন এক নতুন দর্শন-কাঠামো (ফিলসফিকল ফ্রেমওয়ার্ক) নিয়ে আসা যা প্রথম যুগের কাঠামোর সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ (ইনকম্প্যাটিবল)। এখানে 'বর্জন' ও 'অসঙ্গতিপূর্ণ' কথা দুটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই মত মানলে ব'লতে হয় যে 'ট্র্যাকটেটস' থেকে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ উত্তরণের পথটি অমসৃন ও ধারাবাহিকতাহীন নূতনত্বে ভরা। 'ট্র্যাকটেটস'-এর মৌলিক কাঠামোর ধ্বংসাবশেষের উপরেই যেন দাঁড়িয়ে আছে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর দর্শন কাঠামো।

ভিন্ন আর একটি মত হল এই যে 'ট্র্যাকটেটস' থেকে 'ইনভেস্টিগেশনস' উত্তরণকে আরও ভালো ভাবে বোঝা যাবে তখনই যখন ছিটগেনস্টাইন-এর উত্তর কালীন দর্শন-চিন্তাকে তাঁর প্রথম যুগের ট্র্যাকটেটসীয় দর্শন চিন্তার ধারাবাহিক ক্রমপরিনতি হিসেবে দেখা হবে।

এই মতবাদ অনুযায়ী ট্র্যাকটেটসীয় দর্শন-চিন্তার সঙ্গে উত্তর কালীন 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর চিন্তা-শৈলীর সম্পর্ক যেন অনেকটা ফুলের সঙ্গে প্রাক্-পর্ণী শাখার। উদ্ভিদ বিজ্ঞান বলে যে ফুল হল আসলে রূপান্তরিত প্রাক্-পর্ণী শাখা (এ ফ্লাওয়ার ইজ এ মডিফাইড শুট)। যদিও সাধারণ ভাবে দেখলে শাখা এবং ফুলের মধ্যে সাদৃশ্য চোখে না পরারই কথা তবুও তলিয়ে দেখলে ফুল যে প্রাক্-পর্ণী শাখারই ক্রমপরিণতি তা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয় না। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর দর্শন চিন্তার রূপটি কী অর্থে ট্র্যাকটেটসীয় দর্শন কাঠামোর রূপান্তরিত কিন্তু ধারাবাহিক ক্রমপরিণতি তা স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরা।

এই কাজ ঠিকমত ক'রতে হ'লে প্রথমেই দরকার ট্র্যাক্টেটসীয় দর্শন-কাঠামোর মূল কথা-গুলি সংক্ষেপে বলে নেওয়া। 'ট্র্যাকটেটস'-এর মূল কথাগুলি এইরকম -

(১) ট্র্যাকটেটস'-এর প্রেক্ষাপটে দার্শনিক আলোচনার বিষয় প্রধানতঃ তিনটি - জগৎ, চিন্তন ও ভাষা। এ তিনের স্বরূপ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক নিরূপন 'ট্র্যাকটেটস'-এর প্রধান লক্ষ্য।

(২) সত্তার মৌলিকত্ব ও অন্যনিরপেক্ষতার নিরিখে সবচেয়ে প্রাথমিক হল জগৎ আর তাকেই অবলম্বন ক'রে পরস্পর অঙ্গাঙ্গী ভাবে গ'ড়ে উঠেছে 'ট্র্যাকটেটস'-এর ভাষা ও চিন্তন সংক্রান্ত তত্ত্ব। সেই কারণে 'ট্র্যাকটেটস'-এর বচন সংখ্যা ১ ও ২ যথাক্রমে জগৎ এবং জগৎ-উপাদানরূপ যে বিষয়-তন্মাত্র সেই সম্পর্কে। বচন সংখ্যা ৩ চিন্তন সম্পর্কিত। বচন ৪ চিন্তন ও বচনের সম্বন্ধের উপর, বচন ৪.০৫ বচন ও জগতের সম্পর্ক বিষয়ে আর বচন ৪.০০১-এর উদ্দেশ্য হল ভাষা কী তার একটা প্রাথমিক ইঙ্গিত দেওয়া। স্পষ্টতঃই নির্দ্দিষ্ট বচন-সংখ্যাগুলি সেই সেই বচনগুলি যে যে বিষয় সংক্রান্ত, ট্র্যাকটেটস'-এর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দার্শনিক গুরুত্বের সূচক। অর্থাৎ বচন ১ এবং তৎসংক্রান্ত অনুবচনগুলি, বচন ২ এবং তৎসংক্রান্ত অনুবচনগুলির চেয়ে বেশি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ, ইত্যাদি।

(৩) ভাষা ও চিন্তন নিরপেক্ষ ভাবে অস্তিত্বশীল একটি জগতের প্রাক্-স্বীকৃতি না থাকলে 'ট্র্যাকটেটস'-এ চিন্তন ও ভাষার ধারণা শূণ্যগর্ভ হয়ে পরে কেন না তারা উভয়েই এক বিশেষ অর্থে জগতকে 'চিত্রায়িত' করে। চিত্রনের বিষয়ের অস্তিত্ব ছাড়া চিত্রায়ন অর্থহীন হ'তে বাধ্য। সুতরাং জগৎ ও ভাষা উভয়েই জগৎ-নিরূপিত, কিন্তু চিন্তন বা ভাষার কোনোটিই জগৎ-স্বরূপের নিরূপক নয়। অর্থাৎ জগতের স্ব-রূপ সম্পূর্ণভাবে চিন্তন ও ভাষা নিরপেক্ষ।

(৪) অন্যদিকে চিন্তন ও ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় হ'লেও তত্ত্বগতভাবে (ইন প্রিন্সিপল) তারা স্বকীয় দুটি জিনিস। চিন্তন হ'লো বাস্তব স্থিতি (ফ্যাক্ট)-এর যৌক্তিক চিত্র (বচন ৩)। শুদ্ধ যৌক্তিক চিত্রের কোনো ইন্দ্রিয়গম্যতা নেই। আর

সেই কাবণে 'ট্র্যাকটেটস'-এ বচন হল তাই যাব মাধ্যমে চিন্তন (যা কিনা তত্ত্বগতভাবে ভাষা নিবপেক্ষ হতে পাবে) ইন্দ্রিযগ্রাহ্য রূপ পায (৩.১)। আমি মনে কবি যে হ্বিটগেনস্টাইন 'ট্র্যাকটেটস' পর্বে বিশ্বাস কবতেন যে তত্ত্বগত ভাবে ভাষা ছাড়াও চিন্তন সম্ভব।

(৫) জগৎ-স্বরূপ যদি চিন্তন ও ভাষা নিবপেক্ষ হয এবং চিন্তন যদি তত্ত্বগত ভাবেও ভাষা বা বচন নিবপেক্ষ হয, তাহলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে যে বাস্তবে আমবা জগৎ, চিন্তন ও ভাষাব মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখি তাব ব্যাখ্যা কী? এ প্রশ্নের উত্তব দিতে গিয়েই হ্বিটগেনস্টাইনকে তাঁব 'ট্র্যাকটেটস'-এ আবও কয়েকটি দার্শনিক তত্ত্বেব অবতাবনা কবতে হযেছে। সেগুলি হল যথাক্রমে এই রকম -

(৬) বাক্যার্থেব চিত্রকপতা তত্ত্ব (পিকচাব থিওবি অব মিনিঙ্গ) এবং তৎসম্পর্কিত প্রক্ষেপক সম্বন্ধ (প্রেজেকটিভ বিলেশন)-এব ধাবণা। বাক্যার্থ থেকে জগতেব বস্তুস্থিতি বোঝা যায কাবণ বাক্যার্থ হল বস্তুস্থিতিব 'চিত্র'। কিন্তু চিত্রেব সঙ্গে চিত্রিতেব সম্বন্ধটি কেমন? এটা কোনো সাদৃশ্য বা অনুষঙ্গ ভিত্তিক সম্বন্ধ নয এটি হল এক ধবণেব শুদ্ধ যৌক্তিক 'পিওবলি ফর্মালি' সমাকাবত্ব (আইসোমবফিসম) যাব একমাত্র শর্ত্ত হল অনন্য (ইউনিক) পবস্পব অনুবাদ যোগ্যতা (ইন্টাবট্র্যানস্লেটাবিলিটি) (২.১৫১৪, ২.১৫, ৩.৩৪৩, ৪.০১৪১)

এব অর্থ হল এই যে চিত্রকপতা তত্ত্বেব সাহায্যে ভাষা (চিত্র) এবং জগৎ (চিত্রিত) এ দুয়েব মধ্যে যে সম্পর্ক তুলে ধবা হযেছে তাতে ভাষাব সঙ্গে জগতেব সম্পর্ক নিছকই আকাবনিষ্ঠ (পিওবলি ফর্মাল) সমাকাবত্ব। ভাষা যেন জগতেব সঙ্গে আলগা ভাবে জুড়ে থাকা এক খোলস। এ দুযেব সম্পর্ক নিছক ন্যাযিক (পিওবলি লজিকল)। আমাদেব জীবনবোধেব ধবণ রূপ (ফর্ম অব লাইফ) সাধাবণ ভিত্তি থেকে তাবা উৎসাবিত হযনি। সুতবাং 'ট্র্যাকটেটস'-এ ভাষাব সঙ্গে জগতেব সম্বন্ধ এক ধবণেব ন্যাযিক সহসম্বন্ধতা (লজিকল কোবিলেশন) মাত্র, জীবনবোধেব ধবণ নিরূপিত একাঙ্গীভূত নিবিড়তাব (ইনটেগবাল ইন্টিমেসি) সম্বন্ধ নয।

(৭) কিন্তু বাক্য তো পদ-সমষ্টি মাত্র। কাজেই বাকাস্থিত পদগুলিব যদি কোনো বস্তু-দ্যোতকতা না থাকে তাহলে বাক্যার্থগুলিকেও বস্তুস্থিতিব সূচক চিত্র বলা যায না। সুতবাং বাক্যেব অপবিহার্য অবযব হিসেবে এমন সরলতম পদ স্বীকাব কবতে হবে যাবা কোনো বাক্যেব দ্বাবা চিত্রাযিত বস্তুস্থিতিব নিরংশ উপাদানগুলিব (যাকে 'ট্র্যাকটেটস'-এ বলা হয়েছে বিষয়-তন্মাত্র বা অবজেক্টস) অভ্রান্ত দ্যোতক হবে

'ট্র্যাকটেটস' এরকম সরলতম এবং অভ্রান্তদ্যোতক পদকে বলা হয়েছে নাম-পদ বা নেমস ৩.২০২ ; ৩.২০৩)।

(৮) যেহেতু বাক্য হল বিশেষ পদ-সমষ্টি, সুতরাং যে কোনো বাক্যকে বিশ্লেষণ করতে কবতে এমন একটা অবস্থা আসবে যখন বিশ্লেষিত অবয়বগুলি আব বিশ্লেষণ যোগ্য থাকবে না ৩.২ ; ৩.২০৩ অর্থাৎ বিশ্লেষণ-অযোগ্য সরলতম বাক্যীয় উপাদান বা নাম পদে পর্যবসিত হবে (৩.২৬)। আর এই নামপদগুলি যেহেতু কোনো না কোনো বিষয়-তন্মাত্রের অভ্রান্ত দ্যোতক সুতরাং বাক্যার্থেব সঙ্গে বস্তুস্থিতির চিত্রিয় রূপেব সাযুজ্য সুনিশ্চিত হবে যদি না এমন হয় যে একই বাক্যেব এমন একাধিক বিকল্প চূড়ান্ত বিশ্লেষণ সম্ভব যাব ফলে পাওয়া নাম-পদগুচ্ছগুলি (সেটস অব নেমস) পবস্পব ভিন্ন। কিন্তু এমন যে হবে না তা মনে কবাব যুক্তি কী? আর এমন হলে তো একই বাক্য একাধিক বস্তুস্থিতিব চিত্র বলে গণ্য হবে এবং তাব ফলে একই বচন বা বাক্য ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক হবে। সেক্ষেত্রে বাক্যের সঙ্গে চিত্রের এবং চিত্রের সঙ্গে বস্তুস্থিতির যে ঐকৈকিক সম্বন্ধ বা সমাকারত্ব (আইসোমরফিসম) আছে তা আর থাকবে না। এমন যাতে না ঘটে তাব জন্য হুইটগেনস্টাইন 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে তিনটি দার্শনিক প্রাকস্বীকৃতি মেনে নিয়েছেন। সেগুলি হল :

(ক) প্রত্যেক বচনের অর্থ হবে এক এবং সুনির্দ্দিষ্ট (৩.২৩)।

(খ) যে কোনো বচনেব একটিই মাত্র চূড়ান্ত বিশ্লেষণ (কমপ্লিট অ্যানালিসিস) সম্ভব (৩.২৫)।

(গ) চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সব বচনই কতকগুলি নামপদের সমূহ (৪.২২, ৪.০৩১১)।

(৯) ধবা যাক হুইটগেনস্টাইন-এর এ বক্তব্য ঠিক যে প্রকৃত বিশ্লেষণে বাক্য নাম-পদের সমূহ মাত্র এবং প্রতিটি বচনের একটিই মাত্র চূড়ান্ত বিশ্লেষণ সম্ভব এবং সর্বোপরি বাক্যস্থ নামপদগুলি বস্তুস্থিতির সবলতম উপাদান অর্থাৎ বিষয তন্মাত্রের অভ্রান্ত দ্যোতক। এ কথাগুলি মেনে নিলেই কি বলা যায় যে বচনেব জগৎ-মুখীনতা এবং অর্থ (সেন্স) বোধ নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকেনা? এর উত্তর নঞর্থক, কেন না বাক্যস্থ কোনো নাম-পদের দ্যোতনা (বেফারেন্ট) কী এবং তা নিরূপনেব নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিটি ঠিক কী তার উত্তব না পাওযা পর্যন্ত বচনের সঙ্গে জাগতিক বস্তুস্থিতির কোনো যোগসূত্র থাকবে না। হুইটগেনস্টাইন নিজে এ কথা বুঝেছিলেন এবং এই সমস্যাব সমাধানেব চেষ্টা করেছিলেন নামকবণের নির্দেশন তত্ত্ব বা (অস্টেনসিভ থিওবি অব নেমিং)-এর সাহায্যে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন্ নামপদ কিসের দ্যোতক অর্থাৎ কিসের নাম তা আমরা শিখি বা কাউকে শেখাই উদ্দিষ্ট নামধেযটিব দিকে নির্দেশ করে এবং সেই সঙ্গে তাকে যে নামটি দিতে চাই (বা

লোক ব্যবহারে তার যা নাম আছে) সেটিকে শিক্ষার্থীর কাছে উচ্চারণ করবে। যেমন কারও সামনে একটি বিশেষ জীবের দিকে আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ করে ব'ললাম 'গরু', ফলে ঐ ব্যক্তিটি বুঝতে পারল 'গরু' নামটি কী ধরণের জীবের নাম। নাম-করণের এই 'নির্দেশন তত্ত্ব' খুবই স্বাভাবিক এবং সমস্যাহীন মতবাদ ব'লে অনেক দার্শনিকই এক সময় মনে করতেন। 'ট্র্যাকটেটস'-এর আমলে ভিট্‌গেনস্টাইনও তার ব্যাতিক্রম ছিলেন না।

(১০) নামকরণের নির্দেশন তত্ত্ব যদি সম্পূর্ণ ভাবে সমস্যামুক্ত হতো তাহলেও কিন্তু 'ট্র্যাকটেটস'-এ ভাষার প্রকৃতি যে ভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা সব রকম বচনের অর্থবোধের ব্যাখ্যা দিতে পারতো না। তার কারণ হিসেবে বলা যায় যে বাক্যে ব্যবহৃত সব আপাতঃ নামপদই প্রকৃত নামপদ নয় অর্থাৎ তারা কোনো বাস্তব বিষয়ের নাম নয়। উপরন্তু বিশেষ ধরণের বাক্যে ব্যবহৃত ন্যায়িক ধ্রুবক (লজিকল কনস্ট্যান্ট) গুলিকে কিছুতেই নামপদ হিসেবে গণ্য করা যায় না (৪ ০৩১২)। এ সমস্যার সমাধানের জন্যে 'ট্র্যাকটেটস'-এ ভাষার (অর্থাৎ বচন সমষ্টির) দ্বিকোটিক বিভাজন করা হয়েছে স-অর্থক (সিনিগ) এবং নিরর্থক (আনসিনিগ) এই দুই শ্রেণীতে। নীতিবিদ্যার মূল্যায়ক বচনগুলিতে (ইভ্যালুয়েটিভ প্রপজিশনস) ব্যবহৃত বিশেষ্য পদগুলি যেহেতু প্রকৃত নামপদ নয় সেই হেতু ট্র্যাকটেটসীয় মত অনুযায়ী নীতিবিদ্যক বচনগুলি নিরর্থক বচন (৬ ৪২১)। স্পষ্টতঃই তারা কোনো বস্তুস্থিতিরই চিত্ররূপ (পিকচার) নয়, কাজেই তাদের সম্পর্কে সত্যতা বা মিথ্যাত্বের প্রশ্ন অবান্তর। অপর দিকে ন্যায়শাস্ত্রীয় বচনগুলি হয় যৌক্তিক ভাবে সত্য (লজিকলি ট্রু) কিংবা যৌক্তিকভাবে মিথ্যা (লজিকলি ফলস) কিন্তু তারাও কোনো বস্তুস্থিতিকে চিত্রায়িত করে না। অথচ সত্যমূল্য থাকার ফলে ন্যায়শাস্ত্রীয় বচনগুলিকে 'নিরর্থক' বলা যায় না। আবার কোনো বস্তুস্থিতির চিত্র না হওয়ায় এগুলি যে সাধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ বচনের মতোই স-অর্থক তাও বলা যায় না। তাই 'ট্রাক্‌টেটস'-এ ন্যায়শাস্ত্রীয় বচনগুলিকে স-অর্থক কিন্তু শূণ্যগর্ভ (সিনিলস) বলা হয়েছে। অর্থাৎ 'ট্র্যাকটেটস'-এ স-অর্থক বচনের (অর্থাৎ অর্থবাহী ভাষার) দ্বিস্তরীয় তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে যার একটা স্তরে আছে অভিজ্ঞতালব্ধ বচন যেগুলি স-অর্থক (সিনিগ) এবং অর্থপূর্ণ (সিনিলস) আর অন্য স্তরে আছে ন্যায়শাস্ত্রীয় বচন যেগুলি স-অর্থক কিন্তু শূণ্যগর্ভ (সিনিলস)। ভাষার ক্ষেত্রে ট্র্যাকটেটসীয় তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল অর্থবাহী (অর্থাৎ নিরর্থক নয় এমন) ভাষার দ্বিস্তরীয় বিন্যাস স্বীকার করা এবং ন্যায়শাস্ত্রীয় বচন ভিন্ন বস্তুস্থিতির চিত্রায়ণে অক্ষম অন্যান্য বচনগুলিকে স-অর্থক বচনের গন্ডীর বাইরে পড়ে থাকা নিরর্থক (আনসিনিগ) বচন হিসেবে চিহ্নিত করা।

(১১) ট্র্যাকটেটস'-এ যে কোনো স-অর্থক বচনের দ্বাবা বোধিত অর্থেব বাস্তবতাব মাপকাঠি হল ঐ বচনের বস্তুস্থিতি চিত্রায়ণের যোগ্যতা। আর ঐরূপ যোগ্যতাযুক্ত বচনের দ্বাবা বোধিত অর্থেব সম্ভাব্যতার মাপকাঠি হল ন্যাযশাস্ত্রীয় বিধির সঙ্গে অ-বিসম্বাদিতা। যা ন্যায়শাস্ত্রীয বিধিব সঙ্গে বিসম্বাদী (কন্ট্রাডিক্ট দা লজ অব লজিক) তা চিন্তনযোগ্যও নয় (৩.০৩) কিংবা ভাষাব মাধ্যমে উপস্থাপন যোগ্যও নয় (৩.০৩২)। কোনো বচনেব প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে হলে ঐ বচনের ভাষায় প্রকাশিত রূপ বা ব্যাকবণগত রূপ দেখাই যথেষ্ট নয়, বুঝতে হবে আমাদের ভাষাব অন্তর্নিহিত ন্যাযিক রূপটিকেও [৪.০০৩], কাবণ ভাষাব মাধ্যমে যেকোনো বস্তুস্থিতিব চিত্রাযণেব সম্ভাবনাই নিহিত আছে (বস্তুস্থিতিব) উপস্থাপনাব ন্যাযিক নিযমেব মধ্যে (দা পাসিবিলিটি অব অল ইমেজাবি ইজ কন্টেনেড ইন দা লজিক অব ডেপিক্‌শন) (৪.০১৫, তুলনীয - ৩.৩২৫) শুধু তাই নয় অবশ্যম্ভাব্যতা এবং সম্ভাব্যতার চূড়ান্ত ও অমোঘ (অ্যাবসোলিউট) সীমাবেখাও নিরূপিত হয ন্যাযশাস্ত্রীয বিধিগুলিব দ্বাবা (৫.৪৭৩)। অবশ্যম্ভাব্যতা বলতে শুধু ন্যাযিক অবশ্যম্ভাব্যতাই (লজিকল নেসেসিটি) বোঝায (৬.৩৭) যা সম্পূর্ণভাবে দেশ, কাল ও পটভূমি নিবপেক্ষ। একে সংক্ষেপে বলা যায ভাষা ও সম্ভাব্যতা-অবশ্যম্ভব্যতাব ধারণাব উপব ন্যাযশাস্ত্রেব চবম আধিপত্য।

এবাবে উপবে বর্ণিত ট্র্যাকটেটসীয বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনাব সুবিধেব জন্যে সংক্ষেপ কবা যাক। বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ -

(১) ট্র্যাকটেটস'-এব প্রধান আলোচ্য বিষয হল তিনটি - জগৎ, চিন্তন ও ভাষা। শুরু জগৎ নিয়ে, তাবপব ক্রমে চিন্তন ও ভাষার আলোচনা।

(২) সত্ত্বাব মৌলিকত্ব ও অন্যনিরপেক্ষতাব ক্রম অনুসাবে প্রথমে জগৎ, তাবপব চিন্তন ও শেষে ভাষাব প্রসঙ্গ এসেছে ট্র্যাকটেটস'-এ।

(৩) ট্র্যাকটেটস'-এ জগৎ হল চিন্তন ও ভাষার নিরূপক পূর্বশর্ত কিন্তু জগৎ আদৌ ভাষা বা চিন্তন নিরূপিত নয়।

(৪) তেমনিও আবাব তত্ত্বগত ভাবে চিন্তনও ভাষা-নিবপেক্ষ হতে পাবে, কিন্তু ভাষা কখনও চিন্তন-নিবপেক্ষ হতে পাবে না।

(৫) উপবে বর্ণিত ট্র্যাকটেটসীয অর্থে জগৎ, চিন্তন ও ভাষাব মধ্যে একটা একমুখী নিরপেক্ষতা আছে একথা মেনে নিলে, এ তিনেব মধ্যে অনুভবসিদ্ধ যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাব ব্যাখ্যা দেওযাটা 'ট্র্যাকটেটস'-এব একটি প্রধান দার্শনিক সমস্যা এবং আলোচ্য বিষয় হযে ওঠে। বাস্তবে ঘটেছেও ঠিক তাই।

(৬) জগৎ, চিন্তন, ও ভাষাব মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গীসম্বন্ধ আছে তাব ট্র্যাকটেটসীয ব্যাখ্যা

দাঁড়িয়ে আছে ভাষার চিত্ররূপতা তত্ত্ব স্বীকার করা এবং তার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে ভাষাকে একটি নিছক আকারনিষ্ঠ প্রকাশ-মাধ্যম হিসেবে দেখার উপরে। 'ট্র্যাকটেটস'-এর মতে ভাষার গঠন ন্যায়-নিরূপিত (শেপড বাই লজিকল কনস্ট্রেন্টস), এই গঠন আমাদের জীবন বোধের ধরণ (ফর্ম অব লাইফ) দ্বারা নিরূপিত নয়। চিন্তন সম্পর্কেও সেই একই কথা প্রযোজ্য।

(৭) ট্র্যাকটেটস'-এ, চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বচনমাত্রকেই নামপদের সমূহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রকৃত নামপদ যে কোনো না কোনো বিষয়তন্মাত্রের অভ্রান্ত দ্যোতক তা প্রাক্‌স্বীকৃতি হিসেবে মানা হয়েছে।

(৮) বচন (চিত্র) ও বস্তুস্থিতির (চিত্রিত) মধ্যে ঐকৈকিক সম্বন্ধ সুনিশ্চিত করার জন্য বচনের অর্থের সুনির্দিষ্ট একার্থতা মানা হয়েছে এবং যে কোনো বচনের যে কেবলমাত্র একটিই যথাযথ চূড়ান্ত বিশ্লেষণ সম্ভব তা ধরে নেওয়া হয়েছে।

(৯) নামপদের সঙ্গে বস্তুস্থিতির অবয়বগুলির যোগসূত্র স্থাপনের জন্যে ট্র্যাকটেটস'-এ নামকরণের নির্দেশন তত্ত্বকেই যথাযোগ্য পদ্ধতি বলে স্বীকার করা হয়েছে।

(১০) বচনের সত্যমূল্য (ট্রুথ ভ্যালু) থাকা বা না থাকার ভিত্তিতে তাদের স-অর্থক ও নিরর্থক শ্রেণীতে বিভাজন এবং তার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে স-অর্থক বচনের দ্বিস্তরীয় যে বর্গীকরণ (শূণ্যগর্ভ ও অর্থপূর্ণ এই দুই ভাগে) সেটি ট্র্যাকটেটস'-এর আর একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দার্শনিক সিদ্ধান্ত। এখানে লক্ষ্যনীয় যে 'শূণ্যগর্ভ' (সিন্‌লস) এবং 'নিরর্থক' (আনসিনিগ) এক কথা নয়, এবং 'স-অর্থক' (সিনিগ) 'অর্থপূর্ণ'-এর চেয়ে ব্যাপকতর।

(১১) ভাষা ও সম্ভাব্যতার প্রশ্নে ট্র্যাকটেটস'-এ সবচেয়ে বেশি আধিপত্য দেওয়া হয়েছে ন্যায়শাস্ত্রের উপর। চিন্তন-যোগ্যতার নিরূপক কী? ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ যোগ্যতার সীমা কোথায়? সম্ভাব্যতা বা অবশ্যম্ভব্যতার মাপকাঠি কী? ভাষার প্রকৃতি যথাযথভাবে বুঝতে হলে (অর্থাৎ ভাষা যেভাবে চিন্তনকে ছদ্মরূপ দেয় (ডিসগাইসেস থট) তার দ্বারা উৎপন্ন বিভ্রান্তি দূর করতে হলে) ভাষার কোন্ দিকটির উপর বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে? এই সবকটি প্রশ্নের উত্তরের কেন্দ্রবিন্দুই হল ট্র্যাকটেটসীয় ন্যায়শাস্ত্রের ধারণা।

আমরা দেখেছি যে ট্র্যাকটেটস'-এ বচন হল জগতের বস্তুস্থিতির চিত্র আর বস্তুস্থিতি (যার সমগ্রতাই হল জগৎ) যেন চিত্রিত বিষয়। কিন্তু চিত্র আর চিত্রিত, বচন ও জগৎ তো এক নয়। তাহলে ভাষার সঙ্গে জগতের অর্থাৎ বচনের সঙ্গে বস্তুস্থিতির মধ্যে সেতুবন্ধ হয় কীভাবে? 'ট্র্যাকটেটস'-এ সমাধান করা হয়েছে চিত্রায়ণ সম্বন্ধের (পিকচারিং রিলেশন) ধারণা এনে। এই চিত্রায়ণের সম্বন্ধ হল একটি ন্যায়িক সম্বন্ধ (লজিকল রিলেশন) যা বস্তুস্থিতির সরলতম অংশগুলিকে বচনের সরলতম অংশ বা নামপদের সঙ্গে ঐকৈকিক সম্বন্ধে (ওয়ান ওয়ান

রিলেশন) যুক্ত কবে। ফলতঃ একটি বচনেব অনুসঙ্গী (কবেসপণ্ডিং) বস্তুস্থিতি একটিই হয় এবং ঐ বস্তুস্থিতিব অনুসঙ্গী বচনও একটিই হতে পারে (যদিও ঐ বচনেব সমার্থক বাক্য একাধিক হতে পারে)। একথা মানলে যে কোনো বচনেব একটিই সুনির্দ্দিষ্ট অর্থ আছে এবং সত্যমূল্য আছে একথাও মানতে হয়। আবাব ভাষা যদি বচন সমগ্র মাত্র হয এবং ন্যায়শাস্ত্রীয় বচনভিন্ন অন্যান্য অর্থপূর্ণ বচন মাত্রেই যদি বস্তুস্থিতির চিত্র হয় (অর্থাৎ সত্য বা মিথ্যা হয়) তাহলে নিছক সত্যমূল্যের নিরিখে নির্ধারিত বচনগুলি হবে প্রেক্ষাপট নিরপেক্ষ (কনটেক্সট ইন্ডিপেন্‌ডেন্ট) অর্থ প্রকাশক। উপরন্তু কোন্ বচন কি অর্থ বোঝায় তা নিরূপিত হবে বচন ও বস্তুস্থিতির মধ্যে যে ন্যায়িক সমাকারত্ব (লজিকল আইসোমরফিসম) আছে তার দ্বারা এর মধ্যে বক্তার ইচ্ছা, বচনের প্রেক্ষাপট, বিকল্প ব্যাখ্যা (অল্টারনেটিভ ইন্টাবপ্রিটেশন) ইত্যাদির কোনো স্থান নেই। এগুলির পেছেনে ট্র্যাকটেটস'-এব অংশগত প্রচ্ছন্ন প্রাকস্বীকৃতি হল এই যে বচনের সরলতম অংশ নামপদগুলির সঙ্গে তাদের নিজ নিজ পদার্থের সম্পর্ক স্থাপিত হয নির্দেশনের (অসটেনশন) মাধ্যমে।

'ফিলজফিক্যল ইনভেস্টিগেশনস'-গ্রন্থে চিত্ররূপতা তত্ত্ব, বচনেব সুনির্দ্দিষ্ট একার্থতাবাদ, ট্র্যাকটেটসীয় অর্থে সত্যমূল্যহীন বচনমাত্রকে নিবর্থক বলা, বাচনিক অর্থেব প্রেক্ষাপট নিবপেক্ষতা, সরলতম ন্যায়িক অবয়বেব স্বীকৃতি, নামকরণেব নিদর্শন তত্ত্ব এব সবগুলিই পরিত্যক্ত হয়েছে। আমবা আরও দেখেছি যে ট্র্যাকটেটস'-এ ন্যাযশাস্ত্রকে চবম আধিপত্য বা গুরুত্ব দেওয়া হযেছে। যেমন যে কোনো বস্তুস্থিতিব চিত্র হবার পূর্বশর্ত হল ন্যাযিক চিত্র (লজিকল পিকচার) হবাব যোগ্যতা। যা ন্যায়িক সত্যেব বিরোধী তা ভাষায় প্রকাশ কবা বা চিন্তা কার যায় না। নিছক তাত্ত্বিক বিচাবেও কী সম্ভব এবং কী অসম্ভব তাও ঠিক হয় ন্যায়শাস্ত্রের দ্বারা। অসম্ভাব্যতা বা অবশ্যম্ভাব্যতাব চূড়ান্ত ও স্পষ্ট (অ্যাবসোলিউট অ্যান্ড শার্প) সীমাবেখা-ও টেনে দেয় ন্যায়শাস্ত্র - স্বয়ং ঈশ্ববও তা লঙ্ঘন কবতে পারেন না। ভাষা অনেক সময়েই চিন্তাকে বিভ্রান্ত কবে। এই বিভ্রান্তি দূব করতে হলে প্রয়োজন বচনে ব্যবহৃত অবয়বগুলিব ন্যায়িক-ব্যাকবণিক (লজিকো সিন্‌ট্যাক্‌টিকল) বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া এভাবে এক শুদ্ধ. ন্যায়িক সমাকারত্বের (লজিকল আইসোমরফিসম) দৃষ্টি থেকে দেখলে ভাষা হয়ে পড়ে একটা প্রাণহীন, অনমনীয়, বাস্তবের সঙ্গে শিথিলভাবে সম্বদ্ধ একটা ন্যায়িক আকাবনিষ্ঠ কাঠামো (ফর্মাল লজিকাল স্ক্যাফোলডিং) মাত্র। ভাষার সঙ্গে চিন্তনেব এবং এ দুয়ের সঙ্গে জগতের যে যোগ তার মূল আমাদেব জীবনবোধের ধরণের (ফর্ম অব লাইফ) সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে না।

অপরদিকে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধারণার মধ্যে একটি হল ঐ জীবন বোধ ধরণের ধারণা - যেটি ট্র্যাকটেটস'-এর শুদ্ধ ন্যায়িক আকারনিষ্ঠ আঙ্গিকে অনুপস্থিত। অন্যদিকে ন্যায়িক সত্যেব অলঙ্ঘনীয়তা, স-অর্থক ও নিরর্থক বচনের মধ্যে স্পষ্ট ও চূড়ান্ত বিভাগের সম্ভাবনা, ভাষাজনিত বিভ্রান্তি দূর করার জন্যে ন্যায়িক-ব্যাকরণিক ব্যবহাবের উপবই

সমস্তগুরুত্ব দেওয়া এ সব কটি ট্র্যাকটেটসীয় প্রবণতাই 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ পরিত্যাগ করা হয়েছে।

সব শেষে আর একটা কথা এখানে উল্লেখ্য। ভাষা সম্পর্কে 'ট্র্যাকটেটস'-এর একদেশী (ওয়ান সাইডেড) ন্যায়িক আকারগত (লজিকল ফরমাল) মতবাদ পরিত্যক্ত হবার ফলে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ গুরুত্ব সরে এসেছে ভাষার শব্দার্থিক-প্রায়োগিক (সিম্যান্টিক প্র্যাগম্যাটিক) দিকের উপর। ফলে ভাষাজনিত বিভ্রান্তি দূরের জন্যে ট্র্যাকটেটসীয় ব্যবস্থাপত্রে যেখানে ন্যায়সম্মত আদর্শ ভাষা (লজিকলই পারফেক্ট আইডিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ) গড়ে তোলার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে (বচন ৩.৩২৫) সেখানে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ আনা হয়েছে ভাষা-ক্রীড়ার (ল্যাঙগুয়েজ গেম) ধারণা। এর ফলে বাচনিক অর্থ হয়ে ওঠেছে প্রেক্ষাপট সাপেক্ষ এবং ভাষা-ক্রীড়ার রীতি সাপেক্ষ বিকল্প ব্যাখ্যা সহিষ্ণু (অ্যামেনেবল টু অলটারনেটিভ ইন্টারপ্রিশন রিলেটিভ এ ল্যাঙগুয়েজ-গেম এ ল্যাঙগুয়েজ-গেম) ফলে বচনের সঙ্গে অর্থের যে একটা অপরিবর্ত্তী অন্বয় সূত্র আছে 'ট্র্যাকটেটস'-এর এই মতবাদও 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ পরিত্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু এতক্ষণ যা বলা হল তা ঠিক হলে তো আপাতদৃষ্টিতে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর দার্শনিক তত্ত্ব এবং ট্র্যাকটেটসীয় তত্ত্বের মধ্যে একটা সর্বাঙ্গীন অমিল এমনকি বৈপরিত্যই আছে বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের যে দাবি অর্থাৎ 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর তত্ত্ব মূলতঃ ট্র্যাকটেটসীয় মতবাদেরই ধারাবাহিক পরিস্ফুটন - তার থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বৌদ্ধিক লাফ (ইন্টালেকচুয়াল লিপ) এর ফল নয় - একথা সমর্থন করা যাবে কী ভাবে? এ প্রবন্ধের অবশিষ্ট অংশে সেটাই আমাদের আলোচ্য।

প্রথমে লক্ষণীয় যে 'ট্র্যাকটেটস' এবং 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর মূল আলোচ্য বিষয় অভিন্ন - জগৎ, চিন্তা ও ভাষা এবং এই তিনের মধ্যে সম্বন্ধ। যদিও দুটি গ্রন্থে এদের আলোচনার ক্রম গুলি ভিন্ন। এর কারণ পরে আলোচনা করব।

এখন শুরু করা যাক বচনের চিত্ররূপতা তত্ত্ব থেকে। যদিও এই তত্ত্ব ও তার অনুষঙ্গ 'ট্র্যাকটেটস'-এ প্রাধান্য পেয়েছে, তা সত্ত্বেও সেখানে একাধিক বচনে বাক্য-ব্যবহার (ইউস) এর উপর স্পষ্ট করে জোর দেওয়া হয়েছে (৩.৩২৬ , ৩.৩২৮)। কোন শব্দের অর্থ কী তা বুঝতে হবে ঐ শব্দ বা পদটির কোনো বিশেষ বচনের অবযব হিসেবে ব্যবহার দেখে। অর্থাৎ যে কোনো পদের ক্ষেত্রেই বাচনিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহার দেখা সেই পদের অর্থবোধের জন্য আবশ্যিক (৩.৩)। এই মতটিকে যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে মেনে নিলে এটাও মানতে হয় যে বচনের নিরংশ অবয়ব যে নামপদ তার অর্থও বাচনিক ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে। কিন্তু যদি নামকরণের নির্দেশন তত্ত্ব নির্ভুল হয় তা হলে নামপদের অর্থ বোধের জন্যে বাচনিক ব্যবহার দেখা অনাবশ্যক হয়ে পড়ে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে 'ট্র্যাকটেটস'-এ অনুচ্চার দুই প্রাক্স্বীকৃতি যথা পদের বাচনিক ব্যবহার তত্ত্ব এবং নামকরণের নির্দেশন তত্ত্ব (অসটেনসিভ থিওরি অব নেমিং); এদুয়ের মধ্যে একটা বিরোধ আছে। 'ইনভেস্টিগেশনস'-

এ ভাষা-ক্রীডা কেন্দ্রিক মতবাদ, তা বাচনিক ব্যবহার তত্ত্বেবই সুষ্ঠু ও সম্বাদী রূপ। কিন্তু যদি নির্দেশন তত্ত্ব ও ব্যবহাব তত্ত্বের বিবোধ মুক্তিই 'ইনভেস্টিগেশনস'-এব লক্ষ্য হয় তা হলে তো নির্দেশন তত্ত্বকে বজায় রেখে এবং ব্যবহার তত্ত্বকে বর্জন করেও ট্র্যাকটেটস'-এর সঙ্গে সম্বাদী এক দার্শনিক মতবাদ গডে তোলা যায়। হ্বিটগেনস্টাইন তা করেননি কেন? - এর উত্তরও স্পষ্ট। নামকবণের নিদের্শন তত্ত্ব যদি নির্ভুল ও গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে পদের অর্থ (সেই সঙ্গে বচনের অর্থ) ট্র্যাকটেটসীয় ধারাতেই দেওয়া যেতো। কিন্তু 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন একাধিক যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে নামকরণের নির্দেশন তত্ত্ব কিছুতেই ভাষা-ব্যবহার নিবপেক্ষ ভাবে পদ ও পদার্থেব মধ্যে বিকল্প সম্ভাবনা রহিত সুনির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ স্থাপন কবতে পারে না। এছাডাও আব অনেক আপত্তি তিনি দেখিয়েছেন (§§ ২৬, ২৮, ৩০, ৩২, ৪৯, দ্রষ্টব্য)।

আবার যেহেতু নামকবণের নির্দেশন তত্ত্বের সঙ্গে ট্র্যাকটেটসীয় সবলতম উপাদানের ধারণা ওতপ্রোতভাবে জডিত সুতবাং সবলতম উপাদানের ধারণাও যদি আপেক্ষিক হয় তাহলে কোনো পবম অর্থে (ইন অ্যান অ্যাবসোলিউট সেন্স) সবলতম উপাদান বা অবয়ব বলে কিছু আছে ট্র্যাকটেটস'-এব এই মতটিকেও বর্জন কবতে হয়। উপরন্তু ট্র্যাকটেটস'-এব নির্দেশন তত্ত্ব এবং অবিসম্বাদী কোনো এক অর্থে সবলতম অবয়বেব অস্তিত্ব আছে এই ধারণা, এদুটিই আনা হয়েছিলো চিত্ররূপতা তত্ত্বের সহায়ক তত্ত্ব হিসেবে। কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক এক কারণে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মনে চিত্রকপতা তত্ত্বের ব্যাপারে সন্দেহ উঠেছিলো। তিনি তাঁব 'সাম্ বিমার্কস অন্ লজিকল ফর্ম' প্রবন্ধে কনটিনিউয়াস ম্যাগনিটিউড প্রসঙ্গে এই আশঙ্কাব কথা উল্লেখ কবেছেন। সুতবাং দেখা যাচ্ছে যে যে চিত্রকপতা তত্ত্বকে বাঁচানোব জন্যে এত সব কান্ড সেই তত্ত্বেব যাথার্থ্যই সন্দেহজনক, সুতরাং তাব সমর্থক যে দুটি তত্ত্ব - সরলতম অবয়বের তত্ত্ব এবং নামপদের নির্দেশন তত্ত্ব - তারাও গ্রহণযোগ্য নয়। উপরন্তু নির্দেশন তত্ত্ব এবং ব্যবহাব তত্ত্বেব মধ্যে যে বিরোধী প্রবণতা তা নিরাস করা যায় চিত্ররূপতাবাদকে বর্জন করে ট্র্যাকটেটস'-এবই প্রায় অনুচ্চাবিত ব্যবহার তত্ত্বকে যথাযথভাবে রূপান্তরিত কবে ভাষা-ক্রীডা-প্রযোগ কেন্দ্রিক বাক্যার্থ তত্ত্ব মানলে। 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন সেই কাজটিই সম্পূর্ণ কবেছেন।

অন্যভাবে বলা যায় যে পদেব অর্থ নিরূপণের ক্ষেত্রে বাচনিক ব্যবহার বা প্রয়োগের ধাবণাব উপর মৌলিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ এবং তারপব পদের ব্যবহারেব প্রেক্ষাপটকে বচন থেকে প্রসাবিত কবে এক একটি সুনির্দিষ্ট ভাষা-ক্রীডাব প্রেক্ষাপটে রূপান্তবিত কবা হযেছে। ফলে যা ছিল ট্র্যাকটেটস'-এ বাচনিক ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষি তাই-ই 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ রূপান্তবিত হয়েছে এক ব্যাপকতর ভাষা-ক্রীড়ার প্রেক্ষাপটে) ল্যাঙগুয়েজ গেম কনটেক্সট।

এবাব ট্র্যাকটেটস'-এব ন্যায়শাস্ত্র (লজিক) ও ন্যায়িক রূপের (লজিকল ফর্ম) গুরুত্ব ও প্রাধান্যের প্রশ্নে আসা যাক। যদি যে কোনো বচনের অর্থই পরিপ্রেক্ষি নির্ভর হয় তাহলে

স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে ন্যায়িক বচনগুলির অর্থও কি পরিপ্রেক্ষি নির্ভর? এর উত্তর যদি সদর্থক হয় তাহলে ন্যায়িক বচনগুলি আর অবিসম্বাদী সত্য এবং শূন্যগর্ভ থাকে না। এ মত স্পষ্টতঃই 'ট্র্যাকটেটস'-এর সাধারণ প্রবণতার বিরোধী। অপর দিকে ঐ প্রশ্নের উত্তর যদি নঞর্থক হয় তাহলে বাক্যার্থের ব্যবহার-প্রেক্ষাপট কেন্দ্রিক তত্ত্বটিকেও আর সার্বিক এবং ব্যাতিক্রম বিহীন দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে গণ্য করা যায় না। কার্যতঃ 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর বক্তব্যের প্রবনতা এই দিকেই। এই প্রবণতার মূলও আমরা খুঁজে পাই 'ট্র্যাকটেটস'-এর কিছু কিছু জায়গায়, যেমন যেখানে গণিতের সমস্যা সমাধানের জন্য স্বজ্ঞার (ইনটুযিশন) প্রয়োজন আছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে [বচন ৬.২৩৩ ; ৬ ২৩৪ দ্রষ্টব্য] বলা হচ্ছে যে আমাদের ভাষাই এই প্রয়োজনীয় স্বজ্ঞার উৎস। এছাড়াও 'ট্র্যাকটেটস' মতে গণিত নিজেই হল একটি ন্যায়িক পদ্ধতি (বচন - ৬.২)। 'ট্র্যাকটেটস'-এ ন্যায়িক বচনের সত্যতা নির্ভর করে ঐ বচনে ব্যবহৃত ন্যায়িক ধ্রুবকগুলির (লজিকল কনস্ট্যানটস) উপরে অপর দিকে ইনভেস্টিগেশনস-এ ন্যায়িক সত্যগুলির অলঙ্ঘ্যতার কারণ হল 'অভেদ' (আইডেন্টি) 'ভেদ', (ডিফারেন্স), 'ঐক্যমত্য' (অ্যাকর্ড), 'অভিন্ন স্থিতিবত্তা' (রিমেনিং দা সেম) ইত্যাদি, মৌলিক ধারণাগুলি সম্পর্কে আমাদের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে সূচিত ঐক্যমত্য - আর 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ এই ঐক্যমত্য ব্যক্তিগত মতৈক্য নয়, এটা হল আমাদের জীবন বোধের ধরণের অন্তর্নিহিত ঐক্য (দ্যাট ইজ নট অ্যান এগ্রিমেন্ট ইন ওপিনিযনস বাট ইন ফর্মস অব লাইফ, 'পি আই' ২৪১)। ভাষা নিজেই হল জীবনবোধের একটা ধরণ (ল্যাঙগুয়েজ ইজ এ ফর্ম অব লাইফ) এবং যা আমাদের প্রশ্নাতীতভাবে স্বীকার না করে উপায় নেই তা হল এই জীবনবোধের ধরণ (হোয়াট হ্যাজ টু বি এক্সেপটেড ইজ এ ফর্ম লাইফ পি আই-২২৬ পৃঃ)।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যেখানে 'ট্র্যাকটেটস'-এ ন্যায়িক নীতির অলঙ্ঘ্যতার নিছক আকারনিষ্ঠ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ ন্যায়িক বচনগুলিকেও ভাষার পরিপ্রেক্ষি এবং জীবনবোধ নির্ভর করে তোলার পর্য্যায়টি কোনো আকস্মিক বা বিচ্ছিন্ন বৌদ্ধিক লাফ নয়। ট্র্যাকটেটসীয় বীজ [৬ ২৩৩] থেকে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ উত্তরণের ধারাবাহিকতাও এখানে খুব স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান।

ন্যায়িক ও গাণিতিক বচনগুলিকেও এভাবে ভাষা-ক্রীড়া ও জীবন বোধের ধরণ দ্বারা পরিপ্রেক্ষিত (কনটেযচুয়্যালাইজ) এবং আপেক্ষিক বলে মানলে ন্যায়িক সত্যতার অভ্রান্ততা ও পরম পরিপ্রেক্ষি নিরপেক্ষতাও আর মানা যায় না। তার ফলে ন্যায়িক সিদ্ধান্ত (লজিকল কনসিকোয়েন্স), ন্যায়িক অবশ্যম্ভব্যতা (লজিকল নেসেসিটি) এমন কী স্ববিরোধ নিষেধের নীতিকেও (ল অব নন কন্ট্রাডিকশন) আর অবশ্যস্বীকার্য বা ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা রহিত এবং সম্পূর্ণভাবে ভাষা ও জীবন নিরপেক্ষ বলে মানা যায় না। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে 'ট্র্যাকটেটস' বিরোধী হলেও 'ইনভেস্টিগেশসনস' মতের বিরোধী নয় এবং স্ববিরোধ নিষেধের নীতির বৈধতাকেও যে চ্যালেঞ্জ করা যায় তা হ্বিটগেনস্টাইন পরিষ্কার করে বলেছেন তাঁর 'রিমার্কস অন দি ফাউন্ডেশন্স অব ম্যাথামেটিক্স' গ্রন্থে। এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনার জন্য লেখকের

'নলেজ, ট্রুথ-এণ্ড জাস্টিফিকেশন' এর অধ্যায় ১৬ দ্রষ্টব্য। ঐ 'রিমার্কস' গ্রন্থে আরও বলা হয়েছে যে গণিত হলো শেষতঃ একটি নৃতাত্ত্বিক ঘটনা (ম্যাথাম্যাটিকস ইজ আফটার অল অ্যান অ্যানথ্রোপোমরফিক ফেনোমেনন - আর এফ এম v. ২৬) ট্র্যাকটেটস'-এ যখন ন্যায়-শাস্ত্র গণিতকে জগৎ-নিরপেক্ষ কিন্তু অভ্রান্ত ও শূন্যগর্ভ সত্যের আকর বলে দেখানো হচ্ছে তখন তারই পাশাপাশি আরেকটি বিরুদ্ধ বিকল্পের ধারণার বীজও ট্র্যাকটেটস'-এ পাওয়া যাচ্ছে বচন ৪.০০২ এ - যেখানে বলা হয়েছে যে 'আমাদের দৈনন্দিন ভাষা আমাদের জৈব সত্ত্বারই অঙ্গ এবং তার তুলনায় একটুও কম জটিল নয়'। 'ইনভেস্টিগেশনস' এবং 'রিমার্কস' এর যে মতবাদ তাকে সহজেই ট্র্যাকটেটস'-এর বাক্যার্থ সম্পর্কিত বাচনিক ব্যবহার তত্ত্ব এবং বচন ৪ ০০২ এর বক্তব্যকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করার ন্যায়িক ফলশ্রুতি (লজিকল কনসিকোয়েন্স) হিসেবে গণ্য করা যায়।

একটু আগেই আমরা দেখিয়েছি যে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর ভাষা-ক্রীড়া-কেন্দ্রিক তত্ত্বটিকে ট্র্যাকটেটস'-এর বাচনিক ব্যবহার তত্ত্বেরই পরিস্ফুট রূপ হিসেবে দেখা যায়। ট্র্যাকটেটস' এর বাচনিক পরিপ্রেক্ষির ধারণা রূপান্তরিত হয়েছে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর ব্যাপকতর ও জীবনমুখী ভাষা-ক্রীড়া-পরিপ্রেক্ষিতে। যেহেতু 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ একাধিক সম্ভাব্য ভাষা-ক্রীড়ার কথা বলা হয়েছে এবং গণিত ও ন্যায়শাস্ত্রকেও ভাষা-ক্রীড়া এবং জীবনবোধের ধরণের দ্বারা পরিপ্রেক্ষিত (কনটেক্সচুয়ালাইজড) করা হয়েছে সুতরাং সেখানে কূটস্থতার (অ্যাবসল্যুটনেস) ধারণাও বর্জিত হয়েছে আবশ্যিকভাবেই। ফলতঃ অসম্ভাব্যতা, অবশ্যম্ভাব্যতার চূড়ান্ত মাপকাঠি হিসেবে ন্যায়শাস্ত্র তার গুরুত্ব হারিয়েছে এবং ন্যায়িক অবশ্যম্ভব্যতা ও অসম্ভাব্যতাই যে সম্ভাব্যতার একমাত্র অর্থ তা মনে করার যুক্তিও লোপ পেয়েছে। কাজেই এদিক থেকে দেখলেও 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর দার্শনিক সিদ্ধান্তগুলিকে অস্ফুটরূপে ট্র্যাকটেটস'-এ বিদ্যমান ধারণা-বীজগুলির ন্যায়িক পরিস্ফুটন (লজিকল আনফোলডমেন্ট) বলে গণ্য করা যায়। এখানে আরও একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা দেখেছি যে ট্র্যাকটেটস'-এর বাচনিক ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষি রূপান্তরিত হয়েছে ভাষা-ক্রীড়ার পরিপ্রেক্ষিতে। তাহলে ট্র্যাকটেটস'-এ ন্যায়-শাস্ত্রের যে কূটস্থতার কথা মানা হয়েছে তার অনুরূপ কূটস্থতার কোনো রূপান্তর কি 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ দেখা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর সদর্থক। ট্র্যাকটেটস'-এ প্রশ্নাতীত কূটস্থতার আকর হল ন্যায়শাস্ত্র। 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ ঐরকম প্রশ্নাতীত কূটস্থতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আমাদের জীবনবোধের ধরণের ধারণাকে। 'যাকে মেনে নিতেই হবে, যা আমাদের কাছে বিকল্পবিহীন ভাবে প্রদত্ত, তা হল আমাদের জীবনবোধের ধরণ' ('পি. আই.' পৃঃ ২২৬) [তুলনীয়: হোয়েন দা বকবটম ইজ রিচড দা স্পেড ইজ টারনড ব্যাক] এখানেও ট্র্যাকটেটস্'-এর ধারণা-বীজগুলি থেকে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর দার্শনিক তত্ত্বগুলির ক্রমপরিস্ফুটনের ধারাবাহিকতা না চোখে পড়ে উপায় নেই।

ন্যায়শাস্ত্রের কূটস্থতা অস্বীকার করলে এবং সেই সঙ্গে ন্যায়িক বচনগুলির অর্থও ভাষা-ক্রীড়ার পরিপ্রেক্ষি নিরূপিত একথা বললে, এবং তদুপরি ভাষা-ক্রীড়ার বিভিন্নতা স্বীকার

কবলে সত্যমূল্যহীন বচন মাত্রই নিবর্থক (আনসিনিগ) একথা যে ব্যতিক্রমহীন ভাবে সত্য তা আব বলা যায় না। এক ভাষা-ক্রীড়া-পবিপ্রেক্ষিতে যা অর্থহীন অন্য ভাষা-ক্রীড়া-পবিপ্রেক্ষিতে তাই-ই অর্থপূর্ণ হতে পারে সুতবাং স-অর্থক ও নিবর্থক বচনেব গণ্ডীও আপেক্ষিক ও অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। তাব ফলে নীতিশাস্ত্র বা নন্দনতত্ত্বেব বচনগুলিকে আব স্বরূপতঃই নিবর্থক একথাও বলা সঙ্গত হয না।

আবও দুটি বিষযেও 'ট্র্যাকটেটস' এবং 'ইনভেস্টিগেশনস'-এব ধাবাবাহিকতা লক্ষ্যনীয। বচন ৩.৩২১; ৩.৩২৬, বিশেষতঃ ৩.৩২২-ব দিকে নজব দিলে তাব মধ্যে 'ইনভেস্টিগেশনস' -এব পাবিবাবিক সাদৃশ্য (ফ্যামিলি বিসেমব্লান্স) তত্ত্বেব সম্ভাবনা সহজেই চোখে পড়ে। যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই পদেব ব্যবহাব ঐ সব ক্ষেত্রেব মধ্যে কোনো সামান্য ধর্ম বা জাতি স্বীকাবেব ভিত্তি না হয তাহলে বিভিন্ন বঙ ও আকাবেব বস্তুকে আমবা যখন 'টেবিল' বলি তখন তাদের সাধাবণ ধর্ম হিসেবে 'টেবিলত্ব' জাতি মানাবও কোনো যুক্তি থাকে না, যেমন 'টাইম টেবিল' এবং 'ডাইনিং টেবিল'। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে যে যাদেব আমবা সাধাবণভাবে টেবিল বলি তাদেব মধ্যে সাধর্মেব ভিত্তি কী? 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ এব উত্তব হল - পাবিবাবিক সাদৃশ্য।) ('পি আই' ৬৫, ৬৬) এক্ষেত্রে বচন ৩.৩২২ এবং 'পি আই' ৬৫ এব সাদৃশ্য খুবই প্রকট।

অপব বিষয, যেখানে 'ট্র্যাকটেটস'-এ এবং 'ইনভেস্টিগেশনস' এ মূলতঃ একই কথা প্রায একই ভাষায বলা হয়েছে তা হল দর্শন শাস্ত্রেব উৎপত্তিব মূল হিসেবে ভাষা জনিত বিভ্রান্তিকে চিহ্নিত কবা। দার্শনিক সমস্যাব সমাধান মানে ঐ বিভ্রান্তি মুক্ত হবাব পথ দেখানো। 'ট্র্যাকটেটস'-এব উপায় হিসেবে যে ব্যবস্থাপত্রেব ইঙ্গিত দেওয়া হযেছে তা হল ন্যাযিক ভাবে নির্দোষ একটা আদর্শ ভাষা (লজিকলি পাবফেক্ট আইডিয়াল ল্যাঙগুয়েজ) গঠন করে দার্শনিক প্রশ্ন আলোচনাব মাধ্যম হিসেবে তাব সাহায্য নেওয়া (৩.৩২৫ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এই ব্যবস্থাপত্র ফলপ্রসূ হতে পাবে কেবলমাত্র যদি ন্যাযশাস্ত্রেব কূটস্থ অভ্রান্ততা প্রাকস্বীকৃতি হিসেবে মেনে নেওযা হয। কিন্তু এই কূটস্থতাব ধাবণা 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ পবিত্যক্ত হয়েছে, সুতবাং সেখানে দার্শনিক বিভ্রান্তি প্রতিবোধেব ব্যবস্থাপত্র ভিন্ন। আদর্শ ভাষা গঠন ও ব্যবহাব নয়, বিষযস্তবীয় (অবজেক্ট লেভেল) বচনকে বিষযোত্তব স্তবেব (মেটালেভেল) বচনেব সঙ্গে গুলিযে না ফেলাই ঐ বিভ্রান্তি দূব কবা বা বোধ কবাব উপায। কোনো তুলাদণ্ড দিযেই যেমন তাব নিজেব ওজন মাপা সম্ভব নয, তেমনিই কোনো ভাষা সম্পর্কে কিছু বলতে হলে ঐ ভাষাকে তাব নিজস্ব বিষযোত্তব স্তবীয় ভাষা (মেটা লেভেল ল্যাঙগুয়েজ) হিসেবে ব্যবহাব কবা সম্ভব নয। সুতবাং এবকম চেষ্টা থেকে বিবত থাকা অবশ্য কর্তব্য। তা না হলেই দেখা দেয ভাষা-জনিত দার্শনিক বিভ্রান্তি। একটু লক্ষ্য কবলেই বোঝা যাবে যে 'ট্র্যাকটেটস' এবং 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ দুটি গ্রন্থে অপটু ভাষা-ব্যবহাবই হল দার্শনিক বিভ্রান্তি সমস্যাব উৎস বা এই বিভ্রান্তিব প্রতিষেধক হিসেবে ট্র্যাকটেটসীয ব্যবস্থাপত্র হল যা প্রদর্শনযোগ্য (শোয়েবল) তাকে বচনযোগ্যেব (সেযেবল) সাথে গুলিয়ে না ফেলা। অন্যদিকে

ঐ বিভ্রান্তিব প্রতিষেধক হিসেবে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এব ব্যবস্থাপত্র হল বিষযস্তবীয় ভাষাকে (অবজেকট ল্যাঙগুয়েজ) বিষযোত্তব স্তরীয ভাষাব (মেটা-ল্যাঙগুযেজ) সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলা 'ট্র্যাকটেটস'-এ যেমন কোনো চিত্রই নিজেকে চিহ্নিত করতে পাবে না, তেমনই 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ ভাষা-ক্রীডাগুলি প্রত্যেকে এক একটি প্রকাশ-মাধ্যম হওযা সত্ত্বেও তাদেব কোনোটিই কিন্তু স্ব-প্রকাশক মাধ্যম হতে পাবে না ('পি আই.'-৫০)। প্রসঙ্গটি বিস্তাবিত আলোচনাব অপেক্ষা রাখে, কিন্তু এ প্রবন্ধে সে আলোচনা করা হয় নি।

উপবেব বিষযগুলি ছাডা আবও অনেকগুলি দিক থেকে এই ক্রমপরিস্ফুটনমূলক ধাবাবাহিকতাব তত্ত্বকে সমর্থন করা যায এবং এই ধাবাবাহিকতাব তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে সাজিয়ে নিলে 'ট্র্যাকটেটস'-এব সঙ্গে 'ইনভেস্টিগেশনস'-এব গঠন সাদৃশ্য সংক্রান্ত আবও বহু সমস্যাব সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায। প্রবন্ধেব কলেবব বৃদ্ধিব আশঙ্কায তাব বিশদ আলোচনা এ প্রবন্ধে কবলাম না। বিষযটি প্রবন্ধান্তবে আলোচনাব ইচ্ছে বইল।

ভাষার অগাস্টিনীয় ছবি

শেফালী মৈত্র

হ্বিটগেনস্টাইন-এর 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' (সংক্ষেপে 'পি আই') বইটি দীর্ঘ ষোল বছর ধরে লেখা। তিনি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশ করেন নি এই বই। যেমন করেন নি তাঁর আরো অনেক পাণ্ডুলিপি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছাত্ররা এইসব পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন। মূল 'ইনভেস্টিগেশনস' বইটি জার্মান ভাষায় লেখা। এর ইংরেজী অনুবাদ করেছেন তাঁর ছাত্রী জি ই এম অ্যানস্কোম্ব। হ্বিটগেনস্টাইন যেমন তাঁর 'ট্র্যাকটেটস'-এর অনুবাদ পড়ে অনুমোদন করেছিলেন 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর বেলায়, বলাই বাহুল্য, তাঁর সেই সুযোগ ঘটে নি কারণ এই অনুবাদ করা হয় তাঁর মৃত্যুর পর। 'পি আই'-এর যে পাঠ ছাপা হয়েছে তার সবটাই প্রকাশ করতে তিনি চাইতেন কিনা বলা শক্ত। অন্ততঃ সম্পাদকদের ধারণা বই-এর শেষ অংশ হয়ত উনি ছাপতে চাইতেন না। 'পি আই'-এর দুটি ভাগ আছে। প্রথম ভাগটি লেখা হয় ১৯৪৫ সালের মধ্যে, আর, দ্বিতীয় ভাগটি লেখা হয় ১৯৪৬-৪৯ সালের মধ্যে।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর সব লেখার মতো 'পি আই' ও বোঝা কঠিন। তেমনি আবার বইটি পড়তে পড়তে সংগত পাঠ লাগাতে পারলে রোমাঞ্চ লাগে। উনি বই-এর ভূমিকাতেই বলেছেন যে তাঁর বই লেখার উদ্দেশ্য এই নয় যে এই বই পড়ার ফলে পাঠক চিন্তা করার কঠিন পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (আই শুড নট লাইক মাই রাইটিং টু স্পেয়ার আদার পিপল দা ট্রাবল অব থিংকিং, 'পি আই' পৃঃ - viii)।

রেওয়াজ আছে হ্বিটগেনস্টাইন-এর লেখাকে দুটি পর্বে ভাগ করার আদি পর্ব ও উত্তর পর্ব। এই বিভাজন কতটা সমর্থনযোগ্য তা বিতর্কের বিষয় - কেউ বলেন, তাঁর লেখার স্পষ্ট ভাগ আছে, কেউবা দেখেন দুই পর্বের মধ্যে ধারাবাহিকতা। আগের লেখার সঙ্গে তাঁর পরের লেখার ছেদ আছে কিনা সেই বিতর্কের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে অগাস্টিনীয় চিত্রের ব্যাখ্যা। 'পি আই' এর গোড়াতে আমরা যা পাই তা হল, হ্বিটগেনস্টাইন ব্যাখ্যাত 'অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্বের ধারণা - প্রথমে তিনি এই ধারণার পরিচয় দেন, অতঃপর তা সমালোচনা করেন। এই সমালোচনার মধ্যে দিয়ে হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর আদিপর্বের লেখা 'ট্র্যাকটেটসীয়' অর্থতত্ত্বের ধারণাকেও খারিজ করেন। এই অর্থে অগাস্টিনীয় তত্ত্বকে হ্বিটগেনস্টাইন খাড়া করেছেন তাঁর 'পি আই.' গ্রন্থের পূর্বপক্ষ রূপে।

এখানে একটু বুঝে নেওয়া প্রয়োজন কেন অগাস্টিনকে পূর্বপক্ষ রূপে দাঁড় করানো

হচ্ছে। হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেন অগাস্টিনীয় চিত্র এক বিশেষ ধরণের দর্শনভাবনার প্রতিভূ। দীর্ঘকাল যাবৎ পাশ্চাত্য দার্শনিকরা এই জাতীয় ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁদের গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের ধারণা দর্শন শাস্ত্র কতগুলি শাস্বত সত্যের সন্ধান করে। যেমন, দার্শনিকের কাজ হল ভাষার মৌল যৌক্তিক কাঠামো আবিষ্কার করা, ভাষার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধের একটা যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া, মন ও শরীরের স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্পর্ক কী তা সঠিক ভাবে নির্ণয় করা, আত্মা অমর কি না এই তর্কের নিষ্পত্তি করা। হ্বিটগেনস্টাইন স্বয়ং তাঁর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে ভাষার অনুষঙ্গে এমনই কিছু ধ্রুবকের খোঁজ করছিলেন।

পরবর্তীকালে তাঁর মনে হল দার্শনিকরা যেসব প্রশ্ন তোলেন, তার উত্তর দার্শনিকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। এই জাতীয় প্রশ্ন তোলার ফলে দার্শনিকের অবস্থা হয় অনেকটা বোতল বন্দী মাছির মতো - বদ্ধ অবস্থায় উড়ে সে বাইরের পথ পায় না। হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেন দার্শনিকের প্রকৃত কাজ হওয়া উচিত বোতলবন্দী মাছিকে বাইরের পথ দেখানো (টু শো দা ফ্লাই দা ওয়ে আউট অব দা ফ্লাই বটল, 'পি আই' § ৩০৯)। দার্শনিকরা সব সময় মনে করেন আমি পথ চিনি না বা 'আই ডু নট নো মাই ওয়ে অ্যাবাউট' ('পি আই' § ১২৩)। এই পথ দেখানোর জন্য তাঁর কাছে বাড়তি তথ্য পেশ করার দরকার নেই - আমরা এ যাবৎ যা জানি তা-ই নতুন রূপে গুছিয়ে দিলে সমস্যার সমাধান হবে। 'দা প্রবলেমস আর সলভড নট বাই গিভিং নিউ ইন্‌ফর্মেশন, বাট বাই অ্যারেন্‌জিং হোয়াট উই হ্যাভ অলরেডি নোন' ('পি আই' পৃ viii)।

আমাদের ভাষা আমাদের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে বলেই নানান দার্শনিক সমস্যা দেখা দেয়। এ জাতীয় প্রতারণা থেকে আমাদের মুক্তি দেওয়াই দর্শনের প্রধান কাজ। হ্বিটগেনস্টাইন-এর ভাষায় 'ফিলসফি ইজ এ ব্যাট্‌ল এগেনস্ট দা বিয়ুইচমেন্ট অব আওয়ার ইনটেলিজেন্স বাই মীনস অব ল্যাঙগুয়েজ'। ('পি. আই' পৃ viii)।

সেটাই সত্যিকারের দার্শনিক আবিষ্কার যার ফলে ইচ্ছে মতো আমি দর্শনভাবনা থামিয়ে দিতে পারব। এর ফলে দর্শনে শান্তি আসবে, দর্শন আর এমন সব প্রশ্নে জর্জরিত হবে না - যে প্রশ্ন দর্শনের নিজস্ব বৈধতা বিষয়ে সংশয় তোলে, ('পি আই.' § ১৩৩ দ্রষ্টব্য)। দর্শনের কাজ আমাদের সামনে সব তথ্য পেশ করা, এই তথ্যের ব্যাখ্যা দেওয়া তার কাজ নয়, যেমন নয় এই তথ্য থেকে নানা ডিডাক্‌শান বা অনুসিদ্ধান্ত টানা - যদি সব তথ্য আমাদের সামনে মেলে ধরা হয় তাহলে আর ব্যাখ্যা করার কিছু থাকে না। প্রচ্ছন্ন বা গুহ্য তথ্য নিয়ে মাথা ব্যথার কোনো কারণ নেই ('পি আই' § ১২৬ দ্রষ্টব্য)। দর্শন শুধু সেই কথাগুলিই বলে যা সকলে স্বীকার করে ('ফিলসফি ওনলি স্টেট্‌স হোয়াট এভরি ওয়ান অ্যাডমিটস', ('পি আই' § ৫৯৯)।

দর্শনভাবনা ও দার্শনিকের মূল ভূমিকা হ্বিটগেনস্টাইন কী ভাবে দেখেছেন বুঝে নেওয়ার পর এবার আমরা আরো ভালভাবে তাঁর অগাস্টিনীয় চিত্র আলোচনার পটভূমি ও তাৎপর্য

বুঝে নিতে পাবব। এই চিত্রেব মাধ্যমে জগৎ আর ভাষাব একটা অনন্য (ইউনিক) অচ্ছেদ্য সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা কবা হয়েছে। হ্বিটগেনস্টাইন-এব মনে হয়েছে, নানাভাবে পদ ও বস্তুর মধ্যে অনন্য সম্পর্ক স্থাপনেব এই চেষ্টা সার্থক হয নি , যেমন সার্থক হয় নি অর্থবোধেব মানসিক অনুষঙ্গ ব্যাখ্যাব চেষ্টা। পাশ্চাত্য দর্শনে তবু এই প্রচেষ্টাব পৌনঃপুনিকতা দেখে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মনে এসেছে সেই বোতলবন্দী মাছিব উপমা। কীভাবে দর্শন চর্চা কবা উচিত নয় অথচ সচরাচর কবা হয়ে থাকে তাব একটি প্রকৃষ্ট উদাহবণ অগাস্টিনীয অর্থতত্ত্ব। পাশ্চাত্য দর্শনভাবনাব এক বৃহদাংশকে প্রভাবিত কবে আছে অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্বেব ধাবণা। এই তত্ত্বের প্রতিটি অনুপুঙ্খ অনুসরণ না কবেও দার্শনিকরা এই তত্ত্বেব দ্বাবা বিশেষভাবে প্রভাবিত। অগাস্টিন তাঁব নিজেব লেখায় কোথায় কী মত পোষণ কবেছেন সেটা এখানে বড়ো কথা নয়। এখানে কথা হল ঃ হ্বিটগেনস্টাইন অগাস্টিনকে কোন্ মতেব প্রবক্তা হিসেবে দেখেছেন।

'পি আই ' শুরু হয়েছে অগাস্টিন-এব একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। উদ্ধৃতিটি এবকম 'আমাব গুরুজনবা যখন কোনো বস্তুর নামকবণ কবতেন ও সেইমত কোনো কিছুর দিকে অগ্রসব হতেন আমি তখন তা দেখে বুঝে নিতাম যে তাঁবা [কোন্] জিনিসটি [কে] উদ্দেশ করতে চাইছেন, তাঁদেব উচ্চাবিত শব্দটি সেই জিনিসেব নাম। তাঁদেব অভিপ্রায তাঁদেব অঙ্গ সঞ্চালনেব মধ্য দিয়ে প্রদর্শিত হত। এইটাই যেন সকলেব স্বাভাবিক ভাষা মুখেব ভাব, চোখেব চাউনি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব সঞ্চালন এবং গলাব সুব যা দিযে আমবা কী চাইছি, কী আছে, কী বর্জন কবছি বা এড়িয়ে চলছি বোঝা যায। আমি যখন বিভিন্ন বাক্যে বিভিন্ন পদেব যথাযথ ব্যবহাব শুনতাম আমি ধীবে ধীবে বুঝতাম [পদগুলি] কোন্ বস্তুকে নির্দেশ কবে, আব আমি যখন এই পদগুলি উচ্চাবণ সম্বন্ধে অভ্যস্ত হলাম তখন আমি আমার নিজেব বাসনা প্রকাশ করাব জন্য পদগুলি ব্যবহার কবলাম'।[২] ইতিহাসে আমবা একাধিক অগাস্টিন-এর সংবাদ পাই, মনে বাখতে হবে এই উদ্ধৃতিটি অগাস্টিন অব হিপোব, যাঁব জন্ম সাল ও মৃত্যু সাল যথাক্রমে ৩৫৪ খ্রীঃ ও ৪৩০ খ্রীঃ। হ্বিটগেনস্টাইন এই উদ্ধৃতিটি নিয়েছেন অগাস্টিন -এব আত্মজীবনী থেকে, তাঁব কোনো দার্শনিক বচনা থেকে নয। তাঁব এই উদ্ধৃতি থেকে ভাষাব স্বরূপ ও তার ক্রিয়া সম্বন্ধে একটা অসম্পূর্ণ ছবি পাওয়া যায়। হ্বিটগেনস্টাইন তাই অগাস্টিন-এব তত্ত্বকে আবো বিশদভাবে বোঝানোর জন্য উদ্ধৃতিটিব ভাবসম্প্রসাবণ কবেন। অগাস্টিন বলেছেন প্রতিটি পদ একটি বস্তুব নাম। হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন এই ধাবণাব গভীবে রয়েছে আবো তিনটি বক্তব্য যথা ঃ (১) প্রতিটি পদেব অর্থ আছে (২) অর্থ পদেব সঙ্গে সম্পর্কিত এবং (৩) পদ যে বস্তুকে উদ্দেশ কবে সেই বস্তুই পদেব অর্থ। এই তিনটি বক্তব্যেব অতিরিক্ত হ্বিটগেনস্টাইন অগাস্টিনীয তত্ত্বেব সঙ্গে প্রদর্শী সংজ্ঞা বা অস্টেনসিভ ডেফিনিশনেব আবশ্যিক যোগ দেখতে পান। হ্বিটগেনস্টাইন যেভাবে অগাস্টিন-এব উক্তিটিব ('প্রতিটি পদ একটি বস্তুব নাম') ভাবসম্প্রসাবণ কবেন তা অগাস্টিন-এব অভিপ্রেত কিনা আমবা জানি না। কাবণ এই

উক্তিটিব বিকল্প বিস্তাবও সম্ভব। হ্বিটগেনস্টাইন অবশ্য মনে কবেন তাঁব এই ভাবসম্প্রসারণ অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্বেব অনন্য ব্যাখ্যা।

যদিও 'পি আই'. গ্রন্থে নির্দিষ্ট পবিচ্ছেদ ভাগ কবা নেই আমবা বলতে পারি এই বই-এব এক থেকে সাতাশ সংখ্যক উক্তিগুলি অগাস্টিনীয় তত্ত্ব সম্পর্কে উক্তি। এই সূত্রে হ্বিটগেনস্টাইন এই তত্ত্বেব সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু প্রসঙ্গেরও অবতারণা করেন। এই প্রসঙ্গ গুলি হল (ক) পদের অর্থ (খ) পদ ও বাক্যেব পার্থক্য (গ) এক ধরণেব পদেব সঙ্গে আব এক ধবণের পদেব বিভেদ (ঘ) পদের অর্থ ব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রক্রিয়া (ঙ) শব্দবোধের স্বরূপ (চ) উক্তিটি অর্থেব সঙ্গে শব্দবোধেব শর্তের সম্বন্ধ। হ্বিটগেনস্টাইন-এব 'পি. আই.' পাঠেব জটিলতাব একটা কাবণ বিভিন্ন প্রসঙ্গ বই এব বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপিত হয়েছে এবং প্রতিটিব সঙ্গে প্রতিটি এমন অনস্যূত যে তাঁব গোটা বক্তব্য না বোঝা অবধি তাব অংশ বোঝা কঠিন। অথচ সব আলোচনাব অবতাবণা একসঙ্গে কবতে গেলে আলোচনাব খেই হাবানব সম্ভাবনাও বিপুল।

হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন অগাস্টিনীয় তত্ত্বেব মূল প্রতিপাদ্য প্রধানতঃ দুটি। প্রথমতঃ ভাষা নামপদেব মাধ্যমে জগতেব বস্তুর নামকবণ কবে, দ্বিতীয়তঃ ভাষা জগতেব বর্ণনা দেয়। অগাস্টিনীয় তত্ত্ব অনুযায়ী সব পদই নামপদ এবং সব বাক্যই নামপদেব সমাহাব, শুধু যে প্রতিটি পদ নামপদ তাই নয় প্রতিটি নামপদ কোনো একটি বস্তুকে উদ্দেশ কবে। এই বক্তব্যেব মধ্যে হ্বিটগেনস্টাইন আরো তিনটি অনুসিদ্ধান্ত দেখতে পান। সেগুলি যথাক্রমে : প্রতিটি পদেব অর্থ আছে, এই অর্থ কোনোভাবে নামেব সঙ্গে যুক্ত, যে বস্তু নামের দ্বাবা উদ্দিষ্ট সেই বস্তুই নামেব অর্থ। হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেন যে অগাস্টিন-এব অর্থতত্ত্ব অনুসাবে প্রদর্শী সংজ্ঞা নামেব ব্যাখ্যাব প্রাথমিক উপায়।

অগাস্টিন-এব নিজস্ব বক্তব্য ও তাব সঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন কথিত অনুসিদ্ধান্ত যুক্ত কবে একটা তত্ত্বগুচ্ছ গড়ে ওঠে যাব সবটা নিয়ে তৈরি হয় 'পি আই.' উল্লিখিত হ্বিটগেনস্টাইন-এর অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্বের ছবি। এই ছবি প্রবীন হ্বিটগেনস্টাইন-এব কাছে গ্রহণযোগ্য নয় যদিও আধুনিক কালের বেশিবভাগ পাশ্চাত্য অর্থতত্ত্ব কোনো না কোনোভাবে এই অর্থতত্ত্বেব দ্বাবা প্রভাবিত। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে এই প্রভাবেব সংস্পর্শে এলেই তত্ত্ব কলুষিত হয়।

এবাব পর্যায়ক্রমে দেখা যাক্ অগাস্টিনীয় তত্ত্বে প্রদর্শী সংজ্ঞাব আবশ্যিক ভূমিকা স্বীকাবেব ফলে আবো কী কী স্বীকাব কবতে হয়, পাশা পাশি এও দেখা যাক্ প্রতিটি বাক্যই মূলতঃ বর্ণনাত্মক বললে কী দাঁড়ায়। প্রথমে আবম্ভ কবা যাক্ প্রদর্শী সংজ্ঞাব আলোচনা দিয়ে।

অর্থপূর্ণ পদ মাত্রই কোনো কিছুকে উদ্দেশ কবে পদ যাকে উদ্দেশ কবে, তাই পদেব অর্থ। যেমন 'গোলাপ' পদটি গোলাপ ফুলকে উদ্দেশ করে। ফলে এ ক্ষেত্রে গোলাপ

ফুলটি 'গোলাপ' পদের অর্থ। অর্থ দুভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে : শাব্দিক সংজ্ঞার দ্বারা অথবা প্রদর্শী সংজ্ঞার দ্বারা। শাব্দিক সংজ্ঞার সাহায্যে একটি পদের অর্থ আর একটি পদের সাহায্যে ব্যাখ্যাত হয় যেমন 'মাতা' শব্দটির শাব্দিক সংজ্ঞা 'জননী' এই পদটি। এখানে আমরা ভাষার সাহায্যেই ভাষাকে বুঝি। প্রদর্শী সংজ্ঞার সাহায্যে একটি পদের অর্থকে বুঝতে গেলে ভাষার বাইরে জগতের কোনো কিছুর সাহায্যে পদের অর্থ বোঝাতে হয়। এ ক্ষেত্রে কোনো কিছুর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমরা একটি নামপদ উচ্চারণ করি। যেমন একটি গোলাপ ফুলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমরা বলতে পারি 'গোলাপ ফুল'। এই প্রক্রিয়ায় ভাষার সঙ্গে জগতের একটা নির্ভর যোগ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় আর জগতের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন প্রদর্শী সংজ্ঞা স্বীকৃত হয়ে থাকে।

কৌতূহল জাগতে পারে যে ভাষা ও জগৎ উভয়ই বিজাতীয় পদার্থ তবু প্রদর্শী সংজ্ঞার মাধ্যমে দুই-এর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় কোন্ প্রক্রিয়ায়? প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্বের অনুষঙ্গে অবাস্তর। একটি নাম পদ যে বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছে এটা জানাই যথেষ্ট, কীভাবে সম্পর্কিত হয়েছে তা অবান্তর - অর্থজ্ঞানের জন্য।

মনে রাখতে হবে যে প্রদর্শী সংজ্ঞার সাহায্যে নাম পদের সঙ্গে বস্তুর যে সম্পর্ক স্থাপিত হয় তা চিরকালীন। ভবিষ্যতেও একই নামপদ উচ্চারণে একই বস্তুর উদ্দেশ স্থাপিত হবে। একটি বস্তুকে পুনরায় একই বস্তুরূপে চেনা যাবে কী করে? অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষণে একটি বস্তুর তাদাত্ম্য কী করে প্রতিষ্ঠিত হয়, সহজ কথায় আমরা কী করে জানি এটা একই বস্তু? এ বিষয়ে অনেক কূট দার্শনিক বিচার আছে যা পাশ্চাত্য দর্শনে 'প্রবলেম অব আইডেন্টিটি' নামে পরিচিত। অগাস্টিনীয় তত্ত্ব দাবি করে যে এই সমস্যার মধ্যে না ঢুকেও আমরা একই নামপদ যে একই বস্তুকে বার বার উদ্দেশ্য করে তা বুঝতে পারি। একটি নামপদের এমন পৌনঃপুনিক ব্যবহারের মধ্যে নামপদ ও উদ্দিষ্ট বস্তুর সম্পর্কের স্থায়িত্ব জ্ঞাপিত হয়, এর অতিরিক্ত বস্তুর ক্রমান্বয় তাদাত্ম্যের বিষয়ে কিছুই বলা হয় না। ক্রমান্বয় তাদাত্ম্য বা কনটিনুয়াস আইডেন্টিটি বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা মনোবৈজ্ঞানিকের কাজ, প্রদর্শী সংজ্ঞার নয়। এই প্রসঙ্গে 'পি আই'- তে ভিটগেনস্টাইন বলেছেন, দা সেম ইজ দা সেম্ - হাউ আইডেন্টিটি ইজ এসট্যাবলিষ্ট ইজ এ সাইকোলজিকাল কোয়েশ্চন' ('পি আই' § ৩৭৭)।

প্রদর্শী সংজ্ঞার সাহায্যে একটি পদের অর্থ নিরূপিত হওয়ার পরে পদটির অর্থ অপরিবর্তিত থাকে। এরপর বিভিন্ন অনুষঙ্গে পদটি ব্যবহার করলেও তার অর্থ বদল হয় না, একই থাকে।

অগাস্টিনীয় তত্ত্বে সবদিক থেকে প্রদর্শী সংজ্ঞাকে একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বলে বিবেচনা করা হয়। মনে রাখতে হবে যে প্রদর্শী সংজ্ঞা কেবল সরল বা নিরংশ পদের অর্থ প্রতিষ্ঠা করে। সেই পদই সরল বিবেচিত হবে যাকে বিশ্লেষণ করলে অন্য কোনো পদ পাওয়া যায়

না। যেমন 'লোচন' একটি সরল পদ কিন্তু 'পদ্মলোচন' একটি যৌগ পদ, এই পদটি বিশ্লেষণ করলে আমবা পাই 'পদ্ম' এবং 'লোচন'। প্রকারান্তরে এখানে বলা হচ্ছে যে সন্ধিযুক্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদে প্রদর্শী সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয। যেখানে প্রদর্শী সংজ্ঞা প্রযোজ্য, অর্থাৎ সরল পদে, সেখানে এই সংজ্ঞাব সাহায্যে আমরা পদটিব অর্থেব পূর্ণাঙ্গ, চূড়ান্ত ও স্বচ্ছ ব্যাখ্যা পাই। এমনটি না হলে প্রদর্শী সংজ্ঞা পদের অর্থ নিরূপণে এমন মৌলিক (ফাউণ্ডেশনাল) ভূমিকা পালন করতে পারত না। যদি প্রতিটি প্রদর্শী সংজ্ঞা অস্পষ্ট হত বা উভব্যঞ্জক হত তাহলে প্রতিটি প্রদর্শী সংজ্ঞাব সঙ্গে আরো কিছু পরিপোষক ব্যাখ্যার প্রয়োজন হত। আর এই পরিপোষক ব্যাখ্যা যদি প্রদর্শী সংজ্ঞা অতিরিক্ত কোনো ব্যাখ্যা হত তা হলে এই সংজ্ঞা ভিন্ন কোনো মৌল বা ফাউণ্ডেশনল সংজ্ঞা প্রয়োজন হত। তখন আর প্রদর্শী সংজ্ঞাকে পদের অর্থ ব্যাখ্যার মৌলিক উপায বলা যেত না। অগাস্টিনীয় তত্ত্ব অনুসারে প্রদর্শী সংজ্ঞার অতিরিক্ত কোনো পরিপোষক ব্যাখ্যা অবাস্তব অথবা অসংগত।

যখন বলা হয প্রদর্শী সংজ্ঞা একটি পদেব পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দেয় তখন বুঝতে হবে সংজ্ঞাত পদের প্রতিটি সম্ভাব্য ব্যবহারও এই সংজ্ঞার মাধ্যমে জানতে পাবি। আমবা জানতে পারি আর কোন্ কোন্ পদেব সঙ্গে এই পদটি ব্যবহাব করা যেতে পাবে। অর্থাৎ কোন্ কোন্ অনুসঙ্গে পদটির ব্যবহার বৈধ আর কোন্ কোন্ অনুষঙ্গে এই পদেব ব্যবহারটি অবৈধ, তাও জানা যায়।

জগতের যে বস্তুর সঙ্গে একটি নামপদ সম্পর্কিত সেই বস্তুটিই নামপদের অর্থ। তার ফলে বস্তুটির ধর্ম নামপদে প্রতিফলিত। আমরা জানি যে একটি বস্তু আর একটি বস্তুব সঙ্গে ইতিবাচক বা নেতিবাচক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। যেমন আমরা জানি আকাশেব গায়ে টক টক গন্ধ থাকতে পাবে না কারণ আকাশ আব গন্ধের মধ্যে সম্পর্কটি বিযুক্তির। আকাশ আর গন্ধ যদি ইতিবাচক সম্বন্ধে না থাকতে পারে তাহলে আকাশসূচক পদ ও গন্ধসূচক পদও একটি বাক্যে অর্থপূর্ণ ইতিবাচক সম্বন্ধে থাকতে পারে না। 'আকাশ' পদ, 'টক' পদ ও 'গন্ধ' পদ - একটি বাক্যে এমন সহাবস্থান - আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ - অসংগত। এই অসংগতিব কারণ কিন্তু প্রাথমিকভাবে ব্যাকরণেব নিয়েমের শাসন নয়। জগতের স্বরূপ এমন যে যথার্থ ভাবে বলা যায় না যে 'আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ'। এটা বলার প্রতিবন্ধকতা জগতে নিহিত; ব্যাকরণের নিয়মে নয। ব্যাকরণেব নিয়মে এই অনুশাসন সঞ্চারিত হয় মাত্র। যা বাস্তবে হয় না তা প্রদর্শী সংজ্ঞার দ্বাবা প্রতিষ্ঠা কবা যায় না। আগেই বলা হয়েছে প্রদর্শী সংজ্ঞা স্বচ্ছ, তা আর কোনো পরিপূরক ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। পদের নানা আলংকাবিক অর্থ বা রূপক অর্থ থাকতেই পারে তবে সেই অর্থ প্রদর্শী সংজ্ঞা প্রদত্ত নয়। একটি নামপদ জগতের যে বিষয় উদ্দেশ করে তার স্বরূপ হুবহু নামপদের অর্থের মধ্যে বিধৃত হওযাব ফলে ভাষা ও জগতের মধ্যে একটি অনুবদ্ধতা বা কোরিলেশন

স্থাপিত হয। শুধু ভাষা এবং জগৎ নয়, ধাবণা, বচন, ভাষা, জগৎ হয়ে যায় একে অপবেব দ্যোতক। 'পি আই' -তে তা-ই হ্বিটগেনস্টাইন লিখছেন 'থট, ল্যাঙগুযেজ, নাও অ্যাপিয়াব টু আস্ অ্যাজ দা ইউনিক্ কোরিলেট্, পিক্‌চাব অব দা ওয়ার্লড। দিইজ কন্‌সেপ্ট্‌স ঃ প্রপোজিসনস, ল্যাঙগুযেজ, থট, ওয়ার্ল্ড, স্ট্যান্ড ইন লাইন ওযান বিহাইন্ড দ্য আদাব, ইচ্ একুইভ্যালেন্ট টু ইচ্' ('পি. আই', § ৯৬)।

দুই প্রকাব আবশ্যিক সত্যেব কথা সাধারণতঃ বলা হযে থাকে। বিশ্লেষক সত্য বা অ্যানালিটিক ট্রুথ ও সংশ্লেষক সত্য বা সিনথেটিক ট্রুথ। প্রদর্শী সংজ্ঞা যদি একটি বস্তুর পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিতে পাবে তবে তা আমাদেব আবশ্যিক সংশ্লেষক সত্য দেবে। পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বলতে বোঝায পদটিব পূর্ণ পবিচয় দেওযা (ঠিক যেমন পদার্থ বিজ্ঞানের ল বস্তুর আবশ্যিক ধর্মের পরিচয় দেয়)।

যেমন, আমরা যদি 'লাল' পদটির পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা পাই এবং 'হলুদ' পদেব পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা পাই তাহলে আমবা সেই সঙ্গে এই আবশ্যিক সংশ্লেষক সত্য পেযে যাব যে একটি বস্তুব সবটা একই সময়ে লাল এবং হলুদ হতে পারে না। অগস্টিনীয় তত্ত্ব দাবি করে যে প্রদর্শী সংজ্ঞা থেকে এমন সংশ্লেষক সত্য পেয়ে থাকি।

এটাও অগাস্টিনীয় তত্ত্বেব একটি অনুসিদ্ধান্ত যে, কোনো মানসিক অনুষঙ্গ বাদ দিয়ে একটি পদের অর্থ পাওযা যায় না বা একটি পদেব অর্থ জ্ঞাপন কবা যায় না। অর্থ বা মীনিং-এব প্রসঙ্গে সর্বদাই আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং বা বোধের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এটা অগাস্টিনীয় তত্ত্বের মূখ্য স্বীকার্য হলেও হ্বিটগেনস্টাইন-এর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে এই মত বর্জন করা হয়েছে। 'ট্র্যাকটেটস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, শব্দার্থ প্রতিষ্ঠাব সঙ্গে শব্দবোধের কোনো আবশ্যিক সম্পর্ক নেই, ববঞ্চ ঐ লেখায় সবরক-ম মানসিক অনুষঙ্গ উপেক্ষা করে হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর অর্থতত্ত্ব গড়ে তুলেছেন। প্রায় সব দিক থেকেই বলা হয 'ট্র্যাকটেটস'-এর অর্থতত্ত্ব যেন অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্বেব একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই কথাটি অংশত সত্য, সবটা নয় ঃ কাবণ হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর 'ট্র্যাকটেটস'-এব অগাস্টিনীয তত্ত্বেব মানসিক অনুসঙ্গ শুধু যে উপেক্ষা করেছেন তা নয়, তিনি মনে করেছেন কোনো ক্ষেত্রেই মানসিক অনুষঙ্গেব ভূমিকা স্বীকার করা দূষ্য।

অগাস্টিনীয তত্ত্ব অনুসারে একটি নাম পদ কাগজে লিখলে বা উচ্চারণ করলেই তার দ্বারা পদটি উদ্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় না। আমরা পদের সঙ্গে বিষয়েব একটা সম্পর্ক মনে মনে তৈবি করি বলে উভয়ের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পদ আর বিষয়েব যোগযোগ একটি মানসিক ক্রিয়ার দ্বারা স্থাপিত হয়। আর এইভাবেই ভাষা প্রাণ পায়।

কোনো অযৌগ পদের অর্থবোধ হতে গেলেই আণ্ডাবস্ট্যাণ্ডিং বা বোধের প্রয়োজন। প্রতিটি পৃথক পদের অর্থ একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। সে অভিজ্ঞতা ইন্দ্রিয়জ হতে পারে অথবা বুদ্ধিজ বা লজিকাল একসপিরিযান্স হতে পাবে। তবে মৌলিক পদেব শব্দবোধের

কোনো ডিগ্রি বা মাত্রাব তাবতম্য হয না। এমন বলা যায না একই মৌলিক পদের শব্দবোধ কারোর কম হয আর কাবো বেশি হয়। শব্দবোধ এক্ষেত্রে হলে পূর্ণতই হবে, অথবা আদৌ হবে না। তেমনি আবার মৌলিক পদেব সঙ্গে জগতেব বিষয়েব সম্পর্কেব পবিচিতি বা অ্যাকোয়েন্টান্স ও আংশিক হতে পাবে না। পবিচিতি হয় পূর্ণ হবে নতুবা হবে না; পরিচিতিব কোনো মাঝামাঝি অবস্থা নেই।

প্রদর্শী সংজ্ঞায় একটি পদ যে বিষয়কে উদ্দেশ করে সেই বিষয়টির সঙ্গে পরিচিতি হওযাব অর্থ সেই পদেব পূর্ণাঙ্গ 'লজিকাল গ্র্যামাব' বা যৌক্তি ব্যাকরণেব সঙ্গে পবিচিত হওয়া। বিষয়টিকে খুঁটিয়ে জানলেই আমরা জেনে যাব বিষয়টিব সঙ্গে সম্পর্কিত পদটি যৌক্তিক ব্যাকবণেব কোন্ কোন্ নিযমেব দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত। বিষয়েব পবিচিতিব মধ্যে দিয়েই আমরা জেনে যাব তার সঙ্গে সম্পর্কিত পদটিব কোন্ প্রযোগ যৌক্তিক-ব্যকবণের (লজিকাল গ্র্যামারের) বিচাবে বৈধ আর কোন্ প্রয়োগটিই বা অবৈধ।[২] বলাই বাহুল্য যে পদেব ওপবে ব্যাকরণের নিযন্ত্রনেব স্বরূপ কী তা আমবা বোধ বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর মাধ্যমেই জেনে থাকি। অগাস্টিন-এব মতে পদের অর্থ অনুধাবন কখনই একান্ত মানসিক এই বোধশক্তিকে বাদ দিযে হতে পারে না। বিষয়ের পবিচিতির মধ্যেই যেন একটা পূর্ণাঙ্গ অর্থবোধ নিহিত হয়ে থাকে। এই নিহিত পূর্ণাঙ্গ অর্থটিকে যখন ইচ্ছে আমাদেব বোধশক্তির সাহয্যে উদ্ধার করে ফেলতে পারি।

প্রদর্শী সংজ্ঞার সাহায্যে একটি অবিশ্লেষক বা আণবিক পদেব অর্থ আমবা এক লহমায় বুঝে ফেলি। এই তাৎক্ষণিক অর্থবোধ যে কেবল আমাদের পদের অর্থ বুঝিয়ে দেয় তাই নয় ঐ পদের সমস্ত ভবিষ্যৎ প্রয়োগের পবিচযও আমবা অর্থবোধেব প্রাথমিক পবিচয়ের মুহূর্তে পেয়ে যাই। তবে শব্দবোধ যেমন তৎক্ষণাৎ পাওয়া যায় তেমনি এই একই শব্দবোধ মুহূর্তে লোপও পেতে পাবে। এই শব্দবোধ লোপের ফলে অবশ্য শব্দটিব সঠিক প্রযোগে বাধা সৃষ্টি নাও হতে পাবে। অভ্যাসেব বসে শব্দটিব সঠিক প্রয়োগ করে গেলেও তাব অর্থেব বিস্মবণ ঘটতে পারে।

শব্দবোধ থাকার অর্থ এই নয় যে উদ্দিষ্ট বস্তুটি ভবিষ্যৎ কোনো ক্ষণে সেই একই বস্তু কি না তাও শনাক্ত করতে পারব। বস্তুব সঙ্গে বস্তুটিব নামের একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পাবাব অর্থ বস্তুটিব তাদাত্ম্য বা আইডেনটিটি স্থাপন নয়।

একটি পদের অর্থ ব্যাখ্যা কবতে বক্তা তার পূর্ণ জ্ঞানের পরিচয় দেয না। একটা পদের অর্থ ব্যাখ্যা কবতে গিয়ে শুধু এইটুকু ব্যক্ত হলেই চলবে যে কেউ একটি পদেব সঙ্গে একটি বিষযকে সম্পর্কিত করছে।

পদ ও বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করার মধ্য দিয়েই আমরা একটা ভাষা শিখি বা শেখাই। প্রদর্শী সংজ্ঞা ব্যবহার করাটাই ভাষাশিক্ষার একটা প্রাথমিক উপায়। একটি ভাষা শেখাব অর্থই হল সঠিকভাবে বিভিন্ন প্রদর্শী সংজ্ঞা ব্যাখ্যা কবার ক্ষমতা।

তেমনি আবাব সার্থক কথোপকথন বা কম্যুনিকেশনেব লক্ষণ হিসেবে বলা যায়, বক্তা যে পদের সাহায্যে যে বিষয় উদ্দেশ কবছে শ্রোতাও সেই একই বিষয়েব উদ্দেশ বুঝছে। ফলে স্বার্থক কথোপকথনে একদিকে যেমন থাকে বক্তাব উদ্দেশের অভিপ্রায় অপবদিকে থাকে শ্রোত'র ঐ একই অভিপ্রেত উদ্দেশ বোঝাব ক্ষমতা। অভিপ্রায় ও বোধ মিলিযে একটা মানসিক অনুষঙ্গেব প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয এবং সেই প্রেক্ষাপটেই একমাত্র শ্রোতার শব্দবোধ হতে পারে।

প্রদর্শী সংজ্ঞাব দ্বাবা একটি পদের সঙ্গে যখন একটি বিষয়েব সম্পর্ক স্থাপিত হয় তখন সেই বিষযটি সেই পদেব অর্থরূপে পবিগণিত হয়। সেই পদ উচ্চাবণে বক্তাব মনে আব যেসব সুখ, দুঃখ, বিরাগ, বেদনার অনুভূতি হয তা পদেব অর্থ নিরূপণে অবান্তব। যেমন 'বাঁদব' পদটি প্রদর্শী সংজ্ঞাব মাধ্যমে বাঁদর জন্তুটিকে বোঝাবে - আব কিছু নয। 'বাঁদব' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যদি অযোধ্যার কথা মনেও পড়ে তবুও অযোধ্যা 'বাঁদর' পদেব অর্থেব অঙ্গ বলে ধার্য হবে না। পদ যে বিষয়কে উদ্দেশ কবে তা বোঝা বাদে আর কোনো মানসিক অবস্থা, ধারণা, বোধ প্রদর্শিত বিষয়ের অর্থ বোঝাব পক্ষে অবান্তব।

অগাস্টিনীয় তত্ত্ব পেশ করাব পরে যখন হিবটগেনস্টাইন এই মত খণ্ডন কবেন তখন আমরা দেখতে পাই তাঁর বিভিন্ন আপত্তির মূলে একটি আপত্তিই অন্যতম - তা হল ঃ সার্থক সঞ্চাব বা কথোপকথনের জন্য 'অভিপ্রায়' বা ইনটেন্শন বা অভিপ্রায়েব বোধ জাতীয় মানসিক অনুসঙ্গ কেবল যে অবান্তব তা নয়, এমন অনুসঙ্গেব উল্লেখ বিভ্রান্তিকরও বটে।[৮]

বর্তমান প্রবন্ধে সমালোচনার অংশ মূলতঃ বাদ দিযে শুধু মাত্র তাঁর পূর্বপক্ষকে হিটগেনস্টাইন কীভাবে দাঁড কবিযেছেন তাব পরিচয় দেওয়াব চেষ্টা কবা হযেছে।

আমরা বলেছিলাম, অগাস্টিনীয় তত্ত্বে প্রতিপাদ্য বিষয দুটি - প্রথম প্রতিপাদ্য হল প্রতিটি পদেব অর্থ প্রাথমিকভাবে প্রদর্শী সংজ্ঞার দ্বাবা ব্যাখ্যাত হয় এবং দ্বিতীয প্রতিপাদ্য হল প্রতিটি বাক্যই মূলতঃ বর্ণনাত্মক বাক্য। এবার দেখা যাক্ হিটগেনস্টাইন এই দ্বিতীয় অগাস্টিনীয় প্রতিপাদ্যটিকে কীভাবে বুঝেছেন। বাক্যমাত্রই নাম পদেব সমাহাব। এখানে নামপদ বা 'নেম্' কথাটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহাব করা হচ্ছে (যে অর্থে 'ট্র্যাকটেটস' -এ নামপদ ব্যবহৃত হয়েছে)। এমন কথা আমবা 'ট্র্যাকটেটস'-এ পাই যেখানে হিটগেনস্টাইন বলেছেন 'অ্যান এলিমেন্টাবি প্রপোজিশন ইজ এ কম্বিনেশন অব নেমস। ইট ইজ এ নেকসাস এ কনক্যাটিনেশন অব নেমস' ('ট্র্যাকটেটস' ৪.২২) অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্বে বাক্যকে একটি শব্দমালা, শৃঙ্খল বা চেনেব সঙ্গে তুলনা কবা হয, আব এব থেকেই বোঝা যায় যে একাধিক পদ না থাকলে বাক্য গঠিত হতে পারে না। যেখানে একটি পদের দ্বারাই একটা পবিস্থিতির বর্ণনা পাওযা যায় সেখানে মনে হতে পারে যে একপদী বাক্য গঠন কবাও সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একপদী বাক্য হয় না - কিছু শব্দ অনুচ্চার থাকার ফলে মনে হয বাক্যটি একপদী। একটি মাত্র পদের সাহায্যে একটা পবিস্থিতির বর্ণনা দেওয়ার উদাহরণরূপে ধবা যাক্ 'আগুন।' - এই

বাক্যটি। এটা একপদী বাক্য মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। এখানে অন্যান্য পদ উহ্য আছে। যেমন - 'সাবধান এখানে আগুন ধরেছে'। মনে রাখতে হবে যে যতি চিহ্নও বাক্য বোধে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে 'আগুন' পদের অতিরিক্ত '!' এই চিহ্নটিরও অর্থপ্রকাশে অবদান আছে। এই কারণে 'আগুন!' একটি বিশুদ্ধ একপদীয় বাক্য নয়।

অগাস্টিনীয় তত্ত্ব অনুসারে বাক্যের অর্থ নির্ভর করে বাক্যস্থিত পদের অর্থের ওপর। নামপদ ও নামপদ বিন্যাসকারি পদ যেমন ক্রিয়াপদ, অব্যয়, ইত্যাদি, এই দুই জাতীয় পদ মিলিয়ে গঠিত হয় বাক্য তথা বাক্যের অর্থ। যেমন, ধরা যাক্ এই বাক্যটি 'টেবিলের পাশে চেযার আছে'। এখানে 'টেবিল্' 'চেয়ার' এগুলি নামপদ এবং পদগুলিকে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে 'পাশে', 'আছে' এই পদগুলি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী পদের অর্থ বাক্যের অর্থের চেয়ে প্রাথমিক। পদের অর্থ প্রথমে বুঝতে হয় তবেই বাক্যের অর্থ বোঝা যায়। বাক্যের পৃথক কোনো অর্থ নেই। নামপদের অর্থ এবং বিভিন্ন নামপদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপক পদের অর্থ এই দুই দিয়ে বাক্যের অর্থ গঠিত হয।

বাক্যের সত্যমান বা ট্রুথ ভ্যালু নিরূপিত হয় বাক্যের সঙ্গে জগতের বস্তুস্থিতির সম্পর্কের নিরিখে। বাক্যে যে পরিস্থিতি বর্ণিত হযেছে তা-ই যদি জগতের বস্তুস্থিতির প্রকৃতরূপ হয তাহলে বাক্যের বর্ণনার সঙ্গে বর্ণিত বিষযের একরূপতার দরুণ বাক্যটিকে যথার্থ বলে বিচার করা যায়। যেমন - টেবিলের ওপর সত্যিই যদি একটি বই থাকে এবং তাই দেখে যদি 'টেবিলের ওপর একটি বই আছে' এই বাক্যটি উচ্চারণ করা হয় তাহলে বাক্যটি যথার্থ হবে। কিন্তু টেবিলে যদি বই না থাকে তাহলে বাক্যটি অযথার্থ হবে। একটি বাক্যের যথার্থ হওয়া এবং অর্থপূর্ণ হওয়া যেমন এক নয তেমনি তার অযথার্থ ও অর্থহীন হওযাও আদৌ এক নয়। একটি বাক্য অযথার্থ হয়েও অর্থপূর্ণ হতে পারে। ধরা যাক্ এমন একটা পরিস্থিতি যখন টেবিলের ওপর বই নেই তখন 'টেবিলে বই আছে' বললে তা অর্থপূর্ণ অথচ অযথার্থ হবে। অগাস্টিনীয় তত্ত্ব অনুসারে অর্থ নিরূপণ ও যাথার্থ্য নিরূপণ দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া।

পদের অর্থ বোধের একটা মানসিক অনুষঙ্গের কথা যেমন অগাস্টিন স্বীকার করেছেন তেমনি বাক্যার্থ বোধেরও একটা মানসিক অনুষঙ্গ স্বীকার করেছেন। হিটগেনস্টাইন বাক্যার্থ বোধের মানসিক অনুষঙ্গ স্বীকারের নানা অনুসিদ্ধান্ত বা 'করোলারি' দেখতে পান।

আমরা যখন বলি 'বাক্যার্থ বোধ' তখন এই বোধটাই একটা মানসিক প্রক্রিয়া। আমরা যদি একটু তলিয়ে ভাবি বাক্যার্থ বোঝার মানে কী, তাহলে দেখব যে বাক্যার্থ বোঝা মানে বাক্যস্থিত পদের অর্থ বোঝা এবং বাক্যটির যৌক্তিক কাঠামো বোঝা। 'যৌক্তিক কাঠামো' এখানে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে - যে অর্থে হিটগেনস্টাইন তাঁর 'ট্রাকটেটস'-এ যৌক্তিক কাঠামো বা লজিকাল ফর্মের আলোচনা করেছেন। এটি একটি কূট তত্ত্ব। সহজ করে বললে বলা যায় - বাক্যের সেই কাঠামোই বাক্যের লজিকাল ফর্ম যা লজিক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাক্য গঠনের কতগুলি ব্যাকরণগত নিয়ম থাকে যা এক এক ভাষায়

এক এক বকম। যেমন, বাঙলা ব্যাকবণ আব ইংবেজী ব্যাকবণ এক নয। ভাষাব ব্যাকবণগত কাঠামো আব যৌক্তিক কাঠামো এক জিনিস নয। এভাবে যদি বলি 'বাম মানুষ এবং বাম অ মানুষ' (p. ~p) আব যদি বলি 'বাম মানুষ অথবা বাম অ-মানুষ' (pv~p) তাহলে দেখব উভয বাক্যে 'মানুষ', 'অ-মানুষ' এবং 'বাম' ব্যবহাব হওযা সত্ত্বেও বাক্যদুটিব অর্থ ভিন্ন কাবণ বাক্যদুটিব যৌক্তিক কাঠামো ভিন্ন। ফলে দেখা যাচ্ছে বাক্যেব অর্থ কেবল সমন্বিত নামপদেব দ্বাবা নিরূপিত হয না পদবিন্যাসেবও একটা অবদান আছে, অর্থাৎ বাক্যার্থ নিরূপণে যৌক্তিক কাঠামোবও একটা ভূমিকা আছে।

বাক্য বোঝাব মানসিক প্রক্রিযা, বাক্য শোনা, বা বাক্য উচ্চাবণেব মানসিক প্রক্রিযা থেকে পৃথক। বোঝাব প্রক্রিযাটা চলে বাক্য শোনা আব বাক্য উচ্চাবণেব মধ্যবর্তী পর্যাযে।

বাক্য বোঝার অর্থ হল কোন্ কোন্ পবিস্থিতিতে বাক্যটি সত্য হবে তা বোঝা। পবিভাষা ব্যবহাব কবলে বলতে হয বাক্যার্থ বোঝা বাক্যেব ট্রুথ কনডিশন বা সত্য নিরূপক শর্ত বোঝাব নামান্তব। তবে আগেই বলেছি ট্রুথ কনডিশন জানা, বা কী পবিস্থিতি বাস্তবে থাকলে বাক্য সত্য হবে জানা আব বাক্যটি সত্য কিনা জানাও যেমন এক নয তেমনি বাক্যেব 'ট্রুথ কনডিশান' জানা আব বাক্যটি 'ট্রু' কিনা জানা দুটি ভিন্ন মানসিক প্রক্রিযা। একটি বাক্যেব অর্থ বুঝতে হলে তাব (সত্য নিরূপক) অর্থাৎ ট্রুথ কনডিশন বোঝাব ক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট। এব জন্য জগতেব বস্তুস্থিতিব সঙ্গে পাবিচিতি হওযাব প্রযোজন নেই। টেবিলেব ওপব বই আছে বা নেই কোনোটা না জেনেও আমি 'টেবিলেব ওপব বই আছে' এই বাক্যটিব অর্থ বুঝতে পাবি। এই বাক্যটি বোঝাব জন্য মনে মনে আব কোনো চিত্রকল্পেব প্রযোজন নেই।

একটি বাক্যেব পূর্ণাঙ্গ বোধ হতে গেলে বোদ্ধাব জানা অন্যান্য বাক্যেব সঙ্গে এই বাক্যেব যৌক্তিক সম্পর্ক কী তাও বুঝতে হবে। পাশা পাশি জানতে হবে বাক্যটি সত্য হলে তাব ফল কী হবে আব মিথ্যা হলেই বা তাব ফল কী দাঁড়াবে। অর্থাৎ 'টেবিলে বই আছে' বোঝাব অর্থ হবে এইটে বোঝা যে টেবিলে বই থাকলে তা আলমাবিতে নেই, বই অলীক নয, ইত্যাদি। এও জানা যাবে যে এই বচনেব পদ বিন্যাসে কী কী বিধি অনুসবণ কবা হযেছে। অর্থাৎ 'টেবিলেব ওপব বই আছে' যদি অর্থপূর্ণ হয তবে 'টেবিল' এমন একটা পদ যাব সঙ্গে ওপব, নীচ, ইত্যাদি দৈশিক সম্বন্ধে অপব কোনো নামপদ ব্যবহাব কবা যায।

পবিশেষে বলা যায যে বাক্যার্থ বোঝাব সঙ্গে বাক্যেব দ্যোতনা বা 'ফোর্স' বোঝাব কোনো সম্পর্ক নেই। পাশ্চাত্য দর্শনে 'ফোর্স'-এব ধাবণা খানিকটা ব্যঞ্জনাব ধাবনাব সদৃশ। বাক্যেব আক্ষবিক অর্থ বুঝলেই বাক্যার্থ বোঝা হল ধবে নিতে হবে, তাব অতিবিক্ত বাক্যটিব দ্যোতনা বা লোকাব্যবহাব কী না জানলেও বাক্যার্থ বোধ হযেছে ধবে নিতে হবে।

হ্বিটগেনস্টাইন কথিত অগাস্টিনীয়ান ছবিব একটা সংক্ষিপ্ত পবিচয দেওযা হল। এবাব আমবা আবার ফিবে যেতে পারি মূল, 'পি, আই ' গ্রন্থে যেখানে উনি এক নম্বব সূত্রে অগাস্টিন-

এব উদ্ধৃতি দেওয়াব পবেই দু নম্বব সূত্রে একটি সহজ ভাষা-ক্রীডার পরিচয দেন। পববর্তীকালে ভাষাকে খেলাব সঙ্গে হিটগেনস্টাইন তুলনা কবলেও অগাস্টিন তা করেন নি। অগাস্টিন ববং ভাষার ঋজুতা, অনপেক্ষতা, স্পষ্টতাব কথাই বারবাব তুলে ধরেছেন। 'পি আই ' তে হিটগেনস্টাইন মনে কবেছেন ভাষাব এই ঋজুতা, অনপেক্ষতা স্বীকার কবাও একটি বিশেষ ভাষা-ক্রীডার লক্ষণ। ভাষাব ঋজুতা,-ভাষা-ব্যাখ্যার অনন্যতা স্বীকারেব মধ্যে দিয়ে অগাস্টিনীয় তত্ত্ব একটি বিশেষ ভাষা-ক্রীডাব পবিচয় দিচ্ছে।

অগাস্টিন-এর তত্ত্বেব উদাহবণ স্বরূপ একটা পরিস্থিতি কল্পনা করা যায়। ধরা যাক্ একটি বাড়ি তৈরি করার সময কিছু উপাদান বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে যেমন, স্ল্যাব, পিলাব, ইত্যাদি। আমরা এমন একটা ভাষা-ক্রীডাব কথা ভাবতেই পাবি যেখানে রাজমিস্ত্রি 'স্ল্যাব' উচ্চাবণ কবার সঙ্গে সঙ্গে তাব সহকাবী তাকে স্ল্যাব এগিযে দিচ্ছে আবাব 'পিলার' বললে পিলাব এগিয়ে দিচ্ছে। এক্ষেত্রে মনে হতেই পাবে যে প্রতিবাব একটি পদ উচ্চাবণ কবে প্রদর্শী সংজ্ঞা ব্যবহাব কবা হচ্ছে। আর যে এই উচ্চারণ শুনছে সে বুঝছে উচ্চাবিত পদেব উদ্দিষ্ট বস্তুটি। এই ধরণেব একটা ভাষাক্রীডা আমরা ভাবতেই পাবি। 'পি আই' তে হিটগেনস্টাইন বলেন পদেব কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ বা অর্থ আগে থেকে স্থিব কবা থাকে না, সব অর্থই ব্যবহাব সাপেক্ষে বা 'ইউস' সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত হয়। ওপবেব দৃষ্টান্ত দিযে তাঁব কথা বোঝাব চেষ্টা করা যাক্। 'স্ল্যাব' উচ্চারণের মধ্যে দিযে আমরা একটি একক নামপদ বোঝাতে পাবি আবার ব্যবহাবেব অনুষঙ্গ ভেদে আমবা 'স্ল্যাব' উচ্চাবণেব মধ্যে দিযে একটা বাক্য বোঝাতে পারি। 'স্ল্যাব' একটি পদেব দ্যোতক নাকি একটি বাক্যের দ্যোতক তা আগে থেকে ঠিক করা যায় না। ধরা যাক্ আমরা কাউকে 'স্ল্যাব' পদেব অর্থ শেখাতে চাই তখন আমবা কী করি? 'স্ল্যাব' উচ্চাবণ কবি আর স্ল্যাব বস্তুটিকে উদ্দেশ কবি প্রদর্শী সংজ্ঞাব সাহায্যে। এক্ষেত্রে 'স্ল্যাব' নিছক একটি নামপদ। কিন্তু বাজমিস্ত্রি যখন তাব সহকাবীকে বলে 'স্ল্যাব' তখন 'স্ল্যাব' একটি পূর্ণাঙ্গ বাক্যেব সংক্ষিপ্ত রূপ যার মানে 'আমাকে স্ল্যাব এগিযে দাও'। স্ল্যাব কখন পদ আব কখন বাক্যরূপে বিবেচিত তা নির্ভব করবে ব্যবহাবের অনুষঙ্গ বা ইউসেব ওপর। একই পদ বিভিন্ন অনুষঙ্গে বিভিন্নরূপে ব্যবহাব হতে পারে। একটি পদকে বুঝতে হয় একটি ভাষার পূর্ণ ব্যবহারের সন্দর্ভে। আবাব ভাষাব ব্যবহাব বুঝতে হয সামাজিক সন্দর্ভে আব একটি সামাজিক সন্দর্ভ বুঝতে গোটা যাপনেব প্রেক্ষাপট বা 'ফর্ম অব লাইফ' বুঝতে হয।

উপসংহারে বলা যায, 'ট্র্যাকটেটস' এবং 'পি আই ' দুটি লেখার মধ্যেই হিটগেনস্টাইন ভাষা ও জগতেব সম্পর্ক পর্যালোচনা করেছেন। দুটি গ্রন্থে তাঁর সিদ্ধান্ত আলাদা। তাঁব প্রথম লেখাটিতে অগাস্টিনীয় অর্থতত্ত্বেব প্রভাব সুস্পষ্ট। পরবর্তী লেখাতে পদের উদ্দিষ্ট বস্তুই পদেব অর্থ এই তত্ত্ব বর্জিত হযেছে। কয়েকটি পদেব সঙ্গে জগতেব বস্তুর সম্বন্ধ অবশ্যই থাকতে

পাবে। তবে বিশেষ বস্তুর সঙ্গে একটা বিশেষ নামপদকে জড়িয়ে ভাবাটা একটা কন্‌ভেনশন বা প্রথা মাত্র। নামপদের অর্থ ঐ পদটির দ্বারা উদ্দিষ্ট বস্তু নয়।

ভিটগেনস্টাইন মনে করেন, আমরা প্রদর্শী সংজ্ঞাকে বড়ো বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকি। একটি বস্তুকে আঙ্গুল দিয়ে উদ্দেশ করে একটা নাম উচ্চারণ করলেই কি সংজ্ঞা দেওয়া বোঝায়? আরো তো কত কী বোঝাতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় আমরা বস্তুটিকে চাইতে পারি, নিষেধ করতে পারি, আরো কত কিছু। কোন্‌টা করতে চাইছি নির্ভর করবে পদ ব্যবহারের অনুষঙ্গের ওপর। আঙ্গুল দিয়ে উদ্দেশ করার মাধ্যমে যেমন মানে জ্ঞাপিত হতে পারে তেমনি আবার 'আঙ্গুল দিয়ে দেখানো' এই ক্রিয়াটির আরো অনেক রকম মানে হতে পারে। ফলে নাম উচ্চারণ করে আঙ্গুল দিয়ে বস্তুকে দেখালেই নির্দিষ্ট মানে বোঝানো হয় না।

ভিটগেনস্টাইন মনে করেন, যদিও পদের অর্থ কীভাবে নিরূপিত হয় তা বোঝা একটা দার্শনিক সমস্যা তবু দর্শনের আলোচনার বাইরেও আমাদের দেখা উচিত অদার্শনিক তাঁদের অর্থ নিরূপণ কীভাবে করেন। আমরা দেখতে পাব যে পদের অর্থ নানা ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই বোঝানো হয়ে থাকে। একটি পদের অর্থ বোঝা মানে সেই পদের অনুষঙ্গ বোঝা, যাপনের একটি সমগ্র প্রেক্ষাপটে পদটিকে বুঝতে হয়।

এটা ঠিকই যে পদ ও বাক্যের কাজ জগতের বিভিন্ন বস্তু ও বস্তুকূটের পরিচয় দেওয়া, বর্ণনা দেওয়া কিন্তু ভাষা প্রয়োগের দিকে তাকালে আমরা দেখব যে ভাষার বর্ণনাত্মক প্রয়োগ ভিন্ন ভাষার আরো নানা প্রয়োগ আছে। একজন অগাস্টিন পন্থী হয়ত বলবেন সব সত্ত্বেও প্রয়োগের মধ্যে আমরা একটা সাধারণ ধর্ম খুঁজে বার করতে পারি। এই সাধারণ ধর্মটি হবে ভাষার অর্থ সম্পর্কিত প্রয়োগের একটি সাধারণ রূপ। আমরা তখন বুঝতে পারব কী হিসেবে ভাষার বিভিন্ন প্রয়োগ এই অর্থ সম্পর্কিত প্রয়োগের রূপান্তর। এই প্রসঙ্গে ভিটগেনস্টাইন-এর উত্তর সুস্পষ্ট। উনি বলবেন, সব জাতীয় প্রয়োগে কোনো সাধারণ ধর্ম নেই, আছে শুধু পরিবারোপম সাদৃশ্য।

টীকা

এই প্রবন্ধ রচনার জন্য ভিটগেনস্টাইন-এর 'পি আই' ছাড়া মূলতঃ সাহায্য নিয়েছি *Wittgenstein Understanding and Meaning*, by G P Baker and P M S Hacker Basil Blackwell, Oxford, 1980, এই বইটির।

১ 'When they (my elders) named some object and accordingly moved towards some thing, I saw this and I grasped that the thing was called by the sound they uttered when they meant to point it out Their intention was shewn by their bodily movements as it were the natural language of all peoples the expression of the face the play of the eyes the movement of other

parts of the body, and the tone of voice which expresses our state of mind in seeking, having, rejecting or avoiding something Thus as I heard words repeatedly used in their proper places in various sentences, I gradually learnt to understand what object they signified, and after I had trained my mouth to form these signs, I used them to express my own desires'

২ যৌক্তিক কাঠামো হল ভাষার তারতম্য নিরপেক্ষ বচনের সামান্য কাঠামো। বিভিন্ন তত্ত্ব অনুযায়ী ভাষার বিভিন্ন লক্ষণকে ভাষার সামান্য লক্ষণ বলে স্বীকার করা হয়। বিভিন্ন তত্ত্বে বহুল প্রচলিত স্বীকৃত লক্ষণ হল : বিবরণ মূলক বাক্যের উদ্দেশ্যে ও বিধেয় সূচক কাঠামো স্বীকার করা, বচন মাত্রেরই দ্বি-মাত্রিক সত্যতা স্বীকার করা। হিটগেনস্টাইন 'ট্র্যাকটেটস'-এ অবশ্য মনে করতেন বাক্যের আপাতঃ কাঠামো তার প্রকৃত যৌক্তিক কাঠামো নয়। একটি বাক্যকে বিশ্লেষণ করার পরে প্রকৃত অথচ প্রচ্ছন্ন কাঠামোটি প্রকট হয়। এই কাঠামোটি প্রকাশিত হবার পরেও তা হিটগেনস্টাইন-এর মতে দৃশ্য অথচ অনির্বচনীয় থেকে যায়। আর আমরা জানি তাঁর মতে ভাষায় যা দৃশ্য তা চিরতরে অনির্বাচ্য।

৩. এই সংকলনের কয়েকটা প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে হিটগেনস্টাইন-এর অগাস্টিন বিরোধী বক্তব্য ব্যাখ্যাত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ দ্রষ্টব্য বর্তমান সংকলনে ভাষা-ক্রীড়া, যাপনের প্রেক্ষাপট এবং ফ্যামিলি রিসেমব্লান্স বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর বাগর্থতত্ত্বের বিবর্তন ঃ চিত্রতত্ত্ব থেকে ভাষাক্রীড়া

রূপা বন্দোপাধ্যায়

লুডহ্বিগ্ যোসেফ যোহান হ্বিটগেনস্টাইন তাঁব চাব দশক ব্যাপী[১] দার্শনিক জীবনে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন কবেছেন বাববাব। কিন্তু যে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা তাঁব চিন্তাকে উদ্দীপিত করত, তাদেব মধ্যে সমন্বযেব একটি মূল সূত্র স্পষ্টতঃই লক্ষ্য কবা যায়। চিবকালই প্রথাসিদ্ধ দর্শনচর্চা সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন তিনি। আত্মা, অমবত্ব, বিশ্বেব অসীমতা, দেশ, কাল, প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত প্রশ্ন অতি প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিকদেব দর্শনচর্চায প্রবৃত্ত কবেছে, সেই সমস্ত প্রশ্নেব কোনটিকেই তিনি অনুসন্ধানেব যোগ্য বলে মনে কবতেন না। সাধাবণ ভাষার বাকধাবাব দ্বাবা প্রতাবিত হযেই মানুষ দার্শনিক সমস্যার জাল বিস্তার কবে এবং সেই জালে নিজেই বদ্ধ হয - সাবাজীবন বহু মত পবিবর্তনের মধ্যেও এই বিশ্বাস তাঁব অক্ষুন্ন ছিল। ভাষা কীভাবে চিন্তাকে (থট্) প্রকাশ কবতে সক্ষম হয়, ভাষাব সঙ্গে কীরূপেই বা বিশ্বেব সংযোগ স্থাপিত হয় এবং কীভাবে বা ভাষাব্যবহারেব মাধ্যমে জগৎবিষয়ক জ্ঞানেব আদান-প্রদান সম্ভব হয়, এই জাতীয় প্রশ্নেব সমাধান করতে পাবলেই হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে সমস্ত দার্শনিক সমস্যা তিরোহিত হবে। সাধাবণ ভাষাব বিশ্লেষণেব মাধ্যমেই হ্বিটগেনস্টাইন দর্শনেব স্বরূপবিষয়ে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু ভাষাবিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষা, বিশ্ব এবং চিন্তাব পারস্পবিক সম্পর্ক বিষযে যে সব সিদ্ধান্তে তিনি উপস্থিত হয়েছেন, সেই সব সিদ্ধান্ত তিনি তাঁব জীবনে বহুবাব পবিবর্তন এবং সংশোধন কবেছেন। তাঁব এইরূপ সিদ্ধান্ত পবিবর্তন এতই প্রসিদ্ধ যে তাঁব পববর্তী যুগেব দার্শনিকগণ 'ট্র্যাকটেটস লজিকো-ফিলসফিকস' গ্রন্থ এবং 'সাম রিমার্কস অন লজিকল ফর্ম' প্রবন্ধের বচযিতা হ্বিটগেনস্টাইনকে 'আর্লি হ্বিটগেনস্টাইন বা অর্বাচীন হ্বিটগেনস্টাইন' এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দেব পববর্তীকালে তিনি যে সব পাণ্ডুলিপি বচনা কবেছিলেন সেই সমস্ত পাণ্ডুলিপিব প্রণেতাকে 'লেটাব হ্বিটগেনস্টাইন' বা প্রবীণ হ্বিটগেনস্টাইন আখ্যা প্রদান কবেছেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দেব পববর্তী কালে হ্বিটগেনস্টাইন কীভাবে ভাষাব স্বরূপ ব্যাখ্যা কবেছিলেন এবং ভাষা ও বিশ্বেব সম্বন্ধ বিষয়ে ঐ সময়ে তিনি কীরূপ মত পোষণ কবতেন তা সামান্যতঃ নির্ধাবণ কবাই বর্ত্তমান প্রবন্ধেব উদ্দেশ্য। ভাষাব স্বরূপ বিষয়ে এই সময় তিনি যে মত প্রতিপাদন কবেছেন, তা নিরূপণ কবতে পারলে দর্শনবিষয়ে তাঁব পববর্তী জীবনের ধাবণাও অনুধাবন কবা সম্ভব হবে। ভাষাক্রীড়াব (ল্যাঙ্গুয়েজ গেম) ধাবণা হ্বিটগেনস্টাইন-এব পরবর্তী জীবনেব ভাষাচিন্তাব

অন্যতম প্রধান অঙ্গ। তাঁর শেষ জীবনের দর্শনচিন্তায় ভাষাক্রীড়ার প্রকৃত ভূমিকা কী, তা নিরূপণ করাই এই প্রবন্ধের বিশেষ উদ্দেশ্য।

এই প্রবন্ধ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন কীভাবে ভাষা এবং বিশ্বের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হবে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর প্রথম জীবনের ভাষাচিন্তা এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় না হলেও এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা ব্যতিরেকে তাঁর পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহ সম্যক্‌ভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না; কারণ হ্বিটগেনস্টাইন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর নিজের পূর্ববর্তী মত সমালোচনা এবং সংশোধনের মাধ্যমেই তাঁর পরবর্তী সিদ্ধান্তসমূহে উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রবন্ধের এই প্রথম ভাগে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত দুটি সমস্যাও সংক্ষেপে আলোচিত হবে। 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন যে ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন, সেই ভাষা কি সাধারণ ব্যবহারিক ভাষা অথবা ব্যবহারিক ভাষার মূলে অবস্থিত অবভাসবিষয়ক ভাষা, এই বিষয়ে হ্বিটগেনস্টাইন-এর ব্যাখ্যাকারগণের মধ্যে এযাবৎ কোনো ঐকমত্য স্থাপিত হয় নি। কিন্তু এই বিষয়ে কোনো একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মত কী ছিল, তা নিরূপণ করা সম্ভব হবে না। এই কারণেই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে উক্ত সমস্যা সংক্ষেপে আলোচিত হবে। 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে যে ভাষা প্রাথমিক ভাষারূপে গৃহীত হয়েছে তা অবভাসবিষয়ক ভাষা কি না, এই প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য ঐ গ্রন্থে বিশ্বের মূল উপাদানরূপে স্বীকৃত বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ কী, তা নির্ণয় করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গেও হ্বিটগেনস্টাইন-এর ভাষ্যকারগণের মধ্যে মতভেদ বর্তমান। কোনো কোনো ভাষ্যকারের মতে 'ট্র্যাকটেটস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন নির্ধর্মক শুদ্ধ ব্যক্তিকেই বস্তুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অপরপক্ষে অন্য কোনো কোনো ভাষ্যকারের মতে অবভাসের বিষয় বা সংবেদোপাত্তই এই গ্রন্থে বস্তুরূপে গৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথম ভাগে এইরূপ ব্যাখ্যাভেদও অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা আবশ্যক যে 'ট্র্যাকটেটসে' স্বীকৃত বস্তু এবং ভাষার স্বরূপবিষয়ে যে মত হ্বিটগেনস্টাইন-এর ভাষ্যকারগণের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, বর্তমান প্রবন্ধে সেই মত গ্রহণ না করে অপেক্ষাকৃত অপ্রসিদ্ধ মতটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এইরূপ সিদ্ধান্তের কারণ এই যে বর্তমান প্রবন্ধকারের মতে উক্ত অপ্রচলিত মত অবলম্বনেই হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনচিন্তার বিবর্তনের সম্যক্ ব্যাখ্যা সম্ভব। বিশেষতঃ হ্বিটগেনস্টাইন যেভাবে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে নিজের পূর্ববর্তী মতের সমালোচনা করেছিলেন তার দ্বারাও এইরূপ অপ্রচলিত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়ে থাকে। 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে এবং ঐ গ্রন্থের সমকালীন পাণ্ডুলিপিতেও যে এই ব্যাখ্যার সমর্থন পাওয়া যায় তাও প্রবন্ধের প্রথম ভাগে অতি সংক্ষেপে প্রদর্শিত হবে।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে হ্বিটগেনস্টাইন কীভাবে 'ট্র্যাকটেটস' থেকে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এ উত্তীর্ণ হলেন, তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হবে। এই ভাগে প্রদর্শন করা হবে যে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন চিত্রতত্ত্বের দ্বারা ভাষা এবং জগতের

সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস করলেও 'ফিলসফিকাল গ্রামার' রচনার সময় তিনি নিয়মের দ্বারাই ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' রচনার সময় হ্বিটগেনস্টাইন কী কী কারণে এইরূপ দ্বিতীয় মতও পরিত্যাগ করেছিলেন তাও প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

প্রবন্ধের তৃতীয় তথা শেষ ভাগে হ্বিটগেনস্টাইন কীভাবে ভাষাক্রীড়ার ধারণার সাহায্যে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থে ভাষা ও জগতের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন এবং দার্শনিক সমস্যাবলীর তুচ্ছত্ব প্রদর্শন করেছেন তা বিস্তৃতরূপে আলোচিত হবে। প্রসঙ্গতঃ ঐ গ্রন্থে ভাষাক্রীড়ার ভূমিকা বিষয়ে হ্বিটগেনস্টাইন-এর ভাষ্যকারগণ যে সব বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন তাদের মূল্যায়নের মাধ্যমে হ্বিটগেনস্টাইন-এর শেষ জীবনের দর্শনচিন্তায় ভাষাক্রীড়ার প্রকৃত স্থান নির্ধারণের চেষ্টা করা হবে।

[এক]

ভাষা জগতের চিত্র

ভাষার দ্বারা কীভাবে জগৎবিষযক জ্ঞানের আদানপ্রদান হয়ে থাকে এবং কীভাবেই বা ভাষার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে তা ব্যাখ্যার জন্য হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে যে মতবাদ প্রণয়ন করেছিলেন তা কালক্রমে 'বচনের চিত্ররূপতাবাদ' (পিকচার থিওরি অব প্রপজিশনস) নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বচনের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক উপস্থাপন করতে হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে -

চিত্রের অংশ সমূহের সঙ্গে চিত্রিত পদার্থসমূহের সম্বন্ধ জানা থাকলে যেমন চিত্রটি কীরূপ পরিস্থিতিকে বর্ণনা করছে তা পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ কোনো ভাষার অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ জানা থাকলে এবং ভাষার ব্যাকরণের জ্ঞান থাকলে নতুন বচনের তাৎপর্য্য সহজেই অনুধাবন করা যায়।[২]

শুধু তাই নয়, একটি চিত্র কীরূপ পরিস্থিতি বর্ণনা করছে, তা বোঝার জন্য পরিস্থিতিটি বাস্তব অথবা অবাস্তব, তা জানার প্রয়োজন হয় না।[৩] বচনের ক্ষেত্রেও বচনটি সত্য অথবা মিথ্যা তা না জেনেও বচনের তাৎপর্য অনুধাবন করা সম্ভব হয়ে থাকে।[৪] বচনের সঙ্গে চিত্রের এই সমস্ত সাধর্ম্যই সম্ভবতঃ হ্বিটগেনস্টাইনকে বচনের চিত্ররূপতাবাদ প্রণয়নে প্রভাবিত করেছিল।

চিত্র যেভাবে কোনো পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করে বচনও যে সেইরূপেই জগতের বর্ণনা করে থাকে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হ্বিটগেনস্টাইন 'ট্র্যাকটেটস'-এর ২.১ থেকে ২.২২৫ পর্যন্ত সূত্রে চিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ সামান্যতঃ বর্ণনা করেছেন। অনন্তর হ্বিটগেনস্টাইন প্রদর্শন করেছেন যে চিত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ বচনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

কোনো ফ্যাক্ট বা বস্তুকূটকে অপর একটি পদার্থের চিত্ররূপে গণ্য করতে হলে চিত্রের অংশসমূহকে চিত্রিত পরিস্থিতির অংশসমূহের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। এই প্রতিনিধিত্ব

সম্বন্ধটিকে বিশ্লেষণ করলে তাব যেসব বৈশিষ্ট্য নির্ধাবণ কবা যায তা এইরূপ -

(১) চিত্রেব প্রতিটি অংশই চিত্রিত পবিস্থিতির কোনো না কোনো অংশেব প্রতিনিধিত্ব কববে।

(২) চিত্রেব কোনো অংশই চিত্রিত পবিস্থিতিব একাধিক অংশের প্রতিনিধিত্ব কববে না।

(৩) চিত্রিত পরিস্থিতির অন্তর্গত কোনো বস্তুরই চিত্রে একাধিক প্রতিনিধি থাকবে না।

(৪) চিত্রিত পরিস্থিতির অন্তর্গত সকল পদার্থেব চিত্রে প্রতিনিধি থাকবে।[২]

বচনেব ক্ষেত্রেও যে চিত্রের এইরূপ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাও হ্বিটগেনস্টাইন স্পষ্টতঃ স্বীকাব কবেছেন, 'ইন এ প্রপোসিশন দেযাব মাস্ট বি একজ্যাক্টলি অ্যাজ মেনি ডিস্টিংগুযিশেবল পার্টস অ্যাজ ইন দা সিচুয়েশন দ্যাট্ ইট্ বিপ্রেসেন্টস। দা টু মাস্ট পোসেস দ্য সেম লজিকাল (ম্যাথাম্যাটিকাল) মাল্টিপ্লিসিটি' ('টি এল. পি ' ৪.০৪)।

চিত্রেব অংশসমূহেব সঙ্গে চিত্রিত পবিস্থিতিব এইরূপ সম্বন্ধই 'ট্র্যাকটেটস'-এ 'পিক্টোবিয়াল বিলেশনশিপ' (চিত্র-চিত্রিত সম্বন্ধ) নামে উল্লিখিত হয়েছে।

চিত্র এবং চিত্রিত পরিস্থিতির মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ সেট্ থিযোরির পরিভাষা অনুসারে ওয়ান-টু-ওয়ান কবেসপন্ডেন্স বা এক-এক সম্পর্কেব অনুরূপতাব সঙ্গে তুল্য কি না সেই বিষয়ে 'ট্র্যাকটেটস'-এব ব্যাখ্যাকাবগণেব মধ্যে মতভেদ আছে। এই প্রবন্ধে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ না থাকায অতি সংক্ষেপে হ্বিটগেনস্টাইন-এব তত্ত্বেব তাৎপর্য ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কবা যেতে পারে। হ্বিটগেনস্টাইন যখন ৪.০৪ সংখ্যক সূত্রে বচন এবং বচনেব দ্বাবা বর্ণিত পবিস্থিতিব অংশসমূহেব মধ্যে সমবহুত্বেব কথা বলেছেন তখন 'অংশ' পদটি বচনের অন্তর্গত শব্দ অর্থে বা বচনেব ব্যাকবণগত অংশ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, কাবণ বিভিন্ন ভাষাব অন্তর্গত বাক্যেব দ্বাবা বা একই ভাষাব অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অসমসংখ্যক শব্দযুক্ত বচনেব দ্বাবা একই পরিস্থিতিব বর্ণনা কবা যায। সুতবাং কোনো বচনে যত শব্দ আছে, তাব দ্বাবা বর্ণিত পরিস্থিতিতেও ততসংখ্যাক অংশ থাকবে, এইরূপ মত হ্বিটগেনস্টাইন কখনই স্বীকাব কবেন নি। এইকাবণেই হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে বচন এবং বচনেব দ্বাবা চিত্রিত পবিস্থিতিব লজিকাল মাল্টিপ্লিসিটি বা যৌক্তিক বহুত্ব সমান হবে; অর্থাৎ বচন এবং পবিস্থিতিব যৌক্তিক বিভাজন করা হলে তবেই বচনেব অংশ এবং পবিস্থিতিব অংশেব মধ্যে যৌক্তিক সমবহুত্ব থাকবে। ৪.০৪-এব এইরূপ ব্যাখ্যা অনুসাবে AvB এবং ~ (~p. ~Q) এই দুইটি বচনকেও যৌক্তিক সমবহুত্বযুক্ত রূপেই গণ্য কবতে হবে। অবশ্য বচন এবং বচনেব দ্বাবা বর্ণিত পবিস্থিতিব যৌক্তিক বিভাজন কবা হলে উভয়েব যৌক্তিক অংশসমূহেব মধ্যে ওয়ান-টু-ওয়ান কবেসপন্ডেন্স বা এক-এক সম্পর্কেব অনুরূপতা স্বীকাবে হ্বিটগেনস্টাইন এব পক্ষে কোনো বাধা থাকবে বলে মনে হয না। চিত্র বা বচনের দ্বাবা চিত্রিত পবিস্থিতিব অংশসমূহেব মধ্যে এইপ্রকাব, এক-এক সম্পর্ক সম্বন্ধ চিত্রকরেব অভিপ্রায বা লোকব্যবহাবেব দ্বারা স্থাপিত হয়ে থাকে।

কোনো দুটি পদার্থেব যৌক্তিক অংশসমূহের মধ্যে এইরূপ চিত্র-চিত্রিত সম্বন্ধ থাকলেই

একটি পদার্থকে অপরটির চিত্র বলা যায় না। চিত্রের যৌক্তিক অংশসমূহ বিশেষ এক প্রকারে বিন্যস্ত বলেই চিত্রের দ্বারা একটি পরিস্থিতিতে পদার্থসমূহ কীরূপে বিন্যস্ত হয়ে রয়েছে তার বর্ণনা পাওয়া সম্ভব হয়। অর্থাৎ চিত্র স্বয়ং একপ্রকার বস্তুস্থিতি বা ফ্যাক্ট বলেই সে অন্য কোনো সম্ভাব্য বা বাস্তব পরিস্থিতি এ্যাক্চুয়াল স্টেট অব এফেয়ার্স বর্ণনা করতে সমর্থ হয়ে থাকে। চিত্রের অংশসমূহের বিন্যাসপ্রকারকেই বা অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর্মকেই হুইটগেনস্টাইন 'চিত্রের সংস্থান' বা 'দা স্ট্রাকচার অব এ পিক্চার' রূপে অভিহিত করেছেন।

চিত্রের অংশসমূহ কীরূপে বিন্যস্ত হলে চিত্রটি একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করতে সমর্থ হবে, তা অবশ্য সম্পূর্ণরূপেই লোকব্যবহারের অধীন। সুতরাং কোনো চিত্র বা বচনের তাৎপর্যাবোধের জন্য কেবল দুটি ক্ষেত্রে লোকব্যবহারের উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয়। প্রথমত লোকব্যবহার থেকে চিত্র চিত্রিত সম্বন্ধবিষয়ে জ্ঞানলাভ করতে হয়। দ্বিতীয়ত চিত্রগত কীরূপ সংস্থান একটি বিশেষ বস্তুগত সংস্থানের দ্যোতক, তাও ভাষাব্যবহার বা লোকব্যবহারের মাধ্যমে জানতে হয়। এই দুই বিষয়ের জ্ঞান থাকলে নতুন চিত্রের তাৎপর্য্য অনুধাবন করতে বা চিত্র নির্মাণ করে মনের ভাব প্রকাশ করতে কোনোই অসুবিধে হয় না। একই কারণে যিনি কোনো ভাষার অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ জানেন এবং পদসমূহের বিন্যাস পদ্ধতিবিষয়ে যাঁর জ্ঞান আছে, তিনি সহজেই সেই ভাষার কোনো নতুন বচনের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন।

দুটি পরিস্থিতির সংস্থানের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য না থাকলে একটি পরিস্থিতি অপর পরিস্থিতির চিত্র হতে পারে না। চিত্রের সংস্থানের সঙ্গে চিত্রিত পরিস্থিতির সংস্থানের এইপ্রকার সাদৃশ্যকেই হুইটগেনস্টাইন চিত্রের আকার বলেছেন।[৮]

যেমন একটি বর্ণবিশিষ্ট বস্তুসমূহের দ্বারা গঠিত পরিস্থিতিই অপর একটি বর্ণযুক্ত পরিস্থিতির চিত্র হতে পারে, এক্ষেত্রে উভয় পরিস্থিতির মধ্যে বর্ণযুক্তত্বস্বরূপ সাধর্ম্য আছে বলেই একটি বস্তুস্থিতির পক্ষে অপর বস্তুস্থিতির চিত্র হওয়া সম্ভব হয়ে থাকে। সুতরাং এই দৃষ্টান্তে বর্ণযুক্তত্বই চিত্রের আকার। চিত্রের আকারের জন্যই একটি বস্তুস্থিতির পক্ষে অন্য বস্তুস্থিতিকে উপস্থাপন করা সম্ভব হয়।[৯]

দুটি পরিস্থিতির মধ্যে যে যে অংশে সাধর্ম্য না থাকলে একটি অপরটির চিত্র হতেই পারে না, সেইরূপ শুদ্ধ আকারগত সাধর্ম্যকে হুইটগেনস্টাইন চিত্রের যৌক্তিক আকার লজিকাল ফর্ম বলে থাকেন।[১০]

যে কোনো চিত্রই তার যৌক্তিক আকার এবং চিত্রের আকারের দ্বারাই একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির বর্ণনা করতে সমর্থ হয়। চিত্রের আকারের মাধ্যমেই চিত্র বর্ণনকার্য সম্পাদন করে বলে কোনো চিত্রই তার নিজের আকারকে বর্ণনা করতে পারে না। চিত্র তার আকারকে বর্ণনা করতে না পারলেও অবশ্য ঐ আকার প্রদর্শন করতে পারে। কোনো বচনের পক্ষেই তার যৌক্তিক আকারের বর্ণনা করা সম্ভব না হওয়ায় যে আকারগত সম্বন্ধের দ্বারা বচনের

সঙ্গে তার তাৎপর্যের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, সেই সম্বন্ধকে হিটগেনস্টাইন অনির্বচনীয়রূপেই গণ্য করেছেন। তিনি মনে করতেন যে ভাষা এবং জগতের মধ্যে বিদ্যমান এইরূপ আকারগত অনির্বচনীয় সম্বন্ধকে বর্ণনা করার প্রয়াস থেকে অসংখ্য দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে।

ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধ অনির্বচনীয় বলেই 'বাগর্থতত্ত্ব' (সিম্যান্টিক্স) নামক যে শাস্ত্রে ভাষা ও জগতের সম্বন্ধ বর্ণিত হয়, সেই শাস্ত্রকেও তিনি অসম্ভব বলে মনে করতেন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পরবর্তী জীবনে ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধের স্বরূপবিষয়ে হিটগেনস্টাইন-এর মত পরিবর্তিত হলেও ঐ সম্বন্ধের অনির্বচনীয়ত্ববিষয়ক সিদ্ধান্ত হিটগেনস্টাইন কোনোদিনই পরিত্যাগ করেন নি।

[দুই]

বচনের চিত্ররূপতাবাদ থেকে ভাষা ক্রীড়ায় উত্তরণ

২.১ বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় ঃ কিছু সমস্যা

হিটগেনস্টাইন-এর বহু ভাষ্যকার মনে করেন যে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে হিটগেনস্টাইন যে ভাষার স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছিলেন তা একপ্রকার আন্তর অভিজ্ঞতামূলক অবভাসবিষয়ক ভাষা (ফেনোমেনোলজিকাল ল্যাঙ্গুয়েজ)। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ব্যবহারিক পদার্থবিষয়ক ভাষার মূলে রয়েছে এইরূপ অবভাসবিষয়ক ভাষা। অবভাসবিষয়ক ভাষার কথা 'ট্র্যাকটেটস' একবারও উল্লিখিত না হওয়া সত্ত্বেও হিটগেনস্টাইন-এর ভাষ্যকারগণ কী কারণে ঐরূপ ভাষাকেই উক্ত গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয় বলে মনে করেছিলেন 'ট্র্যাকটেটস'-এর মূল সিদ্ধান্তসমূহ বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে।

বচনের চিত্ররূপতাবাদ অনুসারে চিত্র বা বচনমাত্রেরই একটি নির্দিষ্ট সংস্থান থাকে, যেহেতু চিত্রের অংশসমূহ একটি নির্দিষ্ট প্রকারেই বিন্যস্ত হয়ে থাকে। চিত্রের এবং বচনের সংস্থান নির্দিষ্ট হওয়ায় তাদের দ্বারা একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিই উপস্থাপিত হয়ে থাকে। এই কারণেই হিটগেনস্টাইন-এর মতে প্রতিটি বচনেরই একটি নির্দিষ্ট 'ডিটারমিনেট' তাৎপর্য বা 'সেন্স' থাকে। কোনো জটিল বচনের তাৎপর্য নিরূপণ করতে হলে বচনটির যৌক্তিক বিশ্লেষণ আবশ্যক। রাসেল তাঁর বর্ণনাসংক্রান্ত মতবাদে যেভাবে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট বর্ণনাযুক্ত বচনকে বিশ্লেষণ করেছিলেন, জটিল বচনসমূহকে বিশ্লেষণ করার জন্য হিটগেনস্টাইনও সেই জাতীয় প্রক্রিয়ারই অনুসরণ করেছেন। কোনো জটিল বচনকে বিশ্লেষণ করা হলে যেসব সরল বচন লাভ করা যায়, সেই সব সরল বচনের যৌক্তিক সমন্বয়ের দ্বারাই জটিল বচনটির তাৎপর্য নিরূপিত হয়ে থাকে। হিটগেনস্টাইন-এর মতে জটিল বচনের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া অন্তবিহীন নয়। জটিল বচনকে বিশ্লেষণ করতে করতে আণবিক বচনে ('এলিমেন্টারি প্রপজিশনসে') উপস্থিত হতে পারলেই জটিল বচনের বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া বিশ্রান্তি লাভ করে থাকে। আণবিক বচন না থাকলে জটিল বচনের বিশ্লেষণপ্রক্রিয়া অনন্ত হত, ফলে, কোনো বচনেরই নির্দিষ্ট

তাৎপর্য থাকত না। আণবিক বচনমাত্রই একাধিক যথার্থ নামেব সমন্বযে গঠিত হয। এই সব নামকে আব বিশ্লেষণ কবা যায় না বলেই আণবিক বচনেব বিশ্লেষণও সম্ভব নয। নামের বিশ্লেষণ সম্ভব নয বলেই নামেব বাচ্য বস্তুসমূহকেও (অবজেক্টস) হ্বিটগেনস্টাইন নিবংশ রূপেই গণ্য কবেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে হ্বিটগেনস্টাইন নামেব একমাত্র অর্থরূপে যে নিবংশ, অপবিবর্তনীয বস্তুসমূহ স্বীকাব করেছেন তাদেব স্বরূপ কী প্রকার? প্রথমতঃ তারা কি নির্ধমক শুদ্ধ ব্যক্তি (বেযার পার্টিকুলার) অথবা ধর্ম (প্রপার্টি), সম্বন্ধ (বিলেশন), প্রক্রিয়া (ফাংশান) প্রভৃতিও বস্তুরূপে গণ্য হতে পাবে? দ্বিতীয়ত এই সকল বস্তু কি প্রত্যক্ষযোগ্য অথবা প্রত্যক্ষেব অযোগ্য?

এই প্রশ্নেব উত্তবে জি ই এম অ্যানস্কোম্ব, জর্জ পিচাব, আই এম কোপি, বিচার্ড বার্নস্টাইন, প্রভৃতি দার্শনিকগণের মতে 'ট্র্যাকটেটস'-এব বস্তুকে শুদ্ধ নির্ধর্মক ব্যক্তিরূপেই গণ্য করা উচিত।

অপবপক্ষে এবিক স্টেনিযুস, আন্দ্রে ম্যবি, মেবিল বি হিন্টিক্কা, জাকো হিনটিক্কা প্রমুখ দার্শনিকগণেব মতে ধর্ম বা সম্বন্ধও বস্তুরূপে গৃহীত হতে পারে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জর্জ পিচাব, অ্যানথনি কেনি, প্রমুখ দার্শনিকগণ মনে করেন যে বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য নয়। আমরা কখনই আমাদের অভিজ্ঞতায নিবংশ বস্তুর সম্মুখীন হই না বলেই হ্বিটগেনস্টাইন বস্তুব কোনো দৃষ্টান্ত প্রদান কবেন নি বা বস্তুব নামেব সমন্বয়ে গঠিত কোনো আণবিক বচনেবও উল্লেখ করেন নি।

অন্যদিকে জাকো হিন্টিক্কা ও মেবিল বি হিন্টিক্কাব মতে সংবেদনেব (সেন্সেশন) দ্বাবা যে সকল সংবেদোপাত্ত (সেন্স-ডেটা) আমাদের নিকট অপবোক্ষরূপে প্রকাশিত হয়, সেই সকল সংবেদোপাত্তকেই, হ্বিটগেনস্টাইন বস্তুরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মধ্যবর্তী এবং শেষ পর্যায়েব দর্শনচিন্তায ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধই এই প্রবন্ধেব মূল আলোচ্য বিষয় হওয়ায এইস্থলে বস্তুব স্বরূপসংক্রান্ত মতভেদ বিস্তৃতরূপে আলোচনা করার কোনো অবকাশ নেই। আমাদের মনে হয় যে জাকো হিন্টিক্কা, মেবিল বি. হিন্টিক্কা প্রমুখ দার্শনিকগণকে অনুসরণ করে অবভাস্যকে বস্তু এবং অবভাসবিষয়ক ভাষাকে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থের প্রাথমিক ভাষারূপে প্রাইমাবি ল্যাঙ্গুয়েজ স্বীকাব কবলেই হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনচিন্তার বিবরণ সুসঙ্গতরূপে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। এই কারণেই জাকো হিন্টিক্কা ও মেরিল বি হিন্টিক্কা 'ইনভেস্টিগেটিং হ্বিটগেনস্টাইন' নামক গ্রন্থে তাঁদেব মতেব সপক্ষে যে সকল যুক্তি প্রদান করেছেন, তা এইস্থলে অতিসংক্ষেপে উপস্থাপন করা হবে। প্রসঙ্গক্রমে কোনো কোনো স্থলে অপরপক্ষের দার্শনিকগণেব যুক্তিও উল্লেখপূর্বক খন্ডন কবা হবে। প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে জাকো হিন্টিক্কা এবং মেবিল. বি হিন্টিক্কা বলেছেন যে 'নোটবুক্স'-এ হ্বিটগেনস্টাইন বস্তুতঃই ধর্ম এবং সম্বন্ধকে বস্তুরূপে উল্লেখ করেছেন, 'রিলেশনস অ্যান্ড প্রপারটিস, এট্সেট্রা, আব অবজেক্টস টু' ('নোটবুক্স,' ১৯১৪-১৯৯৬, পৃঃ ৬১, ১৬ জুন, ১৯১৫)

পববর্তীকালে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এ নাম ও তাব অর্থবিষযে নিজেব পূর্ববর্তী মত আলোচনা প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন 'বেড এক্সিসিস্টস' এইরূপ দৃষ্টান্তেব উল্লেখ কবেছেন,

"আই ওযান্ট টু বেস্ট্রিক্ট দা টার্ম 'নেম' টু হোযাট্ ক্যান নট্ অকাব ইন দ্য কম্বিনেশন 'x এক্সিস্টস' দাস্ ওয়ান ক্যান নট সে 'রেড্ এক্সিস্টস' বিকস ইফ দেযার ওযাব নো রেড ইট কুড নট বি স্পোকেন অব অ্যাট অল্" - বেটাব ঃ ইফ 'x এক্সসিস্টস' ইজ মেণ্ট সিম্পলি টু সে' 'x' হ্যাস এ মিনিংগ দেন ইট ইজ নট্ এ প্রপজিশন হুইচ্ ট্রিটস্ অব x, বাট এ প্রপজিশন অ্যাবাউট আওযাব ইয়ুস অব ল্যাঙ্গুযেজ, দ্যাট ইজ, অ্যাবাউট দা ইয়ুস অব দা ওযার্ড 'এক্স' ('পি আই' ৫৮)

'ফিলসফিকাল ইন্‌ভেস্টিগেশনস'-এব এই অংশে হ্বিটগেনস্টাইন যে 'ট্র্যাকটেটস'-এব সিদ্ধান্তসমূহেবই আলোচনা কবছেন তা এই অনুচ্ছেদেব পূর্ববর্তী ও পববর্তী কিছু অনুচ্ছেদ আলোচনা কবলেই বোঝা যায়। এইস্থলে 'বেড' নামেব দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হওয়ায় বোঝা যায যে প্রথম জীবনে তিনি ধর্মকে বস্তুব মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত কবেছিলেন।

আপত্তি হতে পাবে যে 'নোটবুক্স'-এ ধর্ম এবং সম্বন্ধ বস্তুরূপে স্বীকৃত হলেও 'ট্র্যাকটেটস' বচনাব সময তিনি এইরূপ মত পবিবর্তন কবে থাকতে পাবেন; এবং 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এ 'বেড এক্সসিস্টস' দৃষ্টান্ত আলোচনাকালে তিনি যে 'ট্র্যাকটেটস'-এব সিদ্ধান্তেবই আলোচনা কবছেন, তা কোথাও স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়নি। সুতবাং 'ট্র্যাকটেটস থেকেই যদি হিন্‌টিক্কা প্রমুখ দার্শনিকগণেব মতেব সপক্ষে প্রমাণ পাওযা না যায়, তবে ঐ গ্রন্থেব এইপ্রকাব ব্যাখ্যা স্বীকার করাবও যথেষ্ট কাবণ থাকবে না।

এইরূপ আপত্তিব উত্তবে জাকো এবং মেরিল বি হিন্‌টিক্কা বলেছেন যে 'ট্র্যাকটেটস'-এব ৫ ০২-সংখ্যক সূত্রই এই বিষয়ে প্রমাণ। ঐ সূত্রে হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন, দ্য আরগুমেন্টস অব ফাংকশানস আব বেডিলি কনফিউসড উইথ দা এ্যাফিক্সেস অব নেমস .... ফব এক্সাম্পেল, হোযেন বাসেল বাইটস '+c' দা 'c' ইজ অ্যান এ্যাফিক্স হুইচ ইনডিকেটস দ্যাট দা সাইন অ্যাজ এ হোল ইজ দা অ্যাডিশন-সাইন ফব কার্ডিনাল নাম্বাবস। বাট্ দা ইউস অব দিস সাইন ইজ দা বেসাল্ট অব আববিট্রাবি কন্‌ভেনশন অ্যান্ড ইট উড্ বি কোযাইট্ পসিবল টু চুজ্ এ সিম্পল সাইন ইনস্টেড অব '+c' .. (.... অ্যান অ্যাফিক্স ইজ অলওযেজ পার্ট অব এ ডেসিক্রিপশন অব দা অবজেক্ট টু হুজ নেম উই অ্যাট্যাচ্ ইট্)।'

এই সূত্রটি থেকে পবিষ্কাবভাবেই বোঝা যায় যে যোগপ্রক্রিযার বাচকচিহ্নটি একটি নামপদ। কাবণ প্রথমত, '+c' এই চিহ্নের সঙ্গে একটি উপাঙ্গ বা এ্যাফিক্স যুক্ত হয়ে থাকে এবং ঐ সূত্রে স্পষ্টরূপেই বলা হযেছে যে উপাঙ্গ বা এ্যাফিক্স কেবল নামপদেব সঙ্গেই যুক্ত হতে পাবে। দ্বিতীয়ত হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে '+c' একটি সিম্পল সাইন বা সবল চিহ্ন। 'ট্র্যাকটেটস'-এব 'সিম্পল সাইন' এই বাক্যাংশ যে নাম অর্থেই প্রযুক্ত হযেছে, সেই বিষয়ে 3.202-সংখ্যক সূত্রই প্রমাণ ... 'দা সিম্পল সাইনস এমপ্লযড ইন প্রপসিশনস আব কল্ড নেমস।' সুতরাং '+c' চিহ্নটি প্রক্রিয়াব বাচক হওয়া সত্ত্বেও নাম হওয়ায় প্রক্রিয়াকেও নামেব বাচ্য তথা বস্তুরূপে স্বীকার করতে হবে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে জাকো হিন্‌টিক্কা এবং মেবিল বি হিন্‌টিক্কা বলেছেন যে 'ট্র্যাকটেটস'-এর বস্তুকে অপরোক্ষ অনুভবের বিষয় বা অবভাস্যরূপে ব্যাখ্যা করা না হলে ঐ গ্রন্থের বহু সূত্র ব্যাখ্যাই করা যাবে না। উক্ত গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন, 'দা লিমিট্‌স অব মাই ল্যাঙ্গুয়েজ মিইন দা লিমিট্‌স অব মাই ওয়ার্ল্ড" ('টি এল. পি ' ৫.৬) 'আই অ্যাম মাই ওয়ার্ল্ড দা মাইক্রোকসম' 'টি এল পি.' ৫.৬৩। ৫.৬ সংখ্যক সূত্রে বিশ্বের আকার এবং উপাদানগত সীমার কথাই বলা হয়েছে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে বস্তুসমূহই জগতের উপাদান এবং বস্তুসমূহের আকারের দ্বারাই জগতের যাবতীয় বস্তুস্থিতির আকারও নিরূপিত হয়ে থাকে। বস্তু যদি অনুভবের অতীত পদার্থ হয়, তাহলে তাদের দ্বারা গঠিত বস্তুস্থিতির সমষ্টিরূপ বিশ্বকে বিষয়ীর সঙ্গে অভিন্ন বলার কোনো অর্থ হয় না। অপরপক্ষে বস্তুসমূহ যদি অপরোক্ষ অনুভবলব্ধ হয়, তবেই তাদের দ্বারা গঠিত বিশ্বকে বিষয়ীর সঙ্গে অভিন্ন বলা যেতে পারে। হ্বিটগেনস্টাইন অবশ্য একথা বলেন নি যে বস্তুর স্বরূপ কোনোভাবে বিষয়ীর দ্বারা নিরূপিত হয়ে থাকে বা বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ীর অস্তিত্বের অধীন। কিন্তু বস্তুসমূহ অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত না হলে তারা ভাষাব্যবহারের বা চিন্তার বিষয় হতে পারে না। এই কারণেই তাদের অপরোক্ষ অনুভবলব্ধ অবভাস্যরূপে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত।

বিশ্বের যা উপাদান, তা যে অভিজ্ঞতারও অংশ সেই বিষয়ে 'ট্র্যাকটেটস'-এ অন্য প্রমাণও বিদ্যমান। ঐ গ্রন্থে স্পষ্টতঃই বলা হয়েছে, 'দা ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড লাইফ আর ওয়ান' ('টি এল. পি ৫.৬২১), জীবন এবং বিশ্ব অভিন্ন হওয়ায় জীবনের যা উপাদান, তাকেই বিশ্বেরও উপাদান বলতে হবে। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে জীবন বলতে হ্বিটগেনস্টাইন কী বুঝেছেন? মৃত্যু সম্বন্ধে 'ট্র্যাকটেটস'-এ তিনি যা বলেছেন তার দ্বারাই তাঁর জীবন সম্পর্কিত ধারণার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁর মতে মৃত্যু অভিজ্ঞতায় প্রতীয়মান হয় না বলেই তা জীবনের কোনো ঘটনা নয়।[৮] সুতরাং জীবন অভিজ্ঞতারই সমষ্টি। ফলতঃ অভিজ্ঞতায় যা প্রতীয়মান হয়, তাকেই জীবনের অংশ বলতে হবে এবং ৫.৬২১ অনুসারে জীবনের অংশই বিশ্বেরও উপাদান হবে।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর যে সমস্ত ভাষ্যকার বস্তুকে প্রত্যক্ষযোগ্য বলেন না, তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে নামের যা বাচ্য তা যদি অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত না হয়, তবে নাম এবং বাচ্যের মধ্যে যে চিত্র-চিত্রিত সম্বন্ধ ভাষাকে জগতের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে সেই সম্বন্ধের জ্ঞানই উৎপন্ন না হওয়ায় জগৎবিষয়ে ভাষাব্যবহার এবং চিন্তা আবদ্ধই হতে পারত না। জর্জ পিচার এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপন করে[১০] তার নিরসন করতে বলেছেন যে বস্তু সমূহকে পৃথকরূপে জানা সম্ভব না হলেও তারা অন্য বস্তুস্থিতির সঙ্গে মিলিত হয়ে বস্তুস্থিতি গঠন করলে সেই বস্তুস্থিতিকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে এবং বস্তুস্থিতির জ্ঞানের দ্বারাই ঐ বস্তুস্থিতির উপাদানীভূত বস্তুসমূহের আকার বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বহু অসুবিধা যে থেকেই যায়, তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, 'ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু সি ফর এক্স্যাম্পল, হাউ এ নেম ক্যান বি কোরিলেটেড উইথ অ্যান অবজেক্ট, হাউ আই ক্যান মিন দা নেম

'এ' টু দ্যাট অবজেক্ট, হোয়েন আই কান্ট পিক ইট আউট ফ্রম আদার্স উইথ হুইচ ইট ইজ কন্‌ফিগাবড ইন এ স্টেট অব অ্যাফেয়ার্স।' জর্জ পিচার, পৃঃ ১৩৬।

পিচার বলেছেন যে বস্তুকে প্রত্যক্ষযোগ্য বলার পথে সর্বাপেক্ষা গুরুতর বাধা এই যে শুদ্ধ ব্যক্তি কখনও অভিজ্ঞতাগোচর হতে পারে না। বস্তুসমূহ যদি গুণ বা সামান্য ধর্ম হত, তবে তাদের প্রত্যক্ষযোগ্য বলায় বিশেষ কোনো অসুবিধা থাকত না। কিন্তু আমরা পূর্বেই লক্ষ্য করেছি যে গুণ বা সম্বন্ধকে বস্তুরূপে গণ্য করার সপক্ষেও যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান। সুতরাং বস্তু প্রত্যক্ষগোচর হতেই পারে না, এইরূপ সিদ্ধান্তও 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থের দ্বাবা নিঃসন্দিগ্ধরূপে সমর্থিত নয়।

অপরপক্ষে জাকো এবং মেরিল বি হিন্‌টিক্কা প্রদর্শন করেছেন যে ১৯৩০-৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত হ্বিটগেনস্টাইন-এব বক্তৃতামালাব যে সংকলন ডেসমন্ড লি কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে, তাতে হ্বিটগেনস্টাইন স্পষ্টতঃই অপরোক্ষ অনুভবে প্রতীয়মান বিষযসমূহকেই বস্তুরূপে স্বীকার করেছন, 'অবজেক্টস এটসেটবা, ইজ হিয়ার ইউসড ফর সাচ থিংস অ্যাজ্ এ কালাব এ পয়েন্ট ইন ভিসুয়াল স্পেস, এটসেটবা' ডেসমন্ড লি সম্পাদিত 'হ্বিটগেনস্টাইনস লেকচার্স', পৃঃ ১২০।

প্রশ্ন হতে পাবে যে 'ট্র্যাকটেটস'-এ কী জাতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, সেই বিষয়ে ঐ গ্রন্থে কোনো মন্তব্য নেই কেন?

এর উত্তর এই যে কোনো বস্তুর উল্লেখপূর্বক তার সম্বন্ধে অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বেব বিধান করা হলে পুনরুক্তি অথবা স্ববিরোধ দোষ হবে। কারণ নামের যেহেতু বস্তু ব্যতিরেকে অন্য কোনো অর্থ থাকতে পারে না, সেইহেতু কোনো নাম যদি কোনো ভাষায় অর্থপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তাব বাচ্য বস্তুটি সৎ। 'ক', এই নামের অর্থ বুঝলেই তার বাচ্যেব অস্তিত্বেরও জ্ঞান হয় বলে 'ক আছে' এই বাক্য পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট। অপবপক্ষে ঐরূপ অর্থপূর্ণ নাম ব্যবহার কবে যদি 'ক নেই' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করা হয়, তবে সেই বাক্য স্ববিরোধদোষে দুষ্ট হবে। এই কাবণেই বস্তুর অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব কোনো বচনের দ্বারা বর্ণিত হতে পাবে না। হ্বিটগেনস্টাইন-এর এইরূপ মতই 'বস্তুসত্তাব অনির্বচনীয়ত্ববাদ' (দা ইন্‌এফেবিলিটি অব অবজেকচুয়াল একসিস্‌টেন্স) নামে প্রসিদ্ধ। তাঁব মতে ভাষায় নামের অর্থপূর্ণ ব্যবহাবের দ্বারাই নামেব বাচ্যেব অস্তিত্ব প্রদর্শিত হয়ে থাকে। বস্তুর অস্তিত্ব আলোচনার বিষয় হতে পারে না বলেই হ্বিটগেনস্টাইন ঐ বিষযে কোনো আলোচনা কবেন নি। কী কী নাম অর্থপূর্ণরূপে কোনো একটি ভাষায় বস্তুতঃপক্ষে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তার আলোচনা বাস্তব অভিজ্ঞতানির্ভর হওয়ায় তা যুক্তিবিদ্যাব আলোচ্যও হতে পাবে না।

'ট্র্যাকটেটস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন যেমন বস্তুব স্বরূপ বা কী জাতীয় বস্তুর অস্তিত্ব আছে, এই সব বিষয়ে কোনো আলোচনা কবেন নি, সেইরূপ নাম এবং বস্তুর সম্বন্ধের স্বরূপবিষয়েও ঐ গ্রন্থে কোনো আলোচনা দৃষ্ট হয না। বস্তু যদি অপরোক্ষ অনুভবগোচর হয়, তবে অবশ্য এই বিষয়ে গ্রন্থকাবেব নীববতা সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। কাবণ বস্তুসমূহ যদি অপরোক্ষ

অনুভবের দ্বারা জ্ঞাত হয়, তবে নামের অর্থ প্রদর্শক লক্ষণের অস্টেনসিভ ডেফিনিশন) দ্বারাই জানা যেতে পারে এবং নাম এবং বাচ্যের সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করবারও আর কোনো প্রয়োজন থাকে না।

এইরূপ অবভাস্য বিষয়ই যদি বস্তুরূপে গৃহীত হয়, তবে স্বীকার করতে হবে যে অবভাসবিষয়ক ভাষাই দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষার ভিত্তি। 'ট্র্যাকটেটস'-এর মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিটগেনস্টাইন পরবর্তীকালে এইরূপ মতই প্রকাশ করেছেন, 'সেন্স ডেটা আর দা সোর্স অব আওয়ার কন্‌সেপ্টস' ('হিটগেনস্টাইনস লেকচারর্স,' কেমব্রিজ ১৯৩০-১৯৩২, পৃঃ ৮১)

সুতরাং অবভাসবিষয়ক ভাষাকেই 'ট্র্যাকটেটস'-এর প্রাথমিক ভাষা (প্রাইমারি ল্যাঙ্গুয়েজ) রূপে স্বীকার করতে হবে এবং প্রদর্শক লক্ষণের দ্বারাই ঐরূপ ভাষার অন্তর্গত নামসমূহের সঙ্গে জগতের ক্ষুদ্রতম অংশের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে।

২.২ হিটগেনস্টাইন-এর মত পরিবর্তন

হিটগেনস্টাইন-এর জীবনীকারগণ বলেছেন যে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'ট্র্যাকটেটস'-এ ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি কিছুকাল দর্শনচর্চা থেকে বিরত থাকেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় পর্যায়ের দর্শনচর্চা আরম্ভ করার পরই হিটগেনস্টাইন অবভাসবিষয়ক ভাষা সম্বন্ধে তাঁর পূর্ববর্তী মত পরিবর্তন করেন। এই সময়ে রচিত তাঁর একটি মন্তব্য - যা পরে 'ফিলসফিকাল রিমার্কস' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল - থেকে জানা যায় যে অবভাসবিষয়ক ভাষাকে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ব্যাবহারিক পদার্থবিষয়ক ভাষার ভিত্তিরূপে স্বীকার করা আর তাঁর অভিপ্রেত ছিল না।[১১]

প্রশ্ন হবে যে কী কারণে হিটগেনস্টাইন এই সময় অবভাসবিষয়ক ভাষাকে প্রাথমিক ভাষার স্থান থেকে বিচ্যুত করেছিলেন?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে এই সময়েই হিটগেনস্টাইন লক্ষ্য করতে শুরু করেন যে ব্যাবহারিক পদার্থবিষয়ক ভাষার ব্যবহার অবভাসবিষয়ক ভাষার অধীন নয়, বরং অবভাসবিষয়ক আলোচনাই ব্যাবহারিক ভাষার প্রয়োগকে অপেক্ষা করে এবং যে সমস্ত আলোচনা ব্যাবহারিক পদার্থের ক্ষেত্রেই যুক্তিসঙ্গত, ভ্রান্তিবশতঃ দার্শনিকগণ প্রায়শঃই অবভাসবিষয়েও সেই জাতীয় আলোচনা করে থাকেন। তাঁর 'দা বিগ টাইপস্ক্রিপ্ট' নামে প্রসিদ্ধ 'ফেনোমেনোলজি ইজ গ্রামার' শীর্ষক পাণ্ডুলিপিতে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যায়।[১২]

এই অপ্রকাশিত রচনায় হিটগেনস্টাইন প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন যে কোনো অবভাসের ক্ষেত্রে 'বস্তু', 'ধর্মী' বা 'ধর্ম', ইত্যাদি শব্দপ্রয়োগের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম করা যায় না। কোনো চাক্ষুষ সংবেদনে যদি একটি নীল প্রেক্ষাপটে দুটি রক্তিম বিন্দুর প্রতিভাস হয় তবে সংশয় থেকে যায় যে ঐ প্রতিভাসে একই রক্তরূপ কি দুটি স্থানে প্রতীয়মান হয়েছে অথবা ঐ স্থলে দুটি সমান আকৃতি ও বর্ণযুক্ত বিন্দুই প্রতীয়মান হয়েছে? প্রথম ব্যাখ্যা অনুসারে

বক্তরূপেব প্রতিভাসকে বস্তুরূপে এবং তাব দৈহিক অবস্থান এবং আকাবেব প্রতিভাসকে ধর্মরূপে গণ্য করতে হবে। অপরপক্ষে উক্ত প্রতিভাসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা স্বীকৃত হলে এইস্থলে বিন্দুর প্রতিভাসকে বস্তু এবং রক্তরূপ ও গোলাকৃতির প্রতিভাসকে ঐ বস্তুর ধর্মরূপে গণ্য করতে হবে। প্রতিভাসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এইরূপ সংশয়ই প্রমাণ করে যে প্রতিভাসেব ক্ষেত্রে 'বস্তু', 'ধর্ম', প্রভৃতি পদের মুখ্যপ্রয়োগ সম্ভব নয়। ব্যাবহারিক পদার্থের সঙ্গে সাম্যবশতঃই প্রতিভাসের ক্ষেত্রে ঐ সকল পদেব গৌণ প্রয়োগ হযে থাকে। এই ছবিতে দুটি বর্ণ আছে - এইরূপ ব্যাবহারিক পদার্থবিষয়ক বাক্যে যেমন রূপ বিষয়ে দ্বিত্ব বিশেষণ প্রয়োগ করা হয়েছে, সেইরূপ পূর্বোক্ত প্রথম ব্যাখ্যাতেও রূপকেই ধর্মী এবং তাব আকৃতি, অবস্থান ও সংখ্যাকে ধর্ম বলা হয়েছে। অপরপক্ষে উক্ত প্রতিভাসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় প্রতিভাসটিকে 'এইস্থানে দুটি লাল বল আছে , এইরূপ ব্যাবহারিক পদার্থবিষযক জ্ঞানেব সঙ্গে তুলনীযরূপে গণ্য কবা হযেছে। প্রতিভাসকে যখনই ভাষায় প্রকাশ কবা হয, তখনই ব্যাবহারিক পদার্থবিষযক ভাষার উপব এইভাবে নির্ভব কবতে হয বলেই অবভাসবিষযক ভাষাকে ব্যাবহারিক পদার্থবিষযক ভাষাব ভিত্তিরূপে গণ্য কবাব কোনই কাবণ নেই।

হিটগেনস্টাইন-এব 'ফিলসফিকাল বিমার্কস' গ্রন্থ এবং ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বচিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে অন্য একটি কারণেও তিনি এই সমযে অবভাসবিষযক ভাষাকে অসম্ভব এবং অপ্রযোজনীয় বলে মনে করতে আবম্ভ করেছিলেন। তিনি এই সময লক্ষ্য কবেন যে অবভাসবিষয়ক ভাষাব সত্যাসত্যনিরূপণ (ভেবিফিকেশন) সম্ভবই নয। কারণ কোনো বচনেব সত্যমূল্য নিরূপণ কবতে হলে বচনটিকে বাস্তব জগতেব সঙ্গে তুলনা কবা প্রয়োজন। 'ট্র্যাকটেটস'-এ তিনি লিখেছিলেন, 'রিযালিটি ইজ কম্পেয়ারড্ উইথ প্রপজিশনস' ('টি এল পি ' ৪.০৫) দ্বিতীয় পর্যাযে দর্শনচর্চা আবম্ভ কবেও তিনি লিখছেন, 'আই মাস্ট বিয়ালি কমপেয়াব বিযালিটি উইথ এ প্রপজিশসন' (ভন রিক্ট-এর পাণ্ডুলিপি সংখ্যা অনুসাবে ১০৭, জাকো হিন্‌টিক্কা কর্তৃক অনুদিত, জাকো হিনটিক্কা মেরিল. বি হিন্‌টিক্কা, 'ইনভেস্টিগেটিং হিটগেনস্টাইন,' পৃঃ ১৬৫)

এই সমস্ত রচনাতে হিটগেনস্টাইন বচনেব সঙ্গে বস্তুস্থিতিব সাক্ষাৎ তুলনাব কথাই বলতে চেয়েছেন, তাঁব মতে বস্তুস্থিতিব সঙ্গে এইরূপ সাক্ষাৎ তুলনা ব্যতিরেকে বচনেব সত্যাসত্যনিরূপণ সম্ভবই নয।[১৩]

কিন্তু বচনমাত্রই যদি এইভাবে জগতেব সঙ্গে তুলনীয হয তাহলে অবভাসবিষযক ভাষা নিতান্তই অসম্ভব হবে। কাবণ ভাষা সম্পূর্ণরূপে ব্যাবহারিক জড জগতেব অংশ। এইকাবণে ভাষা ব্যাবহারিক জড জগতেব বর্ণনা কবতে পাবে এবং সেই জগতেব সঙ্গেই তাব তুলনা সম্ভব হতে পাবে। যে নিজে ব্যাবহারিক জগতেব অঙ্গ সে কীভাবে যা ব্যাবহারিক জগতেব অঙ্গ নয় সেই প্রতিভাসকে ব্যক্ত কবতে সক্ষম হবে?[১৪]

যখনই ব্যাবহারিক ভাষা প্রয়োগ কবে প্রতিভাসকে প্রকাশ কবাব চেষ্টা কবা হয, তখনই দার্শনিক অপসিদ্ধান্তেব উদ্ভব হয।[১৫]

কিন্তু অবভাসবিষয়ক ভাষা যদি অসম্ভব হয় এবং ব্যাবহারিক ভাষাই যদি একমাত্র সম্ভবপর ভাষা হয়, তাহলে ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধবিষয়ে বহু নতুন সমস্যার উদ্ভব হবে। কারণ অবভাসবিষয়ক ভাষায় অবভাসই নামের বাচ্য হওয়ায় নামের অর্থ অভিজ্ঞতায় সাক্ষাৎভাবে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এইরূপ ভাষার ক্ষেত্রে নামের অর্থ কীরূপে প্রতীয়মান হয় এবং নাম-বাচ্য সম্বন্ধের স্বরূপ কী প্রকার, এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধান সহজেই করা যায়। কিন্তু ব্যাবহারিক ভাষার ক্ষেত্রে এই সকল প্রশ্নের সমাধান সহজ নয়। কারণ প্রথমতঃ, ব্যাবহারিক ভাষায় যে সব পদার্থবিষয়ে বাক্যপ্রয়োগ করা হয় তারা প্রায়শঃই অতি ক্ষুদ্র বা অতি বৃহৎ। ফলতঃ ব্যাবহারিক ভাষার অন্তর্গত সমস্ত নামের অর্থ অভিজ্ঞতায় সাক্ষাৎভাবে প্রদর্শিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, ব্যাবহারিক ভাষায় নাম ও বাচ্যের মধ্যে সম্বন্ধও অনেক জটিল। সেক্ষেত্রে একই নাম বিভিন্ন পদার্থকে এবং বিভিন্ন নাম একই পদার্থকে উপস্থাপন করতে সক্ষম। ব্যাবহারিক ভাষায় এমন বহু নামপদ ব্যবহৃত হয়, যাদের বাচ্য অভিজ্ঞতায় উপস্থাপিত হতে পারে না, যেমন 'ভারত' এই নামপদের বাচ্যকে প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। সামান্য ধর্ম বা সকল গুণবাচক পদসমূহের অর্থও সাক্ষাৎরূপে প্রদর্শিত হতে পারে কি না, এই প্রশ্নও এই সময় হুইটগেনস্টাইনকে চিন্তিত করেছিল। অবশ্য 'দা ব্লু বুক' প্রণয়ন করার সময়ও হুইটগেনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে নামের বাচ্য প্রদর্শক লক্ষণের দ্বারাই নিরূপিত হয়ে থাকে। 'ফিলসফিকাল গ্রামার'-এও তিনি এইরূপ মতই প্রকাশ করেছেন।[৮] দর্শনচর্চার এই মধ্যবর্তী পর্যায়ে হুইটগেনস্টাইন প্রদর্শক লক্ষণের গুরুত্ব অস্বীকার না করলেও এই জাতীয় লক্ষণের সমস্যা বিষয়েও যে তিনি অনবহিত ছিলেন না, তাও অতি স্পষ্ট। 'দা 'ব্লু বুক'-এ প্রদর্শক লক্ষণের কথা উল্লেখ করার অব্যবহিত পরেই তিনি লিখেছেন, 'নিড্ দা অস্টেনসিভ ডেফিনিশন ইটসেল্ফ বি আন্ডারস্টুড? কান্ট দা অস্টেনসিভ ডেফিনিশন বি মিস্ আন্ডারস্টুড?' ('দা ব্লু বুক,' পৃঃ ১)

হুইটগেনস্টাইন-এর তাৎপর্য্য এই যে প্রদর্শক লক্ষণের দ্বারা নামের অর্থ নিরূপণেও বহু বিভ্রান্তি হতে পারে। যেমন একটি শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট মার্জারের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে যদি 'ক', এই নামপদটি প্রয়োগ করা হয়, তবে, প্রশ্ন হতে পারে যে 'ক' কী ঐ মার্জারের ব্যক্তিনাম? অথবা 'ক' পদটি যে কোনো মার্জার অর্থেই প্রযুক্ত হয়ে থাকে? অথবা 'ক' পদ মার্জারের কোনো অঙ্গের বাচক? অথবা 'ক' পদের দ্বারা শ্বেতবর্ণেরই উল্লেখ করা হয়েছে? অথবা এইস্থলে মার্জারের একত্বসংখ্যার প্রতি নির্দেশ করার জন্যই 'ক' পদটি ব্যবহার করা হয়েছে? অথবা 'ক' পদের দ্বারা মার্জারত্বরূপ সামান্য ধর্মই উল্লিখিত হয়েছে? অথবা 'ক' পদের দ্বারা মার্জারের বসার বিশেষ ভঙ্গীটিরই উল্লেখ করা হয়েছে? সুতরাং প্রদর্শক লক্ষণের লক্ষ্যটি কী প্রকার পদার্থ, তা জানা না থাকলে ঐরূপ লক্ষণের দ্বারা নামের বাচ্য নিরূপণ সম্ভবই নয়।

শুধু তাই নয়, প্রদর্শক লক্ষণের দ্বারা পুরোবর্তী, বর্তমানকালীন ও মূর্ত পদার্থের (কন্‌ক্রিট এনটিটি) বাচক নামপদের অর্থনিরূপণ যদিও বা সম্ভব হয়, এই জাতীয় লক্ষণের দ্বারা

বিমূর্তপদার্থবাচক নামপদের অর্থ নিরূপণ করা যায় না। অতীত, অনাগত এবং দূরবর্তী পদার্থেব বাচক নামপদের অর্থও প্রদর্শক লক্ষণের দ্বারা নির্ণয় করা যায় না। অন্য ব্যক্তি বা প্রাণীর অনুভূতি, সংবেদন প্রভৃতির উল্লেখ করার জন্য যে সকল পদ ব্যবহার করা হয়, সেই সকল পদের অর্থও এইরূপ লক্ষনের দ্বারা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, 'এই', 'এখানে', প্রভৃতি যে সকল পদ ব্যবহার করে প্রদর্শক লক্ষণ প্রয়োগ করা হয়, সেই সব পদের অর্থই বা প্রদর্শক লক্ষণেব দ্বারা কীরূপে নিরূপিত হবে?

ব্যাবহাবিক ভাষাকে একমাত্র সম্ভবপর ভাষারূপে গ্রহণ করার পর হ্বিটগেনস্টাইন শুধু যে নাম-বাচ্য সম্বন্ধের স্বরূপ বিষয়েই নতুন কবে চিন্তা আরম্ভ করেছিলেন তাই নয়, নাম-বাচ্য স্বম্বন্ধকেই পদ-পদার্থেব সম্বন্ধেব মূল ভিত্তিরূপে গণ্য করা যায় কি না সেই বিষযেও তাঁর বহু সংশয় উপস্থিত হয়। নাম-বাচ্য সম্বন্ধকেই যদি ভাষা এবং জগতেব সম্বন্ধের মূল ভিত্তি বলে মনে করা হয়, তাহলে নামপদের অর্থ যেভাবে নিরূপণ করা হয়, সেইভাবেই ভাষার অন্তর্গত সমস্ত পদেব অর্থ নির্ণয় করতে হবে। সেক্ষেত্রে যে কোনো পদের অর্থনির্ণয়ের জন্যই কোনো একটি বস্তুকে তাব অর্থরূপে নির্দেশ করতে হবে। কিন্তু যে কোনো ভাষাতেই এমন বহু পদ আছে যাবা একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে ভাষায় 'এবং', 'অথবা', প্রভৃতি যে সকল সংযোজক ব্যবহৃত হয়, তাবা কোনো নির্দিষ্ট বস্তুকে নির্দেশ করে না; 'বা·' 'আহা', এই জাতীয় পদকেও কোনো নির্দিষ্ট পদার্থেব বাচকরূপে গণ্য করা যায় না। শুধু তাই নয়, দৈনন্দিন ভাষায় এমন বহু পদ থাকে যাদেব ব্যবহাবের কোনো নির্দিষ্ট বিধি প্রণয়ন কবা যায় না; যেমন 'সময়', 'পরিমাপ' প্রভৃতি পদ। হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে এই সমস্ত পদের ব্যবহার ব্যাখ্যার জন্য যখনই অনুগত নিয়ম প্রণয়নেব চেষ্টা কবা হয়, তখনই দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।[১৭] এই সব সমস্যা লক্ষ্য করেই হ্বিটগেনস্টাইন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সমস্ত পদেব সঙ্গে তাদেব অর্থেব সম্বন্ধ কোনোভাবেই নাম-বাচ্য সম্বন্ধের অনুরূপ নয়।

নাম ও বাচ্যের সম্বন্ধ যদি ভাষা ও জগতেব সম্বন্ধের মূল ভিত্তি না হয়, তাহলে প্রদর্শক লক্ষণের দ্বাবা সকল প্রকার পদের সঙ্গে তাদের অর্থের সম্বন্ধ স্থাপিতও হবে না। ফলে প্রশ্ন হবে যে ভাষার সঙ্গে জগতেব সম্বন্ধ কী কবে স্থাপিত হয়?

'দা ব্লু অ্যাণ্ড ব্রাউন বুক্স', 'ফিলসফিকাল গ্রামার' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনাকালে হ্বিটগেনস্টাইন ভাষাব্যবহারের বিভিন্ন প্রকার নিয়মের দ্বারাই এই সম্বন্ধ স্থাপনের প্রয়াস করেছিলেন।[১৮]

ভাষা প্রয়োগের এই সমস্ত নিয়মই যে এই পর্যাযে ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধেব মূল ভিত্তিরূপে তাঁর নিকট গৃহীত হয়েছিল, সেকথাও তাঁর রচনাতে পরিষ্কারভাবে উল্লিখিত হয়েছে, 'ইউ ক্যান নট্ গেট্ বিহাইন্ড দা রুল্স, বিকস দেয়ার ইজনট এনি বিহাইন্ড' ('ফিলসফিকাল গ্রামার' II, পৃঃ ২৪৪)

প্রদর্শক লক্ষণের বহু অসুবিধে লক্ষ্য করা সত্ত্বেও হ্বিটগেনস্টাইন এইসময় এইপ্রকার

লক্ষণের আবশ্যকতা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন নি; কারণ প্রদর্শক লক্ষণেব দ্বারা অন্ততঃ কিছু পদ ব্যবহারের নিয়ম নির্ধারিণ কবা যায়। তিনি অবশ্য শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেন যে প্রদর্শক লক্ষণের দ্বারা নামপদ ব্যবহাবের নিয়ম নির্ধারিণ করা যায় না। কারণ এইপ্রকার লক্ষণের দ্বারা কেবল সাধারণ ব্যাবহারিক ভাষার সঙ্গে কিছু শারিরীক ইঙ্গিতের (জেসচার্স) সম্বন্ধমাত্র স্থাপন করা যায়। যিনি এইপ্রকার ইঙ্গিতেব ভাষা বোঝেন না, তিনি প্রদর্শক লক্ষণের দ্বারা নামের বাচ্য নিরূপণ করতেই পারেন না। সুতরাং প্রদর্শক লক্ষণ কেবল সাধারণ ভাষাকে একপ্রকার শারীর-ভাষায় অনুবাদ করতে পারে; যেসব নিয়মের দ্বারা নাম ও বাচ্যেব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, প্রদর্শক লক্ষণ থেকে সেরকম কোনো নিয়ম পাওয়া যায় না।

কিন্তু নিয়মের দ্বারা বচনেব সঙ্গে জগতের সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস করা হলেও বহু সমস্যা থেকেই যায়। যেমন প্রশ্ন হতে পারে যে এই সমস্ত নিয়ম কী জাতীয় পদার্থ? কীভাবেই বা এই সকল নিয়ম ভাষা এবং জগতের মধ্যে সম্বন্ধস্থাপন করে থাকে? শুধু তাই নয়, নিয়মের দ্বারা ভাষাব সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, একথা বলা হলে সেই সম্বন্ধের স্বরূপবিষয়ে কিছুই বলা হয় না, বরং ভাষা এবং জগতেব মধ্যে একটি তৃতীয পদার্থ স্বীকার করার ফলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ হ্বিটগেনস্টাইন চিবকালই মধ্যবর্তী পদার্থ স্বীকারেব বিরোধীই ছিলেন।

ভাষাপ্রযোগ নিয়ম অনুসাবেই হয়ে থাকে, একথা স্বীকাব করলেই যে ভাষাসংক্রান্ত সমস্ত সমস্যাব সমাধান হয় না, তা প্রতিপাদনের জন্য হ্বিটগেনস্টাইন 'ফিলসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ('ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস,' I, সেকশনস ১৪৩-২৪২ দ্রষ্টব্য) এই গ্রন্থে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যে 'নিযম অনুসবণ করা' এই বাক্যাংশের অর্থ কী? আমবা কখন বলতে পারি যে কোনো ব্যক্তি একটি নিযম অনুসরণ করেই কোনো ক্রিয়াব অনুষ্ঠান করছেন? এই প্রশ্নেব উত্তরে 'দা ব্লু বুক' গ্রন্থে (পৃঃ ১২-১৩) হ্বিটগেনস্টাইন বলেছিলেন যে কোনো ক্রিয়ার পূর্বে যেসব চিন্তা করা হয়, নিয়মের প্রতীকী রূপটি যদি সেই চিন্তার অংশ হয়, তবেই বলা যেতে পাবে যে ঐ ব্যক্তি সচেতনভাবে নি: ম অনুসবণ করে ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করলেন। পরবর্তীকালে 'ফিলসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস' রচনার সময়ে তিনি অবশ্য এই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেছেন। কারণ কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠানেব পূর্বে কেউ যদি কোনো নিয়মেব কথা চিন্তা কবেও থাকেন, তাব দ্বারাই প্রমাণিত হয় না যে ঐ নিয়ম অনুসবণ কবেই তিনি ঐ ক্রিয়া করেছেন। অন্য কোনো চিন্তা বা আবেগেব দ্বারা প্রবৃত্ত হয়েও তিনি ঐ একই ক্রিয়া কবে থাকতে পাবেন। যদি বলা হয় যে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কোনো নিয়মের প্রতীকী রূপটিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হলে তবেই বলা যায় যে তিনি নিয়মটিকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয়েছেন, তবে তার উত্তবে হ্বিটগেনস্টাইন বলবেন যে কোনো একটি স্থলে নিয়মের প্রতীকটি যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়েছে কি না, তা কীভাবে স্থির করা হবে? 'ফিলসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থে এই সমস্ত প্রশ্নেব উত্তরে

তিনি বলেছেন, কোনো একটি ক্রিয়া নিয়ম অনুসরণ করে অনুষ্ঠিত হয়েছে কি না, তা স্থিব করতে হলে অনুষ্ঠানকর্তার চিন্তা বা মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার কোনো প্রয়োজন নেই; কারণ প্রথমত অন্যেব ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এইরূপ বিশ্লেষণ সম্ভবই নয়; দ্বিতীয়ত, এইরূপ বিশ্লেষণের দ্বাবা কোনো একটি ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিয়ম অনুসৃত হযেছে কি না, তা নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ কবাও সম্ভব নয়। এ কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কোনো ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের পূর্বে কোনো নিয়মেব কথা চিন্তা করা হলেও ক্রিয়াটি যে ঐ নিয়ম অনুসরণ করেই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার কোনো নিযম নেই। এই কারণেই হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন যে কোনো ক্ষেত্রে একটি নিয়ম অনুসৃত হয়েছে কি না, তা স্থিব করতে হলে ক্রিয়াটির ব্যবহাবগত পরিপ্রেক্ষিত (বিহেভিযারল কনটেক্সট) আলোচনা করা প্রয়োজন। যেমন ঐ ব্যক্তিকে ঐ নিযম অনুসাবে কাজ করতে শিক্ষা দেওযা হয়েছিল কি না? ঐ জাতীয নিযম পালনে সে অভ্যস্ত কি না? এই সব প্রশ্নেব উত্তবের উপরই নির্ভর করে যে কোনো ব্যক্তি নিয়ম অনুসাবেই কোনো ক্রিয়াবিশেষেব অনুষ্ঠান কবেছেন কি না। লক্ষণীয় বিষয় এই যে বহু মানুষের একজাতীয় ভাষাব্যবহার ও জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটেই এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন কবা যায় এবং এই সব প্রশ্নেব উত্তর প্রদান কবা যায়।[১৯] যে সকল ভাষাগত ও জৈব-সামাজিক ব্যবহাবেব পবিপ্রেক্ষিতে নিয়ম অনুসবণ করা সম্ভব হয়, তাদেরই হ্বিটগেনস্টাইন ভাষাক্রীড়া (ল্যাঙ্গুয়েজ গেম) রূপে অভিহিত কবেছেন, এবং প্রথম জীবনে ভাষাব স্বরূপ নির্ণযের জন্য ও ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার জন্য তিনি যেমন বচনের চিত্ররূপতা ও নাম-বস্তু-সম্বন্ধকে ব্যবহাব করেছিলেন, মধ্যবর্তী পর্যায়ে যেমন ভাষার ব্যবহারবিধি বা নিযমসমূহেব দ্বাবা ঐ একই উদ্দেশ্য সাধন কবতে চেযেছিলেন, দার্শনিক জীবনেব শেষ পর্যায়ে সেইরূপ ভাষাক্রীডাব দ্বারা একই সঙ্গে ভাষার স্বরূপ এবং ভাষা ও জগতেব সম্বন্ধ, এই উভযই উপাদানেব প্রযাস করেছেন।

[তিন]

ভাযাক্রীড়া

৩.১ সাধারণ ভাষা কি একপ্রকার ক্যালকুলাস বা গণিতবিশেষ?

ভাষাক্রীডাব কথা হ্বিটগেনস্টাইন প্রথম উল্লেখ করেন 'দা ব্লু বুক'-এ। 'ফিলসফিকাল গ্রামাব' গ্রন্থেও তিনি সাধাবণ ভাষাব সঙ্গে দাবা প্রভৃতি খেলাব সাদৃশ্য বিষযে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁব নিজেবই একটি পুরাতন সিদ্ধান্ত সমালোচনাব মধ্যেই নিহিত ছিল ভাষাক্রীডাব ধাবণাব বীজ। 'ট্র্যাকটেটস' বচনাব সময় তিনি নামের দ্বারা গঠিত আণবিক বচনসমূহকে পরস্পব নিরপেক্ষরূপেই গণ্য করেছিলেন; কাবণ তাঁব মতে যদি অনুমানের দ্বাবা 'p' বচনেব থেকে 'q' বচনকে লাভ কবা যায়, তাহলে 'p' অবশ্যই একটি জটিল

বচন হবে 'q'-এব তাৎপর্য্য কোনো না কোনো ভাবে 'p'-এব তাৎপর্যের মধ্যে নিহিত থাকবে। কিন্তু 'ফিলসফিকাল বিমার্কস' গ্রন্থে তিনি স্বযং, বিস্তৃতভাবে, এই সিদ্ধান্ত খন্ডন কবেছেন ('ফিলসফিকাল রিমার্কস,' ৮-viii)। ঐ স্থলে তিনি প্রতিপাদন কবেছেন যে যেমন 'ক একটি লাল বস্তু', এই বচনেব থেকে যেমন জানা যায় যে 'ক সবুজ নয়' বা 'ক হলুদ নয়', সেইরূপ আণবিক বচনেব ক্ষেত্রেও একটি বচন অন্য বচনেব সত্যতাপ্রক্রিয়া (ট্রুথ ফাংশন) না হওযা সত্ত্বেও একটিকে অপরটিব থেকে অনুমান করে পাওয়া যেতে পারে, যেহেতু দুই বা ততোধিক বচনে এমন নাম থাকতে পাবে যারা একই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নানা পবস্পববিরুদ্ধ ধর্মেব বাচক। এই কাবণেই 'ফিলসফিকাল রিমার্কস' গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে কোনো ভাষাব অন্তর্গত বচনসমূহ বিভিন্ন বচনতন্ত্রে (সাট্জ সিসটেম) বিভক্ত। একই তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত বচন সমূহ একই সঙ্গে সত্য হতে পারে না। সুতবাং তাদেব মধ্যে একটি বচনের সত্যতা নিরূপিত হলে অন্যান্য বচনেব সত্যমূল্যও নিরূপণ করা যায, যদিও এদের মধ্যে কোনো বচনই অন্যদেব সত্যতা-প্রক্রিযা নয। এইরূপে 'ফিলসফিকাল রিমার্কস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন সাধাবণ ভাষাকে একপ্রকার ক্যালকুলাস রূপে গণ্য কবলেও 'ফিলসফিকাল গ্রামার' বচনা-কালে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে সাধাবণ ভাষার সঙ্গে যে কোনো ক্যালকুলাস-এর যত সাদৃশ্য আছে, ক্রীডাব সঙ্গে তার থেকে অধিকতর সাদৃশ্য বিদ্যমান। কারণ যে কোনো ক্যালকুলাস-এ বাক্যগঠন এবং অনুমানের নির্দিষ্ট নিয়ম থাকলেও সাধারণ ভাষার ক্ষেত্রে প্রায়শঃই সেইরূপ কোনো নির্দিষ্ট বাক্য গঠন বিধি (ফর্মেশন রুলস) বা অনুমানবিধি (রুলস অব ইন্ফারেন্স) থাকে না। কোনো ক্যালকুলাস-এ যে সকল নিয়ম থাকে তারা সামান্য নিয়ম (ইউনিভার্সাল রুলস)। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন লক্ষ্য কবেন যে অসাধারণ ভাষার ক্ষেত্রে সর্বদা এরূপ কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম থাকে না যা প্রয়োগ করে বচনের যৌক্তিক আকার, তাৎপর্য এবং বচনসমূহের মধ্যে পারস্পাবিক সম্বন্ধ নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা যায।

শুধু তাই নয়, সাধারণ ভাষাকে একটি ক্যালকুলাসরূপে দেখা হলে কোনো ভাষার নিয়মসমূহ প্রয়োগ করা সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা বয়েছে, সেই সব সমস্যার উপব কোনো আলোকপাতই করা যাবে না।

ভাষাপ্রয়োগেব সঙ্গে ভাষাব্যবহারকারীর অন্য ব্যবহাবের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, ভাষাকে একটি ক্যালকুলাস-এর সঙ্গে তুলনা কবা হলে সেই সম্বন্ধও অনুদঘাটিত থেকে যায়।

ভাষাকে ক্যালকুলাস-এর সঙ্গে একজাতীয়রূপে গণ্য কবা হলে মনে হতে পাবে যে ক্যালকুলাস-এর ন্যায় ভাষারও একটি নির্দিষ্ট যৌক্তিক আকাব আছে। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন পববর্তীকালে প্রদর্শন করেছেন যে কোনো সাধারণ ভাষাবই এইরূপ কোনো নির্দিষ্ট যৌক্তিক আকার থাকে না। এই সব কাবণেই তিনি ভাষাকে ক্যালকুলাসেব সঙ্গে তুলনা করা পবিত্যাগ কবেছিলেন।

৩.২ ভাষা এবং ক্রীড়া ঃ সাদৃশ্যের অনুসন্ধান

'ফিলসফিকাল গ্রামাব' রচনাব সময থেকেই হ্বিটগেনস্টাইন লক্ষ্য করেন যে ভাষা এবং দাবা প্রভৃতি ক্রীড়ার মধ্যে বহু সাদৃশ্য রয়েছে। ক্রীডাব যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে এইরূপ তুলনায প্রবৃত্ত করেছিলেন তা এই যে সমস্ত ক্রীডাব কোনো নির্দিষ্ট অনুগত লক্ষণ নিরূপণ কবা যায় না। এমন কোনো ধর্মেব কথা উল্লেখ কবা সম্ভব নয যা সমস্ত ক্রীড়াতেই সমানভাবে বর্তমান। আবার 'ক্রীডা' পদ 'গো' বা 'হবি' পদেব ন্যায় নানা অত্যন্তভিন্ন অর্থের বাচক নয়। একই পিতামাতাব সন্তানসমূহের মধ্যে যেমন কোনো নির্দিষ্ট সাধর্ম্য না থাকা সত্ত্বেও একপ্রকার পারিবাবিক সাজাত্য (ফ্যামিলি বিসেম্‌ব্লেন্স) থাকে এবং তাদের খুব সহজেই যেমন পবস্পব ভ্রাতা বা ভগিনীরূপে বোঝা যায়, সেইভাবেই বিভিন্ন প্রকাব ক্রীড়ার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট অনুগত ধর্ম না থাকলেও তাদেব ক্রীডারূপে বুঝতে কোনই অসুবিধা হয না। দাবা, ক্রিকেট, টেনিস, প্রভৃতি খেলায বহু জটিল নিয়ম থাকলেও কোনো ছোট শিশু যখন একা একা বল নিয়ে খেলা করে তাব প্রায় কোনোই নিযম থাকে না। কোনো কোনো খেলা প্রতিযোগিতামূলক হলেও বহু খেলাই প্রতিযোগিতামূলক নয়। সমস্ত খেলাব হাবজিতেবও প্রশ্ন থাকে না। অধিকাংশ ক্রীডা ক্রীডাবিদের মনোবঞ্জনেব কারণ হলেও তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়ায় ক্রীডাবিদেব মনোরঞ্জনেব প্রশ্ন গৌণই হয়ে যায়। সুতবাং প্রতিযোগিতা, নিয়ম অনুসরণ কবা, মনোরঞ্জন, দক্ষতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসমূহ অধিকাংশ ক্রীডায় থাকলেও সকল ক্রীডায় এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই থাকে না। অধিকাংশ ক্রীড়ায় যে সকল বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদেব যদি $P_1, \ldots P_n$; এইরূপ একটি তালিকায নিবদ্ধ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে কোনো ক্রীডায P_1, P_3 এই দুটি ধর্ম আছে, অন্য কোনো ক্রীডায আবাব P_3, P_5, P_7, এই তিনটি ধর্ম আছে এবং এইভাবে সমস্ত ক্রীডাতেই এই তালিকাব অন্তর্গত কোনো না কোনো ধর্ম থাকবে। অবশ্য এই তালিকা সম্পূর্ণও নয়, অপবিবর্তনীয়ও নয। নতুন কোনো ক্রীডার আবির্ভাব হলে এই তালিকায় নতুন ধর্ম সংযোজিত হবে, আবাব পুরনো কোনো ক্রীডার যদি আব প্রচলন না থাকে, তবে ঐ তালিকার কিছু ধর্ম বিলুপ্তও হযে যেতে পাবে।

ক্রীডাব এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য যে কোনো সাধারণ ভাষাব ক্ষেত্রেই লক্ষ্য কবা যায়। স্মরণ বাখতে হবে যে ভাষাব অন্তর্গত বচনসমূহ কীভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে তাব ব্যাখ্যা করাব জন্যই হ্বিটগেনস্টাইন ভাষাকে দাবাজাতীয় ক্রীডাব সঙ্গে তুলনা কবেছিলেন। 'ট্র্যাকটেটস' বচনাব সময় হ্বিটগেনস্টাইন স্বযং মনে কবতেন যে ভাষাব প্রতিটি ক্ষুদ্রতম এককেব বাচ্য নিরূপণ কবতে পাবলে এবং বচনেব সংস্থানেব সঙ্গে কোনো একটি পবিস্থিতির সংস্থানেব সম্বন্ধ নিরূপণ কবতে পাবলেই ভাষাব অন্তর্গত বচনসমূহেব তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কবা যাবে। কিন্তু 'ফিলসফিকাল গ্রামাব' বচনাব সময় থেকেই তিনি উপলব্ধি কবেছেন যে ভাষাব প্রতিটি ক্ষুদ্রতম এককেব সঙ্গে একটি বাচ্যকে সমৃদ্ধ কবতে পারলেই ভাষাব অন্তর্গত বচনসমূহেব তাৎপর্য ব্যাখ্যা কবা যায না। আবাব ফর্মালিস্ট গণিতবিদ্‌গণেব ন্যায় তিনি একথাও স্বীকাব কবতেন না যে গণিতেব ভাষা বা সাধারণ ভাষা কিছু চিহ্নেব সমষ্টিমাত্র, যে চিহ্নসমূহকে

কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসাবে বিন্যস্ত করতে পারলেই বাক্য গঠিত হয় এবং বাক্যকে অন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসাবে পবিবর্তিত কবলে একটি তন্ত্র গঠন কবা যায়। তাঁব মতে দাবাখেলায় দাবার বিভিন্ন প্রকার ঘুঁটিব যে বিশেষ ভূমিকা থাকে, সেই ভূমিকা ঐ সব ঘুঁটির সঙ্গে কোনো বাহ্যপদার্থের সম্বন্ধেব উপর নির্ভব কবে না। দাবাখেলায় কোনো ঘুঁটির ভূমিকা তার আকারের দ্বারাও নির্ধারিত হয় না। কিন্তু দাবাখেলায় প্রতিটি ঘুঁটিব স্থান পবিবর্তন (মুভ) যেসব নিয়মের বা ব্যবহারবিধির উপর নির্ভর করে, সেই সব ব্যবহারবিধির দ্বারাই কোন্ ঘুঁটিকে রাজা বলা হবে, আর কাকেই বা মন্ত্রী বলা হবে, তা নিরূপিত হয়ে থাকে। অনুরূপভবেই ভাষার অন্তর্গত পদ বা বচনেব ব্যবহারবিধিব দ্বারাই ভাষাব অংশসমূহের তাৎপর্য নির্ধারিত হয়ে থাকে। এইভাবেই হ্বিটগেনস্টাইন 'ব্যবহারই তাৎপর্য্য' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হযেছিলেন।[২০]

৩.৩ কৃত্রিম ভাষাক্রীড়ার উদ্ভাবন ও সাধারণ ভাষার সঙ্গে তার তুলনা

ভাষা এবং দাবাজাতীয় খেলার মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকাব সাদৃশ্যই হ্বিটগেনস্টাইনকে ভাষাক্রীডার ধাবণা প্রণয়নে অনুপ্রাণিত কবেছিল। সাধারণ ভাষাব স্বরূপ বিশ্লেষণেব সর্বাপেক্ষা প্রধান অসুবিধে এই যে সাধাবণ ভাষার কোনো বিকল্প নেই। কাবণ সাধাবণ ভাষার সঙ্গে জগতের যে সকল সম্বন্ধ থাকে (মিনিংগ বিলেশন), সেই সমস্ত সম্বন্ধেব মাধ্যমেই সাধাবণ ভাষা কোনো পদার্থের বর্ণনা কবতে সক্ষম হয়। মানুষ যখন প্রথম কোনো সাধারণ ভাষা শেখে তখন সে এই সমস্ত সম্বন্ধকেই আযত্ত কবে থাকে এবং পবে যখন সে অন্য কোনো ভাষা শেখে, তখন সে পূর্বে শেখা ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধসমূহ অবলম্বনেই নতুন ভাষা অর্জন করে থাকে। ভাষা ও জগতেব এই প্রকার সম্বন্ধকে পবিত্যাগ কবে ভাষাব্যবহাব সম্ভব নয় বলেই ভাষার দ্বাবা এইরূপ সম্বন্ধেব বর্ণনা কবা যায় না বা এই সম্বন্ধসমূহকে পবিবর্তিতও করা যায় না। দার্শনিক জীবনেব এই মধ্যবর্তী এবং শেষ পর্যায়েও হ্বিটগেনস্টাইন বাগর্থতত্ত্বকে (সিম্যান্‌টিক্‌স) অনির্বচনীয়রূপে গণ্য কবতেন বলেই সাধারণভাষার বিশ্লেষণেব জন্য তিনি ভাষাক্রীড়াপদ্ধতির উদ্ভাবন কবেন। এই পদ্ধতিতে সাধাবণ ভাষা অপেক্ষা অনেক সবল কৃত্রিম ভাষা উদ্ভাবন করে সেই সমস্ত ভাষাব বিশ্লেষণ কবা হয়ে থাকে। এই সব কৃত্রিম ভাষার সঙ্গে সাধারণ ভাষার বহু সাদৃশ্য থাকে বলে এই পদ্ধতিব দ্বাবা সাধারণ ভাষার প্রকৃতিও অনুধাবন কবা যায়। 'দা ব্লু বুক'-এ হ্বিটগেনস্টাইন প্রথম ভাষাক্রীডাব কথা উল্লেখ কবেন।[২১]

এই গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর উদ্ভাবিত কৃত্রিম ভাষাক্রীড়াসমূহকে শিশুর ভাষা বা আদিম ভাষার (প্রিমিটিভ ল্যাঙ্গুযেজ) সদৃশরূপে উপস্থাপন কবেছেন। তাঁব মতে যে কোনো সাধাবণ ভাষারই আদিরূপ এইরূপ সরলই হয়ে থাকে লক্ষণীয় বিষয় এই যে এইপ্রকাব সরল ভাষাতেও স্বীকার বা অস্বীকার করা, প্রশ্ন করা, আদেশ বা অনুরোধ করা, ইত্যাদি বচনের বহু ভূমিকাই উপস্থিত এবং এই প্রকার কৃত্রিম ভাষাক্রীডার জটিলতা সাধারণ ভাষার তুলনায় অতি অল্প হলেও সাধারণ ভাষার সঙ্গে এই জাতীয় ভাষাব কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই।

এই কারণেই এইসব ভাষাব বিশ্লেষণেব দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওযা সম্ভব হবে, সেই সকল সিদ্ধান্ত অল্প বিস্তব পরিমার্জিতরূপে সাধারণ ভাষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য স্মরণ বাখতে হবে যে শিশুর ভাষা কোনো সম্পূর্ণ ভাষা নয়, তা পূর্ণ বয়স্ক মানুষের ভাষার অংশবিশেষ। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন যেসব আদিম ভাষাক্রীড়ার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন, সেই সব ভাষা অতি সরল হলেও সাধাবণ ভাষাব ন্যায় সম্পূর্ণ। এইকাবণেই এইজাতীয় ভাষার সঙ্গে সাধারণ ভাষাব তুলনা করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। এইস্থলে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এ উল্লিখিত এবং পরবর্তীকালে বহুল আলোচিত একটি আদিম ভাষাক্রীড়াব দৃষ্টান্তেব উল্লেখ কবা যেতে পাবে - '.. দা ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ মেন্ট টু সার্ভ ফর কম্যুনিকেশন বিটুযিন এ বিল্ডার A অ্যান্ড অ্যান অ্যাসিস্টান্ট B। A ইজ বিল্ডিং উইথ বিল্ডিং স্টোনস, দেয়াব আব ব্লকস, পিলার্স স্ল্যাবস অ্যান্ড বিমস। B হ্যাস টু পাস দা স্টোনস, অ্যান্ড দ্যাট্ ইজ দা অর্ডাব ইন হুইচ A নিডস দেম ফব দিস পাবপস দে ইউস এ ল্যাঙ্গুযেজ কনসিস্টিং অব দা ওয়ার্ডস 'ব্লক', 'পিলাব', 'স্ল্যাব', 'বিম'। A কল্স দেম আউট, ... স ব্রিংগ B দা স্টোন হুইচ্ হি হ্যাস লার্ন্ট টু ব্রিং অ্যাট সাচ-অ্যান্ড-সাচ এ কল। ... কনসিভ দিস অ্যাজ এ কম্প্লিট প্রিমিটিভ ল্যাঙ্গুযেজ ('ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস,' ওযান, সেক-২)

৩.৪ স্বাভাবিক ভাষাক্রীড়া : ভাষা ও জগতের মধ্যে সেতু

'দা ব্লু বুক' এবং 'ফিলসফিকাল গ্রামার'-এ হ্বিটগেনস্টাইন বহু কৃত্রিম ভাষাব উদ্ভাবন কবলেও এবং ঐ সকল কৃত্রিম ভাষাক্রীডা শিশুব ভাষাশিক্ষাপ্রক্রিযা এবং সাধাবণ ভাষাব বিবর্তন ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হলেও ঐ দুই গ্রন্থে কৃত্রিম ভাষাক্রীড়াসমূহ সাধারণ ভাষাব সঙ্গে তুলনীয় দৃষ্টান্তরূপেই উপস্থাপিত হযেছে। ভাষাক্রীডাব ধারণা (নোশন) যে সাধারণ ভাষাব সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যাব জন্য ব্যবহৃত হতে পাবে তাব ইঙ্গিত প্রথম পাওযা যায় 'দা ব্রাউন বুকে'। 'হোয়াট ইজ দা রিলেশন বিটুইন এ নেম অ্যান্ড দা অবজেক্ট নেম্ড, সে, দা হাউস অ্যান্ড ইটস নেম? আই সাপোস উই কুড গিভ আইদাব অব টু আনসার্স। দা ওয়ান ইজ দ্যাট দা বিলেশন কন্সিস্টস ইন সাবটেন স্ট্রোকস হ্যাভিং বিন পেনটেড অন দা ডোর অব দা হাউস। দা সেকন্ড আই মেন্ট ইজ দ্যাট দা বিলেশন উই আব কর্নসার্নড উইদ ইজ এস্ট্যাব্লিশড, নট জাস্ট বাই পেন্টিং দিস্ স্ট্রোকস অন দা ডোর, বাট বাই দা পার্টিকুলার রোল হুইচ দে প্লে ইন দা প্র্যাকটিস অব আওযাব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ উই হ্যাভ বিন স্কেচিং ইট' .. (দা ব্রাউন বুক, পৃঃ ১৭২)

ব্যাবহাবিক পদার্থবিষয়ক ভাষাই মুখ্য ভাষা, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর যে সমস্যা হ্বিটগেনস্টাইনকে পীড়িত কবছিল, এই অনুচ্ছেদে তিনি সেই প্রশ্নই পুনরায় উত্থাপন করেছেন। এই প্রবন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে অবভাসবিষয়ক ভাষার ক্ষেত্রে নামেব বাচ্য অভিজ্ঞতায়

সাক্ষাৎরূপে উপস্থাপিত হওয়ার নাম-বাচ্য সম্বন্ধের স্বরূপবিষয়ে ঐ প্রকার ভাষায় বিশেষ কোনো জটিলতা থাকে না। কিন্তু সাধারণ ব্যাবহারিক পদার্থবিষয়ক ভাষায় নাম ও বাচ্যের সম্বন্ধে যে এইরূপ সরল হতে পারে না, তাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যাবহারিক ভাষায় নাম ও বাচ্যের সম্বন্ধের স্বরূপ কী প্রকার, পূর্বোদ্ধৃত অনুচ্ছেদে সেই প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করা হয়েছে। পূর্বোক্তসন্দর্ভে হুইটগেনস্টাইন বলছেন যে কোনো ভাষায় ব্যবহৃত প্রতিটি নামের জন্য একটি বাচ্য স্বীকার করা হলেই নাম-বাচ্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হয় না। কোনো ভাষায় যে কোনো নামের যে বহুমুখী ব্যবহার হয়ে থাকে সেই সমস্ত ব্যবহারই একটি নামের সঙ্গে একটি বিশেষ বাচ্যকে সমৃদ্ধ করে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে 'দা ব্রাউন বুক'-এ উক্ত সন্দর্ভের অব্যবহিত পরেই গ্রন্থকার বলছেন যে নামের ব্যবহার কেবল নাম-বাচ্য সম্বন্ধ স্থাপনই করে না, বস্তুতঃ ঐ সকল ব্যবহারই উক্ত সম্বন্ধস্বরূপ, যেহেতু ঐ সমস্ত ব্যবহারের অতিরিক্ত কোনো সম্বন্ধ নাম এবং বাচ্যের মধ্যে থাকে না।

'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এও তিনি লিখেছেন, 'নাও হোয়াট ডু দা ওয়ার্ডস অব দিস ল্যাঙ্গুয়েজ সিগনিফাই? হোয়াট ইজ সাপ্পোসড টু সো হোয়াট দে সিগনিফাই ইফ নট দা কাইন্ড অব ইউস দে হ্যাভ?' ('ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস,' ১০)

এইস্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে হুইটগেনস্টাইন 'ব্যবহার (ইউস) পদটিকে কেবল শব্দব্যবহার অর্থে প্রয়োগ করেছেন, অথবা শব্দব্যবহারের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত শারীর ব্যবহার বা সামাজিক ব্যবহারও ঐ পদের অর্থরূপে তাঁর অভিপ্রেত ছিল?

এই প্রশ্নের উত্তর তিনি স্পষ্টরূপেই প্রদান করেছেন, 'আই স্যাল অলসো কল দা হোল, কনসিস্টিং অব ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড দা অ্যাকশনস ইন্ টু হুইচ ইট ইজ য়োভেন, দা 'ল্যাঙ্গুয়েজ গেম'। ('ফিলসফিকাল ইভেস্টিগেশনস' I, ৭)

হুইটগেনস্টাইন-এর তাৎপর্য্য এই যে শব্দব্যবহারমাত্রই 'ভাষাক্রীড়া' পদের অর্থ নয়; যে সকল জটিল শারীরবৃত্তীয় ও সামাজিক ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতে শব্দব্যবহার সম্ভব হয় সেই সমস্ত ব্যবহারই ভাষাক্রীড়ার অন্তর্গত। একটি শিশু যেভাবে কোনো নতুন শব্দের অর্থ শেখে, তা বিশ্লেষণ করলে হুইটগেনস্টাইন-এর তাৎপর্য বোঝা যাবে। যেমন প্রশ্ন করা যেতে পারে যে আমরা কখন বলতে পারি যে একটি শিশু 'বই' শব্দটির অর্থ শিখেছে? যদি 'বই' শব্দটিকে ব্যবহার করে যে সমস্ত বাক্যপ্রয়োগ করা হয়, শুধু সেই সকল ভাষাব্যবহারকেই উক্ত শব্দের সঙ্গে জড়িত ভাষাক্রীড়া বলা হয়, তবে যতদিন পর্যন্ত না শিশুটি বইয়ের বর্ণনা করতে পারছে বা বইয়ের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কথা বলছে ততদিন পর্যন্ত বলা যাবে না যে সে ঐ শব্দের অর্থ বুঝেছে। কিন্তু বস্তুতঃ পক্ষে কোনো শিশু যদি 'বই আন' এই বাক্য শুনে বই আনতে পারে বা বইকে বলের থেকে পৃথক করতে পারে তাহলেই বলা যায় যে সে 'বই' শব্দটির অর্থ বুঝেছে। সুতরাং যে সব ব্যবহার সম্পাদনে সক্ষম হলে বলা হয় যে 'কোনো শিশু একটি শব্দের অর্থ জানে', সেই সব ব্যবহারের মধ্যে অধিকাংশই শারীরব্যবহার বা সামাজিক ব্যবহার। বস্তুতঃপক্ষে হুইটগেনস্টাইন 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থে যে সমস্ত ভাষাক্রীড়ার উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে সর্বপ্রকার ব্যবহারই অন্তর্ভুক্ত। এই গ্রন্থে

গ্রন্থকার যে সমস্ত ভাষাক্রীড়া উল্লেখ করেছেন, সেই সমস্ত ভাষাক্রীড়ার মধ্যে স্পষ্টতঃই দুটি প্রকারভেদ লক্ষ্য করা যায় - বিশুদ্ধ-ভাষা-ক্রীড়া এবং অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীডা। যে সব ভাষাক্রীড়ায় শব্দব্যবহার বা বাক্যপ্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোনো ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করতে হয় না সেই সমস্ত ভাষাক্রীড়াকেই পিচার প্রমুখ হিটগেনস্টাইন-এর ভাষ্যকারগণ বিশুদ্ধ ভাষাক্রীড়ারূপে অভিহিত করেছেন। অপবপক্ষে যে সকল ভাষাক্রীড়ায় ভাষাব্যবহার ব্যতিরেকে অন্য প্রকার ক্রিয়ারও অনুষ্ঠান করতে হয়, তাকেই পিচার অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীড়া বলেছেন। (জর্জ পিচার, 'দা ফিলসফি অব হিটগেনস্টাইন,' পৃঃ ২৪০ দ্রষ্টব্য) এই দুইপ্রকার ভাষাক্রীডার মধ্যে অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীডাই মুখ্য; যেহেতু মূলতঃ অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীড়ার দ্বারাই ভাষার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে থাকে এবং অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীড়ায় দক্ষতা অর্জন না কবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশুদ্ধ ভাষাক্রীডায় লিপ্ত হওয়া যায় না। যেমন শিশু যদি বল নিয়ে খেলা কবতে পাবে. বল আনতে বলা হলে বল নিয়ে আসতে পারে, তবেই পরবর্তীকালে তার পক্ষে বলেব আকৃতি বর্ণনা করা বা বল বিষয়ে কোনো আলোচনা করা সম্ভব হবে। ভাষাশিক্ষাব ক্ষেত্রে অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীডায় দক্ষতা অর্জনের উপব প্রায়শঃই বিশুদ্ধ ভাষাক্রীডা অনুষ্ঠানেব ক্ষমতা নির্ভর করে বলেই অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীডাকেই মুখ্য ভাষাক্রীড়ারূপে গণ্য করতে হবে। কোনো প্রাণীব সামগ্রিক জীবনযাত্রাই যে তার ভাষাকে তাৎপর্য্য প্রদান কবে, তা প্রতিপাদন করতেই হিটগেনস্টাইন বলেছেন যে, যে কোনো ভাষা প্রয়োগই এই বিশেষ প্রকাব জীবনশৈলীর অঙ্গ।

আপত্তি হতে পারে যে গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রেব চিহ্নসমূহ যেরূপে ব্যবহৃত হয়, তাকে বিশুদ্ধ ভাষাক্রীড়াই বলতে হবে এবং এই সকল চিহ্ন কোনো অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীড়ার অঙ্গরূপেই অর্থবহ হয়ে ওঠে, একথাও বলা যায় না। সুতরাং বিশুদ্ধ ভাষাক্রীড়া সর্বদাই অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীডার অধীন, এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। এইপ্রকার আপত্তির উত্তরে হিটগেনস্টাইন বলবেন যে কোনো শব্দ মূলতঃ যে প্রকার ভাষাক্রীড়ায় ব্যবহৃত হয়, সেই ভাষাক্রীড়াই তার আশ্রয়স্বরূপ এবং সেই ভাষাক্রীডাই ঐ শব্দের অর্থ নিরূপণ করে থাকে। ভাষায় যত প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত প্রকাব শব্দেরই কোনো বাচ্য নির্ণয় করা যায় না। সুতবাং ভাষাক্রীড়ামাত্রই সেই ক্রীড়ায় প্রযুক্ত শব্দসমূহকে কোনো না কোনো জাগতিক পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ কবে, একথা মনে করার কোনো কারণ নেই। গণিতের অন্তর্গত ভাষাক্রীড়াসমূহও গাণিতিক চিহ্নসমূহকে গণিতশাস্ত্রবহির্ভূত পদার্থেব সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য অনুষ্ঠিত হয় না। নামেব আশ্রয়ীভূত ভাষাক্রীড়ার দ্বারা নাম এবং বাচ্যেব সম্বন্ধ স্থাপিত হলেও সমস্ত ভাষাক্রীড়াই যে পদেব সঙ্গে কোনো পদার্থের সম্বন্ধস্থাপনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয় না, তা হিটগেনস্টাইন অতি স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন কবেছেন, '.... উই ডু দা মোস্ট ভেরিয়াস থিংগস উইথ আওয়াব সেনটেনসেস। থিংক অব এক্সক্লামেশনস এ্যালোন, উইথ দেয়ার কম্‌প্লিটলি ডিফ্যাবেন্ট ফাংশনস।

ওয়াটার!

আওয়ে!

আউ!

হেল্প!

ফাইন!

নো!

আর ইউ ইনক্লাইনড স্টিল টু কল দিইজ ওয়ার্ডস 'নেমস অব অবজেক্টস'? ('ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' I, ২৭)

সুতরাং সকল ভাষাক্রীড়াই পদের সঙ্গে পদার্থের সম্বন্ধস্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় না। গাণিতিক ভাষাক্রীডাসমূহ পদ-পদার্থের সম্বন্ধ স্থাপনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত না হলেও এরাও কোনো না কোনোভাবে অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীডার উপর নির্ভর করে; যেহেতু কিছু কিছু অবিশুদ্ধ ভাষাক্রীডা অনুষ্ঠানে দক্ষতা থাকলে তবেই বিশুদ্ধ ভাষাক্রীডার অনুষ্ঠান করা যায়।

ভাষাক্রীড়ার দ্বারাই ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধ স্থাপন সম্ভব, ভাষাক্রীড়ার এইরূপ ব্যখ্যা অবশ্য হ্বিটগেনস্টাইন-এর সকল ভাষ্যকার স্বীকার করেন না।[১৪]

বেকার এবং হ্যাকার এর মতে হ্বিটগেনস্টাইন 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' রচনার সময় ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধ ব্যাখ্যার জন্য যে কোনো প্রয়াসকেই ব্যর্থ বলে মনে করতেন। এই কারণেই ঐ গ্রন্থে তিনি মূলতঃ বিভিন্নপ্রকার ভাষাব্যবহারের সম্বন্ধ নিরূপণেরই চেষ্টা করেছেন। কৃত্রিম ভাষাক্রীডাসমূহের বিশ্লেষণ করা হলে সাধারণ ভাষার অন্তর্গত বচনসমূহের বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার ব্যাখ্যা করা সহজতর হবে বলেই তিনি কৃত্রিম ভাষাক্রীডাসমূহ উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু এই সকল কৃত্রিম ভাষাক্রীডাই 'ভাষাক্রীডা' পদের মুখ্যার্থ। সাধারণ ভাষার অন্তর্গত ব্যবহারবিধি বিষয়ে যখন হ্বিটগেনস্টাইন 'ভাষাক্রীডা' পদটি ব্যবহার করেছেন, তখন ঐ পদে গৌনার্থেই প্রযুক্ত হয়েছে। উপমান বা দৃষ্টান্তবাচক পদ অনেক সময়েই উপমেয় বা দার্ষ্টান্তিকে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। আলোচ্যস্থলেও 'ভাষাক্রীডা' পদটি কৃত্রিম ভাষাক্রীডারূপ দৃষ্টান্তের বাচক হওয়া সত্ত্বেও কখনও কখনও সাধারণ ভাষারূপ দার্ষ্টান্তিকের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ ভাষা কৃত্রিম ভাষাক্রীডার অনুরূপ হলেও তা কখনই স্বয়ং ভাষাক্রীডা নয়।

জাকো হিন্‌টিক্কা এবং মেরিল বি. হিন্‌টিক্কা তাঁদের 'ইনভেস্টিগেটিং হ্বিটগেনস্টাইন' গ্রন্থে ভাষাক্রীড়ার পূর্বোক্ত প্রকার ব্যাখ্যা বিস্তৃতরূপে খন্ডন করেছেন। তাঁদের মতে হ্বিটগেনস্টাইন যখন প্রথম ভাষাক্রীড়ার ধারণা উদ্ভাবন করেছিলেন, তখন সাধারণ ভাষার সঙ্গে তুলনীয় দৃষ্টান্তরূপেই ভাষাক্রীড়া উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে 'দা ব্রাউন বুক' এবং 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' রচনার সময় তিনি যে ভাষাক্রীডার দ্বারাই ভাষা এবং জগতের সম্বন্ধ নিরূপণের চেষ্টা করেছিলেন, তা এই প্রবন্ধে পূর্বেই উদ্ধৃতিসহকারে প্রদর্শিত হয়েছে। ভাষাক্রীডাই যে আমাদের দ্বারা উচ্চারিত বাক্যসমূহকে অর্থবহ করে, তা অন সার্টেন্টি গ্রন্থেও স্পষ্টতঃ স্বীকার করা হয়েছে, 'আওয়ার টক গেটস ইটস মিনিং ফ্রম দা রেস্ট অব আওয়ার প্রোসিডিংস' ('অন সার্টেন্টি, § ২২৯)

ভাষাশিক্ষা সম্বন্ধে হ্বিটগেনস্টাইন যা বলেছেন, তাব দ্বাবাও প্রতিপাদিত হয় যে ভাষা ক্রীডাব দ্বাবাই ভাষাব অংশসমূহেব অর্থ নিরূপিত হয়ে থাকে। কোনো একজন ব্যক্তি একটি ভাষা জানেন, একথা তখনই বলা যায় যখন তিনি ঐ ভাষায নতুন বাক্য বচনা কবতে পাবেন বা অন্যেব দ্বাবা উচ্চাবিত বা লিখিত নতুন বাক্যেব অর্থ অনুধাবন কবতে পাবেন। এইরূপে ভাষাব্যবহার কবতে হলে যে ভাষাব অংশসমূহেব সঙ্গে জগতেব অংশসমূহেব সম্বন্ধেব জ্ঞান আবশ্যক, তা বলাই বাহুল্য। এখন প্রশ্ন এই যে, এই সম্বন্ধেব স্বরূপ কি প্রকার এবং কিরূপেই বা এই সম্বন্ধের জ্ঞান হয়ে থাকে? প্রদর্শক লক্ষণেব জ্ঞানেব দ্বাবা এইরূপ জ্ঞান লাভ করা যায় না। কাবণ কোনো ভাষায় একটি প্রদর্শক লক্ষণ কিরূপে ব্যবহৃত হয়, তা জানা না থাকলে প্রদর্শক লক্ষণেব দ্বাবা যে কোনো পদেব অর্থ নিরূপণ কবা যায় না, তা পূর্বেই উল্লেখ কবা হয়েছে। অপ্রদর্শক লক্ষণে (নন অস্টেন্সিভ বা ভার্বাল ডিফিনিশন) একটি শব্দেব অর্থ নিরূপণেব জন্য অন্য শব্দেব সহাযতা গ্রহণ করা হয। এইকাবণে কেবল এইজাতীয় লক্ষণেব দ্বাবা পদেব অর্থ নিরূপণের প্রয়াস করা হলে ভাষাব মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে হবে, ভাষাব সঙ্গে জগতেব সম্বন্ধ স্থাপন কখনই সম্ভব হবে না। নিযমের এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয ও নিয়মেব জ্ঞানেব দ্বাবাই এইরূপ সম্বন্ধ জ্ঞাত হয়ে থাকে, তাও বলা যায় না, কাবণ প্রায়শঃই দেখা যায যে নিযম সম্বন্ধে কোনো প্রকাব সচেতনতা না থাকা সত্ত্বেও বহু ব্যক্তি নানা প্রকাব ভাষাক্রীডাব অনুষ্ঠান কবে থাকেন।

হ্বিটগেনস্টাইন অবশ্য ভাষাশিক্ষা ও ভাষাপ্রয়োগেব ক্ষেত্রে নিযমেব গুরুত্ব কখনই অস্বীকার কবেন নি। কিন্তু তাঁর মতে ভাষাক্রীডাব পরিপ্রেক্ষিতেই বলা যায যে কোনো নিযম পালিত হয়েছে। সুতবাং কোনো ভাষার নিয়ম জানলেই ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয, একথাও বলা যায় না।

বস্তুতঃপক্ষে হ্বিটগেনস্টাইন যথার্থভাবেই উপলব্ধি কবেছেন যে কোনো ভাষাব অন্তর্গত একাধিক বচনেব জ্ঞান থাকলেই ভাষাজ্ঞান অর্জিত হয না। ভাষাশিক্ষা একপ্রকাব দক্ষতা (স্কিল) অর্জন। কিন্তু লক্ষণ বা নিযমেব জ্ঞানেব দ্বাবা ভাষাজ্ঞানেব ব্যাখ্যা কবা হলে ভাষাজ্ঞান বাচনিক জ্ঞানেই (প্রপজিশনাল নলেজ) পর্যবসিত হবে। এই কাবণেই তিনি বলেছেন যে কোনো ভাষাব অন্তর্গত অধিকাংশ ভাষাক্রীড়ায় দক্ষতা অর্জন কবতে পারলে তবেই একটি ভাষা আয়ত্ত করা সম্ভব। এই বিকল্প স্বীকৃত হলে পূর্বোল্লিখিত বহু সমস্যাবই সমাধান সম্ভব হবে। যেমন অভ্যাসেব দ্বারাই ভাষাক্রীডায দক্ষতা অর্জিত হওযাব ব্যাকরণ কোনো প্রকাব সচেতনতা না থাকা সত্ত্বেও কীরূপে ভাষাব্যবহার কবা যায তাব ব্যাখ্যাতে আব কোনো অসুবিধে থাকবে না। ভাষাক্রীডাই ভাষা এবং জগতেব মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন কবে ভাষাকে অর্থবহ কবে, একথা স্বীকার কবা হলে সাধারণ ভাষাব তাৎপর্যেব অনির্দিষ্টতাও ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। ভাষাক্রীডাব বহুত্ব, জটিলতা ও একাধিক ভাষাক্রীডাব মধ্যে স্পষ্ট সীমাবেখাব অভাবেই এইরূপ অনির্দিষ্টতাব উদ্ভব হয়ে থাকে। সর্বোপবি সাধাবণ ভাষাকে ভাষাক্রীডাব

সমষ্টিরূপে ('ফ্যামিলি অব ল্যাঙ্গুয়েজ-গেমস') গণ্য করা হলে সহজেই দার্শনিক সমস্যার উদ্ভবের কারণ ব্যাখ্যা করা যায় এবং ঐ সকল সমস্যার অবলুপ্তির পথও নির্দেশ করা যেতে পারে।

৩.৫ দার্শনিক সমস্যা ঃ উৎপত্তির হেতু ও বিলোপের উপায়

হুইটগেনস্টাইন-এর মতে সমস্ত শব্দেরই আশ্রয়স্বরূপ এক বা একাধিক ভাষাক্রীড়া থাকে। যখন সেই সকল ভাষাক্রীড়াবহির্ভূতরূপে শব্দ ও বাক্যের ব্যবহার হয়, তখনই দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়।[২৬]

যেমন সময় সংক্রান্ত সমস্ত প্রকার ব্যবহারের থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি 'সময়' পদটি ব্যবহার করা হয়, তাহলেই সময় সংক্রান্ত দার্শনিক প্রশ্নাবলীর উৎপত্তি হয়ে থাকে। এইরূপ সমস্যার দৃষ্টান্ত প্রদান করার জন্য হুইটগেনস্টাইন সেন্ট অগাস্টিনের রচনা উদ্ধার করেছেন। ('ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস,' § ৮৯) সেন্ট অগাস্টিন-এর 'কন্‌ফেশনস' গ্রন্থের অন্তর্গত যে সন্দর্ভ 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এ উল্লিখিত হয়েছে, সেই অংশের ইংরাজী অনুবাদ এইপ্রকার -

'ফর হোয়াট ইজ টু ? হু ক্যান রেডিলি অ্যান্ড ব্রিফলি এক্সপ্লেন দিস? হু ক্যান ইভেন ইন থট্ কম্প্রিহেন্ড ইট, সো অ্যাজ টু আটার এ ওয়ার্ড অ্যাবাউট ইট? বাট হোয়াট ইন ডিসকোর্স ডু উই মেনশান মোর ফ্যামিলিয়ারলি অ্যান্ড নোয়িংলি দ্যান টাইম? অ্যান্ড, উই আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়েন উই স্পিক্ অব ইট, উই আন্ডারস্ট্যান্ড অলসো, হোয়েন উই হিয়ার ইট স্পোকেন অব বাই অ্যানাদার। হোয়াট দেন ইজ টাইম? ইফ নো ওয়ান আস্কস মি, আই নো ঃ ইফ আই উইশ টু এক্সপ্লেন ইট টু ওয়ান দ্যাট আস্‌কেথ, আই নো নট ...' ('দা কনফেসন্স অব সেন্ট অগাস্টিন', এডওয়ার্ড বি পুসি কর্তৃক অনূদিত, পৃঃ ২৫৩)।

'সময়' পদটি সাধারণতঃ কিছু ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন 'এখন সময় কত হল?' 'এই কাজ করার এখন সময় নেই', 'কারও জন্য অপেক্ষা করতে হলে সময় কাটতেই চায় না', ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদে এই সমস্ত ব্যবহারের থেকে বিযুক্ত করে সময় কী? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে বলেই লেখকের মনে হয়েছে যে তিনি সময়ের স্বরূপ নিজে বুঝতে পারা সত্ত্বেও অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করতে পারছেন না। যে সকল দৈনন্দিন ব্যবহারের অনুষঙ্গে 'সময়' শব্দের ব্যবহার হয়, সেই সব ক্ষেত্রেই যদি পদটির ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে এই জাতীয় দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টিই হতে পারত না।

৩.৬ উপসংহার

দার্শনিক সমস্যাসমূহের অবলুপ্তির যে উপায় হুইটগেনস্টাইন নির্দেশ করেছেন সেই উপায়

বিষয়ে তাঁর পরবর্তী দার্শনিকগণ বহু প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন যে কোনো শব্দ যে সমস্ত ভাষাক্রীড়ায় ব্যবহৃত হয়, সেই সব ভাষাক্রীড়ার থেকে বিচ্ছিন্ন করে শব্দটি ব্যবহার করা হলেই দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়ে থাকে।

তাঁর এই প্রকার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি হবে যে একটি ভাষাক্রীড়াকে অন্য ভাষাক্রীড়ার থেকে পৃথকীকৃত করার কোনো উপায় হিটগেনস্টাইন নির্দেশ করেন নি; ফলে কখন একটি শব্দ নিজের আশ্রয়ীভূত ভাষাক্রীড়ার পরিধি অতিক্রম করে প্রযুক্ত হচ্ছে, তা স্থির করার কোনো উপায় নেই।

এইরূপ আপত্তির উত্তরে হিটগেনস্টাইন-এর সপক্ষে অবশ্য বলা যেতে পারে যে শব্দ বা বাক্যব্যবহারের কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম প্রণয়ন করা যায় না বলেই তিনি ভাষাক্রীড়ার দ্বারা ভাষাব্যবহার ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছিলেন। সুতরাং ভাষাক্রীড়ার লক্ষণ প্রণয়নের চেষ্টা করা হলে বা একটি ভাষাক্রীড়াকে অপর ভাষাক্রীড়ার থেকে ব্যাবৃত্ত করার জন্য নিয়ম নির্ধারণ করতে হলে যে উদ্দেশ্যে ভাষাক্রীড়ার ধারণা ব্যবহার করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কোনো ব্যক্তি যখন কোনো ভাষা শিক্ষা করেন, তখনই তিনি সেই ভাষার অন্তর্গত অধিকাংশ ভাষাক্রীড়ার অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। কোনো শব্দকে তার নিজস্ব ব্যবহারিক প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যবহার করা হলে, ঐরূপ অভ্যাসের দ্বারাই তিনি তা বুঝতে পারেন।

এইস্থলে হিটগেনস্টাইন-এর বিরুদ্ধে পুনরায় আপত্তি হতে পারে যে কোনো একটি ভাষা শিক্ষা করা বলতেই বা কী বোঝায় ? তাঁর মধ্যে যে কোনো সাধারণ ভাষাই বহু ভাষাক্রীড়ার মিলিত রূপ। কোনো ব্যক্তি যদি তাদের মধ্যে বেশ কিছু ভাষাক্রীড়ার অনুষ্ঠানে সমর্থ হন তবেই বলা যায় যে ঐ ভাষা তিনি শিখতে পেরেছেন। কিন্তু যাঁরা ঐ ভাষা ব্যবহার করেন তাঁদের মধ্যে কেউই সম্ভবতঃ ঐ ভাষার অন্তর্গত সকল ভাষাক্রীড়া অনুষ্ঠানে সমর্থ হন না। ফলে তাঁরা সকলেই একই ভাষা শিক্ষা করেছেন, একথা কী করে বলা সম্ভব?

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে সাধারণ ভাষায় যখন বলা হয় যে দুই ব্যক্তি একই ভাষা ব্যবহার করেন. তখন তাঁদের ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন বলে মনে করার কোনো কারণ নেই। ঐ দুটি ব্যক্তি সম্পূর্ণ অভিন্ন ভাষা ব্যবহার না করলেও তাঁদের ভাষার মধ্যে যে পারিবারিক সাজাত্য (ফ্যামিলি রিসেম্বলেন্স) থাকে, সেইরূপ সাজাত্যবশতঃই তাঁরা একে অন্যের ভাষাকে একই জাতীয় ভাষা বলে বুঝতে পারেন। বস্তুতঃপক্ষে একই ভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তিসমূহের জীবনযাপনের রূপও (ফর্ম অব লাইফ) প্রায় এক প্রকার বলেই তাদের মধ্যে ভাষাগত আদানপ্রদান সম্ভব হয়ে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে জীবনশৈলীর এইরূপ সাজাত্যবশতঃই এক মনুষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যগণের পক্ষে অন্য মনুষ্যগোষ্ঠীর ভাষাক্রীড়া আয়ত্ত করা সম্ভব হয়ে থাকে, এবং জীবনযাত্রার রূপ ভিন্ন বলেই কোনো মনুষ্যেতর প্রাণী মানুষের জানা কোনো ভাষায় কথা বললেও ঐ প্রাণীর বক্তব্য অনুধাবন করা যাবে না। যেমন কোনো সিংহ যদি বাংলা ভাষা ব্যবহার করে বলে, 'আমি এখন ভ্রমণ করছি' এবং এই

বাক্য উচ্চারণের পর সে যেভাবে বসেছিল সেইভাবেই বসে থাকে, তবে সিংহটি বাংলাভাষায় কথা বলে থাকলেও কোনো বঙ্গভাষীর পক্ষে তার তাৎপর্য্য নিরূপণ করা সম্ভব হবে না।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর বহু ভাষ্যকারের মতে সাধারণ ভাষাকে বহু ভাষাক্রীড়ার মিলিত রূপ বলে গণ্য করা হলে শুধু যে ভাষার একত্ব (ইউনিটি) ব্যাখ্যা করতে অসুবিধে হয় তাই নয়, অর্থসংক্রান্ত কিছু মূল সমস্যাও এই মতে অমীমাংসিত থেকে যায়। ভাষাব্যবহারকালে আমাদের যে অর্থবোধ (আন্ডারস্ট্যান্ডিং অব মিনিং) হয়ে থাকে, সেই অর্থবোধকে ব্যাখ্যা করা যে কোনো অর্থসংক্রান্ত মতবাদের মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ যখন আমরা কোনো বচনের তাৎপর্য্য বুঝি তখন আমরা কী বুঝে থাকি, তা নিরূপণ করাই এইজাতীয় মতবাদের লক্ষ্য। এই প্রশ্নের উত্তরে হ্বিটগেনস্টাইন বলবেন যে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো বচনের ব্যবহার জানেন তবেই তিনি বচনটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারবেন। ব্যবহার বলতে কী বোঝায় তার অবশ্যই তিনি কোনো অনুগত লক্ষণ প্রদান করেন নি। তিনি শুধু বিভিন্ন প্রকার ভাষাক্রীড়ার উল্লেখপূর্বক ভাষাব্যবহারের দৃষ্টান্তই প্রদান করেছেন।

কিন্তু রাশ্ রীস তাঁর 'হ্বিটগেনস্টাইনস বিল্ডার্স' শীর্ষক প্রবন্ধে প্রদর্শন করেছেন যে যিনি কখনও কোনো ক্রীড়ার অনুষ্ঠান করেন নি তাঁর নিকট বিভিন্ন ক্রীড়ার বর্ণনা করা হলে তিনি ক্রীড়ার স্বরূপ অনুধাবণ করতে পারেন। কিন্তু যিনি কখনও কোনো ভাষা ব্যবহার করেন নি তাঁর নিকট বিভিন্ন ভাষাক্রীড়ার উল্লেখ করা হলেও তিনি ভাষাপ্রযোগ বলতে কী বোঝায় তা বুঝতে পারবেন না। কারণ সকল দৃষ্টান্ত অনুধাবন করতে হলেও তাঁকে যে ভাষায় দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা হয়েছে সেই ভাষা জানতে হবে। সুতরাং যিনি কোনো ভাষাই ব্যবহার করেন নি, দৃষ্টান্তের দ্বারা তাঁর নিকট ভাষাব্যবহার ব্যাখ্যা করা যায় না। আর যিনি কোনো ভাষা ব্যবহার করতে পারেন তাঁর নিকট ঐরূপ ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। হ্বিটগেনস্টাইন ('ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থের আরম্ভে § ২) যে স্থপতিদের ভাষার উল্লেখ করেছেন সেই ভাষায় ব্যবহৃত 'ব্লক', 'স্ল্যাব' প্রভৃতি শব্দের অর্থ না বুঝলে ঐ ভাষাক্রীড়া বোঝাই যাবে না। বস্তুতঃ ভাষা সর্বপ্রকার ব্যবহারের মাধ্যম বলেই এই সমস্ত অসুবিধে হয়ে থাকে। ভাষাকে সর্ব ব্যবহারের মাধ্যমে বলা হলে ভাষাব্যবহার ও তাৎপর্যবোধের কী জাতীয় ব্যাখ্যা প্রদান করা সম্ভব হবে, এই বিষয়ে বহু চিন্তার প্রয়োজন থাকলেও বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই।

টীকা

প্রবন্ধের মধ্যে ব্যবহৃত সকল উদ্ধৃতির অধ্যায় এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত সংস্করণ অনুসারে প্রদত্ত হয়েছে।

১। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে হ্বিটগেনস্টাইন-এর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে আগমনের সময় থেকেই তাঁর দর্শনচর্চার সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধরা যায়। মাঝে কয়েক বছরের বিরতি ছাড়া ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনচর্চা অব্যাহত ছিল।

২। 'A proposition is a picture of reality for if I understand a proposition, I know the situation that it represents. And I understand the proposition without having had its sense explained to me' (TLP, 4.021)

৩। 'What a picture represents it represents independently of its truth or falsity, by means of its pictorial form ' (RLP, 2.22)

৪। To understand a proposition means to know what is the case if it is true (One can understand it, therefore, without knowing whether it is true)

It is understood by anyone who understands its constituents. (TLP, 4.024)

৫। 'In a picture the elements of the picture are the representatives of objects' (TLP 2 131)

৬। 'What a picture must have in common with reality, in order to be able to depict it correctly or incorrectly .. in the way it does, is its pictorial form' (TLP, 2 17)

৭। Pictorial form is the possibilty that things are related to one another in the same way as the elements of the picture' (TLP, 2 151)

৮। 'What any picture, of whatever form must have in common with reality, in order to be able to depict it correctly or incorrectly in any way at all is logical form, i e the form of reality.' (TLP 2 18)

৯। 'Death is not an event in life, we do not live to experience death .' (TLP, 6 4311)

১০। 'Let us consider in turn two possibilities (a) that objects are observables, and (b) that they are not observabes. .. The biggest obstacle in the way of accepting thesis (b) is undoubtedly Wittgenstein's central doctrine that the meaning of a name is the object it denotes'. (George Pitcher, *The Philosophy of Wittgenstein*, পৃঃ ১৩২-১৩৪)

১১। 'I do not now have phenomenological language or "primary language" as I used to call it, in mind as my goal I no longer hold it to be necessary' (*Philosophical Remarks*, I Sec 1)

১২। 'Assume that there are in my visual field two red circles of equal size on a blue background What is it that is present here in duplicate and what is present only once? One could say; we have here *one* colour but two locations But it was said that redness and circularity are properties of two objects which one could call patches and which have certain spatial relations to each other The explanation here are here two objects—patches—which sounds like a physical explanation what worries us here is the unclarity of the grammar of the sentence I see two red circles on a blue background', especially its relation to the grammer of sentences 'There are two red balls on the table'. and again 'I see two colours in this picture'? I can naturally say, instead of the former sentence, 'I see two patches with the properties Red and

Circular in [this] spatial relation to each other' and equally well 'I see the colour red on two circular locations next to each other'. If I stipulate that this sentence is to mean the same as the sentence above. Then the grammar of the words 'patch', 'location', 'colour', etc. must adjust to the [grammar] of the words in the former sentence. The confusion arises here because we believe that we have to decide about the presence or absence of an object (thing), viz. the patch, in the same way as one decides whether what I see is (in a physical sense) red paint or a reflection" (*The Big Typescript*, G.H. von Wright-এর পাণ্ডুলিপির তালিকা অনুসারে এই পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ২১৩, G.H. von Wright, *Wittgenstein* পৃঃ ৪৩-৫৭, এই পাণ্ডুলিপির পূর্বোদ্ধৃত অনুবাদ করেছেন, Jaakko Hitikka. (Jaakko Hintikka, Merill B Hintikka, *Investigating Wittgenstein*, পৃঃ ১৪৩ দ্রষ্টব্য।)

১৩। 'You cannot compare a picture with reality unless you can set it against it as a yardstick You must be able to fit the proposition on to reality' (*Philosophical Remarks*, IV, Sec. 43)

১৪। 'The language itself belongs in the second [i.e physicalistic] system If I describe a language, I am essentially describing something that belongs to physics But how can physical language describe the phenomenal?' (*Philosophical Remarks VII*, Sec 68)

১৫। "The worst philosophical errors always arise when we try to apply our ordinary-physical-language in the area of the immediately given." (*Philosophical Remarks*), VI Sec 57)

১৬। 'The correlation of an object and a name is generated by nothing but a table, by ostensive gestures at the same time as the name is uttered, or by something similar' (*Philosophical Grammar* II, Sec 24)

১৭। 'What causes most trouble in philosophy is that we are tempted to describe the use of important 'odd job' words as though they were words with regular functions (*The Blue and Brown Books*, পৃঃ ৪৪)

১৮। 'We are interested in language as a process in accordance with explicit rules For philosophical problems are misunderstandings which must be removed by clarifying the rules according to which we are inclined to use words." (*Philosophical Grammar*, II Sec. 32)

১। 'Following a rule is analogous to obeying an order We are trained to do so, we react to an order in a particular way But what if one person reacts in one way and another in another to the order and the training? Which one is right?

Suppose you came as an explorer into an unknown country with a language quite strange to you In what circumstances would you say that the people, there gave orders, understood them, obeyed them, rebelled against them, and so on?

The common behaviour of mankind is the system of reference by means of which we interpret an unknown language." (*Philosophical Investigations*, I. Sec. 206)

২০। 'For a large class of cases .. though not for all .. in which we employ the word "meaning" it can be defined thus : the meaning of a word is its use in the language". (*Philosophical Investigations*, I, Sec. 43)

২১। 'I shall in future again and again draw your attention to what I shall call language games. These are ways of using signs simpler than those in which we use the signs of our highly complicated everyday language. Language-games are the forms of language with which a child begins to make use of words. The study of language games is the study of pirmitive forms of language of primitive languages. If we want to study the problems of truth and falsehood of the agreement and disagreement of propositions with reality, of the nature of assertion, assumption and question, we shall with great advantage look at primitive form of language in which these forms of thinking appear without the confusing background of highly complicated processes of thought. When we look at such simple forms of language, the mental mist which seems to enshroud our ordinary use of language disappears. We see activities, reactions, which are clear-cut and transparent On the other hand we recognize in these simple processes forms of language not separated by a break from our more complicated ones. We see that we can build up the complicated forms the primitive ones by gradually adding new forms'. (*The Blue Book*, পৃঃ ১৭)

২২। '... we might use the expression' the relation of name and object does not merely consist in this kind of trivial, 'purely external', cennection, "meaning that what we call the relation of name and object is characterized by the entire usage of the name;' (*The Brown Book* পৃঃ ১৭৩)

২৩। 'But how many kinds of sentences are there? Say assertion, question, and command? ... There are countless kinds: countless different kinds of use of what we call "symbols", "words", "sentences". And this multiplicity is not something fixed, given once for all; but new types of language, new language-games, as we may say, come into existence, and others become obsolete and get forgotten.

Here the term "language-game" is meant to bring into prominance that the fact the speaking of language is part of an activity, or of a form of life.

Review the multiplicity of language games in the folo wing examples, and in others:

Giving orders and obeying them ...

Describing the appearance of an object, or giving its measurements ... constructing an object from a description (a drawing) ...

Reporting an event ..

Speculating about an event ...

Asking, thanking, cursing, greeting, praying (*Philosophical Investigations*, I, Sec 23)

২৪। 'If the similarities between the artificial language-games and such a fragment of language are sufficiently striking and extensive, it is natural to extend the term 'language-game' by applying it also to the fragment itself — The whole point lies in constructing illuminating comparisons in order to dispel confusion The measure of its success is the degree of naturalness in describing puzzling fragments of our language as language-games. Yet, like all such analogical developments of language, the transference of terminology carries with it attendant dangers We are moving in the realm of analogy, language is not a game, nor typically are the activities into which its use is woven (G. P Baker, P M S Hacker, *Wittgenstein · Underatanding and Meaning*, প্রথম খণ্ড। পৃঃ ৯৮)

২৫। One can also imagine someone's having learnt the game without ever learning or formulating rules. (*Philosophical Investigations*, I, sec 31)

২৬। '. philosophical problems arise when language goes on holiday' (*Philosophical Investigations*, I, Sec 38)

পরিবার সাদৃশ্য

এণাক্ষী মিত্র

ভাষার ব্যবহাব ও চলন সম্বন্ধে এক অভিনব চিন্তাশৈলী হ্বিটগেনস্টাইন-এব উত্তব-পর্বেব দর্শনে উপস্থাপিত হয়েছে। এই পর্বেব চিন্তাধাবাব বিকাশ ও বিন্যাসে যে ক'টি ধাবণা কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন কবেছে 'পবিবাব সাদৃশ্যেব' ধাবণাটি তাদেব অন্যতম। এই ধাবণাটিব যথার্থ তাৎপর্য উপলব্ধি কবতে হলে হ্বিটগেনস্টাইন-বিবোধী ধ্রুপধী পটভূমিটি চিনে নেওয়া দবকাব। ভাষাব চলন সম্বন্ধে যে অতি-প্রাচীন, অতি সমাদৃত মতবাদ যা প্লেটোব আমল থেকে দার্শনিক পটভূমিকে আচ্ছন্ন করে বেখেছে - খুব সবল ও সংক্ষিপ্ত ভাবে বলতে গেলে তা হল এই

> ভিন্ন দেশে ও কালে অবস্থিত বিভিন্ন বিসদৃশ ব্যক্তি সম্বন্ধে আমবা একই নাম পদ ব্যবহাব কবি। বিভিন্ন মানুষ, যাবা দেশে ও কালে অনুগত যাদেব আকৃতি ভিন্ন, চেহাবা ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, তাদেব প্রত্যেককে 'মানুষ' পদের দ্বাবা অভিহিত কবে থাকি। এই বিভিন্ন ব্যক্তিব মধ্যে মনুষ্যত্বরূপ একটি অনুগত সমান ধর্ম বিদ্যমান যা আমাদেব অনুগত-ব্যবহাবকে সমর্থন কবে। এই অনুগত ধর্মকে 'ইউনিভার্সাল' বা 'সামান্য' বলা হয়। এই সামান্যের চরিত্র সম্বন্ধে সামান্যবাদীদেব মধ্যে অভ্যন্তবীণ মতবিরোধ আছে (এ ক্ষেত্রে সেই আলোচনাব প্রয়োজন নেই)। প্রাসঙ্গিক তথ্য এইটুকুই সামান্যবাদীবা এক নামপদেব দ্বাবা অভিহিত বিবিধ ব্যক্তিতে এক নিত্য অনুগত ধর্ম স্বীকাব কবেন। প্লেটো, অ্যারিস্টট্‌ল, বাসেল, স্ট্রসন, প্রমুখ দার্শনিকেব নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কবা যায়।

এই মতবাদ থেকেই উদ্ভূত হয় এক বিশেষ সংজ্ঞা-তত্ত্ব এই মতে সংজ্ঞা দেওয়া মানেই সংজ্ঞি-বস্তুব (যে বস্তুটিব সংজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে) ধারণাটিকে তাব মৌল উপাদানে বিশ্লেষণ করা। যে কোনো সংজ্ঞিব ধারণা মাত্রই একটি জটিল বা যৌগ ধাবণা, এবং জটিল ধাবণা মাত্রই কতগুলি সরল ধারণার সমাবেশ তার অতিরিক্ত কিছু নয়। বাসায়নিক বিশ্লেষণের আদলেই প্রতিটি জটিল ধাবণা নিঃশেষে কতগুলি সবল আণবিক ধাবণায় বিশ্লেষিত হয়। এবং সংজ্ঞা যে শুধু সংজ্ঞিত বস্তুর ধাবণাটি বিশ্লেষণ করে তাই নয় এর দ্বারা সংজ্ঞিত বস্তুর উপাদানগুলি প্রকটিত হয়। শৃঙ্গবত্ব ও গলকম্বলত্বেব সাহায্যে যখন গরুব সংজ্ঞা দেওয়া হয়, তখন মনে রাখতে হবে শৃঙ্গবত্ব যে শুধু গরুর ধারণাটির যৌক্তিক উপাদান বা লজিকাল প্রপার্টি তা নয়, তা বাস্তব গো-ব্যক্তিরও বাস্তব উপাদান। তা'হলে এই মতে সংজ্ঞাব স্বরূপ

কী দাঁড়াল? কোনো বস্তুব, যেমন গরুব সংজ্ঞা-প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ ধারণাব অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গো-ব্যক্তির মধ্যে অনুস্যূত সমান ধর্ম 'গোত্ব'-র বিমূর্ত চিন্তায় উপস্থাপিত হয়, এই সমান ধর্মটি আবার তাব উপাদানীভূত সরল ধারণায (শৃঙ্গবত্ব ও গলকম্বলবত্ব) বিশ্লেষিত হয। বিমূর্ত সমান ধর্মটিই (এক্ষেত্রে গোত্ব) 'গো' এই প্রত্যয়-শব্দ বা কন্‌সেপ্ট ওয়ার্ড-এর দ্বাবা নির্দেশিত হয়ে থাকে, এবং এটিই 'গো' শব্দেব অর্থ।

হিটগেনস্টাইন-এর পবিবাব-সাদৃশ্য ধাবণাটি ধ্রুপদী সামান্য-তত্ত্ব ও সংজ্ঞা তত্ত্বেব প্রতিবাদী ধাবণা। বর্তমান নিবন্ধটিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হযেছে। প্রথমে পবিবার সাদৃশ্যেব প্রত্যযটি সাধাবণভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথম ভাগটিকে আবার আলোচনাব সুবিধের জন্যে কযেকটি পর্যায়ে ভাগ কবা যেতে পাবে। প্রথম পর্যায়ে এই ধাবণাটির একটি সরলীকৃত বিশ্লেষণ ও তদনুযায়ী ধারণাটি কীভাবে ধ্রুপদী সামান্যবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ কবা হযেছে তাব একটি প্রাথমিক ইঙ্গিত দেওয়া হবে। এই সবলীকৃত ব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে সামান্যবাদীব তরফ থেকে সম্ভাব্য আপত্তিগুলি দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচিত হবে। তৃতীয় পর্যাযে আমরা ধাবণাটিকে সম্ভাব্য বিভ্রান্তিব জাল থেকে মুক্ত কবে তার সূক্ষ্মতম ও পবিশ্রুত অর্থটি উদ্ধাবেব চেষ্টা করব।

[এক]

প্রথমে ধ্রুপদী সামান্যবাদের বিরুদ্ধে হিটগেনস্টাইন-এব নূন্যতম বক্তব্যটি বুঝে নেওযা যাক্। তাঁব মতে একটি পদ দ্বাবা বোধিত বিভিন্ন ব্যক্তিগুলিব মধ্যে কোনো অনুগত সমান ধর্ম নেই। হিটগেনস্টাইন-এব পবিবার-সাদৃশ্য ধাবণাটি আলোচনা করাব আগে তাঁব ব্যবহৃত 'স্পিল' পদটিব অর্থ বুঝে নেওযা দবকাব - এই জার্মান পদটিব বাঙলা ও ইংবেজী প্রতিশব্দ যথাক্রমে 'ক্রীড়া' ও 'গেম'।

'ক্রীডা' বা 'খেলা' শব্দটিব দ্বাবা বিভিন্ন ধবণেব ক্রিযাকলাপ বোঝায। বল খেলা, তাস খেলা, খো খো খেলা, কাবাডি খেলা - এই সবগুলিব মধ্যে কোনো অনুগত সমানধর্ম আছে কি? সব খেলাতেই কি হাব-জিৎ বা প্রতিযোগিতাব স্থান থাকে? তাই যদি হয, 'পেশেন্স' খেলাকে তাহলে এই নিবিখে আব খেলা বলা যাবে না। সব খেলাতেই কি সুনির্দিষ্ট নিযম অনুসৃত হয়, সব খেলাতেই কি অনুশীলন ও দক্ষতাব প্রযোজন? একটি শিশুব শুয়ে শুয়ে হাত পা নেডে খেলা কবা, একটি বালকেব এলোপাথাডি বল ছোঁড়া এই খেলাগুলিতে উপবি-উক্ত ধর্মগুলি স্পষ্টতঃই অনুপস্থিত। এইবাব দেখা যাক্ সব খেলাতেই আনন্দ প্রমোদের উপাদান থাকে কি না, সব খেলাই মনোবঞ্জক কি না? মুষ্টি যুদ্ধ বা বোমেব বুল ফাইটিং প্রভৃতি রক্তক্ষযী, প্রাণ-নাশী খেলাগুলিতে আমোদ প্রমোদেব উপাদান কি পাওযা যায় - এ বিষয়টি তর্কসাপেক্ষ। হিটগেনস্টাইন দাবি কবেন বিবিধ ক্রীডাব মধ্যে এক অনুগত সমানধর্ম নেই। একটি সমান ধর্মেব পবিবর্তে আমবা পাই অনেকগুলি ধর্মের একটি গুচ্ছ যাব কোনোটিই একক ভাবে সব ক্রীডাগুলিতে সমব্যাপী নয। বিষযটি আরো বিশদভাবে আলোচনা কবা যাক।

ক প্রদত্ত ধর্মগুলি, যেমন প্রতিযোগিতা বা আমোদ প্রমোদ বা শরীর চর্চা, কোনোটিই ক্রীড়া মাত্রের পর্যাপ্ত শর্ত নয়, এমনকি আবশ্যিক শর্তও নয়। শুধু তাই নয়, প্রদত্ত ধর্মগুচ্ছ থেকে আমরা এমন কোনো উপদল বা সাবসেট ও তৈরি করতে পারব না যা ক্রীড়া মাত্রের পর্যাপ্ত- আবশ্যিক শর্তরূপে দাবি করা যায়।

খ সাধারণতঃ প্রতিটি ক্রীড়াতেই একাধিক ধর্ম বিদ্যমান। কোনো ধর্মই তার আশ্রয় ক্রীড়া ব্যক্তিটিতে (ইন্ডিভিজুয়াল গেমে) ব্যাপীত নয়, একাধিক ধর্ম সমন্বয়ে তা ব্যাপ্ত। এই অর্থে বলতে পারি কোনো ধর্মই তার আশ্রয় ক্রীড়াটির প্রকৃতি পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করে না। যেমন ক্রীড়া$_1$-এর বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয় 'খ', 'গ', 'ঘ' ধর্মের দ্বারা, ক্রীড়া$_2$ 'খ', 'গ', 'ঘ' ধর্মের দ্বারা, ক্রীড়া$_3$ 'ঘ', 'ঙ', 'চ' ধর্মের দ্বারা, ইত্যাদি। এই অর্থে আরো বলতে পারি যে প্রতিটি ধর্ম তার আশ্রয় ক্রীড়াটিতে অংশতঃ ব্যাপ্ত।

গ. এই ধর্মগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। কোনোটিই তার আশ্রয় ব্যক্তির সঙ্গে সমব্যাপ্য নয়। যেমন 'খ', 'গ' ধর্মগুলি ক্রীড়া$_1$কে আচ্ছাদন করে ছড়িয়ে পড়ে অন্য ক্রীড়াতে ক্রীড়া$_2$ এ। 'গ', 'ঘ' ধর্মগুলি আবার ক্রীড়া$_2$কে আচ্ছাদন করে ছড়িয়ে পড়ে ক্রীড়া$_3$ এ।

ঘ তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি ধর্মই তার আশ্রয় ব্যক্তিকে অংশতঃ আচ্ছাদন করে আবার অংশতঃ প্রসারিত হয় অন্য ক্রীড়াতে। হুইটগেনস্টাইন তা-ই এই ধর্মগুলি সম্বন্ধে 'ওভারল্যাপিং' বা অধিক্রমণ বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন। উল্লিখিত ক্রীড়া$_1$ ও ক্রীড়া$_2$এর মধ্যে 'খ' ও 'গ' ধর্ম দুটি 'ওভারল্যাপ' করে অথবা বলা যায় একে অপরকে অধিক্রম করে এবং এই বিচারে 'খ' ও 'গ' ধর্ম দুটি ক্রীড়া$_1$ ও ক্রীড়া$_2$ এই উভয় ক্রীড়ার সাধারণ ধর্মও বটে। হুইটগেনস্টাইন এই ধর্মগুলিকে 'কমন ফিচার্স' বা সাধারণ ধর্মরূপেও অভিহিত করেছেন ('পি আই.' ৬৬)। চরকায় খন্ড খন্ড তুলোর আঁশ একটির ওপর একটি জড়িয়ে যখন সুতো কাটি তখন এই অধিক্রমণ প্রক্রিয়ারই সাহায্য নিই। প্রতি আঁশ তার অগ্রবর্তী আঁশটিকে অংশতঃ ঢেকে অংশত প্রসারিত হয় ঐ আঁশের বাইরে। এই বাইরের অংশের ওপর আবার এসে পড়ে পরবর্তী আঁশ। কোনো একটি অখন্ড আঁশ দিয়ে নয়, বহু খন্ড খন্ড আঁশ একটির উপর একটি জড়িয়ে তৈরি হয় ক্রমলম্বমান সুতোটির শরীর। অনুরূপভাবে কোনো এক সর্বব্যাপী ধর্মের সাহায্যে নয়, বহু অধিক্রমক ধর্ম এক ক্রীড়া থেকে আর এক ক্রীড়ায় যোগসূত্র রচনা করে চলে, এইভাবেই গড়ে ওঠে ক্রীড়ার প্রত্যয়, 'ক্রীড়া' শব্দের অনুগত ব্যবহার।

অতএব দেখা গেল 'ক্রীড়া' শব্দের অনুগত ব্যবহারের মূলে কোনো এক অনুগত সামান্য ধর্ম নেই আছে শুধু সাদৃশ্য। এবং এই সাদৃশ্য কোনো একটি ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে নি। প্রতি ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অধিক্রমক ধর্মের নিয়ন্ত্রণে তৈরি হয়ে চলে নানা প্রকার সাদৃশ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। পুরো প্রক্রিয়াটা একটা ছকে ফেলে দেখান যেতে পারে।

ক্রীড়া১	ক্রীড়া২	ক্রীড়া৩	ক্রীড়া৪	ক্রীড়া৫
ক, খ, গ	খ, গ, ঘ	ঘ, ঙ, চ	ঙ, চ, ছ	ছ, জ, ঝ

চিত্র নং ১

হ্বিটগেনস্টাইন এই সাদৃশ্যকে পরিবার-সাদৃশ্য আখ্যা দিয়েছেন কেন? এক পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে কোনো অনুগত সমান ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায় না, যা পাওয়া যায় তা হল কতগুলি অধিক্রমক ধর্ম - গায়ের রঙ, নাসার গঠন, চোয়ালের আকার, চোখের মণির রঙ, দৈর্ঘ্য, হাঁটার ভঙ্গী, বাচন ভঙ্গী, মানসিকতা। এই ধর্মগুচ্ছের কোনো একটি ধর্ম বা একাধিক ধর্মের একটি বিশেষ 'সাব সেট' বা উপদল দেখান যাবে না যা এ পরিবারের অন্তর্ভুক্তির পর্যাপ্ত বা আবশ্যিক শর্ত। উক্ত ধর্মগুলি অধিক্রমণ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে সাদৃশ্য পরম্পরা রচনা করে চলে।

এখন প্রশ্ন হল কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পদ - যেমন 'ক্রীড়া', 'পরিবার', 'সুখ', 'সুন্দর' - যেগুলির কোনো অনুগত লক্ষণ-ধর্ম খুঁজে পাওয়া যায় না, সেগুলিই কি শুধু পরিবার-সাদৃশ্যের আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়? অর্থাৎ পরিবার সাদৃশ্যের বিস্তৃতি কতদূর? এই প্রশ্নের পূর্ণাঙ্গ উত্তর এই পর্যায়ে দেওয়া সম্ভব নয়। হ্বিটগেনস্টাইন পরিবার সাদৃশ্যের দৃষ্টান্তরূপে অনেক শব্দের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি যথাস্থানে উল্লিখিত হবে। এই পর্যায়ে এইটুকু অবশ্যই বলা যেতে পারে যে ভাষার অধিকাংশ পদই সাদৃশ্য পরম্পরায় ব্যবহৃত হয়। দু একটি নিত্য-ব্যবহার্য পদের উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বোঝান যেতে পারে। ধরা যাক্ 'সোনা' পদটি। পদটির অনুষঙ্গে অনেকগুলি ধর্ম ব্যবহার করা হয়ে থাকে - যেমন সোনা থেকে নিঃসৃত আলোকরশ্মির একটি বিশেষ মান, একটি বিশেষ আনবিক সংখ্যা (৭৯), একটি বিশেষ আনবিক গুরুত্ব, একটি বিশেষ রঙ, একটি বিশেষ মাত্রার নমনীয়তা, একটি বিশেষ গলনাঙ্ক। কোনো একটির অনুপস্থিতিতে যদি অন্য ধর্মের কয়টি থাকে তাহলেও বস্তুটিকে সোনাই বলব, ফলে কোনো ধর্ম স্বতন্ত্রভাবে আবশ্যিক ধর্ম নয়। কোনো বস্তুর আনবিক সংখ্যা ভিন্ন হলেও যদি তার রঙ, নমনীয়তা, গলনাঙ্ক মান একই হয় তাকে সোনা বলব না কোন্ যুক্তিতে? প্রদত্ত ধর্মগুলির কোনো একটি সোনা হওয়ার পর্যাপ্ত শর্ত নয়, এমন কী সোনার আনবিক সংখ্যাও নয়। রাসায়নিকরা যদি এমন বস্তুর সন্ধান পান যার আনবিক সংখ্যা ৭৯, কিন্তু যার রঙ বেগুনী, গলনাঙ্ক ভিন্ন নমনীয় মান ভিন্ন - তাহলে তারা কি বস্তুটিকে সোনা বলবেন না? অনেক রাসায়নিক দাবি করতে পারেন প্রদত্ত সব ধর্মের সমন্বয় সোনা হওয়ার পর্যাপ্ত শর্ত, উক্ত ধর্মগুলির কোনো একটি না থাকলে বস্তুটিকে সোনা বলা হবে না। কিন্তু কোনো উপাদানের আইসোটোপ (কোনো মৌল পদার্থের বিভিন্ন পারমাণবিক ওজন বিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পরমানুর যে কোনোটি, আইসোটোপ) - ধরা যাক্ 'ক' উপাদানটির আইসোটোপ-এর গুরুত্ব ভিন্ন, হওয়া সত্ত্বেও রাসায়নিকরা তো তাকে 'ক' উপাদানেরই আইসোটোপরূপে অভিহিত করে থাকেন। এবার 'বিড়াল'-এর মত একটি অতি সাধারণ শব্দ

পর্যালোচনা করা যাক্। চতুষ্পদী লোমওয়ালা, গোঁফওয়ালা, মাংসাশী মিউ মিউ শব্দকারী - এই ধর্মগুলির কোনো একটি আবশ্যিক নয়, কারণ, এমন বিড়াল থাকতেই পারে যে মিউ মিউ করে না, যে নিরামিষাশী।[১] অনুরূপ যুক্তিতে ধর্মগুলি এককভাবে বা সমন্বিতভাবে পর্যাপ্ত ধর্মও বলা যায় না, কোনো বিড়ালে হয়ত থাকে ক, খ, গ ধর্ম, কোনোটিতে খ, গ, ঘ ধর্ম, কোনোটিতে ঘ, ঙ, চ, ইত্যাদি। এইভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক শব্দ নিয়েই পরীক্ষা করে দেখা যাবে ঐ শব্দ দ্বারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তিগুলির কোনো অনুগত সমান ধর্ম নেই, আছে কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রাবরক ধর্মনিয়ন্ত্রিত সাদৃশ্য পরম্পরা।

এইটুকুই হল পরিবার-সাদৃশ্যের নূন্যতম ব্যাখ্যা। আপাতদৃষ্টিতে ধ্রুপদী সামান্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে এটি একটি জোরালো পদক্ষেপ। ধ্রুপদী তত্ত্ব অনুযায়ী যে শব্দের অর্থ ছিল এক অভিন্ন অখণ্ড, পরিবার সাদৃশ্যের সাহায্যে সেই শব্দের ব্যাখ্যা দেওয়ার ফলে শব্দটি অর্থ হয়ে দাঁড়াল অনেকান্ত, খণ্ডিত, প্রবহমান।

[দুই]

আপাত দৃষ্টিতে জোরালো মনে হলেও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে দেখা যাবে প্রাথমিক আলোচনায় পরিবার-সাদৃশ্যের এই অধিক্রমণটি ততটা জোরালো নয়। বস্তুতঃ এই বক্তব্য অনুযায়ী হুইটগেনস্টাইন-এর মতবাদ এক সাদৃশ্যবাদী সামান্যতত্ত্ব রূপেই প্রতিভাত হয়। সাদৃশ্যবাদের বিরুদ্ধে সাধারণতঃ ধ্রুপদী সামান্যবাদীরা যে আপত্তি তুলে থাকেন তা হল এই - সাদৃশ্য সর্বদাই তাদাত্ম্যভিত্তিক দুটি ভিন্ন বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্যের সমন্ধ উভসাধারণ কোনো এক অভিন্ন ধর্মকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। অন্যান্য সাদৃশ্যবাদীর অপেক্ষায় হুইটগেনস্টাইন-এর মৌলিকত্ব এইটুকুই যে তিনি এক ধর্মভিত্তিক সাদৃশ্যের পরিবর্তে বহুধর্মভিত্তিক সাদৃশ্য মেনেছেন। এই কথা বলার সপক্ষে যুক্তিগুলি নিম্নরূপ -

১। বস্তুতঃ হুইটগেনস্টাইন তাঁর দর্শনে এক অনেকানুগত ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, পার্থক্য এইটুকুই যে তাঁর অনুগত ধর্মটি বিভিন্ন বিকল্প-উপাদানের দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাবরক ধর্মগুলিকে নিয়ে আমরা একটি বৈকল্পিক সেট বা একটি বৈকল্পিক যৌগধর্ম তৈরি করতে পারি এবং দাবি করতে পারি প্রতিটি ব্যক্তিই এই সেটের সদস্য, বা প্রতিটি ব্যক্তিতেই ঐ বৈকল্পিক ধর্মটি সমভাবে বিদ্যমান। অর্থাৎ প্রতিটি ক্রিয়াতে ক v খ v গ v ঘ এইরূপ বৈকল্পিক ধর্ম রয়েছে যেখানে 'ক' হল হারজিৎ 'খ' হল বিনোদন 'গ' দক্ষতা 'ঘ' নিয়মাবলী, ইত্যাদি। ক v খ v গ v ঘ . এইরূপ বৈকল্পিক শৃঙখলার সব ক্রীড়ার অনুগত সমান ধর্ম।

২। বিভিন্ন উপাদানগুলি বা সাদৃশ্য নিয়ামক ধর্মগুলিকে হুইটগেনস্টাইন বস্তুতঃ ধ্রুপদী সামান্যেরই মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ 'ক্রীড়া' শ্রেণীটির অন্তর্ভুক্ত অনেক অনু-শ্রেণী বা সাবক্লাস আছে যেমন ফুটবল খেলা, দাবা খেলা, টেনিস খেলা, প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রীড়া-নাম বস্তুতঃ ব্যক্তি নাম নয়, শ্রেণীনাম - ক্রীড়াশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বিশেষ ক্রীড়া-

শ্রেনীব নাম। সেক্ষেত্রে 'ক' ধর্মটি ক্রীডা মাত্রেরই সমানধর্ম না হলেও একটি বিশেষ ক্রীডা-শ্রেণীব (যেমন দাবা শ্রেণীব) অন্তর্ভুক্ত সব ব্যক্তির সমানধর্ম হতে পারে, অর্থাৎ প্রতিটি দাবা নমুনাব সমানধর্ম, এবং এই অর্থে সাদৃশ্য নিয়ামক প্রাববক ধর্মগুলির প্রতিটিকেই নিত্য অনেকানুগত ধর্মেব মর্যাদা দেওয়া যায। ক্রীডাত্ব রূপ ধ্রুপদী সামান্যেব অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা অসীম, প্রথম ক্ষেত্রে এই অসীমতা অধিক দেশ-ব্যাপী ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা অল্প দেশব্যাপী।

৩। হিটগেনস্টাইন-এব এই নব্য সামান্য প্রকল্পটি আঙ্গিকে অপরিচ্ছন্ন, জটিল ও গুরুভাব। ধ্রুপদী সামান্য তত্ত্ব অনুযায়ী যেখানে সব ক্রীডায একটি সমান ধর্ম স্বীকার করলেই চলে - সেখানে, সাদৃশ্যবাদ মানলে, একটিমাত্র পদেব জন্য এক-গুচ্ছ সামান্য স্বীকাব কবতে হবে এবং ভাষাব প্রতিটি পদই যদি 'পবিবাব' বা 'ক্রীডা'-র মত আচবণ করে তাহলে প্রতিটি পদেব জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ প্রাববক সামান্য স্বীকাব করতে হবে। হিটগেনস্টাইন-এব পবিবাব সাদৃশ্য তত্ত্বটি তাই ধ্রুপদী সামান্য তত্ত্বেবই এক নিকৃষ্ট রূপ।

৪। যদি আমাদেব ব্যবহৃত ছকের 'ক্রীডা', 'ক্রীড়া',, এব দ্বারা ব্যক্তি ক্রীডা বুঝে থাকি সেক্ষেত্রেও প্রাবরক ধর্মগুলি ('ক' 'খ' 'গ', ইত্যাদি) কে এক স্বতন্ত্র ধবণেব সামান্যেব মর্যাদ' দিতে হবে যাদেব আশ্রিত ব্যক্তিব সংখ্যা অগণিত নয়, গণিত (ন্যূনপক্ষে দুই)। অতএব হিটগেনস্টাইন-এব সাদৃশ্যতত্ত্বেব এইরূপ সামান্যবাদী ব্যাখ্যা দিলে বিমূর্ত্ত পবাবস্তুর অনুপ্রবেশ আটকান যাবে না।

৫। হিটগেনস্টাইন-এর পবিবাব সাদৃশ্য ব্যাখ্যাকে অনুগত সামান্য ধর্মের সমথকরূপে ভাবা যেতে পাবে। 'ক্রীডা' পদটিকে কোনো এক অনুগত ধর্মের দ্বাবা লক্ষণ না দেওয়া গেলেও 'ক্রীডা' পদটিব সংজ্ঞা দেওয়া যাবে। সামান্যবাদীদেব মতে এই বিকল্প সংজ্ঞাদানেব প্রক্রিয়া শুধু যে অধিকতব জটিল ও আযাস সাধ্য তা নয়। ঐ বিকল্প প্রক্রিযাব মধ্যে দিয়ে দেখা যাবে পক্ষান্তবে একটি অনুগত সামান্য ধর্মই প্রতিষ্ঠা পাবে। সংজ্ঞাব এই বিকল্প প্রক্রিযাটিকে চাবটি পর্যাযে ভাগ কবা যেতে পাবে -

(ক) কিছু কিছু ক্রীডাকে আদর্শ প্রতিকল্প (প্যারাডাইম) রূপে চিহ্নিত করতে হবে, যার সঙ্গে সাদৃশ্যেব ভিত্তিতে অন্য ক্রীডাগুলি 'ক্রীডা' পদবাচ্য কি না তা নিরূপিত হবে।

(খ) সাদৃশ্য সূচক ধর্মগুলিব একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিতে হবে।

(গ) স্পষ্টতঃই তালিকাব সব ধর্মগুলিব গুরুত্ব সমান হবে না তাই তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযাযী ধর্মগুলিকে সাজাতে হবে।

(ঘ) এই গুরুত্ব অনুযায়ী এক একটি ধর্মে এক একটি মান আরোপ করতে হবে।

(ঙ) এই মান কতকাংশে চবিতার্থ হলে একটি ক্রীডাকে আমবা 'ক্রীডা' পদবাচ্য বলব

তা স্থির কবতে হবে। এই প্রয়োজনে মানেব একটি নিম্নসীমা নির্ধারণ কবতে হবে।

(চ) প্রদত্ত ক্রীডায় সমবেত ধর্মগুলিব মানেব যোগফল যদি ঐ নিম্নসীমা অতিক্রম কবে তাহলে ঐ ক্রীডাটি ক্রীডা পদবাচ্য বলে স্বীকৃত হবে।

শুধু 'ক্রীড়া' পদটিই নয় অন্য যে কোনো পদেব যদি সবাসরি অনুগত সামান্য ধর্ম উল্লেখের মাধ্যমে সংজ্ঞা না দেওযা যায় তাহলে সেই পদটিকে উপবি-উক্ত 'ক' থেকে 'চ'এর মধ্যে উল্লিখিত প্রক্রিযার মাধ্যমে সংজ্ঞা দেওয়া যাবে। আব একটু তলিযে ভাবলেই বোঝা যাবে সংজ্ঞা দানের এই বিকল্প প্রক্রিযা কেমন করে অনুগত সামান্য ধর্ম স্বীকাবের দাবিকে পুনববহাল কবে।

[তিন]

তবে কি সত্যিই হুিটগেনস্টাইন-এর পবিবার-সাদৃশ্য তেমন কোনো বৈপ্লবিক ধাবণা নয়? আসলে কি আমবা গোড়া থেকে ধ্রুপদী তত্ত্বজালেব ভেতব থেকে অপরাপব তত্ত্বকে দেখাব চেষ্টা করি, অপবিবর্তিত ধাবণাগুলিকে পবিচিত ধ্রুপদী ধাবণাব নিবিখে বুঝে নেওয়াব চেষ্টা কবি, যেমন কবা হযেছে পবিবাব সাদৃশ্যেব ক্ষেত্রে? পবিবার সাদৃশ্যেব ধাবণা না বোঝার মূলে কাজ কবছে দুটি প্রাথমিক বিভ্রান্তি। প্রথমটি প্রাববক ধর্ম সংক্রান্ত সংখ্যাগত বিভ্রান্তি এবং অপবটি প্রাববক ধর্ম সংক্রান্ত প্রকৃতিগত বিভ্রান্তি। প্রথমেই মনে রাখতে হবে একটি অনুগত সামান্যেব পবিবর্তে হুিটগেনস্টাইন একাধিক অথচ সীমিত সংখ্যক সামান্য যে স্বীকার কবেছেন তা নয়। তাঁর স্বীকৃত ধর্মগুলি সংখ্যায অসীম, সঠিকভাবে বলতে গেলে তাদেব সংখ্যা অনির্দিষ্ট। আমি কি ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ - এই দশটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ধর্মেব দ্বাবা 'ক্রীডা' শব্দেব খন্ডিত, অনেকান্ত প্রবহমান রূপকে চিবকালের মত টিকিয়ে বাখতে পাবি? তা পাবি না, কোনো ক্রীডাতে যদি ত, থ, দ ধর্ম থাকে এবং অন্য দিক দিয়ে যদি তা প্রচলিত ক্রীডাগুলিব অনুরূপ হয় তাহলে তাকে 'ক্রীড়া' বলব না কোন্ যুক্তিতে? বিডালেব উদাহবণটিতেই আবার ফিরে যাওয়া যাক। বিডালটিব মুখ দিযে যদি সহসা কয়েকটি ইংরেজী ছত্র নির্গত হয় সেটিকে কি 'বিডাল' বলব না কি 'বিড়ালাকৃতি মানুষ' বলব? যদি চোখেব সামনে সেটি সহসা আযতনে একশগুণ বড হযে যায?[১] হুিটগেনস্টাইন নিজে 'চেয়ার' শব্দটিব প্রসঙ্গে মন্তব্য কবেছেন - 'সামনে চেযাব দেখে উঠে আনতে গেলাম, কিন্তু সেটি সহসা চোখেব সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতএব এটি চেয়াব নয দৃষ্টিভ্রম।' কিন্তু আবাব যদি কযেক মুহূর্ত পরে চেযাবটি পুনরাবির্ভূত হয, তাকে স্পর্শ কবতে পাবি, তাহলে কি বলব চেয়াবেব তিবোধানটাই দৃষ্টিবিভ্রম? কিন্তু আবার যদি চেয়াবটি অদৃশ্য হয়? ('পি আই' ৮০) সব সময়েই অভাবিত, অকল্পনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে যার আলোকে পদেব সংজ্ঞাব নতুন ধর্ম সংযোজন কবতে হয়, পুরানো ধর্ম ছেঁটে ফেলতে হয়। বিভিন্ন ধর্মেব

তালিকার শেষ সদস্যটি বসিয়ে কখনই আমি তালিকাটিকে সম্পূর্ণ বলে দাবি করতে পারি না। সাদৃশ্য পরম্পরায় শব্দ বয়ে চলে এক অনন্ত সীমাহীন প্রবাহে।

দ্বিতীয়তঃ এই প্রাবরক ধর্মগুলি সমানধর্ম নয়। 'ক্রীড়া'$_১$, 'ক্রীড়া'$_২$ কে ব্যক্তি-ক্রীড়ার নাম হিসেবেই নিই বা ক্রীড়া শ্রেণীর নাম হিসেবেই নিই উভয় ক্রীড়ার মধ্যে কোনো উভ সাধারণ সমান-ধর্ম নেই। ক্রীড়া$_১$ আশ্রয়ী 'ক' 'খ' ধর্মটি ক্রীড়া$_১$ আশ্রয়ী 'খ' ধর্মটির সাদৃশ্য। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে সাদৃশ্য সম্বন্ধটি একটি বিশুদ্ধ সম্বন্ধ, কোনো অসম্বন্ধ একক অভেদাত্মক ধর্মের ওপর নির্ভরশীল নয়। দুই ব্যক্তিকে সদৃশ রূপে বোঝা বা বলা কোনো উভয়াশ্রয়ী অভিন্ন ধর্মের অপেক্ষা রাখে না। প্রতিটি ব্যক্তিই অনন্য, অভিনব এমন কোনো সাধারণ ধর্ম নেই যা দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অভেদে পুনরাবৃত্ত হতে পারে, ভাষান্তরে 'ক' 'খ' 'গ' ধর্মগুলি সমানধর্ম নয়। তারাও অনন্য, তারাও ব্যক্তি-প্রাতিস্বিক, প্রতিটি ধর্ম তার আশ্রয় অনন্য ব্যক্তির আলোকে অনন্য মাত্রা লাভ করে, শব্দের বিবিধ প্রয়োগ ও পুনরাবর্তনে তার কোনো সাধারণ নির্য্যাস, কোনো শাশ্বত সারাৎসার পুনরাবর্তিত হয় না। বস্তুতঃ ধর্ম নিরপেক্ষ ধর্মী, ও ধর্মী-নিরপেক্ষ ধর্ম - এই দ্বিকোটিক কাঠামো হ্বিটগেনস্টাইন-এর পরবর্তীকালের দর্শনে স্বীকৃত হয়নি। কোনো কিছুকে 'লাল' বলে অভিহিত করলে, কাকে 'লাল' বলছি তারই দ্বারা রূপায়িত হবে 'লাল' এর অর্থ - ব্যক্তি ও সামান্য মিলে মিশে যায় এক সমগ্রে। লাল চুল, লাল পদ, সূর্যাস্তের লাল আভা, লজ্জায় লাল কপোল, - এসব ক্ষেত্রে কোন্ বিমূর্ত লালত্ব ধর্ম বিদ্যমান? সাদা চামড়া, সাদা মনের মানুষ, সাদা দুধ - এসব সম্বন্ধেও একই মন্তব্য প্রযোজ্য। 'উঁচু গলা' ও 'উঁচু বাড়ি' - শোনা ও দেখার মধ্যে কোন্ সমতা আছে তা হ্বিটগেনস্টাইনকে বিস্মিত করেছে। ('পি আই' ৩৭৭) 'ব্লু অ্যান্ড ব্রাউন বুক'-এ আর এক উদাহরণ পাওয়া যায় 'গভীর দুঃখ', 'গভীর শব্দ', 'গভীর কূপ' (১৩৭)। 'পি আই' ১০৪ - এ তিনি তুলে ধরেছেন তাঁর ছোটবেলার একটি ছোট্ট ঘটনা যখন পাখির ডাকের ওপর আরোপিত 'গান' শব্দটিতে তিনি সবসময়েই অস্বস্তি বোধ করতেন। শেষে কোনো এক ব্যক্তি বলেন ' "গান" বোলো না, অন্য কিছু বল'। এর পর থেকেই হ্বিটগেনস্টাইন পাখির আওয়াজকে উপভোগ করতে আরম্ভ করেন। অতএব বোঝা যাচ্ছে ক্রীড়া শব্দের ক্ষেত্রেও 'হার জিৎ', 'প্রতিযোগিতা' 'অবসর-বিনোদন', 'দক্ষতা', 'কুশলতা' - এর কোনটিই সমানধর্ম নয়। হ্বিটগেনস্টাইন নিজেই প্রশ্ন তুলেছেন দাবা খেলার যে দক্ষতা সেই একই দক্ষতা কি টেনিস খেলাতেও প্রদর্শিত হয়? ('পি. আই' ৬৬) ক্রিকেট-খেলার আমোদ ও বুল-ফাইটের আমোদ কি তুল্যমূল্য? দাবা খেলার দক্ষতা ও টেনিস খেলার দক্ষতা পরস্পর সদৃশমাত্র এবং অনুরূপ যুক্তিতে আমরা আরও অগ্রসর হয়ে বলতে পারি প্রতিটি বিশেষ বিশেষ দাবা খেলার মধ্যেও কোনো অনুগত সমানধর্ম নেই। দাবা$_১$ এর দক্ষতা দাবা$_২$ এর দক্ষতা সদৃশ মাত্র। ব্যাপারটি পরিষ্কার করার জন্য আমাদের দক্ষতা$_১$ এর দক্ষতা দাবা$_২$ এর দক্ষতার সদৃশ মাত্র। ব্যাপারটি পরিষ্কার করার জন্য আমাদের দক্ষতা$_১$ ও দক্ষতা$_২$ রূপে নির্বাচন করা উচিত। বস্তুতঃ অনুচ্ছেদ ৬৬-এ ব্যবহৃত শব্দ দুটিই বিভ্রান্তি উৎপাদন করে,

বিশেষ ও সামান্যের দ্বিধা-বিভক্ত পরাতত্ত্বেব জন্ম দেয়, ভুযো সমালোচনাব পথ খুলে দেয়। পুবো অনুচ্ছেদটি খুঁটিয়ে পড়লে 'কমন' ও 'ফিচারস' শব্দগুলি আমাদেব বিভ্রান্ত কববে না।[২] তথাকথিত প্রাববক ধর্মগুলি বস্তুতঃ প্রাববক নয়, ধর্মও নয়, তারা বিশেষ, বিবিধ, বিচিত্র পবস্পর সদৃশ। সাদৃশ্যেই শেষ কথা, সম্বন্ধই শেষ কথা, এই সাদৃশ্য-সম্বন্ধ আমাদেব কোনো অসম্বন্ধ অভেদে পৌঁছে দেয না। ভাষান্তবে সব ব্যক্তিই অনন্য, সব প্রত্যয়ই অভিনব তথা অবিভাজ্য - তাদেব বিশ্লেষণ কবে কোনো পুনবাবর্তনীয় মৌল উপাদান পাওয়া যায় না। এইভাবে ধ্রুপদী সামান্যতত্ত্বেব দ্বারা পবিপুষ্ট বিশ্লেষণবাদী সংজ্ঞাতত্ত্বটিও নিরাকৃত হল।

সাদৃশ্যকে যাঁবা অভেদাবলম্বীরূপে দেখতে অভ্যস্ত তাঁবা প্রথাগতভাবে হ্বিটগেনস্টাইন-এব বিরুদ্ধে অনবস্থা-দোষের অভিযোগ নিয়ে আসেন। দাবা খেলা ও টেনিস খেলা যদি পবস্পর ভিন্ন হয়, দাবা খেলাব দক্ষতা ও টেনিস খেলাব দক্ষতাও যদি পরস্পব ভিন্ন হয়, সর্বোপবি দাবা$_১$ এর দক্ষতা ও দাবা$_২$ এর দক্ষতাও যদি পবস্পব-ভিন্ন হয, তাহলে আমি উভয়কে এক নামে অভিহিত কবি কেন? সাদৃশ্যের পেছনে যদি কোনো অভেদ বা তাদাত্ম্য না থাকে তাহলে 'ক্রীড়া', 'দাবা', 'দক্ষতা', 'কুশলতা', 'দাবাব চাল', প্রভৃতি শব্দেব অনুগত ব্যবহাব অব্যাখ্যাতই থেকে যাবে। কোনো এক স্তবে গিয়ে অভেদ স্বীকার না কবলে সাদৃশ্য ব্যাখ্যাও হবে না, ভাষা প্রযোগও কোথাও অবস্থান পাবে না অর্থাৎ ভাষাব কোনো গ্রাউন্ড থাকবে না, সেক্ষেত্রে ভাষা-প্রয়োগই অসম্ভব হয়ে পডবে। এখন একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এই অনবস্থা হ্বিটগেনস্টাইন-এব কাছে দোষাবহ নয, এটি ভাষাব কোনো ন্যূনতা নয়, কোনো গ্লানি নয, ভাষা স্বরূপতঃই অনবস্থ। অনুগত ব্যবহাবেব মূলে সাক্ষাৎভাবে বা সাদৃশ্য- পবম্পবায় কোনো অনুগত সমানধর্ম লুকিযে নেই যা প্রকাশ্যে বা অন্তবালে থেকে আমাদেব শব্দপ্রয়োগ নিয়ন্ত্রণ কবে। ভাষা-প্রয়োগেব তাই কোনো ব্যাখ্যা হয় না, তা কোনো চরম বৈধাযনেব অপেক্ষা বাখে না, এটি একটি শূন্যস্থিত, নিরালম্ব ঘটনামাত্র।

আলোচনা প্রসঙ্গে আমবা প্রতিটি বস্তুকে অনন্য বিশেষ রূপে অভিহিত কবেছি, ও প্রতিটি প্রত্যয়কে অবিভাজ্যরূপে চিহ্নিত কবেছি। এখন বৌদ্ধদেব মতেও প্রতিটি সদ্‌বস্তু অনন্য অভিনব স্বলক্ষণাক্রান্ত, এবং ভাষায ব্যবহৃত বিশেষণ মাত্রই যেহেতু অনেকানুগ্রাহী, স্বলক্ষণ-বস্তুগুলি তাই শব্দের দ্বারা অনভিলাপ্য-ভাষাতীত সত্তা। অপবপক্ষে ম্যাব ও শুভ বা গুড-এব প্রত্যযটিকে সবল বা অবিভাজ্য রূপে গণ্য কবেন, কাবণ প্রত্যযটিকে অনেকানুগ্রাহী শব্দেব দ্বাবা বিশ্লেষণ কবা যায় না। এই প্রত্যযটিও ম্যুবেব দর্শনে ভাষাতীত সত্তা রূপে স্বীকৃত। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে সব সত্তা সব প্রত্যযই ভাষা নির্ভব, এব বাইবে আমবা পা ফেলতে পারি না, অন্য কোনো স্থান থেকে ভাষাকে দেখতে পাই না। অর্থের কোনো অবশিষ্টাংশ নেই যা শব্দ থেকে বাইবে পডে থাকে, যাকে ভাষা ধবতে পারে না, অনন্ত সাদৃশ্যেব খেলা অনন্ত শব্দপ্রবাহেব মধ্য দিয়ে নিত্য নির্মীয়মান তার শবীর। হ্বিটগেনস্টাইন ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রতিটি বস্তুকে অনন্য বিশেষ রূপে চিহ্নিত কবাব উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ভাষাব

ভাষাতীত বুনিয়াদ (সমানধর্ম বা সামান্য ধারণা)কে নিরাকৃত করা, তা কোনো স্বজ্ঞালব্ধ অনভিলাপ্য সত্তার ইঙ্গিত বহন করবে না।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবার সাদৃশ্য ধারণাটির প্রকৃত মাহাত্ম্য ও বিস্তৃতি হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হবে। ভাষার মধ্যে স্বল্প সংখ্যক কিছু শব্দ দলছুট ও বেপরোয়া, বাকী সব নিয়মনিষ্ঠ ও আজ্ঞাবাহী - এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে আমাদের প্রথমেই সর্তক হওয়া প্রয়োজন। হ্বিটগেনস্টাইন নিজে 'ক্রীড়া' 'পরিবার', এবং 'চেয়ার' ছাড়াও অনেক শব্দের উল্লেখ করেছেন বা ইঙ্গিত দিয়েছেন যেমন, 'বাক্য', 'বচন', 'ভাষা, 'সংখ্যা', `পঠন', 'নিয়ম', 'ইচ্ছা', 'অভিপ্রায়', 'কৃতি', 'প্রত্যাশা', 'বেদনা'। এই শব্দগুলি নিয়ে আলোচনার অবকাশ এ মুহূর্তে নেই। বরঞ্চ আমাদের পুরোন উদাহরণের সেই সাধারণ শব্দ 'বিড়াল'-এ ফিরে যাওয়া যাক। আমরা দেখেছি 'বিড়াল' শব্দের পরিচায়ক বিশেষণগুলি - যেমন মাংশাসী, লোমওয়ালা, মিউ মিউ করে ডাকে, স্তন্যপায়ী, এগুলি দিয়ে 'বিড়াল' শব্দের সব সম্ভাব্য প্রয়োগকে আয়ত্ত করা যায় না। একটু একনিষ্ঠ বিচারে দেখা যাবে সংজ্ঞাটি নিজেই যে শুধু অনিশ্চয়তার দায়ে দায়ভাগী তাই নয়, যে যে শব্দের দ্বারা সংজ্ঞাটি প্রণয়ন করা হল তাদেরও কোনো নির্দিষ্ট প্রয়োগস্থল নেই। 'স্তন্যপায়ী' শব্দটির প্রয়োগ কি নিঃশেষে কয়েকটি সীমিত বিশেষণের মধ্যে ধরে রাখা যায়? স্তন্যপায়ী মাত্রই কি চার পা বিশিষ্ট? 'পা' শব্দটি কোন্ কোন্ স্থলে প্রয়োগ করব? যদি পা-টি এমন হয় যে তা শুধু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাই দেখা যায়? যদি প্রাণীটি ঐ পায়ের ওপর না চলতে পারে? যদি সাধারণ পায়ের আকৃতিবিশিষ্ট হয়েও শরীরের উপবিভাগ বা এককোণ থেকে নির্গত হয়? যদি তার বেড় তার দৈর্ঘ্যের থেকে দেড়গুণ বেশী হয়?[৪] তাহলেও কি তাকে 'পা' বলব? শরীরের উপরিভাগ ও নিম্নভাগের মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা কোথায়? কোন্ বিন্দুতে পায়ের আয়তন ছোট হতে হতে আণবিক আয়তনে এসে পৌঁছয়? আরেকটা উদাহরণ দেখা যাক, সোনার সোনালী রং ক্রমান্বয়ে বয়ে চলে হলুদে, হলুদ থেকে লালে - লাল থেকে কমলায়। এইভাবে আমরা যত বেশি শব্দের আচরণ যত ঘনিষ্ঠভাবে বিচার করব শব্দের উন্মুক্তগুণী বৃত্তির দুটি মাত্রা ক্রমশঃই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠবে। (১) শব্দকে আমরা নিয়মের বেড়া দিয়ে যতই বাঁধতে চেষ্টা করি ঐ বেড়ার বাইরের উপাদান ক্রমাগতই ঐ বেড়া ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে পড়ে, ফলে শব্দের চারণভূমি আরও সম্প্রসারিত করতে হয়, নতুন করে বেড়া বাঁধতে হয়, পূর্বপ্রণীত নিয়মের মধ্যে নতুন শব্দ সংযোজন করতে হয়, প্রয়োজন মত পুরোন শব্দ ছেঁটেও ফেলতে হয়। (২) যে বেড়াটি বাঁধা হল তা যে শুধু বহিরাগত শব্দ দ্বারা আক্রান্ত তা নয় - স্বয়ং আত্মদীর্ণ, আত্মবিভাজিত, নিজেকে উপচে সে বেরিয়ে পড়ে নিজ-আবেষ্টনীর বাইরে। এই অর্থে কোনোশব্দই তার নিজের সঙ্গে পুরোপুরি অন্বিত বা সমব্যাপ্য নয়। কোনো শব্দের ছিদ্র ঢাকতে আমরা আবার যে শব্দই ব্যবহার করি না কেন তা তো স্বয়ং সরন্ধ্র, ছিদ্রল, ভেদচিহ্নিত। শব্দ শুধু এক শব্দ থেকে আর এক শব্দতে নিয়ে যায়, তা কখনও শব্দাতীত কোনো সত্তাকে নির্দেশ করে না।

পবিবাব-সাদৃশ্যেব ধাবণাটিব প্রাথমিক বিশ্লেষণে মনে হয়েছিল তা শব্দেব প্রযোগস্থলকে এক আচ্ছাদক দিয়ে বাঁধাব পবিবর্তে একাধিক আচ্ছাদকের প্রাববর্ণ প্রক্রিযায বাঁধাব এক বিকল্প প্রস্তাব। কিন্তু খুঁটিযে বিচার কবে দেখা গেল আচ্ছাদক বা বিশেষণ উদ্ভাবনেব প্রক্রিযাটি সীমাহীন, ও তদুপবি শব্দরূপ আচ্ছাদক মাত্রই ছিদ্রল সরন্ধ্র। শব্দ শুধু তাই এক শব্দ থেকে আব এক শব্দে অনন্ত সাদৃশ্যেব চাল বেয়ে নিবন্তব খেলা কবে চলে।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর একশ বছর আগে মীল ও বেইন ভাষার এই উল্লঙ্ঘনী বৃত্তিকে লক্ষ্য করেছিলেন। 'সিস্টেম অব লজিক' গ্রন্থে (১৮৪৩) মীল মন্তব্য কবেন 'নেমস ক্রিপ অন ফ্রম সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট আনটিল দা ওযার্ডস কাম টু ডিনোট এ নাম্বাব অব থিংস নট ওনলি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অব এনি কমন অ্যাট্রিবিউট বাট হুইচ হ্যাভ এ্যাকচুযালি নো এ্যাট্রিবিউট ইন কমন' কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন-এব সঙ্গে মীল ও বেইনেব দৃষ্টিভঙ্গীব মৌলিক পার্থক্য এইখানেই যে মীল ও বেইনেব কাছে ভাষার এই অনির্দিষ্টতা, পিচ্ছিলতা, তাব একটি গ্লানি বা ন্যূনতা, পীড়াদায়ক বিকৃতি, যা সৌভাগ্যবশতঃ কযেকটি সীমিত শব্দেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আধুনিক কালেব অনেক ভাষা-দার্শনিক ভাষাব বহুল সংখ্যক শব্দেব এই উল্লঙ্ঘনী বৃত্তি লক্ষ্য কবে এক আদর্শ ভাষা নির্মাণেব পবিকল্পনা নিয়েছেন। সচেতন নিযম প্রণয়নেব দ্বাবা নতুন শব্দ নির্মাণ কবতে হবে ও পুবোন বিপথগামী শব্দগুলিকে - যাবা বৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালীতে অনুপযুক্ত, নির্দযভাবে ছেঁটে ফেলতে হবে। হ্বিটগেনস্টাইন-এব পবিবাব-সাদৃশ্যেব আলোচনা থেকে নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলি পবিষ্কার হওয়া উচিত -

(ক) ভাষার সব শব্দই 'ক্রীড়া' শব্দেব মত অনেকান্ত ফলে পরিবাব-সাদৃশ্যেব ব্যাখ্যার কোনো বিকল্প নেই।

(খ) পূর্ণাঙ্গ সর্বব্যাপী লক্ষণকে তাত্ত্বিক আদর্শরূপেও গ্রহণ কবা যায না, কাবণ যত সযত্ন প্রণীত সুপবিকল্পিত লক্ষণই হোক না, যে ভাষাব দ্বাবা লক্ষণটি নির্মিত হল সেই ভাষাব মধ্যেই অনিশ্চযতা, সেই সর্বেব মধ্যেই ভূত। ভাষাব প্রণীত লক্ষণমাত্রই তাই ভাষার দুবপণেয় দ্বিস্তব অনিশ্চযতাব দ্বাবা আক্রান্ত হবে।

সব শব্দই যে বস্তুতঃ 'ক্রীড়া' শব্দেব মত তা আপাতগ্রাহ্য নয়, আমবা দেখেছি সব শব্দেই অনিশ্চযতাব দুটি স্তব আছে একটি বহিবাক্রমণজনিত ও অন্যটি স্বগত। প্রথম স্তবেব অনিশ্চযতাকে বোঝা যতটা সহজ দ্বিতীয় স্তবে তা আবও গভীর আবও জটিল। এখন 'ক্রীড়া' শব্দটিব ক্ষেত্রে দুটি স্তরই স্পষ্ট, তাই প্রথম স্তবেব মধ্য দিয়ে ক্রমান্বযে দ্বিতীয় স্তবে পৌঁছতে আমাদেব দৃঢমূল 'ধ্রুববাদী' ঐক্যবোধ সহসা বাধাপ্রাপ্ত হয না। কিন্তু অন্যান্য অনেক শব্দেব ক্ষেত্রে যেমন 'মানুষ', 'গরু', 'পক্ষী', প্রভৃতি শব্দেব ক্ষেত্রে যেখানে আপাতদৃষ্টিতে একটি অনুগত সমানধর্ম দ্বাবা শব্দগুলিকে ছেঁকে ফেলা যায় সেখানে অনিশ্চযতার প্রথম স্তবটি স্পষ্ট নয়। এখানে শব্দগুলিব অনিশ্চয়তাকে হৃদয়ঙ্গম কবতে হলে আমাদের সবাসরি পৌঁছতে হবে দ্বিতীয় স্তবে, যেখানে লক্ষণঘটক ধর্মগুলি যেমন মানুষেব ক্ষেত্রে যুক্তিবাদিতা, গরুব

ক্ষেত্রে গলকম্বলবত্ত্ব, শৃঙ্গবত্ত্ব, এই ধর্মগুলিই পিচ্ছিল, আত্মদীর্ণ, আত্মবিভাজিত। অতএব যদিও সব শব্দকেই পবিবার-সাদৃশ্যেব দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা যায় একদিকে কিছু কিছু শব্দের অস্থিবতা সহজগম্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তা আরও গভীর। তবু মনে বাখতে হবে শব্দেব এ দ্বিধা বিভাজন অমোঘ বা চিরায়ত নয়, আর-সব শ্রেণীকরণের মত তা পিচ্ছিল ও ভিত্তিহীন।

হ্বিটগেনস্টাইন কেন শব্দের আচরণ বর্ণনা করতে গিয়ে পরিবারের উপমা ব্যবহার করলেন দেখা যাক। শব্দের সর্বস্তবেব অনিশ্চয়তা এই শব্দটির মধ্যে যেন প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রথম কথা, একই পবিবাবভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সত্যিই কোনো একক বিশেষণ খুঁজে পাওয়া যায় না, তাই আনতে হয় অনেকগুলি বিশেষণ। দ্বিতীয়তঃ, এই সীমিত সংখ্যক বিশেষণ দ্বাবাও সব সদস্যদের আবৃত করা যায না - এই বিশেষণগুলি প্রভাবিত হয় বাহ্যিক চাপেব দ্বাবা - তাই পুরোন শব্দেব বেডা ভেঙে আরও নতুন নতুন বিশেষণ যোগ করতে হয় বদল কবতে হয় বিশেষণের। কাবণ চোখের বং, চুলেব আভা, গাত্রবর্ণ, দৈর্ঘ্য, শাবীবিক গঠন, চোয়ালের গঠন, নাসাব আকাব, বাচনভঙ্গী মানসিকতা, - যত ধর্মই উল্লেখ কবা যাক না কেন, ঐ পবিবারেব কোনো এক সদস্য জন্মাতে পারে যার উল্লিখিত ধর্মগুলিব একটিও নেই। সেক্ষেত্রে উক্ত তালিকায বিশেষণ যোজনা কবতে হবে। তৃতীযতঃ 'পরিবার' শব্দটিব ক্ষেত্রে তার পরিচায়ক বিশেষণগুলির আত্মদীর্ণতা খুব স্পষ্টভাবে আমাদেব আঘাত কবে। বিভিন্ন নীল চোখেব মধ্যে স্পষ্টতঃই নীলত্বরূপ কোনো সাধারণ ধর্ম নেই। গাঢ নীল বং ক্রমান্বয়ে সাদৃশ্যের ঢাল বেয়ে ধূসব নীল, ধূসব, ও ক্রমান্বযে কালো রঙে মিলিযে যায, উন্নত নাসা সাদৃশ্য পবম্পবায যে কোন্ বিন্দু'তে গিয়ে ভোঁতা নাকে পরিণত হয় তা বলা যায় না।

শব্দেব এই অনিশ্চয়তা, পিচ্ছিলতা, প্রতিবর্ততাব নিয়মে ফিবে আসে এই অনিশ্চয়তাব ব্যাখ্যাকারী মূল পাবিভাষিক শব্দগুলিতে। 'প্রাবরণ' 'সাদৃশ্য', 'মিল', 'আদল', 'সমতা', 'একরূপ' 'অভিন্ন' এমন কী 'পরিবার সাদৃশ্য' শব্দটি নিজে পরিবাব-সাদৃশ্যের উদাহরণ। 'প্রাববণ' শব্দটির ক্ষেত্রে আমবা দেখেছি যে অর্থে একটি তুলোর আঁশ তাব অগ্রবর্তী আঁশকে প্রাবৃত করে, সে অর্থে আমরা দুটি প্রবন্ধেব মধ্যে, দুটি প্রশ্নের মধ্যে পারস্পবিক প্রাবরণের কথা বলি না। শবীরী প্রাববণ সাদৃশ্য পবম্পবাব চাল বেযে গডিযে চলে বিধর্মক নিবালম্ব সাদৃশ্যে - যে অর্থে হ্বিটগেনস্টাইন ওভারল্যাপিং সিমিল্যাবিটিস-এর কথা বলেছেন। ('পি. আই ' ৬৬)। 'সাদৃশ্য', 'মিল', 'এক', 'অভিন্ন' এই শব্দগুলিও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা প্রকরণে বিভিন্ন মাত্রালাভ কবে। সংগীতেব দুটি সুবকে বা দুটি স্ববমাত্রাকে যে অর্থে সদৃশ বলি সেই অর্থেই কি দুটি অনুভূতিকে সদৃশ বলে? বা যে অর্থে অনুভূতিকে 'এক' বলি সে অর্থেই কি দুটি সংখ্যাকে 'এক' বলি? তাই একটি শব্দেব ক্ষেত্রে ধরা যাক 'ক্রীড়া'র ক্ষেত্রে প্রতিটি ক্রীডাজোডের সাদৃশ্য সম্বন্ধ অনন্য - বিভিন্ন সাদৃশ্য সম্বন্ধগুলি পরস্পর সদৃশ, এদেব মধ্যে সাদৃশ্য-সম্বন্ধত্ব রূপ কোনো এক অনুগত সামান্য নেই। 'সাদৃশ্য' শব্দটিও তাই পিচ্ছিল.

জঙ্গম, অনিশ্চিত। সাদৃশ্য-প্রবাহেব কোনো চবম নিয়ন্তা বা নিয়ামক নেই একটি শব্দেব সম্ভাব্য সাদৃশ্যমুখগুলি কোনো পূর্বনির্ধাবিত নিয়মেব ছকে দেওয়া নেই, এই প্রগলভ বহুমুখী সাদৃশ্য স্রোতকে সাদৃশ্যেব কোনো সাধারণ আকাব বা ছকে বাঁধা যায় না। সাদৃশ্য প্রবাহেব প্রতিটি ধাপ তাই নিরালম্ব নিরাশ্রয়। সব শব্দের মত 'সাদৃশ্য'-শব্দটিও আত্মদীর্ণ, তাবও কোনো স্ব-অভিন্ন স্বরূপ নেই যা সাদৃশ্যকে বৈসাদৃশ্য থেকে পৃথক করে। এই ব্যাপাবটি একটু খতিয়ে দেখা যাক। সাদৃশ্যবাদীরা দাবি কবেন পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু নেই যাদেয় মধ্যে কোনো সাদৃশ্যসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। অপবপক্ষে এমন দুটি বস্তু নেই যাবা সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন, যাদেব মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। কতগুলি আপাত বিসদৃশ বস্তু নেওয়া যাক, ত্রিভুজ গাছ, এক সংখ্যাটি, দৌড়ন রূপ ক্রিয়া, সংযোগ সম্বন্ধ। এই সব বস্তুগুলি কিন্তু কালে অবস্থিত, তাই এদেব মধ্যে কালিকতা ধর্মটি আছে। তাছাড়া এবা প্রত্যেকেই গত দশ মিনিটে আমাব মনে ভাসমান হযেছে। এই দুটি সাদৃশ্যেব কোনো একটির ভিত্তিতে আমি উল্লিখিত বস্তুগুলিকে একই শ্রেণী বা প্রত্যয়েব অন্তর্ভুক্ত কবতে পাবি ও একই শ্রেণী নামে অভিহিত কবতে পারি। অপর দিকে দুটি সমানাকাব, সমানবর্ণের ববফ খণ্ড, যাদেব ধবে নেওয়া যাক আণবিক সংস্থানও এক, কিন্তু একটি পূর্বমুখী অপবটি পশ্চিমমুখী। এই বৈসাদৃশ্যটুকুব ভিত্তিতে তাদেব ভিন্ন প্রত্যযেব বা শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত কবা যেতে পারে। এখন সাদৃশ্যবাদীদেব মতে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি বাস্তবে উপস্থিত, ভাষানিবপেক্ষভাবেই উপস্থিত। আমবা এই প্রদত্ত সম্বন্ধগুলিব মধ্য থেকে নিজের আগ্রহ, প্রয়োজন ইচ্ছা, অনুসাবে সাদৃশ্য নির্বাচন কবি অথবা বর্জন করি, নিজ প্রয়োজন অনুসাবে কিছু কিছু বস্তুকে এক পবিবাবের অন্তর্ভুক্ত কবি, কিছু কিছু বস্তুকে এক পবিবারেব অন্তর্ভুক্ত কবি না। হুিটগেনস্টাইন বলবেন, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যগুলি ভাষাতীত পদার্থ নয, তাবা ভাষাব বাইরে থেকে আমাদের ভাষা প্রয়োগ, ও শ্রেণীকরণকে নিযন্ত্রণ করে না। 'পূর্বমুখী', 'পশ্চিমমুখী', 'সমবর্ণ', 'এক আণবিক আকাব', গত দশ মিনিট মনে ভাসমান হওয়া — এই সব বিশেষণগুলি কোনোটিই শব্দনিবপেক্ষ কোনো এক অখণ্ড স্ব-অভিন্ন পদার্থকে নির্দেশ করে না। সব সত্তাই অপরাপ্ত খণ্ডিত, আত্মদীর্ণ নিরালম্ব শব্দপ্রয়োগেব মধ্য দিয়ে নিত্য নির্মীযমান তাব শরীর। এই অর্থেই 'সাদৃশ্য' শব্দেব কোনো এক অখণ্ড অর্থ নেই, শব্দেব অন্তঃস্থিত আত্মবিরোধিতাব ঝোঁক তাকে ঠেলে দেয নিজ আবেষ্টনীব বাইবে, সাদৃশ্য থেকে বৈসাদৃশ্যে।

নামবাদী বা নমিনালিস্টবা মনে কবেন যে সামান্য ধাবণাগুলি নাম বা শব্দমাত্র তাঁদেব মতে বাস্তবে আছে কতগুলি ভিন্ন, ভিন্ন, খণ্ড, খণ্ড একক বস্তু, যাদেব মধ্যে কোনো অনুগত সমানধর্ম নেই, এমনকি কোনো পাবস্পবিক সাদৃশ্যও নেই। সাদৃশ্যবাদী ও নামবাদীদের সঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মিল এইটুকুই যে এঁবা সকলেই অনুগত সমানধর্মকে অস্বীকাব করেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে চবম অমিল এইখানেই যে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে শব্দ বা চিহ্ন বা নাম ঐ চিহ্ন নিবপেক্ষ কোনো চিহ্নিত অর্থকে উদ্দেশ্য করে না। শব্দ বা চিহ্ন কোনো [illegible] নয় যা ঐ শব্দ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নিবপেক্ষ কোনো পদার্থেব সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এইভাবে

হ্বিটগেনস্টাইন সামান্যবাদী, নামবাদী ও সাদৃশ্যবাদীব চিবকালীন ত্রিকোণিক দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটান।

সমগ্র আলোচনার নির্য্যাস আমরা নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলিব মাধ্যমে সাজাতে পাবি -

১ হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনে পরিবাব সাদৃশ্যেব ধারণাটি শব্দ প্রযোগেব এক বিকল্প ব্যাখ্যা-প্রকল্পরূপে উপস্থাপিত হয় নি। শব্দপ্রয়োগের তত্ত্বহীনতা বা নিবালম্বতাকে প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করাব জন্যই পবিবার সাদৃশ্যের অবতাবণা। 'পি. আই' ৬৫, তে হ্বিটগেনস্টাইন মন্তব্য করেন যে ভাষার বিভিন্ন প্রয়োগগুলিব মধ্যে এই সম্বন্ধ বা এই সম্বন্ধগুলি থাকাব জন্যই আমরা এদের 'ভাষা' রূপে অভিহিত কবি। ' ইট ইজ বিকজ অব দিস্ বিলেশনশিপ, অব দিজ বিলেশনশিপস, দ্যাট উই কল দেম অল ল্যাঙ্গুয়েজ' - এখানে 'বিকজ অব' বাক্যাংশেব দ্বাবা তিনি সাদৃশ্যকে শব্দ প্রয়োগেব সমর্থক ভিত্তিরূপে উপস্থাপন করেন নি, সাদৃশ্য যে শব্দের খেলাব মধ্য দিয়েই ক্রম নির্মীয়মান তাবই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

২. 'পি আই ' ৬৫-তে হ্বিটগেনস্টাইন-এব আব একটি মন্তব্য বিচার কবা যাক্। উনি বলেন, এ'সব ক্রিযাকলাপগুলিব ক্ষেত্রে যে আমি একই শব্দ ব্যবহাব কবি তা এদেব মধ্যে কোনো অনুগত ধর্ম আছে বলে নয়, কাবণ তাবা একটি আব একটিব সঙ্গে বহু বিচিত্র প্রকাব সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ' আই অ্যাম সেযিং দিজ ফেনোমেনা হ্যাভ নো ওযান থিং ইন কমন হুইচ মেকস আস ইউজ দা সেম ওযার্ড ফব অল, - বাট দে আব বিলেটেড টু ওয়ান অ্যানাদাব ইন মেনি ডিফাবেন্ট ওয়েজ।' 'বিলেটেড' শব্দটিব ইটালিক ছাঁদ দেখে এইটাই বোঝা যায় যে সম্বন্ধ অন্বয সাদৃশ্যই হ্বিটগেনস্টাইন-এব দর্শনেব সাবাৎসাব। একটি শব্দকে তাব প্রযোগস্থল থেকে তাব আনুষঙ্গিক শব্দগুলি থেকে বিযুক্ত কবে দেখা যায় না শব্দেব কোনো অন্তর্নিহিত কূটস্থ, অসঙ্গ, শাঁসবস্তু নেই যা ক্ষেত্র থেকে ক্ষেত্রান্তবে পুনরাবর্তিত হতে পাবে। প্রতিটি প্রয়োগ ক্ষেত্রেই এক নতুন অন্বয়, এক নবমাত্রিক বিচ্ছুবণ এক নতুন উপলেপ, বাদ দিযে কী অন্বিত হল, কী বিচ্ছুরিত, এই প্রশ্নের অবকাশ হ্বিটগেনস্টাইন-এব দর্শনে নেই।

৩ অন্তর্লীন ও বহিবঙ্গ আক্রমণেব দ্বাবা ছিন্নভিন্ন হযে যায প্রতিটি শব্দের শবীব। বহিরূপাদান ও অন্তর্নিহিত আত্মবিবোধী সম্ভাবনাগুলি তাকে ক্রমাগত ঠেলে দেয তার নিজ সীমানাব বাইবে। এইভাবে পবিবাব সাদৃশ্য শেষ পর্যন্ত ভাষাব আত্মদীর্ণতা ও আত্মবিবোধী প্রবনতাকেই সমাদব কবতে শেখায।

৪. অনেক ভাষা-দার্শনিক শব্দার্থকে তাব প্রকরণ ও প্রয়োগস্থলেব থেকে বিযুক্ত কবে তাকে নিজ অববোধেব মধ্যে বন্দী, নিঃসঙ্গ হিমায়িত জডবস্তুতে রূপান্তবিত কবেন।

তাঁদেব জন্যে একবাব নিয়ম প্রণয়ন কবলেই শব্দেব যাবতীয় সম্ভাবা, অনাগত, প্রয়োগস্থল চিরকালেব মত বপ্ত করা যায়।

এই সার্বভৌম নিয়মের ঘেবাটোপের মধ্যেই যেন ধরা পড়ে শব্দেব অসঙ্গ কূটস্থ তন্মাত্র। একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় নিয়ম প্রণয়নই যথেষ্ট, নিয়মের প্রয়োগ, বা শব্দের বিবিধ পুনরাবর্তন এক অনাবশ্যক অলংকাব মাত্র। একবাব নিয়ম প্রণযনেব দ্বাবাই যদি শব্দগুলি অর্থপুষ্ট হয়ে ওঠে, তবে সেগুলি নিয়ে আমি নাডাচাডা কবলাম নাকি দেরাজে পুরে বেখে দিলাম তাতে ভাষার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। সেক্ষেত্রে কোনো একটি শব্দ নিয়ে আমি একবাব প্রয়োগ কবতে পারি অথবা একবারও প্রয়োগ না করতে পারি. তাতে এ শব্দেব চিবায়ত শ্বাশ্বত সত্তাব কোনো হানি হবে না। হুিটগেনস্টাইন-এর পবিবাব সাদৃশ্যেব ধাবণা আমাদেব এ কথাই বাব বার মনে কবিযে দেয - শব্দেব পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ ও বিবিধ যাপনের অনুষঙ্গে শব্দ তাব অর্থ লাভ কবে, ভাষা লাভ কবে তাব অস্তিত্ব।

চরকাব আঁশেব ওপর আঁশ জড়িযে যেভাবে সূত্র রচনা কবা হয তাব সঙ্গে শব্দ প্রবাহেব একটি ব্যাপাবে বৈষম্য আছে। প্রথম প্রক্রিযাটি একটি একমুখী এক বৈখিক প্রক্রিযা। অপবপক্ষে শব্দেব নানা বোধ বুনন নানা মুখী সাদৃশ্য বিস্তাবকে অনেকটা মাকড়সাব জালের সঙ্গে তুলনা কবা চলে। হুিটগেনস্টাইন-এব শব্দ বিস্তাবকে 'কমপ্লিকেটেড নেটওযার্ক অব সিমিল্যাবিটিস ওভাবল্যাপিং অ্যান্ড ক্রিসক্রসিং' এইরূপেই বর্ণনা কবেছেন। ('পি. আই.' ৬৬)। আমবা দেখেছি দাবা খেলার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হাব-জিৎ বিশেষণটি একসঙ্গে বিচ্ছুবিত নানা দিকে - টেনিসেব হাব-জিতে, ভালবাসাব হার-জিতে, বিশ্বাসের হাব-জিতে। আমবা আবও দেখেছি মাকডসাব জালেব কতগুলি প্রত্যন্ত সীমা আছে কিন্তু একটি শব্দের বিস্তাব সর্বদাই অসমাপ্ত, পবিবাবেব সন্তান প্রবাহেব মতই তা নিবন্তব সীমাহীন। তৃতীয়ত মাকডসাব জালেব সঙ্গে শব্দজালেব আবও তফাৎ এই যে, শব্দজালের কোনো কেন্দ্রবিন্দু নেই কোনো আবম্ভস্থল নেই। একটি শব্দেব চাবপাশেব যে অনুভূমিক বিস্তাব ও তাব কালানুগ ধাবাবাহিকতা - এই যে দুই সমক্রম ও অনুক্রমেব অক্ষ ববাবব বেড়ে ওঠে সব শব্দ, নিবন্তব অন্বিত হয, বিচ্ছুবিত হয়, অন্য শব্দে। তাই কোনো শব্দেব কোনো আদিম অনন্বিত অসম্বদ্ধ উদ্ভব-মুহূর্ত নেই। 'ক্রীড়া' শব্দটিব কোনো প্রথম প্রয়োগস্থল নেই, এমন কোনো বেখা নেই যেখানে 'ক্রীড়া' শব্দজালেব আরম্ভ যা 'অ-ক্রীড়া' শব্দজাল থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করতে পাবে। একটি পরিবারের আবম্ভ ও শেষেব যেমন কোনো সুস্পষ্ট সীমাবেখা নেই প্রতিটি শব্দজাল তেমনি নিজেকে ছাপিযে ওঠে অন্য শব্দজালে. একটি শব্দ-পবিসবেব আত্মবিবোধী ঝোঁক তাকে ঠেলে দেয অন্য শব্দ-পবিবাবে। এই সকল পবস্পব-অন্বিত শব্দ-পবিবাবেব প্রবাহেই নিরন্তব নির্মিত হযে চলে আমাদের ভাষা।

টীকা

১ দ্রষ্টব্য, *An Introduction to Philosophical Analysis*, John Hospers, Allied Publishers, New-Delhi, 1986, পৃঃ ১২-৩

২ দ্রষ্টব্য, *An Introduction to Philosophical Analysis*, John Hospers, পৃঃ ১৩

৩ হুইটগেনস্টাইন তাঁর পি আই ' ৬৬-তে বলেছেন, ' if you look at them you will not see somthing that is common to *all*, but similarities, relationships, and a whole series of them at that . Look for example at board games with their multifarious relationships-এর পরে দুর্ভাগ্যবশতঃ উনি 'common features drop out and others appear' এইরূপ মন্তব্য করলেও শেষের দিকে 'similarities crop up and disappear এই মন্তব্যে বিভ্রান্তির সম্ভাবনা নাকচ করেছেন। আরও মনে রাখা দরকার যে 'overlapping' বিশেষণ উনি একবারই ব্যবহার করেছেন তা 'common features'-এর অনুসঙ্গে নয় similarity বা সাদৃশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে। ' we see a complicated network of similarities overlapping and crisscossing

৪ দ্রষ্টব্য, *An Introduction to Philosophical Analysis*, John Hospers, পৃঃ ১৩

নিয়মানুসরণ প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন

প্রিয়ম্বদা সরকার

হ্বিটগেনস্টাইন-এর সমস্ত বচনায ভাষা ও ভাষা সম্পর্কিত নিয়মকানুনেব আলোচনা মুখ্যভাগ অধিকাব কবে আছে। বস্তুতঃ নিযমানুসরণ সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনা তাঁকে ববাববই আকৃষ্ট কবেছে। 'ট্র্যাকটেটস'-এ আমবা দেখি তিনি ভাষা, সত্য চিহ্ন ও চিহ্নিতেব মাঝে যে প্রক্ষেপকবণেব নিয়ম আছে তাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে কবছেন ('ট্র্যাকটেটস' ৪.০১৪ এবং ৪.০১৪১)। তাঁর মতে এই নিযম দিয়েই হয় বোঝাপড়া - এই নিয়মেব জন্যই চিহ্ন থেকে চিহ্নিতে, ভাষা থেকে জগতে উত্তবণ সম্ভব। আবার 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থে দেখি যে নিযমানুসরণ সংক্রান্ত প্রচলিত ধ্যান-ধাবণা ভাঙ্গতে তিনি বদ্ধপবিকব। অনুমান করা বোধহয় অসঙ্গত হবে না যে তিনি নিজেও জীবনেব প্রথমভাগে প্রচলিত ধাবণাব বশবর্তী ছিলেন। বাস্তবিকই 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস'-এর নিযম সম্পর্কিত আলোচনা 'ট্র্যাকটেটস'-এর আলোচনা ব্যতিবেকে অসম্পূর্ণই থেকে যাবে।

এই প্রবন্ধে মুখ্য বিষয যদিও হ্বিটগেনস্টাইন-এর শেষ দিককাব বচনাসমূহ এবং শব্দসংখ্যা ও সময়ের বাঁধনে সীমিত, এই রচনায় 'ট্র্যাকটেটস'-এর পূর্ণাঙ্গ আলোচনা অসম্ভব, তবুও দু-চাবটির মন্তব্য উল্লেখেব নিতান্ত প্রযোজন অনুভব কবছি। যেমন এটা আমাদের মনে বাখতে হবে যে 'ট্র্যাকটেটস'-এ তিনি যে প্রক্ষেপকরণেব নিয়মেব কথা বলেছেন তা কিন্তু নির্দিষ্ট। এমন কী, ভাষার সঙ্গে খেলার তুলনাও তাঁর প্রথম দিকের লেখাগুলিতে পাই। আমবা ১৯৩১-এব 'লেকচার নোটস'-এ এই ধবণেব কথাব উল্লেখ পাই। তিনি বলেন -

> ভাষাকে সুসংবদ্ধ হতে গেলে নিযম থাকতেই হবে। খেলাব সঙ্গে তুলনা কব - যদি কোনো নিয়ম না থাকে তাহলে সেটা খেলাই হয় না - এই অর্থে দাবা খেলাকে একটি ভাষাই বলা যেতে পাবে।[১]

স্পষ্টতঃই হ্বিটগেনস্টাইন এখানে ভাষার নিযমকে নির্দিষ্ট ও অমোঘ ভাবছেন। শুধু তাই নয়, লক্ষণীয এটাও যে খেলার ধাবণার সঙ্গে নিযমের ধাবণাকে তিনি অপরিহার্য মনে করছেন এবং ভাষাব সঙ্গে সাদৃশ্য পেয়েছেন। বলা যেতে পাবে যে এই উক্তিই তাঁব পববর্তীকালের 'ভাষাব খেলা'র ধাবণার জনক; আমবা আমাদেব আলোচনার পরবর্তী পর্যাযে দেখব নিয়মেব এই নির্দিষ্টতাব বিরুদ্ধে তিনি নানা যুক্তি দিয়েছেন, তিনি বলেন -

> আমবা নিযমকে উদ্দেশ্য (মোটিভ) হিসেবে মনে কবলেও যখন আমবা নিয়মেব

উল্লেখ করি, তখন তাকে কারণ হিসেবেই মনে করি নিয়মগুলি নির্দিষ্ট ও প্রদত্ত। তারা কোনো কোনো সংযোগকে অনুমতি দেয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেয় না।"

এখানে আমরা দেখছি যে তিনি মনে করছেন যখন আমরা কোনো নিয়মানুসরণ করি - তখন নিয়মানুসরণের কোনো না কোনো কারণ থাকে। আবার তিনি বলেন -

বস্তুস্থিতির যৌক্তিক ছবি হল চিন্তা ('ট্র্যাকটেটস' ৩)
সত্য চিন্তার সমগ্রতাই সমগ্র জগতের প্রতিকৃতি ('ট্র্যাকটেটস' ৩.০১)

এখানে তিনি বলতে চাইছেন যে আমার চিন্তায় ভাষা সম্পৃক্ত হয় বিষয়ের সঙ্গে অর্থাৎ প্রক্ষেপ করণের নিয়মটি আন্তর-অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি জগৎ সম্পর্কে চিন্তা করেই জগতের প্রতিকৃতি গঠন করি। তাই অহম্‌বাদ সম্পর্কিত আলোচনা নিয়মের এই বৈশিষ্ট্য থেকে স্বতঃই অনুসৃত হয়।

আমারা আমাদের আলোচনায় দেখব হ্বিটগেনস্টাইন নিয়মসম্পর্কিত প্রচিলত ধারণাগুলিকে খন্ডন করেছেন যেমন নির্দিষ্টতা বা আন্তর অভিজ্ঞতার সঙ্গে নিয়মের সম্পৃক্ত হওয়া এবং নিয়মের কোনো না কোনো কারণ থাকার বিশ্বাসকে পরবর্তীকালে হ্বিটগেনস্টাইন খন্ডন করেছেন। শুধু তাই নয়, নিজে এই ভুল ধারণার ফাঁদে পা দিয়েছিলেন বলেই এর মূল উৎপাটনে তিনি এত নির্মম। যাই হোক নিয়মানুসরণের ধারণার যে আলোচনা হ্বিটগেনস্টাইন 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' ও 'রিমার্কস অন দা ফাউন্ডেশনস অব ম্যাথাম্যাটিকস' গ্রন্থে করেছেন, তার নঞর্থক দিক হল ভুল ধারণাগুলির খন্ডন। এই আলোচনার সদর্থক দিক কিছু আছে কি না - এ বিষয়ে ব্যাখ্যাকারদের মতবিরোধের অন্ত নেই। এই নিবন্ধে মূলতঃ হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্যই বিশ্লেষণ করা হবে। তাই অবশ্যম্ভাবীভাবেই নঞর্থক দিক আলোচনার পর সদর্থক তত্ত্ব কিছু পাওয়া যায় কিনা সে বিষয়ে আলোকপাত করা হবে, এবং নিয়মানুসরণ প্রসঙ্গে গাণিতিক বা যৌক্তিক আবশ্যিকতা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির বিপক্ষে হ্বিটগেনস্টাইন কী বলতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট করা হবে। এই দিক দিয়ে ভাবলে প্রবন্ধটি ভাষ্যমূলক, সমালোচনামূলক নয়। তবুও এ ধরণের ব্যাখ্যামূলক আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করছি যেহেতু হ্বিটগেনস্টাইন-এর সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর বক্তব্যের প্রকৃত অর্থ না বোঝার ফলেই উদ্ভূত হয়েছে। তাই আমার লক্ষ্য হল নিয়মানুসরণ সম্বন্ধে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মূল রচনা অনুসারে সঠিক ভাষ্যের উপস্থাপনা করা - এবং দেখানো যে অধিকাংশ ভাষ্য ও সমালোচনাগুলি হ্বিটগেনস্টাইন-এর সঠিক মূল্যায়ন করতে অপারগ।

এই নিবন্ধটি মূলতঃ তিনটি পর্বে বিভক্ত। প্রথম পর্বে নিয়ম সম্পর্কিত ধারণা অর্থাৎ নিয়ম কাকে বলে তার আলোচনা, দ্বিতীয় পর্বে কেমনভাবে একজন নিয়মানুসরণ করে, তার ব্যাখ্যা ও এই প্রসঙ্গে ভুল ধারণাগুলির খন্ডন এবং তৃতীয় পর্বে নিয়মানুসরণের সদর্থক দিকগুলি তুলে ধরা।

[এক]

নিয়ম কাকে বলে?

আমরা আগেই দেখেছি যে হ্বিটগেনস্টাইন ভাষার সঙ্গে খেলার তুলনা করেছেন বা ভাষাকেই খেলা বা ভাষার খেলার কথা বলেছেন। ভাষার সঙ্গে খেলা তুলনীয় হয়েছে সম্ভবতঃ এই কারণে যে উভয় ক্ষেত্রেই নিয়ম অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অবশ্য এটা ঠিক যে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কঠোরভাবে নিয়মানুসারী নই। অনেকসময় এমনও হয় যে আমরা শব্দটি সঠিকভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু ব্যবহারের নিয়ম জিজ্ঞাসা করলে ঠিকমতো বলতে পারি না।

এখানে প্রশ্ন ওঠে তবে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিয়মের ভূমিকাটি কী? কী অর্থেই বা শব্দব্যবহারে নিয়ম প্রযুক্ত হয়? নিয়ম কীভাবেই বা শব্দের ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে? এ সব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে আমাদের জানতে হবে হ্বিটগেনস্টাইন নিয়ম বলতে কী বুঝিয়েছেন? প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে হ্বিটগেনস্টাইন নিয়মের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নিয়ম তত্ত্বের সন্ধান করেন নি - সেই হিসেবে এই পর্বের প্রশ্নবোধক নামকরণটি নিঃসন্দেহে প্রচলিত ভুল ধারণার পরিচয় বহণ করছে।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে 'নিয়ম' এই শব্দ ব্যবহারের নিয়ম শব্দব্যবহারের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। বস্তুতঃ তিনি বলেছেন -

> 'আমি 'নিয়ম' শব্দ ব্যবহারের নিয়ম প্রথমে সারণীবদ্ধ না করেই 'নিয়ম' কথাকে ব্যবহার করতে পারি এবং এই নিয়মগুলি কোনোমতেই অতি-নিয়ম হবে না।'[৩]

এখন যদি কেউ খেলার জন্য কিছু নিয়ম সারণীবদ্ধ করে অথবা কোনো চিহ্ন ব্যবহারের নিয়ম তালিকাকারে সাজায়, তবে তাকে নিয়ম কথাটারও সংজ্ঞা দিতে হবে এরকম কোনো আবশ্যিকতা নেই। তাই যদি হয়, তবে কীভাবে 'নিয়ম' শব্দটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে? হ্বিটগেনস্টাইন বলেন ঃ অনেক রকমভাবেই একজন 'নিয়ম' শব্দটি ব্যবহার করতে পারে। যেমন 'নিয়ম' শব্দটি না উল্লেখ করেই বলতে পারেন যে $p \supset q$ যুক্তিবাক্য থেকে সিদ্ধান্ত $p.(p. \supset q)$ অনুসৃত হয়। আবার একটি বিশেষ খেলার (মনে করা যাক্ লুডোর) নিয়ম জিজ্ঞাসা করলে কেউ 'নিয়ম' শব্দটি উচ্চারণ না করেই খেলার নিয়মগুলি বলে যেতে পারেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে নিয়মের উদাহরণগুলি বিভিন্ন প্রকারের হওয়ায় তাদের মধ্যে কোনও একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যা নিয়মত্বকে উদ্দেশ করে তা দেখতে পাচ্ছি না।

অবশ্য এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে যে যদি আমরা নিয়মত্ব বলে কিছু না মানি তবে কী করে বুঝবো কোন্‌টা নিয়ম আর কোন্‌টা নিয়ম নয়? সর্বোপরি আমরা যদি নিয়মের সংজ্ঞাই দিতে না পারি তবে আমরা নিয়ম শিখি কী করে?

হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে আমরা উদাহরণ থেকেই নিয়ম শিখি। এ প্রসঙ্গে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমরা সাধারণতঃ নিয়ম ও নিয়মের বহিঃ প্রকাশ বা উদাহরণের মধ্যে

পার্থক্য করে থাকি যেমন একটা তালিকা, একটা শহরের নাম, একটা দূরত্বজ্ঞাপক স্তম্ভ বা একটা নির্ঘন্ট, ইত্যাদি, এগুলিকেই আমরা নিয়মের উদাহরণ হিসেবেই দেখে থাকি। হিটগেনস্টাইন কিন্তু এগুলিকে নিয়মের উদাহরণ হিসেবে না দেখে এগুলিকেই নিয়ম বলে থাকেন। অর্থাৎ সাধারণভাবে আমরা যে পার্থক্য করে থাকি সেটা হিটগেনস্টাইন করেন না – আর তাই তাঁর কাছে 'আমি নিয়ম জানি' এর অর্থ হল 'আমি নিয়মানুসরণ করে চলি'। শুধু তাই নয়, আমরা এই নিবন্ধে দেখব যে তিনি অনুভূতি ও অনুভূতির উদাহরণ বা বহিঃপ্রকাশ বা অনুভূতি প্রকাশক আচরণের মধ্যে কোনোরকম পার্থক্য করেন নি। অনুরূপভাবে ওপরের তালিকাভুক্ত উদাহরণগুলি নিয়মের প্রতীক নয়, এগুলিই নিয়ম।

যাই হোক্ যদি আমরা মেনেও নিই যে তালিকা, শহরের নাম ও দূরত্বজ্ঞাপক স্তম্ভ বা নক্‌শা গুলোই নিয়ম, এবং নিয়ম ও তার উদাহরণের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই তবুও প্রশ্ন থেকে যায় ঃ আমরা কীভাবে নিয়ম শিখি? কীভাবেই বা তালিকা পড়তে শিখি। এর উত্তরে হিটগেনস্টাইন বলেন যে লোকে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমেই নিয়ম শেখে। তিনি মনে করতেন 'নিয়মিত' বা 'রেগুলার' এবং 'একইরকম' বা 'ইউনিফর্ম' যেমন সমগোত্রীয় ধারণা তেমনি 'নিয়ম' বা 'রুল' ও 'একই' বা 'দা সেম' এই দুই ধারণাও সমগোত্রীয়। এই ধারণাগুলি কেমন করে ব্যাখ্যা করা যায় তা বলতে গিয়ে হিটগেনস্টাইন বলেছেন

> 'নিয়মিত', 'একরকম', 'একই', এই পদগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করতে হলে শিক্ষার্থীকে একই রঙ, একই দৈর্ঘ্য একই আকার প্রথমে দেখাতে হবে। শিক্ষার্থীকেও ঐ উদাহরণ খুঁজে বার করতে হবে, যা উদাহরণ বলে গণ্য নয় তা খারিজ করতে হবে। এমন করেই উদাহরণ প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থবোধ হতে পারে।[৮]

যেমন কোনো ছাত্রকে যদি ২ যোগ করতে বলা হয় সে যদি শেষ অবধি একইরকমভাবে যোগ করে যায় তবে বলা যেতে পারে যে সে নিয়মটি শিখেছে। উদাহরণ ও অভ্যাসের সাহায্যেই আমরা নিয়ম শিখি, যখন আমরা সফলভাবে একটি অনুক্রমকে দীর্ঘায়িত করতে পারি তখন বলা যেতে পারে যে আমরা নিয়মটিকে অনুসরণ করেছি বা বুঝতে পেরেছি। 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থের ১৮৫ নং সূত্রে হিটগেনস্টাইন একটি ছাত্রের উল্লেখ করেছেন যাকে ২ যোগ করতে বলায় সে ১৯৮ অবধি ঠিক যোগ করেছে কিন্তু ১০০০ থেকে ১০০৪ ১০০৮ ১০১২ ১০১৬ এইভাবে এগোচ্ছে। অবশ্যই তাকে যা করতে বলা হয়েছে তা সে মনে করে নি, অর্থাৎ সে নিয়মানুসরণ করে নি। কিন্তু তাকে যে ১০০২, ১০০৪, ১০০৬ এইভাবেই এগোতে বলা হয়েছে অন্য কোনোভাবে এগোতে বলা হয় নি - তা '২ যোগ কর' এই নির্দেশ বা নিয়ম থেকে কী করে আবশ্যিকভাবে অনুসৃত হবে? তাকে যা করতে বলা হয়েছিল তা সে করেনি - এটাই বা কীভাবে প্রতিপন্ন করা যাবে? অর্থাৎ ২ যোগ কর' এর অন্তর্নিহিত অর্থ কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে? কী করে বুঝব অনুক্রমের শেষ সংখ্যায় এই নিয়ম প্রযুক্ত হবে? এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে গেলে জানতে হবে নিয়মানুসরণ করা বলতে কী বোঝায়, বা কীভাবে আমরা নিয়মানুসরণ করি।

[দুই]

আমবা কীভাবে নিযমানুসরণ করি?

এই পর্বের শিরোনাম অনেকের কাছেই অকিঞ্চিৎকব মনে হতে পারে যেহেতু দৈনন্দিন জীবনে নিয়মানুসরণ ক্রিযাটি কোনো সমস্যাব সৃষ্টি কবে। কিন্তু দার্শনিক মহলে এটি নানা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ও তৎ নিবাবক নানা বিরুদ্ধ তত্ত্বের জনক। এই নিয়মানুসরণ সংক্রান্ত সমস্যা আর কিছুই নয, তত্ত্ব ও তাব প্রয়োগেব সমস্যা। নিয়ম হল তত্ত্ব, তা কোনো একটি বিশেষ কালে (মনে কবি বর্তমান) গঠিত বা উচ্চারিত। কিন্তু তার প্রয়োগ ক্ষেত্রটি সেই কালেই সীমাবদ্ধ নাও থাকতে পাবে অর্থাৎ কিনা ভবিষ্যতের কোনো অজানা ক্ষেত্রেও সেটি নির্ভুলভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। এখন প্রশ্ন হল ঃ তা কীভাবে সম্ভব? এ সম্বন্ধে যে ধরণেব চিন্তা ভাবনা আমবা সকলেই কবে থাকি, যে ধারণাগুলি আমাদেব মনে দৃঢমূল হযে আছে, হ্বিটগেনস্টাইন সেই ধাবণাবই বিরুদ্ধেই 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' ও 'বিমার্কস' গ্রন্থে নানাবিধ যুক্তি দেখিযেছেন। বোঝাব সুবিধেব জন্য আমি আমাদেব সযত্নলালিত ভুল ধাবণাগুলিকেই প্রথমে আলাদা কবার চেষ্টা করেছি ও নাম দিযেছি M_1 M_2 M_3 এবং M_4

M_1 আমাদেব আন্ত-অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই নিয়ম বা তত্ত্ব ও তার অনন্ত প্রয়োগক্ষেত্রে সম্বন্ধিত হয। আন্তর-অভিজ্ঞতার অর্থ নিযমটিকে বোঝানো, মনে মনে ভাবা, বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করা, ইত্যাদি। অর্থাৎ আমি যদি নিয়মটি মনে মনে ভাবি, ঠিকভাবে বুঝে থাকি অথবা চিন্তা কবি, কীভাবে এগোতে হবে এ সম্বন্ধে যদি বিশেষ প্রত্যক্ষ হয় তবে সেই নিয়মের প্রয়োগেও আমাব কোনোবকম ভুল হবে না। ভুল হওযাব অর্থই হল আমি নিয়মটিকে বুঝি নি বা নিযমটি আন্তব অভিজ্ঞতাব সঙ্গে সম্পৃক্ত হযনি।

M_2 গাণিতিক সূত্রই নিয়মানুসরণেব বিভিন্ন ধাপগুলি নিয়ন্ত্রিত কবে। এক্ষেত্রে গাণিতিক সূত্রেব বিশেষত্বই নিয়ম ও তাব ভবিষ্যৎ নির্ভুল প্রয়োগকে সম্বন্ধিত করা। আমরা বেশীবভাগ সময়েই মনে কবে থাকি যেন নিযম এক আদর্শযন্ত্র - যাব ভেঙ্গে যাওযাব, মিলিয়ে যাওয়াব, কোনো সম্ভাবনাই যেন নেই, যেমন নেই নিয়মের অনুষঙ্গে ভুল হওযার সম্ভাবনা।

M_3 নিযমেব ব্যাখ্যাই নিয়মানুসবণের বিভিন্ন ধাপগুলি নিয়ন্ত্রিত কবে। অর্থাৎ আমি নিয়মের ব্যাখ্যা যা কবেছি - তাই ভবিষ্যতে আমি নিয়মানুসরণ কবছি কী কবছি না - - তাকে নিয়ন্ত্রণ কববে। এক্ষেত্রে তত্ত্ব ও নিযমের ব্যাখ্যাই নিয়ম ও তাব নির্ভুল প্রয়োগকে সম্বন্ধিত কবে।

M_4 যদি কোনো নিযম বা আদেশ আমবা পালন কবি তবে সেই নিযম পালনেব কোনো না কোনো কারণ থাকবেই। এক্ষেত্রে কাবণের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদেব - অসন্দিগ্ধতা প্রমাণের অপেক্ষা বাখে।

এই চাব প্রকাব ভ্রান্ত ধাবণাব বিরুদ্ধে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য এবাব পর্যায়ক্রমে আলোচনা কবা যাক।

M_1 . এ আমবা আন্তর অভিজ্ঞতাকে নিয়ম ও তাব নির্ভুল প্রয়োগেব নিয়ামক হিসেবে দেখেছি। এখন আন্তব-অভিজ্ঞতা বলতে আমরা অনেক সময় বুঝি যে মনেব মধ্যে একটা অদ্ভুত ক্রিয়া ঘটে যায় বা মনে কবি নিয়মটিই যেন তার পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে আমাদেব জানান দেয়। আবার অনেক সময় মনে কবি নিয়ম ও সঠিক নিয়মানুসরণ সম্পর্কে আমাদের বিশেষ বা অ-লৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। এখানে মনে বাখা দবকাব যে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' ও 'রিমার্কস'-এ হিটগেনস্টাইন কেবলমাত্র এই তিন ধবণেব অভিজ্ঞতাকেই তুলে ধবেন নি আরও ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতার কথা তিনি চিত্তাকর্ষক উদাহরণেব সাহায্যে বর্ণনা করেছেন। আমি বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলিকে মোটামুটিভাবে তিনভাগে ভাগ করেছি। আন্তব অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ কবে যে তিন ধরনেব অভিজ্ঞতা স্বীকৃত হয়েছে নীচে তাদেব বিরুদ্ধে হিটগেনস্টাইন-এর প্রতিক্রিয়া তুলে ধবা হল। নিয়ম পালন মানে 'মনেব মধ্যে একটা অদ্ভুত ক্রিয়া ঘটান' এই প্রসঙ্গটি দিয়ে শুরু করা যাক্। এই বিশেষ অদ্ভুত ক্রিয়াটি আব কিছুই নয়, মুখে যা বলি মনে মনে তারই অর্থকে বুঝি আব অর্থটা এমনই যে ভবিষ্যতের অনন্ত সংখ্যক প্রয়োগেব ক্ষেত্রে ঐ অর্থটি নির্ভুল উত্তবকে নিয়ন্ত্রিত কববে। অর্থাৎ আমি যদি প্রকৃতই একটি নিয়মের অর্থ বুঝে থাকি ('বুঝে থাকা' কথাটি গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এটি একটি বিশেষ মানসিক অবস্থাকে বোঝাচ্ছে) তবে ভবিষ্যতে কোনো ক্ষেত্রে কখনই আর আমাব ভুল হবাব সম্ভাবনা থাকে না। তাই যখন আমি আমার ছাত্রকে ২ যোগ কবতে বলি, তখন যদি সে মনে প্রকৃতই এর অর্থ বুঝে থাকে বা বোঝাব সেই মানসিক অবস্থা যদি তাব প্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে সে কখনোই ১০০০ এব পরে ১০০৪ লিখবে না।

হিটগেনস্টাইন কিন্তু কোনো আন্তব অভিজ্ঞতাব সঙ্গে সঠিক নিয়মানুসবণের সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁব যুক্তি হল যদি নিয়মপ্রকাশক শব্দ উচ্চারণেব সঙ্গে ভবিষ্যতে নির্ভুল প্রয়োগেব কোনো সম্বন্ধ না থাকে তবে কোনো শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোনো মানসিক অবস্থার সঙ্গেও ভবিষ্যত প্রয়োগেব কোনো সম্বন্ধ থাকবে না। শব্দ উচ্চাবণ ক্রিয়াটি সর্বজনীন, তা বাহ্য জগতে অনুষ্ঠিত, তাব সঙ্গেই যদি ভবিষ্যৎ প্রয়োগেব সম্পর্ক না থাকে, তবে কোনো বিশেষ ব্যক্তিগত মানসিক অবস্থাব (যা অপরেব কাছে চিব-অপ্রকাশ্যই থাকে) সঙ্গত সঠিক নিযমানুসবণেব কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে হিটগেনস্টাইন-এব ব্যক্তিগত-ভাষা সম্পর্কিত মতামত আমাদেব স্মবণে বাখতে হবে। অন্যভাবে বলতে পারি শব্দোচ্চাবণ ক্রিয়াটি যদি শূণ্যগর্ভ হয (অর্থাৎ নিযমানুসবণেব সঙ্গে সম্পর্কহীন হয আমবা এটিকে প্রতীক চিহ্নে বলতে পাবি $S = O$)। তবে শব্দোচ্চাবণেব সমকালিন মানসিক অবস্থাও শূন্যগর্ভ বা নিযমানুসবণেব সঙ্গে সম্পর্কহীন হবে। তাই এটি সম্পূর্ণই ভুল ধাবণা যে একটি বিশেষ মানসিক অবস্থায উপনীত হলে তবেই ভবিষ্যতের সব প্রয়োগ অভ্রান্ত হবে।

এবাব আসি অন্য অভিজ্ঞতা 'জানান্ দেওয়ার প্রসঙ্গে। আমবা আগেই বলেছিলাম যে কোনো একটি ক্রমকে দীর্ঘায়িত কবতে গেলে কীভাবে এগোতে হবে তা আমাকে নিয়মাবলিই

জানান্ দেবে। হ্বিটগেনস্টাইনকে অনুসবণ কবে এইমত প্রসঙ্গে বিশদ করে বলা যায় — কেউ কল্পনা করতে পাবেন যে একটি বিশেষ অনুভূতির জন্যই তিনি নিয়মটি ঠিকভাবে প্রয়োগ কবতে পাবলেন, মনে করা যাক্ অংকের নিয়ম। তিনি বলতে পাবেন ঃ আমি জানি না কেমনভাবে নিয়মগুলো হঠাৎ আমাকে জানান্ দিল কীভাবে এগোতে হবে। এটা শুনে আমবা এইভাবে আমাদেব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কবে থাকি ঃ 'অবশ্যই। কারণ তুমি নিয়মানুসবণ করে সঠিকভাবেই এগোচ্ছ'।[৫]

হ্বিটগেনস্টাইন অভিজ্ঞতাবাদীদের 'জানান্ দেওয়া' তত্ত্বেরও বিরোধী ছিলেন। তিনি যুক্তি দেখান ঃ এরকম হতেই পাবে যে নিয়মটি একভাবে এগোনব জন্য জানান্ দিল কিন্তু সেভাবে এগোনটা নিয়মানুসবণ নয়। আবার এরকম হতে পারে যে সে প্রকৃতই নিয়মানুসবণ কবছে না অথচ তার কাছে জ্ঞাপিত হচ্ছে যে সে নিয়মানুসবণ করছে।

এ ছাড়াও 'নিযমানুসরণ করছি' ও 'আমি জানতে পাবছি যে এইভাবে বলতে হবে' - এদেব মধ্যে পার্থক্য আছে। আমি নিয়ম শেখাতে পাবি, নিযমানুসরণ কীভাবে কবতে হবে তা দেখাতে পাবি, কিন্তু আমি জানতে পাবছি আব আমাব এই জানতে পাবাটা একটি বিশেষ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল - এটা কখনো কাউকে শেখানো যায না , দেখানো তো যায়ই না। আমি ভাসা ভাসা অস্পষ্ট, একটা ধাবণা দিতে পাবি - যে এটা একধবণের ব্যক্তিগত অনুভূতি যেটা কখনোই কোনো ব্যক্তিকে নিযম শেখানোব সমতূল্য হবে না।

শুধু তাই নয, নিযমানুসবণকে যদি জানান্ দেওয়াব মতো ব্যক্তিগত অনুভূতি দিযে ব্যাখ্যা কবি, তবে নিয়মানুসবণ যথার্থ হচ্ছে কিনা তা বিচাবেব ভাব সেই অনুভূতির উপরেই থাকে। সেক্ষেত্রে আমার মনে হচ্ছে যে আমি যথাযথভাবে নিয়মানুসবণ কবছি আব আমি প্রকৃতই নিয়মানুসবণ করছি - এব মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। অন্যদিকে এটা নিশ্চিত যে নিয়মানুসবণ কোনো ব্যক্তিগত ব্যাপাব নয - কাবোব মনে হওযা না হওয়াব উপব তা নির্ভব কবে না। এই প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন শুধু ইঙ্গিত দিযেছেন যে যখন কোনো ব্যক্তি নিয়মানুসবণেব ক্ষেত্রে আন্তর-অভিজ্ঞতাব নির্দেশের অপেক্ষা কবে তখন তাব কাছে নিয়মানুবর্তিতা আশা কবা যায় না। আমবা পরে দেখব যে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে নিয়ানুসরণের সঙ্গে নিযমানুবর্তিতাব ধাবণা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। শুধু তাই নয়, তিনি এই ধাবণাকে অভ্যাস বা বীতি-নীতির সঙ্গেও যোগ করেছেন। এখন যদি নিয়মানুসরণেব ধাবণাকে নিয়মিত অভ্যাসের ধাবণাব সঙ্গেও যোগ কবা হয তখনই মনে হচ্ছে যেন নিযমানুসবণ কবছি' আব 'প্রকৃত নিযমানুসরণ কবছি' - এদেব পার্থক্য আবও সুস্পষ্ট রূপে ধবা পড়ে ও 'জানান্ দেওযা' তত্ত্বেব ফাঁকিটুকু চোখেব সামনে ধবা পড়ে।

এবারে আসি নিয়ম প্রত্যক্ষেব তত্ত্বে। আমবা অনেকসময এবকমও বলে থাকি যে অনুক্রমে আমি নিয়ম প্রত্যক্ষ কবি। বস্তুতঃ তত্ত্ব ও তাব প্রয়োগের সম্পর্কটুকু আমি প্রত্যক্ষ কবি এবং তারই জন্য আমি ভবিষ্যতেব অজানা ক্ষেত্রেও নিয়মকে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে পাবি।

এক্ষেত্রে হুইটগেনস্টাইন বলেন যে আমরা একটি বিশেষ ক্রমের নিয়মানুবর্তিতা অবশ্যই প্রত্যক্ষ করতে পারি। যদিও একটি নিয়ম ও তার ভবিষ্যতের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করা কখনোই সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও যদি মনে করা হয় যে একটি নিয়মের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভাবনাকে একটি অভিজ্ঞতা লব্ধ সত্য রূপে জানা যায় তবে এই মনে করার মধ্যে গন্ডগোল রয়েছে। যদি বলি 'আমি নিয়মকে প্রত্যক্ষ করি বা দেখতে পাই'। তবে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়ম প্রযুক্ত হবার ঘটনাকে দেখতে পাই বলেই মনে করতে হবে। নতুবা এই প্রত্যক্ষ করার কোনো সার্বিক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

অতএব আমাদের আন্তর অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই নিয়ম ও তার অনন্ত প্রযোগ ক্ষেত্র সম্বন্ধিত হয় - এ তত্ত্ব মানা গেল না। তবে আন্তর-অভিজ্ঞতাবাদ খন্ডিত হলেই আমাদের সমস্যার সমাধান হয়। প্রশ্ন কিন্তু রয়েই যায় , উদাহরণের ছাত্রটি কী করে জানবে '২ যোগ কর' এই নিয়মে ১০০০ এর পর ১০০২- ই হবে ১০০৪ নয়?

M_2 : ভবিষ্যত্বের সমস্ত ধাপগুলি যেন বীজগণিতের সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এখানে হুইটগেনস্টাইন নিয়মের যথার্থ প্রয়োগ সংক্রান্ত একটি দৃঢ় মূল ভ্রান্ত ধারণাকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমরা সাধারণতঃ বিশ্বাস করি যে নিয়মগুলি যেন গাণিতীয় অপেক্ষক। এই অর্থে যে গাণিতীয় অপেক্ষকের মূল্য অনির্দিষ্ট এবং যে মূল্যই বসানো হোক্ না কেন, ফল সুনিশ্চিতই থাকে। আমরা অনুভব করি যে নিয়মগুলো আমাদের একইভাবে বলতে বাধ্য করে এবং এর নির্দেশিত পথ আমরা অনুসরণ করতে বাধ্য অর্থাৎ নিয়মের ভূমিকা যেন অপেক্ষকের মতো। মূল্য যাই হোক না কেন, প্রয়োগক্ষেত্র যাই হোক না কেন, ভবিষ্যতের সব ধাপই যেন নিয়ম নিয়ন্ত্রিত বা অপেক্ষক-নিয়ন্ত্রিত-এর একটুও নড়চড় হবার উপায় নেই। হুইটগেনস্টাইন এই ধারণা অস্বীকার করেন। তিনি মনে করেন 'নিয়ন্ত্রিত' শব্দের দুটি অর্থের মধ্যে পার্থক্য না করার ফলে এরকম ভুল ধারণা জন্মায়। তিনি বিশদ করেন -

$y = x^2$ সূত্রটি কী ১০০ নং ধাপে কী হবে - তাকে নিয়ন্ত্রিত করে?

এটার অর্থ এরকম হতে পারে ঃ 'এর সম্বন্ধে কোনো নিয়ম আছে কি? অথবা বেশিরভাগ লোকই কি সূত্রটি শেখবার পরে ১০০ নং ধাপে একইরকম উত্তর দেয়? এই দুটি প্রশ্ন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ধারণা প্রকাশ করে। প্রথম প্রশ্নটি গাণিতিক সূত্রের অপেক্ষকতা সংক্রান্ত, দ্বিতীয় প্রশ্নটি লোকব্যবহার সংক্রান্ত।[৮]

হুইটগেনস্টাইন মনে করেন যে এই দুই অর্থের মধ্যে পার্থক্য করা জরুরী। আমরা যখন এই দুটি অর্থকে গুলিয়ে ফেলি, তখনই বলি যে নিয়মটি বীজগণিতের সূত্রের মতো বা গাণিতিক অপেক্ষকের মতো, অর্থাৎ মানুষের নিয়মপালনের প্রতিটি ধাপ গাণিতিক সূত্রে গাঁথা. এই প্রচলিত ধারণাটি হুইটগেনস্টাইন একটি যন্ত্রের রূপকের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন, 'যন্ত্রের সমস্ত কাজই যেন যন্ত্রের মধ্যে থাকে' ('ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' §৭৮) আমরা মনে করি ১৯৯০ সালে যে মশলাপেটাই যন্ত্রটি কেনা হয়েছিল ১৯৯৪ সালে সে যেভাবে

কাজ করছে তার সবটুকুই যেন যন্ত্র নির্মানের সময় থেকেই পূর্ব নির্ধাবিত। এবকম মনে করি বলেই স্বচ্ছন্দে বলতে পারি ঃ এইভাবে মশলা পেষাই করা যদি এই যন্ত্রের কাজ হয়ে থাকে তবে ২০৯০ সালেও এইটা এভাবেই মশলা পেষাই করবে-এব নডচড় হবাব উপায় নেই, যেহেতু যন্ত্রটি ভবিষ্যৎ প্রযোগ-সম্ভাবনা তাব নির্মানলগ্নেই স্থির হয়ে গেছে। আমরা যখন এরকম কথা বলি তখন কিন্তু আমবা বাস্তব জগতের যন্ত্রেব কথা ভাবি না কারণ বাস্তব যন্ত্রের অংশবিশেষ ভেঙ্গে যেতে পারে, বেঁকে যেতে পারে, নষ্ট হতে পারে, সেক্ষেত্রে যন্ত্রটি আগামী দিনে কেমন কাজ কববে সে সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না। সুতরাং 'একটি যন্ত্রে সমস্ত গতিবিধি ও কাজকর্ম যে পুরোপুরিভাবে পূর্ব নিয়ন্ত্রিত - এরকম কথা আমবা তখনই বলতে পারবো যখন আমরা যন্ত্রকে একটি প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করি - বাস্তব জগতের একটি স্বাভাবিক যন্ত্র সম্বন্ধে এমন দাবি কবা যায না' গননাব যন্ত্রকে প্রতীক হিসেবে নিলে ভুলেব কোনো সম্ভাবনা থাকে না। সাধারণ বাস্তব যন্ত্রের ভুল হতেই পারে। হ্বিটগেনস্টাইন বলেন যে আমবা এই দুটি ধাবণাকে গুলিয়ে ফেলি, আব ভাবি যে, আদর্শ যন্ত্র সবসমযেই পুবোপুরিভাবে সমস্ত ভবিষ্যতেব কাজকর্মকে নিপুনভাবে নিযন্ত্রন কববে।

তাই যখন আমরা বলি যে $y = x^2$ এই সূত্রই আগামী গণনাব সব ধাপগুলিকেই নিখুঁতভাবে নিয়ন্ত্রন কববে তখন আমরা এই দুই ধারণাকে গুলিয়ে ফেলি আর ফেলি বলেই এইবকম বলতে পাবি। প্রতীকি গাণিতিক অপেক্ষককের নিরিখে নিযমেব স্বরূপ বুঝবার চেষ্টা কবি বলেই নিয়মানুসবণে ভুল হওয়া অসম্ভব বলে মনে হয। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের নিয়মানুসবণেব ভুল হতেই পাবে। '২ যোগ কব' এই নিয়ম পালনে ১০০ নং ধাপে সে ব্যক্তি নিয়মটি কীভাবে পালন কববে তার কোনো সুনিশ্চিত পূর্বাভাস দেওয়া যায় না। আন্তব-অভিজ্ঞতা-তত্ত্বের মতো দেখা যাচ্ছে বীজগাণিতিক-সূত্র-তত্ত্ব দিযেও নিয়ম ও তার প্রয়োগ-সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করা গেল না। এবার দেখা যাক্ নিয়মানুসরণেব কোনো ব্যাখ্যামূলক তাৎপর্য দেওযা যায কি না।

নিয়মানুসরণ সব সমযেই কোনো না কোনো ব্যাখ্যাব উপব নির্ভবশীল।

M_3 : আমবা যখন নিয়ম অনুসবণ কবি তখন নিযমটিব কোনো না কোনোভাবে ব্যাখ্যাব ভিত্তিতেই অনুসবণ কবে থাকি। ব্যাখ্যা বলতে তিনি মূলতঃ বুঝিয়েছেন এক চিহ্ন থেকে অপর চিহ্নে অনুবাদ ঃ অর্থাৎ নিযমপ্রকাশক বাক্যটিকে যদি একই অর্থবিশিষ্ট অন্য আব একটি বাক্যে অনুবাদ কবি তবে দ্বিতীয বাক্যটি প্রথম বাক্যেব ব্যাখ্যা বলে পাবিগণিত হবে। নিযমানুসবণেব জন্য প্রথম বাক্যেব বিশ্লেষণ দরকার এবং প্রথম বাক্যকে বিশ্লেষণ কবতে গিযেই আমবা দ্বিতীয় বাক্যে বা ব্যাখ্যায় উপনীত হয়েছি, অর্থাৎ কীভাবে আমবা নিযমানুসবণ কববো তাব নির্দেশ আমরা নিযমসূচক বাক্যটিব বিশ্লেষণেব ফল স্বরূপ পাচ্ছি। বাস্তবিকই 'ট্র্যাকটেটস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন এইবকম ব্যাখ্যাতাত্ত্বিক মতবাদেব অনুসাবী ছিলেন। সেইসময় তিনি দৃঢভাবে বিশ্বাস কবতেন যে প্রতিটি বচন শেষ বিচাবে একটি মৌল বচনের সত্যাপেক্ষক তাই বচনকে বিশ্লেষণ কবতে কবতে পবিশেষে এই মৌল বচনে আমবা পৌছাই।

বিশ্লেষণ বলতে হিটগেনস্টাইন তখন ব্যাখ্যাকেই বুঝতেন আর ব্যাখ্যা বলতে এক চিহ্ন বা বাক্যকে অপব চিহ্নে বা বাক্যে অনুবাদ কবাকেই বুঝতেন। 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থে দেখি তিনি এই মতেব বিরুদ্ধে বলছেন : আমবা সবসময়ই 'x' চিহ্নকে 'y' চিহ্নে অনুবাদ কবতে পাবি, আবাব 'y' চিহ্নকে 'z' চিহ্নে অনুবাদ কবতে পারি কিন্তু তাতে 'x'-এর অর্থ কিছুমাত্র পরিষ্কাব হয না। কাবণ 'x' চিহ্নেব অর্থ যদি হয বেড়াল, তবে, 'y' চিহ্নটি 'x' এব অর্থ যে বেড়াল তারই দ্যোতক হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'y' চিহ্নের অর্থ পরিস্ফুট কবাব জন্য অন্য চিহ্ন, মনে কবা যাক্ 'z' এব প্রয়োজন হয়ে পড়বে, 'z' সেক্ষেত্রে 'y চিহ্নটি যে x চিহ্নের অর্থ বেড়াল বোঝাচ্ছে' তারই দ্যোতক হবে। এইভাবে আমবা শুধু কথার গোলকধাঁদাতেই ঘুবে মরি, কোনো লক্ষ্যে পৌঁছতে পাবি না-তাই ব্যাখ্যা কখনোই অর্থকে বা বিষযকে নিরূপন কবে না। শুধু তাই নয়, হিটগেনস্টাইন বলেন এই তত্ত্ব কূটাভাসজনক পরিস্থিতিবও উদ্ভব ঘটায়, ২০১ নং অংশে তিনি বলেন -

> এটা আমাদেব পূর্বে উল্লেখিত কূটাভাস : কোনো কার্য পরম্পবাই একটি নিযম দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত নয় - কারণ প্রত্যেক কার্য পরম্পবাকেই নিযমটির আনুগ বলে দেখানো যায। এব উত্তর হল যদি সব কাজকেই নিয়মটিব আনুগ বলে দেখানো যায তাহলে সব কাজকেই নিযমটিব বিবোধী বলেও দেখানো যায়, সেক্ষেত্রে কাজটি 'নিয়মানুসাবী' বা 'নিয়মবিবোধী' কোনোটাই হবে না।"

এই ২০১ নং অংশে 'এটা' এই সর্বনামটি ২০০ নং অংশে যে পবিস্থিতিব আলোচনা আছে তাকেই নির্দেশ কবছে। ২০০ নং অংশে আমবা দেখি যে, সেখানে দু'জন আদিম মানবেব কল্পনা কবা হযেছে যাবা, আমবা যেবকম দাবা খেলি সেবকম দাবা খেলাব পরিবর্তে জোড় পাযে লাফাচ্ছে ও চীৎকাব কবছে। এখন নির্দিষ্ট নিয়মানুযাযী চেঁচানো বা জোড় পাযে লাফানোকে দাবা খেলায অনুবাদ কবা যেতেই পাবে। যদি কেউ সেবকম অনুবাদ করে তবে আমবা কি বলতে পাবি যে তাবা দাবা খেলছে?

এই পবিস্থিতিটাই কূটাভাসেব জন্ম দিচ্ছে (যেহেতু প্রত্যেক কার্য্যপবম্পবাকেই কোনো না কোনো নিযমেব সঙ্গে মেলানো যাচ্ছে)। আমাদেব মনে বাখতে হবে যে এই কূটাভাসেব উদ্ভব তখনই হচ্ছে যখন আমবা নিযমানুসবণেব ব্যাখ্যামূলক তাৎপর্যবে গ্রহণ কবি। অর্থাৎ নিযমানুসবণ সম্পর্কিত ভুল বোঝাবুঝি থেকেই এই কূটাভাসেব জন্ম। এটা নিযমানুসবণেব ক্ষেত্রে অনিশ্চযতা প্রমাণ কবে না। পক্ষান্তবে এটা দেখায় যে বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যাব অস্তিত্বেব প্রয়োজন স্বীকাব কবলেই এইবকম কূটাভাসজনিত পবিস্থিতিব উদ্ভব হয। এই আমবা দেখি যে ব্যাখ্যামূলক তাৎপর্য মানলে ১৮৫ নং অনুচ্ছেদেব ছাত্রটি মনে কবতে পাবে যে সে ঠিকই কবেছে। সে মনে করতে পাবে যে তাকে ১০০০ অব্দি ২২,০০০ অব্দি ৪ ও ৩০০০ অব্দি ৬ যোগ কবতে বলা হযেছে। অর্থাৎ '২ যোগ কব' এই নিয়মের সে এরকম ব্যাখ্যা করতেই পাবে। এই উদাহবণটি দেখায যে, যে কোনো কার্য্যক্রমেব সঙ্গে যে কোনো নিযমকে

মিলিযে দেওযা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নিযমানুসারী বা নিযমবিরোধী কাজ বলে কিছু থাকে না 'বিমার্কস' গ্রন্থে হুিটগেনস্টাইন কাঠবিক্রেতা ও অন্যান্য আবো উদাহবণ দিয়ে এই ব্যাখ্যা মুলক তাৎপর্য্য উদ্ভুত কূটাভাসেব ব্যাখ্যা কবেছেন। এই কূটাভাসের সমাধান তিনি এইভাবে করেছেন - একভাবে আমরা নিযমকে বুঝি, তাকে ব্যাখ্যা বলা যাবে না বরং সেটা নিযম পালন কবা বা নিযমের বিরুদ্ধে যাওয়াব প্রকৃত ঘটনাব মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয়[৮]। অর্থাৎ আমাদেব নিয়মানুসরণ কবাব অর্থ এক চিহ্ন থেকে অপর চিহ্নে অনুবাদ করা নয়, বরং এ আমাদের ভিত্তিহীন বা যুক্তিহীনভাবে নিয়ম প্রয়োগেব ধরণের উপব নির্ভর করে চলা। ব্যাখ্যা কবা মানেই চিন্তা করা। যখন আমবা ব্যাখ্যা করি-তখন আমরা বস্তুত প্রকল্প গঠন করি যেটা সত্যও হতে পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। হুিটগেনস্টাইন-এর মতে যখন আমবা নিয়মানুসরণ কবি তখন আমরা প্রকল্প গঠন কবি না বা তাব সত্যতা বা মিথ্যাত্বের প্রশ্নও আমাদেব বিচলিত কবে না। এটি কোনোবকম বিচারবুদ্ধি প্রসূত কাজই নয়। এব মুল প্রোথিত আছে আমাদেব আপাতঃদৃষ্টিতে যুক্তিহীন, অভ্যাসগত, কাজকর্মেব মধ্যে - কোনোবকম ব্যাখ্যামূলক তাৎপর্য সেখানে কাজেই আসে না।

এই কূটাভাস প্রসঙ্গে আমাদেব সল ক্রিপকেব মতামত বিশ্লেষণ কবাটা জরুবী। তিনি তাঁব গ্রন্থে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশন'-এব ২০১ নং এর কূটাভাসকে 'সন্দেহবাদীদেব কূটাভাস' আখ্যা দিযে নিম্নলিখিত রূপে পেশ করেছেন -

মনে কবা যাক্ আমাকে ৬৮র সঙ্গে ৫৭ যোগ কবতে দেওয়া হল। এতদিন অবধি আমি যত যোগ কবেছি তার থেকে এটা বড। সাধাবণ যোগেব নিযামানুযায়ী যোগফল হবে ১২৫।

> এখন আমরা একটি নতুন অপেক্ষকের, মনে করা যাক্ 'যা-যোগ' এব, সংজ্ঞা দিচ্ছি। 'যা-যোগ' হল এমন অপেক্ষক যার ৫৬ অবধি যোগেব সঙ্গে কোনো পার্থক্যই নেই কিন্তু ৫৬ নং এর বেশি যোগফল হবে ৫। উপবেব উদাহবণেব যোগফল তাই 'যা-যোগের' নিয়মানুসারে হবে ৫। এখন প্রশ্ন হল এব আগে আমি যতগুলি অঙ্ক কবেছি সেগুলি যোগ করেছি নাকি 'যা-যোগ' কবেছি - সেটা কী উপাযে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে? কারণ সবগুলি অঙ্কই ছিল ৫৬ ব কম আর ৫৬ র কম হলে যোগ ও 'যা-যোগ' এর যোগফলগত কোনো পার্থক্য থাকে না। এখন একজন সন্দেহবাদী সন্দেহ প্রকাশ কবতেই পাবেন এবং বলতে পাবেন যে আমি যোগ বলতে যা-যোগকেই বুঝিযেছি। আমি ও যে যোগই বুঝিয়েছি, যা-যোগ বোঝাই নি - সেটা প্রমাণ কবাব মতো তথ্যাদি বা সাক্ষ্য প্রমাণাদি আমাব কাছে নেই। কারণ আমি যাই বলি না কেন সেটাকে যা-যোগেব সাথেও খাপ খাওয়ানো যেতে পাবে।[৯]

অনুরূপভাবে ১৮৫ নং পরিচ্ছেদের ছাত্রটি বলতে পাবে - যে 'দুই যোগ কব' বললে যে ১০০০ এর পর ১০০২ ই হবে, ১০০৪ নয় - এটা অনুসৃত হয না কারণ যা-যোগেব নিয়মানুসারে ১০০০ অবধি সাধাবণ যোগেব যোগফলেব সঙ্গে কোনো পার্থক্যই থাকবে না

কিন্তু ১০০০ এব পবে হয়ে যাবে ১০০৪. ১০০৮, ১০১২, ইত্যাদি। ছাত্রটি যে আগের দৃষ্টান্তগুলিতে যোগ অপেক্ষককেই বুঝিয়েছে এবং এখনও বোঝাচ্ছে সেটা প্রমাণ করার মতো তথ্যাদি কিছু নেই। কারণ যাই বলা হোক না কেন তাকেই যা-যোগের সাথে মিলিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এইভাবেই যে কোনো আদেশকেই বা যে কোনো নিয়মকেই যে কোনোভাবে অনুসরণ কবা চলে তাই নিয়মানুসাবী বা নিয়মবিবোধী কাজ বলে কিছু থাকছে না।

এখানে ক্রিপকে যে সমস্যার উপস্থাপনা করেন তা হল আমি কী করে দেখাব যে অতীতেব অভিপ্রায় (উদাহরণের ক্ষেত্রে আমি অতীতে যোগই বুঝিয়েছি) অনুযায়ী আমি বর্তমানে শব্দ ব্যবহাব করছি (অর্থাৎ যোগ কবছি)? এই কূটাভাসেব ফলেই ছাত্রটি বলতে পাবে শিক্ষক যা-যোগ বুঝিয়েছেন এবং সে ঠিকভাবেই যা-যোগ কবেছে।

বস্তুতঃ ক্রি·পকেব এই সমস্যা নিয়ে হ্বিটগেনস্টাইন আদৌ বিচলিত নন্। আমাব অতীত অভিপ্রায় অতীতের অর্থের অনুরূপ হয়েছিল কিনা এ প্রশ্ন গোড়াতেই তিনি খাবিজ করে দেন। তিনি প্রশ্ন তোলেন -

> কিন্তু দর্শক খেলোয়াড়েব ভুল ও যথাযথ খেলাব মধ্যে পার্থক্য কববে কী কবে? এর উত্তব হল খেলোযাড়ের ব্যবহাবের মধ্যেই এব বৈশিষ্ট্য আছে।[১০]

শুধু তাই নয় ১৪৩ নং এ তিনি পৌনঃ পুনিকতাব নিবিখেই স্বাভাবিক শিক্ষার্থী ও অস্বাভাবিক শিক্ষার্থীব মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

অর্থাৎ হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে আমি যোগ চিহ্ন ব্যবহাব করছি না যা-যোগ চিহ্ন ব্যবহাব কবছি তা নির্ধাবণ কবাব জন্য বাহ্যিক মানদন্ডই যথেষ্ট। যোগ চিহ্নেব ভবিষ্যত ব্যবহাব সম্পর্কেও তিনি মোটেই সন্দিগ্ধ নন। তিনি জোব দিযে বলেন যে ভবিষ্যতে আমি একটি চিহ্ন ব্যবহাব কবতেই পাবি (সে যোগই হোক যা-যোগই হোক বা বিয়োগই হোক) তা নিয়ে অনিশ্চযতা বা সন্দেহেব কোনো কাবণই থাকতে পারে না। যা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন তা হল নিযম বা তত্ত্বেব বর্তমানে অর্থের সঙ্গে ভবিষ্যতে পুষ্ঠ প্রযোগেব সাযুজ্যতা বা সম্বন্ধ নিয়ে, এবং এই সম্বন্ধ সম্পর্কে তিনি কখনোই সন্দেহবাদীব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ কবেন নি তাই ২০১ নং এব কূটাভাস কখনোই সন্দেহবাদসঞ্জাত কূটাভাস নয। আমরা আগেই উল্লেখ কবেছি যে ২০০ নং পরিচ্ছেদের পবিপ্রেক্ষিতেই তিনি এই কূটাভাসেব অবতারণা করেছিলেন। এটা খুবই আশ্চর্য্যজনক যে ক্রিপকে তাঁব বই ও নিবন্ধে এই অনুচ্ছেদেব কোনো উল্লেখই কবেন নি। তাঁব বক্তব্য হল ঃ

অতীতেব দৃষ্টান্তে আমি যে নিযমানুসবণ কবেছি সে ক্ষেত্রে আমি ভুল কবতেই পাবি এবং সেখানে আমি যে অতীতে যা-যোগ কবি নি, যোগই কবেছি - এই ঘটনাব পক্ষে কোনো তথ্যই জামিনদাব হতে পাবে না। এখানে বাস্তবিকই হ্বিটগেনস্টাইন-এব বক্তব্য সম্পূর্ণ অন্যবকম। তিনি বলেন যে এক্ষেত্রে যোগ ও যা-যোগের মধ্যে ভুল হওয়া বা ঠিক হওযাব প্রশ্নই ওঠে না। কারণ আমরা আগেই দেখেছি 'নিয়ন্ত্রণ' পদটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। গাণিতিক

অপেক্ষক হিসেবে দেখলে ভুল হবাব প্রশ্নই ওঠে না। তাই যখন কেউ বলে যে আমি যখনই অতীতে ৬৮'র সঙ্গে ৫৭ যোগ কবে ১২৫ পেয়েছি এবং ভবিষ্যতেও ১২৫ পাবে তখন সে গাণিতিক অপেক্ষক হিসেবেই যোগকে ব্যবহাব কবেছে। একই সময়ে সে শব্দ ব্যবহার প্রসঙ্গে নিজস্ব অভিপ্রাযেব কথাও বলছে। অর্থাৎ সেই বিশেষ শব্দের প্রতি আচরণগত প্রতিক্রিয়াব কথাও সে মাথায় বাখছে। সেক্ষেত্রে ব্যক্তি মানুষেব প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নবকম হতে পাবে এবং সে ব্যবহাবেব তারতম্য, বা সঠিক কিম্বা ভুল সিদ্ধান্ত নির্ণয় করার জন্য বাহ্যিক মানদন্ড তো বয়েইছে। তাই মনে হয় 'নিয়ন্ত্রণ' পদের দুটি অর্থ নিয়ে যে ভ্রান্ত ধারণার কথা হ্বিটগেনস্টাইন বলেছেন, ক্রিপকে তারই ফাঁদে পা দিয়ে এই সন্দেহবাদসঞ্জাত কূটাভাসেব অবতাবণা করেছেন।

ক্রিপকে এই কূটাভাসেব সমাধান কবেছেন জনসম্প্রদায় বা লোকসমাজেব ধাবণা দিয়ে। তিনি বলেন যে একই ভাষা ব্যবহারকারী জনসম্প্রদায়েব সঙ্গে মিল বা বিবোধ দিযেই কেউ যোগ শব্দটি ঠিকভাবে ব্যবহাব কবছে কিনা তা নির্ধাবিত হবে। অর্থাৎ ছাত্রটি যোগ কবেছে কিনা তা তাব ব্যবহারেব সঙ্গে জনসম্প্রদাযের ব্যবহাবের মিল দ্বাবাই নির্ধাবিত হবে। শুধু ক্রিপকে-ই নন্ ক্রিস্টোফার পীককও তাঁব নিবন্ধে[১১] বলেছেন যে অভ্যাস বলতে হ্বিটগেনস্টাইন জনসম্প্রদায়েব অভ্যাসকেই বুঝিযেছেন। ক্রিপকেব সঙ্গে তাঁর মতেব পার্থক্য হল যে কেবলমাত্র জনসম্প্রদায়েব অভ্যেস বা বীতিনীতিব সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষেব আচবণের মিল বা বিবোধটুকু দিযেই নিযমানুসরণেব ব্যাখ্যা কবা হ্বিটগেনস্টাইন-এব উদ্দেশ্য ছিল না। পীকক-এব মতে হ্বিটগেনস্টাইন এখানে বলতে চাইছেন যে একজন লোক ব্যক্তিগতভাবে কোনো নিয়ম অনুসরণ কবছে কিনা তাও জনসম্প্রদায়ের ধাবণাব নিরিখ ছাড়া বোঝা যাবে না। যাই হোক ২০১ নং এর কূটাভাসের সমাধান কল্পে ক্রিপকে, পীকক উভয়েই জনসম্প্রদায়েব ধারণাকে মেনেছেন দেখতে পাচ্ছি।

ক্রিসপিন বাইট[১২] ক্রিপকের সমালোচনায বলেন যদি জনসম্প্রদাযের ভাষা ব্যবহাব বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ শব্দ ব্যবহাবের যাথার্থ্যতা প্রতিপাদন করে তবে জনসম্প্রদায়েব ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন থেকেই যায়। জনসম্প্রদায যে শব্দ-নিযম ব্যবহাব কবছেন - তা ঠিক না ভুল সে বিচার কে কববে?

এখন এই জনসম্প্রদায়েব ধারণা ও তাব যাথার্থ্যতাব প্রশ্নেব উত্তবে আমবা ম্যালকম বাড ও জেমস হপকিনস-এব সঙ্গে বলতে পারি হ্বিটগেনস্টাইন-এর লেখায় আমবা কোথাও জনসম্প্রদায়ের ধারণা পাই না। কোথাও কোনো পরিচ্ছেদেই তিনি 'জনসম্প্রদায়' কথাটি উল্লেখ করেন নি। শুধু তাই নয কোথাও তিনি রীতি-নীতি ব্যবহার, বা অভ্যাস প্রসঙ্গে সামাজিক রীতি-নীতি ব্যবহাব, বা, সামাজিক অভ্যাসের কথা বলেন নি। ক্রিপকে 'ব্যক্তিগতভাবে' বলতে 'সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন'-র কথা বলেছেন কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন তা বোঝেন নি তিনি মনে করতেন যে সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ একা একজন ব্যক্তি - যেমন ববিন্‌সন্ ক্রুশো

নিয়মানুসবণ কবতেই পাবেন। তাব নিজস্ব ব্যবহাবেব জন্য ভাষাব কল্পনা কবতেই পাবেন। এব মধ্যে কোনো স্ব- বিবোধীতা নেই। তাই তিনি যখন ব্যক্তিগত ভাষাব অসম্ভাব্যতা বিষয়ে যুক্তি দেন তখন সামাজিক ভাবে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যক্তিব কথা ভাবেন নি।[১৩]

ক্রিপকেব বিরুদ্ধে এ কথাও বলা চলে যে জনসম্প্রদাযেব ভাষা-ব্যবহাব দ্বাবা আমবা নিয়মানুসরণেব ক্ষেত্রে পবিচালিত হই - এই মত কিন্তু হিটগেনস্টাইন-এর মোটেই মনঃপুত ছিল না। কারণ তিনি বারবার বলেছেন যে আমরা অন্ধভাবেই নিযমানুসবণ করি অর্থাৎ নিয়মানুসবণেব ক্ষেত্রে কোনোবকম যুক্তি মেনে চলি না। এখন যদি ক্রিপকে বা পীকক এর মতো আমরা একই ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীব শব্দব্যবহাব বা নিয়মানুসরণেব দ্বাবা পবিচালিত হই, তবে আমাদেব নিয়মানুসবণ আব অন্ধ হয না। শুধু তাই নয, জনগোষ্ঠীব ভাষা ব্যবহারের নিরিখেই এর যাথার্থ্যতাও প্রতিপাদন করা যায। অথচ আমবা আগেই দেখেছি যে - যে কোনোবকম যুক্তিব - তা সে আন্তর-অভিজ্ঞতাই হোক কী বিশ্লেষণাত্মক ব্যাখ্যাই হোক - হিটগেনস্টাইন বিবোধী ছিলেন। তাই ক্রিপকেব ব্যাখ্যা আদৌ হিটগেনস্টাইনীয নয় বলে মনে করা যেতে পাবে।

> M_4 : যখন কোনো নিয়ম বা আদেশ আমরা বুঝতে পারি বা পালন কবি তখন তাব পিছনে কোনো না কোনো যুক্তি থাকবেই।

এখানে আমাদেব যুক্তি ও কারণের মধ্যে পার্থক্য করা জরুবী। হিটগেনস্টাইন বলেন যদি কেউ নিয়মানুসরণের কাবণের কথা বলে তবে আমরা সবসময়ই শারীরিক, মানসিক বা যে কোনো বকমেব কাবণ দেখাতে পারি, একটি বিশেষ কাজকে বিশেষভাবে করাব হেতু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে পাবি, কিন্তু কেউ যদি নিয়মানুসবণের যুক্তিব কথা বলে, তবে তিনি বলেন -

> আমি যে নিয়মানুসরণ করছি - তার জন্য যুক্তি থাকাব কোনো প্রয়োজন নেই। যুক্তি হল নিয়মানুসরণেব সোপানের আগের সোপান। কিন্তু কেনই বা প্রত্যেক সোপানের আগের সোপান থাকতে হবে?[১৪]

বস্তুতঃ এই পরিস্থিতিটা অবধারিতই ছিল বলা যেতে পাবে। কারণ আমরা আগেই দেখেছি যে আমাদেব স্বাভাবিক প্রবণতা হল হয় আন্তর অভিজ্ঞতাব সাহায্যে বে াকেই নিয়মানুসবণেব যুক্তি হিসেবে খাড়া করা অথবা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে তাকেই যুক্তি বলে মনে করা। হিটগেনস্টাইন কীভাবে এই অভিজ্ঞতাবাদী ও যুক্তিবাদীদের বক্তব্য খন্ডন করেছেন তা আমবা আগেব পরিচ্ছেদে দেখেছি। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আমবা কোনো নিয়ম অনুসবণেব জন্য কোনো যুক্তি কখনোই দেখাতে পারবো না। তাঁর বক্তব্য হল - যুক্তি দেখালে

তার যাথার্থ্যতা প্রতিপাদনেব জন্য আবো যুক্তি, দ্বিতীয় যুক্তিমালাব জন্য তৃতীয যুক্তি, ইত্যাদি, খোঁজা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তাই তিনি বলেন -

> আমার যুক্তিব ভাঁড়াব শিগ্গীবই ফুবিয়ে যাবে আব আমবা যুক্তি ছাড়াই কাজ কবব।[১৫]

অর্থাৎ সবশেষে আছে কাজ কবা, যুক্তি ছাড়াই কাজ কবা। সব ব্যাপারে যুক্তি খোঁজা দার্শনিকদেব রোগ। যেখানে কোনোরকম যুক্তি নেই সেখানে যুক্তি খাড়া কবলেই দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

এই কারণেই হ্বিটগেনস্টাইন তালিকা বা গাণিতিক সূত্রকে নিয়ম হিসেবে দেখেছেন - -নিয়মেব প্রকাশ হিসেবে নয়। কাবণ নিয়মগুলি যে আমাদেব পরিচালিত কবে এ তিনি মানবেন কিন্তু নিয়মেব পেছনে অন্য কিছু (কোনো যুক্তি বা কাবণ বা অভিজ্ঞতা, ইত্যাদি) আমাদেব পবিচালিত কবে এ তিনি মানবেন না। তাই তিনি বলেন -

> আমি ভয় পাই - এরকম কোনো ব্যক্তি যখন আমায় আদেশ কবেন তখন আমি পূর্ণ বিশ্বাস ও নিশ্চয়তার সঙ্গে তাড়াতাড়ি কাজ কবি, যুক্তিব অভাব আমাকে বিচলিত করতে পাবে না।[১৬]

'আমি তাড়াতাড়ি কাজ কবি' এব অর্থ 'কোন্ ব্যাখ্যাটি সঠিক' সে বিষয়ে আমাকে চিন্তা করতে হচ্ছে না। আমি নিয়মানুসরনেব পিছনে যুক্তি দিতে পারি না - এব অর্থ এই নয় যে আমি অযৌক্তিক আচরণ করি অথবা নিয়মানুসবণ সম্পর্কে সন্দেহেব অবকাশ আছে। 'আমি পূর্ণ নিশ্চয়তা নিয়ে তাডাতাড়ি কাজ করি'-এর অর্থ আমি চিন্তা-ভাবনা না করেই কাজ করি বলে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বস্তুতঃ যেখানে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটিকে পছন্দ কবে গ্রহণ করার কথা থাকে, সেখানেই সন্দেহেব উদ্রেক হতে পারে, মনে হতে পাবে যে সম্ভবতঃ এই ব্যাখ্যাটি ঠিক নয়, অন্য ব্যাখ্যাটি ঠিক, এই জন্য তিনি বলেছেন -

> যখন আমি নিযম মান্য করি আমি নির্বাচন কবে নিযম মান্য কবি না আমি অন্ধভাবেই নিয়ম মেনে চলি।[১৭]

যখন তিনি বলেন যে আমরা অন্ধভাবে নিয়ম মেনে চলি তখন তিনি এব সমালোচনা কবছেন না। তিনি বলতে চাইছেন যে এবকম আমরা সবাই কবি অর্থাৎ আমাদেব নিয়মানুসরণ ক্রিয়াটিব চবিত্রটি তাত্ত্বিক তো নয়ই বরং একে পুবোপুবি ব্যবহাবিক ও অ-বৌদ্ধিক বা নন ইন্টালেকচুয়াল বলা চলে। এখন যদি আমবা নিয়মানুসরণের পিছনে কোনো কারণ না দিতে পারি তাহলে নিয়মানুসবণেব ক্ষেত্রে যে বাধ্যবাধকতা আছে তাকে ব্যাখ্যা কবব কীভাবে? প্রশ্ন ওঠে যৌক্তিক অনিবার্য্যতা বিষয়েও। গণিতে ও তর্কবিদ্যাব সিদ্ধান্তে আমরা যে পূর্ণ নিশ্চয়তা পাই - তাকেই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? এ ব্যাপারে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতামত

নিযে ব্যাখ্যাকারদেব মতভেদ রয়েছে। তাই এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত আলোচনা করার আগে তাঁর মত কোন্‌টা নয় সেটা আমাদের আগেই জানা দরকার।

প্রথমত ওপবের আলোচনা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে গাণিতিক যা যৌক্তিক আবশ্যিকতা বিষয়ে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতবাদ সম্পূর্ণই প্লেটোর মতবাদের বিরোধী ছিল। কারণ প্লেটো বিমূর্ত্ত বিষয়ের গুণ রূপে আবশ্যিকতাকে ব্যাখ্যা করেছেন আর বিমূর্ত্ত বিষযের ধারণাই হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনে অনস্বীকার্য। প্লেটোর মতবাদের সরাসরি বিরোধীতা কবে তিনি বলেন ইর‍্যাশনল নাম্বার বা অমূলক রাশিব কোনো তন্ত্র নেই এবং কোনো অতি-তন্ত্র বা সুপার সিসটামও নেই, কোনো সেট্‌ ও নেই - 'রিমার্কস' II ৩৩। অর্থাৎ সংখ্যা বলতে অর্মূত্ত কোনো সামান্য ধারণা বোঝায় না-সংখ্যা হল তাই যা আমবা কাগজে লিখি। ('ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' ১৪৩ এবং ১৮৫)।

এখন যা আমবা কাগজে লিখি তা হল সংখ্যার আকার বা ফর্ম। তবে কি হ্বিটগেনস্টাইনকে আকারবাদী বা ফর্মালিস্টদের দলে ফেলা যেতে পারে? না, আমরা হ্বিটগেনস্টাইনকে আকাববাদীও বলতে পাবি না কাবণ গণিতশাস্ত্রকে তিনি কখনোই অর্থহীন প্রতীকেব খেলা মনে করেন নি। যেমন 'বিমার্কস' III ৬৭-তে তিনি বলেছেন - গাণিতিক বচনগুলি খেলাব পোজিশন বা স্থান নয।

শুধু তাই নয় এইরকম মতবাদকে তিনি অর্থ-হীন বলেছেন - 'বিমার্কস' V ৪৬। তিনি মনে করেছেন গাণিতিক চিহ্নগুলি কেবলমাত্র তন্ত্র বা সিসটেম-এর মধ্যে নয়, তন্ত্রেব বাইরেও তার একটা অর্থ থাকবে। 'রিমার্কস' V ৪১ এ উনি বলেছেন অনিবার্য্য বচনে যে সব প্রত্যয় থাকে সাধারণ সংশ্লেষক বচনেও তার একটা অর্থ থাকবে। অর্থাৎ হ্বিটগেনস্টাইন আকারবাদী হলে তন্ত্রের বাইরেও আকারগুলি যে অর্থপূর্ণ হয় - তা স্বীকার করতে পারতেন না। তিনি সবসময় মনে কবতেন যে অনুমানেব ক্ষেত্রে একটি বাস্তব প্রয়োগ থাকবে এবং বাস্তব জগতে সাধারণ মানুষ আকাব সম্বন্ধে বা অনুমান সম্বন্ধে কী ভাবে তাব উপবও তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আবাব সাধাবণ মানুষেব গণিত সম্পর্কে ভাবনা বা অভিজ্ঞতাব উপর জোব দিযেছেন বলে তাঁকে অভিজ্ঞতাবাদীও বলা যায় না, কাবণ তিনি গাণিতিক আবশ্যিকতাব সত্যতাকে কখনো অস্বীকার করতে চান নি। তিনি জোব দিয়ে বলেন ২৫ কে ২৫ দিয়ে গুণ করলে ৬২৫-ই পাওযা যায এতে সংশয-র কোনোও কাবণই থাকতে পাবে না। (অর্থাৎ 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' ১৮৫ নং অনুচ্ছেদের যে ১০০৪ ১০০৮ .... লিখেছে সে ভুলই কবেছে এ নিয়ে হ্বিটগেনস্টাইন-এব মনে কোনো সন্দেহই ছিল না.) তিনি মনে করতেন যে আমরা যদি এরকম নিশ্চয়তা সহকাবে ভবিষ্যৎবাণী না কবতে পাবি তবে গণনা ক্রিয়ার কোনো অর্থই থাকে না। ('রিমার্কস' III ৬৬)

এটা হ্বিটগেনস্টাইন মানবেন যে গণনা-ক্রিয়াটি আমাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল, বাস্তব অভিজ্ঞতাই আমাদেব গুণতে শেখায় তবুও গাণিতিক বচন ও অভিজ্ঞতামূলক বচনেব

পার্থক্য আছে। মোটের উপর গাণিতিক বচনে বলা থাকে গণনায় আমাদের কী পাওয়া উচিত. আমরা কী পাই তা নয়। 'প্রমান সবসময়েই দেখায় কী ফল হওয়া উচিত,' ('রিমার্কস' III) অর্থাৎ প্রমাণকে অথবা কোনো গানিতিক বচনকে বর্ণনামূলক বচনা কখনোও বলা যায় না।

উপরের আলোচনা থেকে মনে হচ্ছে হুিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্যের সঙ্গে প্রচলনবাদী বা কন্‌ভেন্সশনালিস্টদের বক্তব্যের মিল রয়েছে। প্রকৃতই আমরা হুিটগেনস্টাইনকে প্রচলনবাদী বলতে পারি কিনা তা বিচার করার জন্য প্রথমেই তাঁর মতকে স্বজ্ঞাবাদী বা 'ইন্টুইশনিস্ট'-দের মত থেকে আলাদা করতে হবে। হুিটগেনস্টাইন স্বজ্ঞাবাদী মতবাদকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। 'ফিলসফিকাল গ্র্যামার'-এ তিনি বলেন -

> স্বজ্ঞাবাদীরা যখন স্বজ্ঞার কথা বলেন তখন তাঁরা কী মনন প্রক্রিয়া বা সাইকোলজিকল প্রোসেস-এর কথা বলেন? যদি তাই বলে থাকেন তবে তা কী করে অঙ্কের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয়?[১৮]

স্বজ্ঞাবাদীদের মতে 'গণিত অন্তরদর্শী সংগঠনের মাধ্যমে তত্ত্বে উপনীত হয়।'[১৯] আমরা M_2 এ দেখেছি হুিটগেনস্টাইন কীভাবে এই ধারণার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছেন। অন্তরদর্শী সংগঠন কখনও গাণিতিক অনুমানের ভিত্তি হতে পারে না কারণ অনুমানটি সঠিক কিনা সেটা স্থির করার কোনো উপায়ই থাকে না। এবং গাণিতিক বচনকে বোঝার অর্থ কোনো বিশেষ মানসিক অবস্থায় উপনীত হওয়া নয় ররং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে ঠিকভাবে প্রয়োগ করা। আর এই ঠিকভাবে প্রয়োগ করার মানদন্ড কখনোই মানসিক প্রতিচ্ছবি দিতে পারে না।

হুিটগেনস্টাইন স্বজ্ঞাবাদীদের নির্মধ্যম নিয়মের বিরুদ্ধে যুক্তিও খন্ডন করেন। যে সব বচনের ক্ষেত্রে নির্মধ্যম নিয়ম খাটে না তাদের বলা হয় অনির্ণেয় বচন। সজ্ঞাবাদীদের বিরুদ্ধে হুিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য হল যে অনির্ণেয় বচনের কথা বলা অর্থহীন কারণ যেখানে নির্মধ্যম নিয়ম প্রযুক্ত হয় না সেখানে যুক্তির অন্যান্য নিয়মও প্রযুক্ত হতে পারে না সুতরাং সেখানে গাণিতিক বচন নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভব হয়। এই বিষয়টুকু বুঝতে পারলে বোঝা যায় যে নির্মধ্যম নিয়মের যথার্থ্যতাকে প্রশ্ন করার কোনো অর্থ হয় না।

এরপর আসি মাইকেল ডামেট প্রসঙ্গে। মাইকেল ডামেট হুিটগেনস্টাইনকে পুরোপুরি প্রচলনবাদী হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[২০] সেখানে 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' ১৮৫ নং অনুচ্ছেদের ছাত্রটির উদাহরণ থেকে ডামেট সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে হুিটগেনস্টাইন-এর মতে আমরা যা খুশী, যেমন খুশী, সিদ্ধান্ত টেনে নিয়মের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে এটি হুিটগেনস্টাইন-এর মত নয়। হুিটগেনস্টাইন এখানে ব্যাখ্যাতাত্ত্বিক মতবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছেন।

মাইকেল ডামেট মনে করেন যে হুিটগেনস্টাইন গাণিতিক দর্শনে অভিজ্ঞতাবাদে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি যে তিনি অভিজ্ঞতামূলক বচন ও গাণিতিক বচনের পার্থক্য নিরূপণের সচেষ্ট ছিলেন-যার জন্য তিনি বলেছেন -

যা প্রমান করা যায় তার মধ্যে কোন্ জিনিসটা অবিসংবাদীভাবে নিশ্চিত? কোনো বচনকে অবিসংবাদীভাবে নিশ্চিত বলার অর্থ হল তাকে ব্যাকরণগত বচনে ব্যবহার করা।[১১]

প্রচলনবাদীদের সঙ্গে হুইটগেনস্টাইন-এর মতের আর একটি পার্থক্য হল গাণিতিক বচন প্রচলনবাদীর মতে বিশ্লেষক আর হুইটগেনস্টাইন-এর মতে সংশ্লেষক। ('রিমার্কস' II ২২ ও III ৪২) প্রচলনবাদীরা মনে করেন বচনে যে পদগুলি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের অর্থের দ্বারাই বচনের সত্যতা নির্ধারিত হয় অর্থাৎ নিয়মের অর্থই বলে দেবে কোথায় কীভাবে এগোতে হবে। এর বিরুদ্ধে হুইটগেনস্টাইন পক্ষান্তরে বলেন যে-যেভাবে এগোন হয়েছে তাই তার অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে। এদিক দিয়ে ভাবলে হুইটগেনস্টাইন প্রচলনবাদীর বিরোধীতাই করেছেন দেখা যাচ্ছে। আবার হুইটগেনস্টাইনকে এ্যান্টিরিয়ালিস্ট হিসাবে বর্ণনা করাও অযৌক্তিক, কারণ এ্যান্টিরিয়ালিস্টের মতে অভিজ্ঞতামূলক বচনের প্রকৃতির উপরেই গাণিতিক দর্শন নির্ভর করে। অথচ হুইটগেনস্টাইন ব্যাকরণগত প্রচলন (বা গ্র্যামাটিকল কনভেন্‌শনকে) সব সময় অভিজ্ঞতামূলক বচনের থেকে আলাদা করেছেন এবং গাণিতিক বচনকে ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যাকরণগত প্রচলনকেই মাথায় রেখেছেন।

অবশ্য ১৯৩০-এ লেখা 'ফিলসফিকাল রিমার্কস' এ হুইটগেনস্টাইন গাণিতিক বচন ও তার প্রমাণ পদ্ধতিকে ব্যবহারিক বচন ও তার যাচাই-করণ পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই 'ফিলসফিকাল রিমার্কস'-এর লেখগুলির সঙ্গে এ্যান্টি-রিয়ালিস্ট মতবাদগুলি মেলে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে পররর্তীকালে তিনি নিজেই এর সমালোচনা করেছেন, বলেছেন যে এটা ঘটনা নয় যে যখন আমাদের হাতে কোনো বচনের প্রমাণ থাকবে কেবলমাত্র তখনই বলতে পারব যে বচনটি সত্য ববং বচন ও তার প্রমাণ পরস্পরের সঙ্গে দৃঢসংবদ্ধ। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আগের মত থেকে তিনি সরে এসেছেন।

তাই গাণিতিক আবশ্যিকতা বা নিয়ম পালনের বাধ্যবাধকতা প্রসঙ্গে প্রচলিত মতগুলির কোনোটিই হুইটগেনস্টাইন-এর মতের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। মনে হয় 'ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' ও 'রিমার্কস' গ্রন্থে তাঁর যে মত আমরা পাই তার মধ্যে আপাত-বিরোধীতা রয়েছে। সম্ভবতঃ এটাই বিভিন্ন ভাষ্যের উদ্ভবের কারণ। যেমন তিনি বলেছেন -

আমরা কি বাধ্য হই? সর্বোপরি আমি যেমনটি পছন্দ করি তেমনভাবেই তো অগ্রসর হতে পারি।[১২]

এই মন্তব্য অবধারিতভাবে হুইটগেনস্টাইন-এর মতবাদকে প্রচলনবাদী মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। বস্তুতঃ 'বাধ্য হওয়া' বলতে অন্য পথে অগ্রসর হবার চিন্তাকে বাদ দিয়ে একটি বিশেষ পথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্তকে বোঝায় ('রিমার্কস' I ৩৪)। বিভিন্ন অনুচ্ছেদে আমরা দেখি যে তিনি বলেছেন বাধ্যবাধকতাটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার 'রিমার্কস' II ২৭ ও II ৪১) একটি বচন স্বতঃসত্য বলে তাকে স্বতঃসিদ্ধ বা এ্যাক্সিয়ম হিসেবে

নিচ্ছি তা নয়, ববং বলা যেতে পাবে যে আমরা একে অবিসংবাদী সত্য হিসেবে নিতে পছন্দ করছি ('রিমার্কস' III ৩)। এই মন্তব্যগুলি যেন ডামেটের পুরোপুবি প্রচলনবাদি তত্ত্বকেই স্বীকার করে নেয়।

হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেন যদি কেউ যেমন খুশী অনুমান কবে তবে 'সে অনুমান করছে' এমন কথা আমবা বলব না। একটি নির্দিষ্ট উত্তব না পেলে অর্থাৎ ৬৮ + ৫৭ = ১২৫ না হযে ৫ হলে আমরা যোগ কবছি বলব না। অর্থাৎ ১২৫ উত্তবটা এখানে আমবা পেতে বাধ্য। আমরা বাধ্য এই কারণে যে গণনা যদি ঠিকভাবে কবা হয তবে এই ফল হতে বাধ্য ('বিমার্কস' I ৮২, ৮৬, ১৬২ এবং III ৩৫)

কিন্তু যদি আমরাই সিদ্ধান্ত নিই তবে এই বাধ্যবাধকতা কোথা থেকে আসে? আমরা জানি যে গানিতিক অনিবার্যতা থেকে বাধ্যবাধকতা অনুসৃত হয়. এখানে বাধ্যবাধকতা দিযে গানিতিক অনিবার্যতাকে ব্যাখ্যা করা যাবে কীভাবে? হ্বিটগেনস্টাইন বলেন যে নিযমগুলো আমাদেব ইচ্ছে বা পছন্দেব উপব নির্ভর কবে না, এগুলো কতকগুলি ব্যবহারিক শর্তেব দ্বারা প্রভাবিত হয়। ব্যবহাবিক শর্ত বলতে বোঝান হচ্ছে যে, গানিতিক পদ্ধতি, বা যৌক্তিক নিয়ম, ইত্যাদি আমাদেব দৈনন্দিন জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবে। তাই বাবংবাব কঠোব অনুশীলনের মাধ্যমে আমবা সচবাচব ভুল কবিনা - সঠিক সিদ্ধান্ত আমরা অভ্যাসবশতঃই নিয়ে ফেলি। সেই কারণেই গাণিতিক বা যৌক্তিক নিয়মকে আমবা বিশেষ আলোকে দেখি, তাদের ভুল-ভ্রান্তি সম্পর্কেও আমাদেব এক বিশেষ মনোভাব গডে ওঠে। ('বিমার্কস' V ৪০)

> যাকে আমারা গননা কবা বলি তা আমাদের জীবনের দৈনন্দিন কাজকর্মেব একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এটা একধরনের কলাকৌশল যা দৈনন্দিন জীবনে নিয়মিত ব্যবহার কবা হয়। সেই জন্যই আমাদেব গননা করা নির্ভুলভাবে নিয়মিত কঠোব অভ্যোসেব দ্বারা শিখতে হয়। তাই এতখানি জোব দিযে নির্ভুলভাবে আমবা বলতে পাবি যে দুই একেব পরে আসে, তিন আসে, দুই এব পরে ... ইত্যাদি।

কঠোব অনুশীলন ও ভুলভ্রান্তিকে বিশেষ চোখে দেখার ফলেই গাণিতিক বচনের অসংশোধনীয় চবিত্র জন্ম নেয়। আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারেব জগৎ-ই নিয়মেব ব্যবহাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয় কিন্তু নিয়ম প্রযোগের সময় আমবাই অনমনীয় হই। অর্থাৎ এই অনমনীয়তা আমাদেব অন্তহীন অভ্যেস ও গাণিতিক বচনের প্রতি বিশেষ মনোভাবেবই ফসল। তাই গাণিতিক প্রত্যযেব গঠন প্রাকৃতিক তথ্যাদি দিয়েই ব্যাখ্যা কবা যায় যদিও গণিত ঐ তথ্যগুলিকে বিবৃত কবে না। একবার প্রত্যয় গঠিত হলে কঠোর অনুশীলনেব মাধ্যমে তা আমাদেব অভ্যাস কবানো হয় যতক্ষন না আমরা দ্বিধাহীনভাবে তাব প্রয়োগ কবতে পাবি ('বিমার্কস' I ৪,১০,২২)

তাহলে আমবা দেখলাম যে যৌক্তিক অনিবার্যতা গাণিতিক বিষয়বস্তু থেকে আসে না

বরং মানুষেব ব্যবহাব থেকেই আসে। এটা একটা ঘটনা যে আমবা অনুমান কবি ও গণনা করি। সঠিক গণনা তাকেই বলব যা আমাদেব ছোটবেলা থেকে তৈবি অভ্যাসের সঙ্গে মিলে যায়, আর যদি একই গণনার বিভিন্ন লোকের কাছে বিভিন্ন রকম ফল হত তবে তর্কবিদ্যা বা গণিতশাস্ত্রের উদ্ভবই হ'তো না।

[তিন]

নিয়মানুসরণ একটি অভ্যাস

আগেব অনুচ্ছেদের আলোচনা থেকে এটুকু স্পষ্ট যে কেউ নিয়মানুসবণ করছে বলার অর্থ হল এরকম ধবনেব পবিস্থিতিতে সে এইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত কবেছে। এখন, এই প্রতিক্রিয়াগুলি কিন্তু কখনোই ব্যক্তিগত হতে পাবে না। তিনি বলেন যে যদি কেউ জীবনে একবারই ঠিকমত পরিস্থিতিতে নিয়ম ঠিকভাবে ব্যবহাব কবে, তবে সে যে নিয়মানুসবণ কবছে একথা বলা যায না। যখন সে বাববাব বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একইভাবে নিযমটি ব্যবহাব করে তখন বলা যায় যে সে নিয়মানুসরণ কবছে। তেমনিভাবে একটি মাত্র ক্ষেত্র দেখে অভিযোগ কবা বা আদেশ দেওয়া বা বোঝা, ইত্যাদি কোনো বিচাবই সম্ভব নয়, আমাদের বীতি নীতি, ব্যবহাবেব সঙ্গে নিয়ম মেনে চলা, আদেশ দেওয়া, ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছে। সেই কারণেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়মানুসবণ করা নিয়ম বুঝতে পারাব লক্ষণ। হ্বিটগেনস্টাইন যে নিযমানুসরণেব তত্ত্বগত বা বুদ্ধিগত ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী ছিলেন না সেটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন প্রসঙ্গে নিয়মকে বাববাব ব্যবহাব কবার কথায় স্পষ্ট হয। আবাব বিভিন্ন প্রসঙ্গে বাববাব ব্যবহাবেব ফলেই নিযমানুসরণ হযে দাঁড়ায় অভ্যাস। তাই

> মনে মনে যদি কেউ চিন্তা করে যে সে নিযম মানছে তবে সেটা নিযম মানা হবে না, কারন একান্তভাবে বা গোপনে নিযম মেনে চলা সম্ভব নয়।২৪

আসলে নিযমানুসবণ অভ্যাস বলেই এব বাহ্যিক মানদন্ড থাকে, আব বাহ্যিক মানদন্ড মানলে এর যাথার্থ্যতা অযথার্থতা নিরূপনে কোনো অসুবিধা হয না। অর্থাৎ বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুসবণ হয়েছে কি হয় নি এ নিয়ে কোনোরকম বিতর্কেব অবকাশ থাকে না। আবার একই নিযম ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন সমযে বিভিন্নভাবে অনুসবণ করতে পারে না কাবণ সব মানুষেব প্রতিক্রিয়া একই বকম হয়, সেই কারণেই পাবস্পবিক সংযোগ রক্ষা সম্ভব।

এখন প্রশ্ন ওঠে সার্বিক ঐক্যমত্যই কি নিযমানুসবণকে নিয়ন্ত্রিত কবে? নির্দেশ কবে কী সত্য অথবা কী মিথ্যা? হ্বিটগেনস্টাইন বলেন 'না', ব্যবহারে বা প্রতিক্রিয়ায ঐক্যমত্য কোনো নিয়ম অনুসবণেব ক্ষেত্রে বা কোনো চিহ্নেব অর্থপূর্ণ ব্যবহারেব আবশ্যিক শর্ত-কিন্তু একটি বাক্য অথবা একটি সূত্র সত্য কী কবে হয় বা কে কবে - সেটা আলাদা প্রশ্ন। আসলে অভ্যাসের ধাবণা বা ব্যবহারে ঐক্যমত্যেব ধাবণাব পিছনে আছে জীবনাকারের ধাবণা বা ফর্ম অব লাইফ

এটা খুবই স্পষ্ট যে সত্য মিথ্যা প্রত্যয়গুলি মানুষের বিচাববুদ্ধি বা যৌক্তিক বুদ্ধিব ফসল। পক্ষান্তবে ভাষা ব্যবহাবেব জন্য ব্যবহাবেব ঐকমত্য চাই যেটা স্বতঃস্ফূর্ত এবং কোনো যুক্তিব উপব প্রতিষ্ঠিত নয়। বস্তুতঃ ব্যবহারেব ঐক্যমত্য বলতে বোঝায় স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়াব মিল, আর জীবনাকাবেব ধারণাতেই ভাষা, নিযম ও তাব অনুসবণ প্রোথিত-এই বক্তব্য দিয়েই হিট্‌গেনস্টাইন প্রচলিত অভিজ্ঞতাবাদী ও বুদ্ধিবাদীদেব নিযমানুসবণ সংক্রান্ত ধাবণাকে খন্ডন করেছেন।

সংশয়বাদের নিরর্থকতা প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন

নির্মাল্য চক্রবর্ত্তী

যবে থেকে মানুষ দর্শন চর্চা করছে, তবে থেকেই সংশয়বাদেব আলোচনা চলছে। 'সংশয়বাদ' এই নামটি থেকেই বোঝা যায় যে, এই মতবাদ একটি সংশয়াত্মক মতবাদ। সংশয়বাদী দার্শনিক আমাদের নানা বিষয়ক জ্ঞানকে সংশয করেন। সাধারণতঃ আমরা মনে কবি যে আমরা বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ কবি। সংশযবাদ আমাদেব এই জ্ঞান হওয়াটাকেই প্রশ্ন কবেন। সংশযবাদী দার্শনিক নানাভাবে দেখাবাব চেষ্টা ক্বেন যে, যে কাবণগুলির জন্য আমাদেব জ্ঞান হয়েছে বলে আমরা মনে কবি, সেই কারণগুলিব কোনোটিই আমাদেব জ্ঞান হওয়াব পক্ষে যথেষ্ট নয়। অতএব আমাদেব সকল প্রকাব জ্ঞান সম্বন্ধেই সংশয়েব সম্ভাবনা থেকে যায। কোনো জ্ঞানই সংশয়াতীত নয়। সুতবাং আমবা কোনো বিষয়কে নিশ্চিত রূপে জানতে পেবেছি - এ কথা কখনই জোব দিয়ে বলতে পাবি না। যদিও এই সংশযবাদ যে কোনো বিষযক জ্ঞানকে কেন্দ্র কবেই হতে পাবে, সচরাচব দর্শনেব ইতিহাসে সংশযবাদেব আক্রমণেব মূল লক্ষ্য হল -

(১) বর্হিজগৎ বিষয়ক জ্ঞান, (২) অপর মন বিষয়ক জ্ঞান,

(৩) আরোহ অনুমানেব যাথার্থ্য, (৪) অতীতেব সত্যতা,

ইদানীংকালে ইংবেজী ভাষা-ভাষী দার্শনিকদেব মধ্যে যাঁবা সংশয়বাদকে খন্ডন কবার চেষ্টা কবেন জি ই. ম্যুর তাঁদেব মধ্যে অগ্রগণ্য। ম্যুর প্রসঙ্গে আলোচনা কবতে গিয়েই হ্বিটগেনস্টাইন সংশয়বাদ সম্পর্কে তাঁব মত ব্যক্ত কবেন। ম্যুর তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'প্রুফ অব অ্যান এক্সটার্নাল ওয়ার্ল্ড'[১] - এ বর্হিজগৎ বিষয়ক সংশয়বাদের বিবোধিতা করেন। ম্যুব দেখাবাব চেষ্টা কবেন যে তিনি নিশ্চিত ভাবেই জানেন যে তাঁর দুটি হাত আছে। একটির পর একটি হাত তুলে তিনি দেখান যে তাঁব দুটি হাত আছে - এবং এই বিষয়ে তিনি নিশ্চিত, অতএব বর্হিজগতে অন্ততঃ দুটি বস্তু আছে, অর্থাৎ দুটি হাত আছে - এই বিষয়ে কোনো সংশযেব অবকাশ নেই। তাঁর অপব একটি প্রবন্ধে[২] তিনি আমাদের সাধাবণ জ্ঞান প্রসূত কয়েকটি বিশ্বাসেব একটি তালিকা দিয়েছেন যেগুলি আমরা সংশয়াতীত ভাবেই জানি বলে তিনি মনে করেন। উদাহবণস্বরূপ, এই বিশ্বাসগুলি হল - আমাব একটি শরীর আছে, এই শবীব তার স্থিতিকাল অবধি পৃথিবীর উপরিতল থেকে খুব একটা দূরে নেই, আমার জন্মাবার বহু পূর্ব থেকেই এই পৃথিবী ছিল, ইত্যাদি। হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন যে ম্যুব ঠিকই বলেছেন যে বর্হির্জগৎ

বিষযক কতগুলি বচন একেবারে গাণিতিক বচনেব মতই নিশ্চিত রূপে সত্য। কিন্তু ঐ বচনগুলিকে যদি বহির্জগতেব অস্তিত্বেব স্বপক্ষে প্রমাণ বলে মনে করা হয, যেটি ম্যুর মনে করেন, তাহলে সেটি ভুল ভাবা হবে। এমন কী এটাও ঠিক নয় যে ম্যুর ঐ বাক্যগুলিকে জানেন; এর কারণ এই নয যে ঐ বাক্যগুলি মিথ্যা, কিন্তু ঐ বাক্যগুলির জ্ঞান হয়েছে বলে মনে কবাটাই নিরর্থক। হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতে, সংশয়াবাদী এবং ম্যুর, উভযেই সংশয়ের স্বরূপ, জ্ঞানের স্বরূপ এবং নিশ্চযাত্মকতাব স্বরূপ নিয়ে বিভ্রান্তিতে ভুগছেন। তাই ম্যুবের সংশয়বাদ বিরোধী যুক্তিগুলিকে ভুল বলেও হ্বিটগেনস্টাইন নিজে সংশয়বাদেব বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। ঐগুলি সংশয়বাদের বিরুদ্ধে হ্বিটগেনস্টাইন-এব যুক্তি নয, ববং সংশয়বাদ যে নিরর্থক এটাই তিনি দেখাবাব চেষ্টা কবেছেন।

এবার হ্বিটগেনস্টাইন-এর মত আর একটু বিস্তৃত কবে বলা যাক্, একটি অভিধাব মানেব প্রসঙ্গ ওঠে একটি জীবন চর্যার (ফর্ম অব লাইফ) পবিপ্রেক্ষিতে। যদি কোনো অভিধাকে কোনো প্রসঙ্গে সঠিকভাবে ব্যবহার কবা যায়, কেবল তখনই বলা যায় যে ঐ অভিধাটিব মানে আছে। একটি অভিধাকে বোঝাব অর্থ ঐ অভিধাটিকে ব্যবহার করার কৌশল জানা।

ম্যুব বলেছেন যে তিনি নিশ্চিত ভাবেই জানেন যে দুটি হাত আছে। একজন সংশয়বাদী সেই জ্ঞানকে অস্বীকার কবেন। তাব উত্তবে ম্যুব আবার যদি বলেন যে তিনি নিশ্চিত ভাবেই জানেন, তাহলে এই বিবাদের আর কোনোদিন শেষ হবে না। উভযেই মূল বিষয়টিকে বুঝতে পাবছেন না। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে 'সংশযবাদ অখণ্ডনীয নয়, কিন্তু অবশ্যই নিরর্থক, এমন জায়গায় সে (সংশয়বাদী) সন্দেহ তোলে যেখানে কোনো প্রশ্নই ওঠে না'।[৩] ম্যুবেব ব্যবহৃত নিশ্চিত জ্ঞানাত্মক বাক্যগুলি নিশ্চিত জ্ঞানেব উদাহবণ নয়, ববঞ্চ সেগুলি এমন কিছুব উদাহবণ যেখানে সংশয় তোলাটাই নিরর্থক। যদি কেউ সংশয় কবেন যে সত্যিই ম্যুর দুটি হাত তুলেছেন কি না, তবে আমরা ত সব কিছু সংশয কবতে পাবি। আমাদেব ইন্দ্রিয়েব নির্ভবযোগ্যতাকেও সংশয় করতে পাবি এবং সেক্ষেত্রে পুবো নির্দেশেব কাঠামো (ফ্রেম অব বেফ্‌বেন্স) যাব মধ্যে থেকে সংশয কবছি, সেটিও সংশযের বিষয হবে। ফলে সংশয় করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। কিছু কিছু বচন আছে যেগুলি দিয়ে কাঠামো তৈবি। সেই বচনগুলিকে সংশয় করলে আমবা কোনো বিচারই কবতে পাববো না। কাবণ বিচাব একমাত্র ঐ কাঠামোব পবিপ্রেক্ষিতেই সম্ভব।

ম্যুর সাধাবণ জ্ঞানেব সমর্থনে যে সাধাবণ জ্ঞানাত্মক বাক্যগুলির উদাহবণ দিয়েছেন সেগুলি তর্কশাস্ত্রেব কথা। কাবণ ভাষাব খেলাকে (ল্যাঙ্গুযেজ গেম) যে বাক্যগুলি বর্ণনা কবে সেই বাক্যগুলি তর্কশাস্ত্রের অংশ। যদি একটি বাক্যেব বিপরীত বাক্য ভাবা যায়, তবে সেই বাক্যটিকে অভিজ্ঞতা নির্ভব প্রকল্প (হাইপোথিসিস) বলে মনে কবতে হবে। কারণ ঐ বাক্যটির সত্য-মিথ্যা নির্ভর করে জগতে বস্তুগুলি পরস্পরের সাথে কীভাবে সম্পর্কিত আছে তার উপব। কিন্তু একটি বাক্যেব বিপরীত যদি নিরর্থক হয়, তবে বুঝতে হবে ঐ বাক্যটি জগৎ

সম্পর্কে কোনো কথা বলে না, আমাদেব ভাবনাব কাঠামো সম্পর্কে কথা বলে, তাই ঐ বাক্যটি তর্কশাস্ত্রেব অর্ন্তগত। অর্থাৎ কোনো একটি বাক্যের সত্যতা/মিথ্যাত্ব নির্ভর করে সেই বাক্যে বর্ণিত অবস্থাটি জগতে আছে কি নেই তাব উপব। বাক্যেব সত্যতা/মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা যায় আমাদের জগৎ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা কী রকম তা দিযে। এই অর্থেই হিটগেনস্টাইন সত্য/মিথ্যাত্মক বাক্যগুলিকে অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রকল্প বলেছেন। কিন্তু যে বাক্যগুলির বিপরীত আমরা ভাবতেই পাবি না, সেই বাক্যগুলিকে সত্য/মিথ্যাত্মক বাক্যেব দলে ফেলতে পাবি না। কাবণ একটি বাক্যকে সত্য/মিথ্যা বলাব অর্থ সেই বাক্যটিকে অথবা তাব বিপবীত বাক্যটিকে ঘোষণা করা। আব এই ঘোষণা নিশ্চয় জগৎ সম্পর্কে আমাদেব অভিজ্ঞতা কী বকম তাব দিকে তাকিয়েই করতে হবে। এখন এমন কোনো বাক্য যদি থেকে থাকে যাব বিপবীত বাক্য আমবা কল্পনাই কবতে পাবি না (সত্য/মিথ্যাত্মক বাক্যগুলি কল্পনাযোগ্য), সেই বাক্যটিকে সত্য/মিথ্যাত্মক বাক্যেব দলে ফেলা যাবে না। ফলে সেই বাক্যটিকে অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রকল্প বলা যাবে না। সেই বাক্যটি জগৎকে বর্ণনা কবে - এই কথা আমবা বলতে পাবব না। হিটগেনস্টাইন-এব মতে, এই ধবনেব বাক্য আমাদেব ভাবনার কাঠামোকে বর্ণনা কবে। এখানে আমবা দুটি স্তবের বাক্যেব কথা বলতে পারি। এক, যে বাক্যগুলি জগৎকে বর্ণনা কবে। এই বাক্যগুলি সত্য বা মিথ্যা হতে পাবে। এই বাক্যগুলির সত্যমূল্য নিরূপণ কবা যায় জগৎ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতার নিবিখে। দুই, জগৎ সম্পর্কে আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয তা ত আমাদেব ভাবনা প্রসূত। এখন এই ভাবনাকে যদি বর্ণনা করতে হয়, সেই বর্ণনাও হবে বাক্যানুবিদ্ধ। এই দ্বিতীয স্তরেব বাক্যগুলির বিপবীত বাক্য নিবর্থক হবে, কারণ দ্বিতীয স্তবের ঐ বাক্যগুলি না মানলে আমাদেব ভাবনা নামক কাজটিই সম্ভব হবে না। ভাবনা সম্ভব না হলে, অভিজ্ঞতাও সম্ভব হবে না। অভিজ্ঞতা সম্ভব না হলে প্রথম স্তবের বাক্যগুলিব সত্যমূল্য বলতে পাবব না। ম্যুবের বাক্যগুলি অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রকল্প (হাইপথিসিস) নয়, কাবণ ঐ বাক্যগুলির বিপবীত আমবা ভাবতেই পাবি না। যখন ম্যুর বলেন যে তাঁব দুটো হাত আছে, তখন যদি আমবা বলি যে ম্যুবেব দুটো হাত নেই, তাহলে সেই বাক্যটিকে মিথ্যা বলা যাবে না, সেটি নিবর্থক। তাই এই বাক্যগুলি ভাবনার কাঠামোকে বর্ণনা কবে, কীভাবে এই জগৎকে বুঝি - সেটা বর্ণনা কবে। জগৎ সম্বন্ধে কোনো তথ্য দেয় না। ঐ বাক্যগুলিকে আমাদেব সংশয কবাটাই নিবর্থক। সংশয কবাব জন্য একটি ভিত্তি থাকা দবকাব।[৮] সেই ভিত্তিকে সংশয কবলে সংশয ব্যাপাবটাই দুর্বোধ্য হযে ওঠে। ম্যুব যদি ঐ বাক্যগুলিব বিপবীত বাক্যগুলিকে নিশ্চিত ভাবে জানেন বলে বলতেন, তবে আমবা শুধু ম্যুবের সঙ্গে ঐক্যমতই হতাম না তা নয়, আমবা তাঁকে পাগল বলতাম।[৭] আমরা কোনো একটি বিশেষ জ্ঞান সম্বন্ধে ভুল কবতে পাবি। কিন্তু এই ভ্রান্তি যখন পুরো ভাবনার কাঠামোটিব দিকে নির্দেশিত হয়, তখন সেই ভ্রান্তিটি নিবর্থক হয়ে দাঁড়ায়। সুতবাং সংশয় এবং ভ্রম

এক জিনিস নয়।

হ্বিটগেনস্টাইন সংশযবাদেব বিরুদ্ধে তাঁর মত ব্যক্ত কবেছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন ম্যূব যেভাবে সংশয়বাদেব বিরোধিতা করেছেন সেটা সফল হবে না। ম্যূবেব যুক্তিগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হযেছে। যুক্তি দিয়ে সংশযবাদেব বিবোধিতা নয়, সংশযবাদেব নিবর্থকতা প্রতিপন্ন কবতে হবে। 'লক্ষ্য ব্যতীত সংশয় সংশয়ই নয়'।[৮] এবং সেই লক্ষ্যে আমবা কখনই পৌঁছতে পারব না যদি আমবা শুধু 'আমি নিশ্চিৎ রূপে জানি যে...' এই আকাবের কতগুলি বাক্য বলি (যেটি ম্যূর করেছেন)। সংশযের অবসান হবে তখনই যখন আমবা কোনো কাজে ব্যাপৃত হব। শিশুবা যখন শেখে যে জগতে বই আছে, পেন আছে, ইত্যাদি, তাবা কেবলমাত্র কতগুলি বাক্য উচ্চাবণ কবে না (যেমন 'আমি জানি যে বই আছে'), তারা বইগুলি খুলে পড়ে, পেন দিয়ে লেখে, ইত্যাদি। সংশয সম্ভব ঐ ধবণের অনেক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে। ঐ সমস্ত কাজগুলিকে সংশয করলে পব সংশযেব আব কোনো ভিত্তি থাকে না। সংশযেব নিবসন কবতে হলে আমাদের কাজেব দিকে, জীবনে প্রযোগেব দিকে তাকাতে হবে। কোন্ পরিস্থিতিতে আমরা কী বাক্য উচ্চাবণ কবি - এটাই দেখতে হবে। এই পর্বিস্থিতিই ঐ বাক্যগুলিকে অর্থবহ কবে তোলে।

আমব' যর্থার্থ অর্থে সংশয তখনই কবতে পাবি, যখন আমবা শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারি। ভাষাব অর্থজ্ঞান থাকলে পবই সংশয সম্ভব হয। কেউ যদি কোনো একটি কাজকে সংশয কবে, তবে তাব সেই বাক্যের অর্থজ্ঞান অবশ্যই আছে। একটি বাক্যেব মানে কী - এটি না জেনে কেউ সেই বাক্যটিকে সংশয কবতে পাবে না। সংশযবাদী যদি এই কথা বলেন যে তিনি জানেন না যে তাঁব একটি হাত আছে, তার মানে সংশয়বাদী এইটুকু নিশ্চয় জানেন যে 'হাত' শব্দটিব মানে কী। সংশযবাদী যদি বলেন যে তিনি জানেন না যে 'হাত' শব্দটিব মানে কী, তবে তাঁব হাত আছে কিনা এই বিষযে তাঁব কোনো সংশযও হতে পাবে না। শব্দজ্ঞানের প্রেক্ষাপটেই সংশয সম্ভব। শব্দজ্ঞানকেও সংশয কবলে, সংশয আব তোলাই সম্ভব হয় না।

এই কাবণে হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন যে সার্বিক সংশয সম্ভব নয়। একজন ছাত্রী যদি তাব শিক্ষকেব সমস্ত কথাতেই সংশয প্রকাশ কবে, তবে সেই শিক্ষক অধৈর্য হযে পডবেন এবং এই অধৈর্য হওযাটাই স্বাভাবিক, কারণ ছাত্রীব সংশয ভিত্তিহীন। কী ভাবে প্রশ্ন কবতে হয - এটি সেই ছাত্রী শেখে নি।[৯] যে খেলাটি ছাত্রীকে শেখাচ্ছেন তার শিক্ষক, সেই খেলাটি সেই ছাত্রী শিখে উঠতে পারে নি। কিছু বিষযকে সংশয় না করাই হচ্ছে সংশয়েব পূর্বশর্ত। খেলাব নিয়মগুলিকে মানলে পবই আমরা বলতে পারি কোনো খেলোয়াড় ভুল চাল চেলেছেন কিনা। কিন্তু খেলাব নিয়মগুলিকেই যদি আমবা সংশয়ের চোখে দেখি, তবে খেলোয়াডেব কোনো একটি চাল ঠিক হযেছে কি না এই প্রশ্ন আব তুলতে পাবি না। শব্দ ব্যবহারকেও

যদি একধবণেব খেলা বলা যায, তবে সেই শব্দ ব্যবহাবেব জ্ঞানকে সংশয কবলে পব আব সংশয তোলাই সম্ভব হয না। কিছু পূর্বস্বীকৃত বিষয় মানাব পবেই আমবা সেই অনুষঙ্গে সংশয প্রকাশ করতে পাবি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সংশয একবকমের নিশ্চযাত্মক জ্ঞানকে ধবে নিয়ে এগোয়।[৮] সংশয যখন হয, তখন আমবা নিবীক্ষা কবে দেখতে পাবি যে সংশয় কবা ঠিক হয়েছে কি না। এখন এই নিবীক্ষা সম্ভব তখনই যখন আমরা কিছু কিছু জিনিসকে অবিশ্বাস কবি না, সংশয কবি না। কাবণ নিবীক্ষাব জন্য কিছু নিবীক্ষামূলক জ্ঞানকে আমাদেব ত মেনে নিতেই হবে। তা না মানলে, নিবীক্ষা কবাই সম্ভব নয। সুতবাং আমবা সংশয তখনই কবতে পাবি, যখন কিছু কিছু বিষয সম্বন্ধে আমাদেব নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে। কিছু কিছু জিনিস সম্বন্ধে আমবা কখনই সংশয় কবতে পাবি না। কতগুলি বাক্য সংশযাতীত, সেই বাক্যগুলি অভিধানেব কাঠামোব অংশ।[৯] এই কাঠামোটি আমাদেব জগৎ বীক্ষা (ওযার্লড পিকচাব) তৈবি কবে। এই জগৎবীক্ষাই আমাদেব সকল বকমেব প্রশ্ন এবং ঘোষণাব ভিত্তি।

উপবোক্ত বিষযটিকে আমবা আর একটু ব্যাখ্যা করতে পাবি।[১০] আমবা বলতে পাবি যে দু'ধরণেব বাক্য আছে, এক ধরনের বাক্য অভিজ্ঞতাব নিবীক্ষাব সম্মুখীন হতে পাবে এবং অভিজ্ঞতাব দ্বাবা ঐ বাক্যগুলিব যাথার্থ্য অথবা অযাথার্থ্য প্রতিপাদন কবা যেতে পাবে। আব এক ধরণেব বাক্য আছে যেগুলি ঐবকম নিবীক্ষণ যোগ্য নয় অথবা যাথার্থ্য-অযাথার্থ্য বিচারাধীন নয। যদি এই দ্বিতীয় ধবণেব বাক্য সম্বন্ধে কেউ সংশয় প্রকাশ কবেন, তবে আমবা বলব যে সংশযবাদীব লক্ষ্য ঠিক হয়নি। প্রথম ধবণেব বাক্য সম্বন্ধে আমাদেব সংশয অবশ্যই হতে পাবে এবং তা নিবসনেব উপাযও আছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কেন দ্বিতীয় ধবণের বাক্যগুলি সম্বন্ধে কোনো সংশয় পোষণ কবা যায় না? তাব কাবণ এই নয় যে বাক্যগুলি স্বতঃপ্রমাণ। স্বতঃপ্রমাণ বাক্যগুলিও প্রমাণেব অপেক্ষা বাখে। কিন্তু আলোচ্য বাক্যগুলি কোনো প্রমাণেবই অপেক্ষা রাখে না, তা সে যেমনই প্রমান হোক্ না কেন। প্রমাণেব জন্য যে কাঠামোব প্রয়োজন, সেই কাঠামোটাই তৈবি হয়েছে ঐ বাক্যগুলি দিয়ে। ঐ বাক্যগুলিই 'প্রামাণ্য বা যাথার্থ্য প্রতিপাদন' নামক কাজটি সম্ভব কবে তোলে। সুতবাং সংশয়বাদী এই বাক্যগুলিব যাথার্থ্য সম্বন্ধে সংশয় করলে পব প্রমাণ কবাব প্রক্রিযা প্রতিহত হবে। তাই এই কথা আমাদেব মানতে হবে যে সংশয়কে সম্ভব কবাব জন্যই কিছু কিছু বিষযে আমাদেব নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকে স্বীকাব কবে নিতেই হবে।

উপবেব আলোচনা থেকে আমবা বুঝতে পাবি যে হ্বিটগেনস্টাইনও ম্যুবেব মত সংশযবাদ বিরোধী, কিন্তু যেভাবে মূব সংশয়বাদের বিরোধীতা কবাব চেষ্টা কবেছেন তাব সঙ্গে তিনি একমত নন। কারণ হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন ম্যুবেব 'আমি জানি যে অমুক ...' বাক্যগুলি সংশয়েব নিবসন কবতে পাববে না। 'আমি জানি যে ক' (যেখানে ক হচ্ছে ম্যুরেব উচ্চাবিত

বাক্য) এমন কিছু ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেখানে কেবল ম্যুবেবই সেই জ্ঞান হতে পাবে, আব কারও সেই জ্ঞান হতে পাবে না। যে সকল বিষযে ম্যুর তাঁর বাক্যগুলি বলেছেন, সেই সকল বিষয়ে আমরাও জ্ঞান অর্জন কবতে পাবি। কাজেই 'আমি জানি' - এই কথাটুকু বাক্যের আগে ব্যবহাব কবে বক্তাব কোনো রকম ব্যক্তিগত জ্ঞানেব কথা বলা হয নি। এমনকি একথাও কেউ বলতে পাবেন যে 'আমি জানি আমাব দুটি হাত আছে' আর 'আমার দুটি হাত আছে' এই দুটি বাক্যের মধ্যে কোনো অর্থগত পার্থক্য নেই।[১১] অর্থাৎ 'আমি জানি', এই অংশটুকু যোগ কবে আমি অতিবিক্ত কোনো কথা বললাম না।

অবশ্য কোনো কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে 'আমি জানি যে ক' এই ধবণেব প্রয়োগ হতে পাবে। ধবা যাক্ কারও মোটব গাড়ী দুর্ঘটনায় হাতটা খুব আহত হযেছে। আমি জানি না তাঁর হাতটা কেটে ফেলতে হযেছে কি না। তিনি যদি বলেন যে তাঁব দুটি হাত আছে, তাহলে আমি জানতে পাবি যে তাঁব দুটি হাত আছে (অবশ্যই ধবে নিচ্ছি যে তিনি একজন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি)। তাবপর তিনি যদি বলেন 'আমি জানি যে আমাব দুটি হাত আছে', তাতে আমি আবও নিশ্চিত হলাম যে তাঁর দুটি হাত আছে। 'আমি জানি' এই অংশটুকু যোগ করাব জন্য আমার নিশ্চয়তা আরও বেড়ে গেল। এটি সম্ভব হল কারণ আমাব এই বিশ্বাস ছিল যে তিনি আমাকে নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পাববেন। কিন্তু সংশয়বাদী যখন বহির্জগতেব বস্তু সম্বন্ধে সংশয় করেন, তিনি কখনই মনে কবেন না যে কাবও পক্ষে তাঁব জ্ঞানকে নিশ্চিত কবা সম্ভব। তাই ম্যুব যখন বলেন 'আমি জানি . ', সেটি সংশযবাদীকে চুপ কবাতে পাবে না। এরপবও সংশযবাদী ম্যুরেব জানাকে প্রশ্ন কবতে পাবেন।

'আমি জানি যে ক' - এই ধবণেব বাক্যগুলি উপযুক্ত পবিস্থিতি ছাড়া অর্থহীন। যখন একজন বলেন যে 'আমি জানি যে এটি একটি গাছ', - তিনি নিজেকে অথবা অপবকে বোঝাতে চান যে তিনি যেটি জানেন সেটি যুক্তিবিজ্ঞান বা অঙ্কশাস্ত্রেব কথা নয।[১২] কিন্তু উপযুক্ত পরিস্থিতি ছাড়া এই বাক্যগুলি বলাব কোনো অর্থই হয় না। আপনি যদি আপনাব বন্ধুর সাথে আলোচনাব মধ্যে হঠাৎ বলে ওঠেন 'আমি জানি যে তুমি অমুক' - এই বাক্যটি যেমন নিরর্থক, তেমনই কোনো পবিস্থিতি ছাড়া 'আমি জানি ...' ধরণেব বাক্যগুলির ব্যবহাব নিবর্থক। 'আমি জানি যে ক' এই বাক্যটিব ব্যবহাব তখনই সম্ভব, যখন আমি ক-এব পক্ষে কিছু যুক্তি দিতে পাবব যেগুলি ক-এব থেকে অধিকতব শক্তিশালী। কিন্তু আমাব যে দুটি হাত আছে, তাব পক্ষে দুটি হাত দেখানো ছাড়া অধিকতব শক্তিশালী কোনো যুক্তি আমি দিতে পাবব না।

অবশ্যই ম্যুবেব অধিকাব আছে এই কথা বলাব যে তিনি জানেন যে তাঁব দুটি হাত আছে। এই ব্যাপাবে তিনি ঠিক বলতে পাবেন, আবার ভুলও বলতে পাবেন। কিন্তু এব দ্বারা সংশযবাদকে ঠেকানো যাবে না। যদি কোনো কিছু সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয, তবে

'আমি জানি' এই অংশটুকু ব্যবহাব কবলেই যে আমাব সেই সম্বন্ধে জ্ঞান হযে গেল এমন নয়।[১৮] জানা রূপ ক্রিয়াটি বিশ্বাস বা সন্দেহ রূপ ক্রিয়া থেকে পৃথক। 'সে এটি বিশ্বাস কবে, কিন্তু এটি সেবকম নয়' এই ধরণের কথা আমবা বলতে পারি। 'সে জানে যে এটি এইবকম, কিন্তু সেটি এইরকম নয়' - এই ধবণেব কথা আমরা বলতে পাবি না। অর্থাৎ 'আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে আমার দুটি হাত আছে' এই কথা বলে সংশযবাদেব উত্তব দেওয়া যাবে না। আমার জানাটা ভূল হতেও পাবে। সেক্ষেত্রে 'আমি জানি' এই অংশটুকু ব্যবহার করাই যাবে না। কাবণ জানাব একটি পূর্বশর্ত হচ্ছে জ্ঞাত বিষযের সত্যতা। এখানেই জানার সঙ্গে বিশ্বাস বা সন্দেহেব পার্থক্য। এমন হতেই পাবে কোনো জিনিস সম্পর্কে আমি জানি - এইরকম ধারণা আমাব ছিল। কিন্তু পবে দেখা গেল সেই জিনিসটি আমি ঠিক যেভাবে জেনেছিলাম সেবকম নয। তখন বুঝতে পাবলাম যে ঐ জিনিসটি সম্পর্কে আমাব জ্ঞান ছিল না। ফলে 'আমি নিশ্চতরূপে জানি' শুধু এই অংশটুকু বাক্যেব আগে ব্যবহার কবলেই যে সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞান হয়েছে বলে দাবি কবতে পাবব এমন কোনো নিশ্চযতা নেই। অন্ততঃ এভাবে সংশয়বাদীকে নিরস্ত কবা যাবে না। কিন্তু ম্যুব ঐবকম মনে করেছিলেন। তাই ম্যুর ভেবেছিলেন যে 'আমি জানি' এই কথাটি সংযোজন করে সংশযবাদীব উত্তব দেওয়া যাবে। যাই হোক্, হুইটগেনস্টাইন অবশ্য মনে করেন যে ম্যুব এই অংশে ঠিক যে, কিছু বাক্য আছে যেগুলিব একটি বিশেষ গুণ আছে, সেগুলিকে সন্দেহ কবা যাবে না। সেগুলিকে যদি সন্দেহ কবা হয়, তবে সংশযবাদ নিরর্থক হযে দাঁড়াবে।

হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনে যাপনের প্রেক্ষাপট

সবিতা চক্রবর্ত্তী

যাপনেব প্রেক্ষাপট বা ফর্ম অব লাইফ-এব ধারণা দর্শনের ইতিহাসে সম্পূণ নতুন। হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর পববর্তী পর্যায়ের রচনায এই ধারণার কথা বলেছেন - শুধু তাই নয় তাঁব দর্শনে যাপন-প্রেক্ষাপটেব ধাবণা মুখ্য এবং মৌলিক স্থান অধিকার কবে আছে। আমাদেব সব চিন্তা-ভাবনা, সমগ্র ভাষাব্যবহার যাপন-প্রেক্ষাপটের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। এই প্রেক্ষাপট আমাদেব ভাষা-ব্যবহারেব পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে কাজ করে, যার ফলে ভাষার প্রতিটি প্রয়োগকেই এব নিরিখে বোঝা যায়।

আমাদের সমগ্র চিন্তা-ভাবনা ভাষায প্রতিফলিত হয। অতএব ভাষা বিশ্লেষণ করে যে কোনো দার্শনিক সমস্যার সমাধান কবা যেতে পারে - এই ধাবণা এবং সমসাময়িক চিন্তাবিদ্‌দের বচনার দ্বাবা প্রভাবিত হয়ে জীবনের প্রথমদিকেব রচনায় হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেছিলেন আমাদের জগতেব যে গঠন বা ফর্ম ভাষারও সেই গঠন এবং আমাদের চিন্তার গঠনও তাই। জগৎ, ভাষা এবং মননের মধ্যে এক অনুপম সাযুজ্য বয়েছে - সেই কারণে ভাষার গঠন জানলেই জগতের গঠন জানা হয়ে যাবে। দার্শনিকেব কাজ হল ভাষা বিশ্লেবণ করে ভাষাব গঠনকে বা আকাবকে জানা। হ্বিটগেনস্টাইন বিশ্বাস করতেন যে কোনো ভাষাবই, তা সে প্রচলিত ভাষাই হোক্ বা কাল্পনিক কোনো ভাষাই হোক, যৌক্তিক আকার বা লজিকাল ফর্ম এক। ভাষা-ব্যবহাব নির্ধাবিত হয় যৌক্তিক নিয়মের দ্বারা আর যৌক্তিক অনিবার্যতাই একমাত্র অনিবার্যতা।[১] লৌকিক ব্যবহাব কীভাবে আমাদের জীবনযাপনেব সঙ্গে সম্পর্কিত - এই বিষযটিব দিকে গুরুত্ব আবোপ না কবে লৌকিক ব্যবহার কীভাবে যৌক্তিক নিয়মের দ্বাবা নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ ভাষাব উপাদানসমূহ কীভাবে বিন্যস্ত হতে পারে তাই তিনি বিশ্লেষণ ক'বেছেন।

হ্বিটগেনস্টাইন তাঁর 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে ধরে নিয়েছেন যে ভাষা ও জগতের মধ্যে একটা সাযুজ্য রয়েছে - এই সাযুজ্য ভাষা ও জগতেব কাঠামোগত বা স্ট্রাক্‌চাবাল সাযুজ্যের মধ্যে বিধৃত। এই বিশ্বাসেব দ্বারা আবিষ্ট হয়ে তিনি জগতেব এক আদর্শ কাঠামো বা মডেল উপস্থাপন করেছেন। দার্শনিক সমস্যার সমাধান তাতে কিন্তু আদৌ হয নি কারণ জগৎ এবং ভাষার মধ্যে সাযুজ্যেব বিষয়টিকে ধবে নিযে তিনি দার্শনিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। প্রথমদিকেব বচনায় হ্বিটগেনস্টাইন বিশ্বাস কবতেন ভাষাব সাবসত্তা বা এসেন্স আছে। এই সারসত্তাকে আবশ্যিক ধর্মও বলা যেতে পাবে। ভাষা তখনই বুঝি যখন ভাষার আবশ্যিক ধর্মকে বুঝি। আবশ্যিক ধর্ম হল অনিবার্য ধর্ম যা কোনো শব্দ নির্দেশিত প্রতিটি পদার্থেব

মধ্যে সবসময় উপস্থিত থাকে। কখন, কোথায় কী উদ্দেশ্যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা না দেখে দেশ-কাল পরিপ্রেক্ষিত নির্বিশেষে শুধু দেখতে হবে শব্দটি অর্থপূর্ণ হবার পক্ষে আবশ্যিক শর্ত কোন্‌টি। ভাষা কীভাবে আমাদের জীবন-যাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত - এই দিকটিকে উপেক্ষা করে স্ট্রাক্‌চার বা কাঠামো অনুসন্ধানেই তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন কারণ, তিনি মনে করেছিলেন ভাষার আকার জানা ভাষা বোঝার পক্ষে যথেষ্ট।[২]

পরবর্তীকালে ফিলসফিকাল ইনভেস্টিগেশনস' লেখার সময় হ্বিটগেনস্টাইন উপলব্ধি করলেন ভাষার কোনো সারসত্তা বা এসেন্স নেই। উনি এও মনে করলেন যে একটা ভাষা বুঝতে গেলে সর্বাগ্রে বুঝতে হয়, ভাষার ব্যবহার কীভাবে হয় আর তার প্রয়োগের অনুষঙ্গই বা কী। তিনি অনুভব করলেন 'ট্র্যাকটেটস'-এর পদ্ধতি অনুসরণ করে শুধুই দার্শনিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করলে অনেক দার্শনিক সমস্যাকে এড়িয়ে গিয়ে ভাষার এক নিখুঁত মডেল পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু দার্শনিকের কাজ কোনো সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া নয় - বরং সমস্যার গভীরে প্রবেশ করা - সমস্যার উৎস নির্ধারণ করা এবং সমস্যাটি নির্মূল (ডিজলভ্) করা।[৩] ভাষা বুঝতে গেলে সাধারণ ধারণা অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ ধারণা বলতে তিনি দেশাতীত কালাতীত সামান্য ধর্মকে বোঝেন নি - যে সামান্য ধর্ম কোনো শ্রেণীর অর্ন্তগত প্রতিটি পদার্থের মধ্যে থাকে। হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেন ভাষার পৌনঃপুনিক প্রয়োগের ভেতর দিয়েই ভাষার সাধারণ ধর্ম গড়ে ওঠে - ভাষার ব্যবহার নিরপেক্ষ কোনো সামান্য ধর্ম নেই। সাধারণ ধারণা আমাদের হয় - ব্যবহারের সাদৃশ্য দেখে এই সাধারণ ধর্ম বোঝা যায়। সাধারণ ধর্ম বলতে তিনি কেবলমাত্র ব্যবহারের সাদৃশ্যকে বুঝেছেন, সাজাত্যকে বোঝেন নি। তাঁর মতে সাধারণ ধর্ম যাপনের প্রেক্ষাপট থেকে উঠে আসে। আমাদের সমগ্র ভাষা-ব্যবহার ফর্ম অব লাইফ বা যাপন-প্রেক্ষাপটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সমগ্র 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ তাঁর উদ্দেশ্যই ছিল বাস্তবিক পক্ষে আমরা ভাষা কীভাবে বুঝি তা বিশ্লেষণ করে দেখানো। তিনি দেখেছেন ফর্ম অব লাইফ-এর পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া কোনো ভাষা বোঝা সম্ভব নয়।

'ইনভেস্টিগেশনস' তিনি শুরুই করেছেন অগাস্টিনীয়ান তত্ত্বকে খণ্ডন করে। এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছিল ভাষার সারসত্তা বা এসেন্স আছে - এই সারসত্তার উপস্থিতির জন্য আমরা ভাষা বুঝি - ধরে নেওয়া হয়েছিল প্রতিটি শব্দ অর্থপূর্ণ, শব্দের সমন্বয়ে গঠিত হয় বাক্য এবং শব্দগুলি কোনো না কোনো পদার্থকে নির্দেশ করে। হ্বিটগেনস্টাইন ভাষা পর্যালোচনা করে দেখলেন ভাষার কোনো সারসত্তা নেই। ভাষায় নিয়ম (রুল), সংজ্ঞা (ডেফিনিশান্) মানদণ্ড (ক্রাইটিরিয়ন্), ব্যাকরণ (গ্রামার), বোধ (আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং), চিন্তা (থট্), প্রভৃতি ধারণা ব্যবহৃত হয়। প্রাচীনকালে অগাস্টিন, ভাষার এই কেন্দ্রীয় ধারণাগুলিকে কোনো না কোনো অনিবার্য ধর্ম সাপেক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন ধরা যাক্ সংজ্ঞার ধারণার ক্ষেত্রে। সংজ্ঞা বলতে কী বোঝায়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়, একটি পদের সংজ্ঞা দেওয়ার অর্থ আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত লক্ষণের মাধ্যমে পদটিকে বোঝানো। শুধু তাই নয়, গত দুশো বছরের

দর্শণের ইতিহাসে এমনকি হ্বিটগেনস্টাইন নিজে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে অগাস্টিনীয়ান তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ যে কোনো পদকে বা ধারণাকে বোঝার জন্য তিনি সংজ্ঞা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। 'ইনভেস্টিগেশানস'-এ হ্বিটগেনস্টাইন দেখলেন সারসত্তা বা এসেন্স অনুসন্ধানের চেষ্টা নিরর্থক কারণ ব্যাখ্যা দিয়ে দার্শনিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। অগাস্টিনীয়ান তত্ত্ব অনুসারে সাধারণ ধর্ম ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রণ করে - দার্শনিক এই সাধারণ ধর্ম আবিষ্কার করবেন, ব্যাখ্যা দেবেন। এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছিল, দার্শনিক সমস্যা মূলতঃ ব্যাখ্যার সমস্যা - প্রতিটি ধারণার (কন্‌সেপ্ট) যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারলেই সমস্যার সমাধান হবে। এই উদ্দেশ্যে দার্শনিক যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবেন সেই ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত।

এই ধরণের মনোভাবের বিরুদ্ধে হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য হল চূড়ান্ত ব্যাখ্যা খোঁজার প্রয়োজন নেই - চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বলে কিছু হয় না কারণ ভাষার কোনো সারসত্তা নেই ব্যবহার দেখে ভাষা বুঝতে হবে। ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় কারো মনে হতে পারে, তাহলে হ্বিটগেনস্টাইন কি আবার নতুন সমস্যা ডেকে আনছেন না? ভাষার কোনো সারসত্তা বা এসেন্স যদি না থাকে তাহলে কিসের ভিত্তিতে ভাষা বুঝি আমরা? তিনি তো প্রায় আত্মঘাতী নীতি সমর্থন করেছেন। ভাষা সর্বাংশে আপেক্ষিক হলে ভাব-বিনিময় কীভাবে সম্পন্ন হবে. বাস্তবিকপক্ষে, এসেন্সকে অস্বীকার করে ভাষাকে সম্পূর্ণ আপেক্ষিক রূপ দেবার পক্ষপাতী হ্বিটগেনস্টাইন ছিলেন না। ভাষায় সাধারণ ধর্মকে তিনিও স্বীকার করেছেন অগাস্টিনীয়ান তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য হল এইখানে যে সাধারণ ধর্ম বলতে তিনি নিত্য বা চিরকালীন কোনো সত্তাকে বোঝেন নি। প্রকৃতপক্ষে তিনি অভিজ্ঞতাপূর্ব আধিবিদ্যক সারসত্তার অস্তিত্ব বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। এসেন্সের অস্তিত্ব ধরে নিয়ে পরে সেই এসেন্স আবিষ্কারেই ছিল তাঁর আপত্তি। তিনি সেইজন্য বলেছেন ভাষায় সাধারণ কিছু খোঁজার পরিবর্তে ভাষার ব্যবহারের দিকে তাকাও।[৮] বিভিন্ন অনুষঙ্গে ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করলে সাধারণ ধর্ম জেনে নেওয়া যায়। এই সাধারণ ধারণার ব্যবহার অতিরিক্ত কোনো তাৎপর্য নেই। হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে, ভাষা আমাদের জীবন-যাপনের ভেতর থেকে উঠে আসে। ভাষা ব্যবহার জীবন-যাপনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। আমাদের যাপন কোনো এক ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে ঘটে - সব ভাব-ধারণা, আশা-প্রত্যাশা, সুখ-দুঃখ, কৃষ্টি-সভ্যতা সেই ইতিহাসের প্রেক্ষাপটেই ঘটে। এই পরিমণ্ডলের কোনো চিরকালীন বা ধ্রুব সত্তা নেই - ইতিহাসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার পরিবর্তিত হয় - তা সত্ত্বেও বলা যায়, এই পরিমণ্ডলই ব্যবহারের ভিত্তি এবং এই যাপনের পরিমণ্ডলেই প্রয়োগকে বুঝে থাকি। যাপনের এই পরিমণ্ডলকেই হ্বিটগেনস্টাইন 'ফর্ম অব লাইফ' বলেছেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, হ্বিটগেনস্টাইন দর্শনে ফর্ম অব লাইফ-এর ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও হ্বিটগেনস্টাইন নিজে এ বিষয়ে বিস্তারিত কোনো আলোচনা করেন নি, বিক্ষিপ্ত কয়েকটি প্যারাগ্রাফে উল্লেখ করেছেন মাত্র।

তাঁব জীবনেব শেষের দিকেব বচনাব মধ্যে সমগ্র 'ইনভেস্টিগেশন'-এব পাঁচটি প্যাবাগ্রাফে এবং অন্যান্য কয়েকটি রচনায এই প্রসঙ্গের উল্লেখ বযেছে। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিক্ষিপ্ত উল্লেখের ফলে এই ধাবণাব মৌলিকত্ব এবং গুরুত্ব যে কতখানি তা ধবা পডে না। আব পডে না বলেই বিস্তাবিত, প্রাঞ্জল আলোচনা জরুরী হযে পডে।

সেই কাবণে, আলোচ্য প্রবন্ধে মূলতঃ বিস্তৃত আলোচনায় হ্বিটগেস্টাইন-এব বক্তব্যই পবিস্ফুট করাব চেষ্টা কবা হযেছে। হ্বিটগেনস্টাইন সর্বত্র প্রায সূত্রাকাবে ফর্ম অব লাইফ-এব কথা বলেছেন সেজন্য প্রতিটি প্রয়োগকে বিশ্লেষণ কবে দেখানো হয়েছে সেই সেই নির্দিষ্ট অংশে তিনি ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন। বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন ফর্ম অব লাইফ-এব উল্লেখ কবেছেন বর্তমান আলোচনায সেজন্য আমবা দেখব - বিভিন্ন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত অংশেব মধ্যে কোনো যোগসূত্র বা অন্তর্লীন ঐক্য আছে কি না - তিনি কি কোনো একটি মূল ধাবণাকে ব্যক্ত কবতে চেযেছেন অথবা বিভিন্ন প্রসঙ্গে ফর্ম অব লাইফ-এব প্রসঙ্গ টেনে বিচ্ছিন্নভাবে যাপনেব পবিবর্তনশীল দিকটিকেই বোঝাতে চেযেছেন। প্রতিটি উদ্ধৃতি বিশ্লেষণেব সময অবশ্যই দেখব ফর্ম অব লাইফ বলতে হ্বিটগেনস্টাইন ঠিক কী বুঝেছেন এবং সামগ্রিকভাবে ভাষায ফর্ম অব লাইফ-এব গুরুত্ব কতখানি।

ফর্ম অব লাইফ বলতে আক্ষবিক অর্থে বোঝায় জীবনেব নক্‌শা বা প্যাটার্ন, জীবনযাপনেব পন্থা। সামাজিক জীব হিসেবে আমবা প্রত্যেকে এক সর্বজনীন সাধাবণ যাপনেব অংশীদাব। এইবার এ বিষযে হ্বিটগেনস্টাইন কী বলছেন দেখা যাক্।

[এক]

ভাষা এবং যাপন-প্রেক্ষাপটেব সম্বন্ধ

শুধুমাত্র যুদ্ধেব বিববণ আব নির্দেশিকাব অনুষঙ্গে একটি ভাষাকে কল্পনা কবা সহজ ... এবং একটি ভাষার ধাবণা থাকাব অর্থ হল যাপন-প্রেক্ষাপটেব ধারণা থাকা [অর্থাৎ ভাষা জীবনযাপন পদ্ধতিব সঙ্গে ওতোপ্রোতোভাবে জডিত] ('পি আই' § ১৯)[২]

'পি আই' ১৯ অংশে হ্বিটগেনস্টাইন বলছেন ভাষাকে কল্পনা কবা মানে যাপনেব প্রেক্ষাপটেব কল্পনা করা। কোনো ভাষা জানতে হলে ভাষাব ব্যাকবণসম্মত বিন্যাস এবং বিন্যাসেব নিয়মাবলী অর্থাৎ সিন্ট্যাক্স জানা যথেষ্ট নয। ভাষাব্যবহারকাবীদেব নিজেদেব মধ্যে পাবস্পরিক বোঝাপড়া বা এগ্রিমেন্টকে বুঝতে হবে। পাবস্পবিক বোঝাপড়া অবশ্যই কোনো না কোনো যাপনের প্রেক্ষাপটে ঘটে। কোন্ পরিস্থিতিতে শব্দটি বা বাক্যটি প্রয়োগ করা হযেছে তা উল্লেখ না কবলে শব্দের বা বাক্যেব অর্থ বোঝা যায় না। জে এফ এম হান্টাব বলেন যে একটি ভাষাকে জানতে হলে সেই ভাষার ব্যাকবণ ছাড়াও অতিবিক্ত কিছু জানতে হয। এই অতিরিক্ত কিছু বলতে তিনি যাপনেব প্রেক্ষাপটকে বুঝেছেন। তাঁর মতে, ভাষাকে সেই ভাষা ব্যবহাবেব অনুষঙ্গে বেখে বুঝতে হবে, বর্ণনা কবতে হবে। কোন্ অনুষঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত

হয়েছে, কোন্ কোন্ ক্রিয়া শব্দটিব সঙ্গে জড়িয়ে আছে, কোন্ অনুষঙ্গে কোন্ ক্রিয়া কীভাবে কার্যকবী হয আমবা জানাব চেষ্টা কবতে পাবি। এই শেষেব বিকল্পটিকেই সম্ভবত হাণ্টাব 'যাপনেব প্রেক্ষাপট' বা 'ফর্ম অব লাইফ' বলেছেন।[৬] ভাষাব অন্যতম উদ্দেশ্য ভাববিনিময অর্থাৎ আমবা একেব ভাব অপবের কাছে ভাষাব মাধ্যমে পৌঁছে দিই। কিন্তু ভাববিনিময়ের জন্য কেবল পবস্পবেব ভাষা জানলে হবে না। একজনেব ভাষা বোঝা মানেই তাব বক্তবা বোঝা নয়। কাবো ভাষা বুঝে তার বক্তব্য নাও বুঝতে পারি। অপবের বক্তব্য বুঝতে গেলে তাব যাপনেব জগতেব সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই। বিষয়টিকে বোঝানোব জন্য হুইটগেনস্টাইন বলেছেন সিংহ ইংবেজী বলতে পাবলেও তাব কথা আমবা বুঝতে পাবব না কাবণ সিংহেব যাপনেব জগৎ আমাদের যাপনেব জগৎ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।[৭]

হুইটগেনস্টাইন যখন বলছেন ভাষাকে জানা মানে যাপনের প্রেক্ষাপটকে জানা - এই উক্তিব মধ্যে উনি বলতে চাননি যে যাপনের প্রেক্ষাপটই ভাষা বা ভাষাই যাপনের প্রেক্ষাপট। ভাষা এবং যাপনেব প্রেক্ষাপটকে অভিন্ন বলা যাবে না। উভয়কে বরং সমব্যাপী বলা যেতে পাবে এবং সেইজন্য একটিকে অপবটিব উল্লেখ ছাড়া বোঝা যায় না। জন্মসূত্রেই আমবা কোনো না কোনো যাপন-প্রেক্ষাপটেব অন্তর্গত - সব চিন্তা-ভাবনা, ক্রিয়াকর্ম যাপন-প্রেক্ষাপটেব মধ্যে প্রোথিত। অর্থাৎ সব চিন্তা-ভাবনা যাপন-প্রেক্ষাপটেব মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। গাবভাব-এব মন্তব্য উল্লেখ কবে বলা যায, কোনো শব্দ বক্তাব জীবনেব পরিপ্রেক্ষিতে কী ভাবে সংযুক্ত না জেনে শব্দটিব অর্থ বোঝা যায না। আবাব কোনো ব্যক্তি কোন্ সাধারণ জীবন-যাপনেব অংশীদার না জেনে সেই ব্যাক্তিব জীবনযাপনকে বুঝতে পাবি না।[৮] সমগ্র যাপনেব পবিপ্রেক্ষিতে শব্দ এবং বাক্যেব অর্থ নির্ধাবিত হয এবং সাধাবণ মানদণ্ডেব নিরিখে শব্দেব অর্থ বোঝা মানে যাপন-প্রেক্ষাপটেব নিরিখে বোঝা।

ফর্ম অব লাইফ বা যাপনেব প্রেক্ষাপট বলতে অনেক সময় ব্যক্তিব একক যাপনকে বোঝায়। এই বিষযে হুইটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য হল, ব্যক্তিব একক যাপন যদি সাধাবণ যাপনেব দ্বাবা স্বীকৃত এবং সমর্থিত হয তাহলেই বিচ্ছিন্ন একটি যাপন অর্থপূর্ণ হবে। ভাষা বুঝতে হলে অবশ্যই ব্যাকরণ জানতে হবে এবং সেই ব্যাকবণ অবশ্যই যাপন থেকে উদ্ভূত হবে। ব্যাকবণ বিশ্লেষণ কবে, প্রযোগেব মধ্যে নিয়মাবলীব উৎস। ভাষাব নিয়মাবলী ভাষা প্রযোগেব মধ্যে দিযে প্রকাশিত হয এবং দার্শনিক ভাষাব প্রযোগ দেখে ভাষাব নিয়মাবলীকে বুঝে থাকেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দার্শনিক ভাষাব প্রযোগের ওপব নির্ভব কবেই একমাত্র ভাষাকে বোঝেন, প্রয়োগেব অতিবিক্ত কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খোঁজার প্রয়োজন মনে কবেন না। আলোচ্য অংশে তাহলে দেখা যাচ্ছে হুইটগেনস্টাইন যাপনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য করছেন - যে কোনো ব্যবহাবকে যাপন-প্রেক্ষাপটেব মধ্যে বেখে বুঝতে বলেছেন। যাপন-প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব এতখানি যে একে বাদ দিযে ভাষা বোঝাই যাবে না।

[দুই]

ভাষা-ক্রীড়া এবং যাপনের প্রেক্ষাপট

এখানে 'ভাষা-ক্রীড়া' অভিধাটি এই কথাটিকে প্রাধান্য দিতে চায় যে একটি ভাষায় কথা বলা একটি ক্রিয়াব অন্তর্গত বা একটি যাপন প্রেক্ষাপটেব অংশ। ('পি আই' §২৩)[৯]

উক্ত অংশে হ্বিটগেনস্টাইন বলতে চাইছেন যে ভাষা শুধুমাত্র বৌদ্ধিক মননক্রিয়াব ফসল নয়। ভাষাব জন্ম আমাদেব জীবনযাপনের মধ্যে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর সময়ে দার্শনিক মহলে মনে করা হত ব্যাকরণ এবং লজিকেব নিয়মেব মাপকাঠিতে ভাষাব কোনো প্রয়োগকে ঠিক বা বেঠিক বলে বিচার কবতে হবে। হ্বিটগেনস্টাইন দেখলেন ভাষায় ধ্রুব বা চিবকালীন বলে কিছু নেই, ইতিহাসের পবিবর্তনেব সঙ্গে ভাষা এবং ভাষাব নিয়মাবলী পবিবর্তিত হয়। ভাষায় নিযমেব গুরুত্ব তিনি মোটেই অস্বীকার কবছেন না এবং ভাষাকে সম্পূর্ণভাবে আপেক্ষিকরূপ দেবার কোনো অভিপ্রাযও তাঁর নেই। তাঁব বক্তব্য হল, ভাষায ব্যবহাব নিবপেক্ষ কোনো নিয়ম নেই। ভাষাব নিয়মাবলী ব্যবহাবেব ওপব নির্ভবশীল। এই বিষযটি বোঝাতে তিনি ভাষা-ক্রীডা বা ল্যাঙ্গুয়েজ গেম-এব উপমা প্রয়োগ করেছেন। খেলাব এমন কোনো সাধাবণ ধর্ম দেখা যায না, যা প্রতিটি খেলায় উপস্থিত - প্রতিটি খেলাব সঙ্গে অপবাপর খেলাব কিছু সাদৃশ্য দেখি, আবাব কিছু বৈসাদৃশ্য দেখি। খেলা হল সাদৃশ্য এবং সংযোগেব বিস্তীর্ণ জাল, এ ছাড়া আব কিছুই নয়।[১০] হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতে, কোনো একটি খেলাকে অন্য একটি খেলা থেকে পৃথক করতে পাবি অর্থাৎ খেলাটিকে চিনতে পাবি। খেলাব সাধাবণ ধর্ম অবশ্যই আছে কিন্তু সেই সাধাবণ ধর্ম প্রয়োগ থেকে উঠে আসে - এব আধিবিদ্যক কোনো সত্তা নেই। খেলাব নিযমাবলী প্রযোগের মধ্য দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়। খেলাটি পবিবর্তিত হলে নিযমাবলীও পবিবর্তিত হতে পাবে। সেইবকমই ভাষা এবং ভাষাব নিযমাবলী ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। কোনো পবিপ্রেক্ষিতে কোনো শব্দেব প্রয়োগ দেখে তাব অর্থ নির্ধাবণ কবা যেতে পাবে। বেকাব এবং হ্যাকার এই প্রসঙ্গে বলছেন যে ভাষা ব্যবহাবের দিকটিকে নির্দেশ কবে, বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায ভাষাব উদ্ভব হয় না। 'বলা' মানে করা, ভাষা-ব্যবহার মানুষেব জীবনযাপনেব সঙ্গে যুক্ত, ভাষা-ব্যবহারে আমাদের যাপনের প্রেক্ষাপট প্রতিফলিত হয়।[১১]

হ্বিটগেনস্টাইন দেখেছেন ভাষা-ক্রীডা বা ল্যাঙ্গুয়েজ গেম-এব ধাবণাটি যাপনেব প্রেক্ষাপটেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ভাষায নিযমেব গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি দেখলেন কোনো নতুন খেলা উদ্ভাবিত হয, কোনো প্রচলিত খেলা সংশোধিত হয়ে নতুনরূপ পবিগ্রহণ কবে আবাব কখনো প্রচলণের বা ব্যবহারেব অভাবে কিছু খেলা বিলীন হযে যায়। ঠিক একইভাবে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কাবেব সঙ্গে সঙ্গে দেখি কত নতুন শব্দের উদ্ভব হচ্ছে, কিছু হাবিয়ে যাচ্ছে আবার কিছু শব্দ নতুন ব্যঞ্জনা পাচ্ছে। ভাষাব এই পবিবর্তনশীল প্রকৃতি কিন্তু ভাষা বোঝার ব্যাপারে কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি কবছে না। শব্দেব প্রয়োগ পর্যবেক্ষণ কবেই অর্থ অনুধাবণ

কবতে পাবি অর্থাৎ ভাষা এবং ভাষাব্যবহারেব নিয়ম বুঝতে পাবি - এটা পাবি এই কাবণে যে প্রয়োগকে যাপন-প্রেক্ষাপটের নিবিখে বুঝে থাকি।

তাহলে 'পি আই' ২৩ অংশেব এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, হ্বিটগেনস্টাইন-এব মতানুযায়ী ভাষায প্রচলিত নিয়মের কোনো আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা দেওযাটা ঠিক হবে না। প্রয়োগেব মধ্যেই নিয়মেব উদ্ভব। প্রয়োগের ভিত্তিতে প্রয়োগেব নিযম গড়ে ওঠে। কিন্তু এই বক্তব্যকে সমর্থন কবেও ভাষার ঋজুতাকে তিনি নষ্ট হতে দিচ্ছেন না - তিনি দেখছেন ভাষাব স্থায়িত্ব। তিনি বলছেন যাপন-প্রেক্ষাপটেব পবিপ্রেক্ষিতে আমবা ভাষা প্রয়োগ কবি - যাপন-প্রেক্ষাপট এইক্ষেত্রে প্রযোগেব নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। আবাব, দেখা যাচ্ছে প্রযোগেব প্রসঙ্গ টেনে হ্বিটগেনস্টাইন বিশেষ প্রযোগকে বোঝাতে চাইছেন না, প্রয়োগেব আকাব বা প্যাটার্নকে বোঝাতে চাইছেন। তিনি বলছেন, বিভিন্ন প্রযোগেব মধ্যে সাদৃশ্য আছে - প্রযোগেব এই সাদৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেই নিয়মকে বুঝি। এই সাদৃশ্যকে তিনি পরিবারোপম সাদৃশ্য বা 'ফ্যামিলি রিজেমব্লেন্স' বলেছেন।[১২] কোনো একটি পবিবাবেব বিভিন্ন সদস্যর মধ্যে কিছু সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে থাকি ঠিক তেমনিভাবে বিভিন্ন প্রযোগেব মধ্যে সাদৃশ্যকে দেখে নিযমকে বুঝে থাকি। ভাষায ব্যবহৃত নিযমেব প্রকৃতি বোঝাতে তিনি সাইনপোস্ট চার্ট এইজাতীয় উপমা ব্যবহাব করেছেন। এইসব উদাহবণকে নিযমেব উদাহবণ না বলে নিয়মেব প্রযোগ হিসেবে বোঝাই যুক্তিযুক্ত হবে।[১৩] ব্যাক্তি যখন সাইনপোস্টকে অনুসবণ কবে, সে প্রচলিত নিযমকে অনুসবণ করে, সমজাতীয জীবনযাপনে অভ্যস্ত হলে নিয়মেব তাৎপর্য সে বুঝতে পাবে, একই যাপনেব জন্য নিযমেব পবিবর্তন হলে সেই পরিবর্তিত নিয়মও সে অনুসবণ কবতে পাবে।

খেলাব উপমা ব্যবহার কবে হ্বিটগেনস্টাইন ভাষাব অপব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকে আমাদের আকর্ষণ কবতে চেযেছেন - তিনি ব্যক্তিব একক অনুশীলনকে উপেক্ষা কবছেন। তাঁব মতে, ব্যক্তির একক অনুশীলন থাকতে পারে কিন্তু তা যদি গোষ্ঠী যাপনেব দ্বারা স্বীকৃত এবং সমর্থিত না হয় তাহলে আমাদেব বিচার্য বিষয় হতে পাবে না। ভাষা-ব্যবহাব কোনো এক ইতিহাসেব প্রেক্ষাপটে ঘটে সেজন্য যখন তিনি যাপনেব পবিপ্রেক্ষিতে অর্থ নির্ধারণেব কথা বলছেন তিনি কখনোই ব্যক্তির যাপনেব কথা বলছেন না, সমগ্র যাপনের পবিপ্রেক্ষিতে একক যাপনকে বোঝাতে চাইছেন। গোষ্ঠী যাপনেব মানদণ্ডে ব্যক্তিব প্রয়োগকে বুঝতে হবে অর্থাৎ স্বীকৃত মানদণ্ডেব পবিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিব নিজস্ব যাপন স্থির হবে। এখানে কেউ বলতে পাবেন, ব্যক্তি ত এককভাবে কোনো মানদণ্ড উদ্ভাবন এবং অনুসরণ কবতে পাবে। সেক্ষেত্রে হ্বিটগেনস্টাইন-এর উত্তর হল : এই মানদণ্ড ব্যক্তির একক প্রয়োগেব অনুষঙ্গেই তাৎপর্যপূর্ণ থাকবে, আমাদেব বোধগম্য হবে না। ব্যক্তিব এককযাপন গোষ্ঠীযাপনের দ্বাবা অনুমোদিত হলেই তা অপবেব বোধগম্য হবে।

[তিন]

যাপন-প্রেক্ষাপটের বোঝাপড়া অভিমতের বা ওপিনিয়নের বোঝাপড়া নয়

'সুতরাং তুমি কি বলছ যে মানুষ নিজেদেব মধ্যে চুক্তি বা সম্মতিব মাধ্যমে সত্য কী মিথ্যা কী তা স্থিব কবে? মানুষেব উচ্চাবণ সত্য বা মিথ্যা হয় এবং ভাষা ব্যবহাবে তার থাকে সহমত এই সহমত অভিমত বা ওপিনিয়নেব ('পি আই' সহমত নয় ফর্ম অব লাইফেব সহমত। §২৪১)।[১৪]

'ইনভেস্টিগেশনস্-এর ২৪১ অংশে হ্বিটগেনস্টাইন যাপন-প্রেক্ষাপটেব প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য কবেছেন। তিনি বলছেন, ভাষা-ব্যবহাবে আমরা যে সহমত পোষণ কবি তাকে শুধুমাত্র অভিমতেব বোঝাপডা বা এগ্রিমেন্ট ইন্ ওপিনিযন্ বলা যাবে না। এই বোঝাপডাকে ববং ফর্ম অব লাইফ-এর বোঝাপডা বলা যেতে পাবে। অভিমত বা ওপিনিয়ন্ বলতে সাধাবণভাবে মনে করা হয় সাময়িকভাবে গৃহীত সিদ্ধান্ত। কখনো আবার অভিমত বলতে বুঝি এমন কিছু যা ব্যক্তিসাপেক্ষ বিশ্বাসেব চেযে সবল এবং প্রমাণেব চেয়ে দুর্বলতব। আবাব অভিমতেব সঙ্গে সম্ভাব্যতাব সম্ভাবনা জড়িযে থাকে, কখনো আবাব অভিমত দ্রুত পবিবর্তিত হয়ে থাকে এবং বিপরীত বিশ্বাস একই সঙ্গে সমর্থিত এবং গৃহীত হয। ভাষা-ব্যবহাবে ঐক্যমত্যেব প্রসঙ্গ অনিবার্য্যভাবে এসে পডে - এই ঐক্যমত্যেব প্রশ্নে 'চুক্তি'ব ধারণা জডিত। ভাষা-ব্যবহাবে সাদৃশ্যকে বোঝাতে চুক্তিব প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন অনেক কথাই বলেছেন।[১৫] চুক্তি বলতে সাধাবণতঃ আমবা বুঝি কৃত্রিমভাবে সম্পাদিত পাবস্পবিক বোঝাপডা। এখন, চুক্তি বলতে যদি শুধুমাত্র কৃত্রিমভাবে সম্পাদিত বহিবঙ্গেব চুক্তি বোঝায তাহলে অর্থ হবে পরিবর্তনশীল - ভাষা-ব্যবহাবেব কোনো স্থিবতা থাকবে না। একজন এক অর্থে শব্দ প্রযোগ করলে অন্যজন তাব অন্য ব্যাখ্যা দিতে পাববে - আবাব একই ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থে একই শব্দ প্রযোগ কবতে পাববে। যাব পবিণাম হল আমবা অপবকে বুঝতে পাবব না। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন এইরকম সম্ভাবনা আদৌ সমর্থন কবেন নি। ভাষা ব্যবহাবে নিয়মেব গুরুত্ব তিনি স্বীকার কবে নিয়েছেন - নিয়মেব অপবিবর্তনশীলতা বা ঋজুতা স্বীকাব কবে ব্যবহাবেব স্থাযিত্বকেও তিনি মেনে নিযেছেন এবং তাবই প্রতিফলন ঘটেছে আলোচ্য অংশে। চুক্তিব কথা যখন তিনি বলছেন কখনোই তিনি কৃত্রিমভাবে সম্পাদিত কোনো চুক্তিব কথা বলছেন না। মানুষেব খেযালখুশী অনুযাযী অর্থ পবিবর্তিত হয় না - একের ভাষা অপরে বুঝি এবং একই অর্থে শব্দ প্রযোগ কবে থাকি। এই যে আমবা ভাষা-ব্যবহারে সহমত পোষণ করি, একে অপবকে বুঝি - এব কাবণ হল আমবা একই যাপন-প্রেক্ষাপটে অবস্থান কবি। এই যাপন-প্রেক্ষাপটকে বাদ দিযে বা অতিক্রম কবে কোনো ব্যবহারকে কল্পনা কবা যায় না - যাপন-প্রেক্ষাপটেব মধ্যে থেকেই ভাষা-ব্যবহাব করি। সেই কারণে ভাষা-ব্যবহারেব ঐকমত্যকে বহিবঙ্গেব চুক্তি বলা যাবে না।

আমদের ভাষা-ব্যবহাবকে যাপন-প্রেক্ষাপটের বোঝাপডা হিসেবে বর্ণনা কবে দর্শনেব ইতিহাসে হ্বিটগেনস্টাইন সম্পূর্ণ এক নতুন সম্ভাবনা সংযোজন কবলেন। এতদিন পর্যন্ত দার্শনিকেরা দ্বিকোটিক লজিক বা টু-ভ্যালিউড্ লজিকেব মাপকাঠিতে ব্যবহারকে যথার্থ বা অযথার্থ বলে মনে করতেন। হ্বিটগেনস্টাইন ভাষা-ব্যবহারে একই সঙ্গে পবিবর্তনশীলতা এবং স্থায়িত্ব উভয়কেই স্বীকাব করলেন। নিয়মমাত্রই আবশ্যিক এবং যা কিছু পরিবর্তনশীল তা আপতিক। আবশ্যিক ও আপতিক এই দুই বিপরীত কোটির মধ্যবর্তী যে আব একটা কোটি থাকতে পারে সে বিষয়ে আমাদের সচেতন কবেছেন হ্বিটগেনস্টাইন। তাই 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর ২৪১ অংশে তিনি বলতে চাইছেন যে দ্বিকোটিক লজিকেব দুটি বিকল্প ছাডাও তৃতীয় একটি বিকল্প আছে। [আবশ্যিকতা সেখানে একদিকে ইতিহাসেব সঙ্গে, যাপনেব সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল নয়, এক প্রকার স্থায়িত্ব আছে। কিন্তু আত্যন্তিকভাবে আবশ্যিক বা চিবকালীন নয়] হ্বিটগেনস্টাইন যেন বলতে চাইছেন যে চূডান্ত আপেক্ষিকতা এবং আত্যন্তিক আবশ্যিকতাব মাঝামাঝি জাযগায় বেখে আবশ্যিকতাকে বুঝতে হবে। সমগ্র যাপনে আমবা নিয়ম অনুসবণ করি, কোনো আদর্শ মেনে চলি, কোনো মূল্যবোধে বিশ্বাস কবি কাবণ একই যাপনপ্রেক্ষাপটে আমবা অবস্থিত।

[চাব]

যাপন-প্রেক্ষাপট এবং প্রত্যাশা

যাবা মুখব, 'প্রত্যাশা' কি শুধু তারাই কবতে সক্ষম? শুধুমাত্র যাবা ভাষা-ব্যবহাবেব দক্ষতা অর্জন কবেছে। অর্থাৎ কিনা প্রত্যাশা আমাদেব সমগ্র জটিল যাপন প্রেক্ষাপটেব প্রত্যংশ ('পি. আই' পৃষ্ঠা ১৭৮)।[১৮]

'ইন্ভেস্টিগেশন্স'-এর ১৭৪ পৃষ্ঠায় তিনি মন্তব্য কবেছেন যে কোনো ভাষায় কথা বলতে পাবলেই সেই ভাষা বোঝা হয় না। বলতে পাবা এবং বুঝতে পাবা অভিন্ন নয়, ভাষা ব্যবহাবে দক্ষতা অর্জন করলেই কেবলমাত্র অর্থ বোঝা যায় এবং দক্ষতা অর্জন কবা যায় তখনই যদি যাপন-প্রেক্ষাপটকে জানা থাকে। তাঁর মতে, যাপন-প্রেক্ষাপটের পবিপ্রেক্ষিত ছাডা প্রত্যাশাও করা যায় না। আমাদের আশা-প্রত্যাশা, আবেগ-অনুভূতি, দুঃখ-বেদনা - সবই কোনো এক যাপন-প্রেক্ষাপটে ঘটে - কোনো ইচ্ছামূলক ক্রিযা যাপনেব পবিপ্রেক্ষিত ছাড়া সম্ভব নয়। সাধাবণতঃ মনে কবা হয়, প্রত্যাশাব ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীন - বাহ্যিক কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে না। ব্যক্তি যা খুশী তাই ইচ্ছা কবতে পারে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য হল, শুধু ভাষার নিয়মাবলী বা সিন্ট্যাক্স জানলেই ভাষায় দক্ষতা অর্জন কবা যায় না এবং ভাষায় দক্ষতা অর্জন করলেই কেবলমাত্র প্রত্যাশা কবা যায। কাবণ,

হিটগেনস্টাইন-এর মতানুযায়ী, ব্যক্তিই যদি ভাষা ব্যবহারের নিয়ামক এবং নির্ধারক হয় তাহলে সেই ভাষার অর্থ ব্যক্তির পরিপ্রেক্ষিতে সীমাবদ্ধ থাকবে - অপরের বোধগম্য হবে না। অর্থাৎ অর্থপূর্ণ প্রত্যাশা করতে হলে কোনো সামাজিক পরিমণ্ডলের মধ্যে করতে হবে। তিনি দেখেছেন, আমাদের সব চিন্তাভাবনা যাপন-প্রেক্ষাপটের অন্তর্গত সেজন্য একে অতিক্রম করে বা বাদ দিয়ে স্বকপোলকল্পিত কোনো ইচ্ছা বা প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়।

[পাঁচ]

যাপন-প্রেক্ষাপটকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা যায় না অথচ সব যুক্তি যাপন প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠিত

এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে তুমি কিছু কাগজ এবং কালি দিয়ে গণনা করতে পার না, যদি তারা অদ্ভুত পরিবর্তনশীল বিষয় হও তাহলেও সেই পরিবর্তন একমাত্র স্মৃতি এবং গণনার আনুষঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে তুলনা সাপেক্ষ। এ বিষয়গুলি যাচাই করা যেত কীভাবে? যা গ্রহন করতে হচ্ছে, যা প্রদত্ত তা - কেউ বলতে পারে - ফর্ম অব লাইফ ('পি আই, পৃষ্ঠা ২২৬)।[১৭]

'ইনভেস্টিগেশনস'-এর দ্বিতীয় অংশের শেষের দিকে গণিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উক্ত মন্তব্য করেছেন। গণিতের সত্যতা অভ্রান্ত। প্রশ্ন হল, গণিতের এই নিশ্চয়তা, অভ্রান্ততার, উৎস কোথায়? এই নিশ্চয়তা নিঃসন্দেহে যেখানে লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে সেখানে কালি এবং কাগজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। গণনার ফলাফল সম্বন্ধে গণিতবিদ্‌দের মতান্তর হয় না, কেন গণিতবিদের মতান্তর হয় না সেই আলোচনায় হিটগেনস্টাইন প্রবৃত্ত হতে চান না। তিনি শুধু দেখছেন তাঁরা বিবাদ করেন না। গাণিতিক নিশ্চয়তার কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা তিনি খুঁজছেন না, বর্ণনা করছেন মাত্র। হিটগেনস্টাইন বলতে চাইছেন গণিতবিদ্‌রা গণিতের নিশ্চয়তা নিয়ে কলহ করেন না, কারণ তাঁদের গণনাপ্রক্রিয়া চলে একই যাপন-প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকে। হিটগেনস্টাইন মনে করেন যুক্তিসর্বস্ব ব্যাখ্যার চমৎকারিত্ব অবশ্যই আছে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে একই বিষয়ের একাধিক যৌক্তিক ব্যাখ্যা পেশ করা যেতে পারে - একাধিক সম্ভাব্য যৌক্তিক ব্যাখ্যার মধ্যে কোন ব্যাখ্যাটি সঠিক সে বিষয়ে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। হিটগেনস্টাইন সেই কারণে গাণিতিক নিশ্চয়তার স্বপক্ষে কোনো আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা অন্বেষন করছেন না - তিনি দেখেছেন, গণিতের যে নিশ্চয়তা দেখি তা আসলে যাপন-প্রেক্ষাপটের নিশ্চয়তা। এখানে নিশ্চয়তা বলতে তিনি মনন প্রসূত কোনো ধারণাকে বোঝেন নি, নিশ্চয়তা বলতে তিনি ব্যবহারের নিশ্চয়তাকে বুঝেছেন। আমরা জন্মসূত্রে কোনো না কোনো যাপন-প্রেক্ষাপটের অন্তর্গত - কোনো একভাবে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকি এবং গাণিতিক গণনার ফল দোষ থাকি। গাণিতিক বচনের সত্যতা কোনো যাপন-প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকে

পর্যবেক্ষণ করা হয়। একই যাপন-প্রেক্ষাপটের মধ্যে থেকে গণিতের পর্যালোচনা হওয়ার ফলে আর মতানৈক্যের সুযোগ থাকে না এবং সেই যাপন-প্রেক্ষাপটে কোনো বচনকে স্বতঃপ্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করলে অভিজ্ঞতানির্ভর প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা থাকে না এবং বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ায় বচনটির সত্যতা বোঝা যায়। কিন্তু এর দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি না যে গাণিতিক বচন অভিজ্ঞতার সঙ্গে অসম্পর্কিত। যাপনের পরিপ্রেক্ষিতে গাণিতিক বচনের সত্যতা বোঝা যায়।

এতক্ষণ পর্যন্ত 'ইনভিস্টিগেশনস' গ্রন্থে যাপন-প্রেক্ষাপটের প্রয়োগ পর্যালোচনায় দেখা গেল 'পি. আই' ১৯ অংশে হিটগেনস্টাইন যাপন-প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করেছেন - সব চিন্তা-ভাবনা, ক্রিয়া-কর্ম যাপন-প্রেক্ষাপটের অন্তর্গত। এরপর কখনো ভাষা-ক্রীড়া বা ল্যাঙ্গুয়েজ-গেম এর আলোচনা প্রসঙ্গে ('পি আই' § ২৩), কখনো অভিমত বা ওপিনিয়নের সঙ্গে যাপন-প্রেক্ষাপটের তফাৎ বোঝাতে ('পি আই' § ২৪১) কখনো আবার মানসিক প্রক্রিয়া প্রত্যাশার সঙ্গে যাপন-প্রেক্ষাপটের সম্পর্ক বোঝাতে যাপন প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন। বিভিন্ন প্রসঙ্গে যাপন-প্রেক্ষাপটের প্রয়োগের মধ্যে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন যাপন-প্রেক্ষাপট আমাদের প্রতিটি কর্মপদ্ধতি, প্রতিটি আশা-নিরাশার সঙ্গে যুক্ত, এমনকি গণিতের সঙ্গেও সম্পর্কিত। বিভিন্ন প্রসঙ্গে একই ধারণার প্রয়োগ করে প্রতিটি ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ধারণার ইঙ্গিত তিনি দেন নি - যাপন-প্রেক্ষাপটের ব্যাপকতা এবং প্রভাবকে বোঝাতে চেয়েছেন মাত্র। যাপন-প্রেক্ষাপট এবং ব্যক্তিগত অভিমত বা ওপিনিয়নের পার্থক্য দেখিয়ে তিনি ভাষায় যাপন-প্রেক্ষাপটের স্থায়িত্ব এবং সার্বিকতাকে বুঝিয়েছেন। আবার গণিতের প্রসঙ্গ আলোচনায় তিনি যাপন-প্রেক্ষাপটের প্রভাবকে দেখানোর চেষ্টা করেছেন - যুক্তি দিয়ে যাপন-প্রেক্ষাপটকে প্রমাণ করা যায় না অথচ সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া যাপন প্রেক্ষাপটের মধ্যে বিধৃত।

'ইনভেস্টিগেশনস' ছাড়া হিটগেনস্টাইন-এর পরবর্তী পর্যায়ের কিছু রচনায় যাপন-প্রেক্ষাপটের উল্লেখ রয়েছে। আমি 'ইনভেস্টিগেশনস'-এর সেই অতিরিক্ত প্রয়োগগুলি উল্লেখ করে দেখাব ঐ অংশগুলিতে যাপন-প্রেক্ষাপট বিষয়ে তার বক্তব্য কী।

[ছয়]

যাপন প্রেক্ষাপট এবং নিশ্চয়তা

এখন এই নিশ্চয়তাকে আমি তাড়াতাড়ি করার ফলের সঙ্গে বা বহিরঙ্গের সিদ্ধান্তের সঙ্গে তুলনা না করে সমগ্র যাপন প্রেক্ষাপটের নিশ্চয়তা বলতে চাই ('অন্ সারটেন্টি ৩৫৮)।' এর দ্বারা আমি এটাই বোঝাতে চাই যেন তা [যাপন-প্রেক্ষাপট] প্রমাণ বা অপ্রমাণের অতীত, যেন জীবন্ত কিছু। ('অন্ সারটেন্টি' ৩৫৯)।[১৯]

'অন সারটেন্টি' গ্রন্থের ৩৫৮ এবং ৩৫৯ অংশে ভাষায় নিশ্চয়তার প্রকৃতি বোঝাতে ফর্ম অব লাইফ বা যাপন-প্রেক্ষাপটের ধারণার কথা বলেছেন। দর্শনের অন্যতম আলোচ্য

বিষয় হল জ্ঞানতত্ত্ব বা এপিস্টিমোলজি। ভিটগেনস্টাইন জ্ঞানতত্ত্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন পুংখানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সমগ্র 'অন সাবেটেন্‌টি' গ্রন্থে তাঁর লক্ষ্য আমরা কীভাবে নিশ্চযতা পাই তা বিশ্লেষণ করে দেখানো। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিযেছেন সংশয়বাদকে খণ্ডন করে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান কী করে আমবা পেয়ে থাকি। আমাদের নিশ্চযাত্মক জ্ঞানেব ভিত্তি কী? লৌকিক ব্যবহাব পর্যবেক্ষণ কবে তিনি দেখিযেছেন সংশয় সবসময কোনো না কোনো অনুষঙ্গে হয, অনুষঙ্গেব উল্লেখ ছাডা সংশয় অর্থহীন। কোনো অনুষঙ্গে সংশয কবাব অর্থ নিশ্চযতাকে ধবে নিযে সংশয় কবা এবং অনুষঙ্গ বুঝলেই সংশয়ের নিবসন হতে পাবে।

অভিজ্ঞতায দেখা যায়, জগতেব অস্তিত্বে সাধাবণত কেউ সংশয কবেন না - সংশয দেখা দেয় কোনো বিশেষ প্রযোগকে কেন্দ্র কবে। কোনো পবিস্থিতিতে হাতকে 'হাত' বলা যাবে কিনা - এ সংশয় যখন দেখা দেয, আমি জানি 'হাত' বলতে কী বোঝায়। শুধুমাত্র বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই পদার্থকে 'হাত' বলা যাবে কিনা এই সংশয় দেখা দিলে যদি বাস্তবে হাত বলেই কিছু না থাকে তাহলে সংশয সম্পূর্ণ অর্থহীন হযে যায।

ভাষাব দিকে তাকালে দেখি যে ইন্দ্রিযানুভবে গৃহীত বাক্য (এম্‌পিবিক্যাল প্রপজিশন্‌) আমাদেব জ্ঞানভান্ডাবকে সমৃদ্ধ কবে। বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতেব চিত্র জন্ম থেকেই জানি না - অসংখ্য প্রয়োগের মধ্যে দিযে পেযে থাকি। ইতিহাসেব কোনো এক প্রেক্ষাপটে প্রতিটি প্রযোগ বিধৃত। এই প্রেক্ষাপটকে স্বীকাব কবে না নিলে কোনো প্রযোগই সম্ভব নয। এখানে ইতিহাসেব প্রেক্ষাপট বলতে যাপনেব প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। এই যে যাপনেব প্রেক্ষাপটেব কথা বলা হচ্ছে তা কোনো আধিবিদ্যক যুক্তি নির্ভব নয - এব অস্তিত্ব কোনো প্রমাণেব অপেক্ষা বাখে না, এব অস্তিত্ব আমাদেব কাছে প্রশ্নাতীত সত্য, একে স্বীকাব করেই বিভিন্ন প্রয়োগ কবে থাকি। যাপনেব প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ কবি বলে ব্যবহাব সম্পর্কে নিশ্চযতা পাই সুতবাং ইতিহাসেব প্রেক্ষাপট ব্যবহাবেব ভিত্তি হিসেবে কাজ কবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রচলিত ফাউন্ডেশন-এব ধাবণাকে বর্জন কবেও তিনি ইতিহাসেব প্রেক্ষাপট বা ফর্ম অব লাইফকে ফাউন্ডেশনেব মর্য্যাদা দিলেন। ইতিহাসেব প্রেক্ষাপট প্রচলিত অর্থে ফাউন্ডেশন বলতে যা বোঝায তাব মতো না হলেও এক জাতীয ভিত বা ফাউন্ডেশন। যাপন-প্রেক্ষাপট যে আছে তা প্রমাণ কবাব কোনো প্রযোজন নেই, যাপন-প্রেক্ষাপট সব প্রমাণেব আধাব আব সেইজন্য সব প্রমাণেব উর্ধ্বে।

[সাত]

যাপনের প্রেক্ষাপট এবং ব্যাখ্যা

কিন্তু কীভাবে শিক্ষক ছাত্রেব কাছে নিযমব্যাখ্যা কবেন, (কেন না, তাঁকে তো নির্দিষ্ট একটা ব্যাখ্যা দিতেই হবে) - নিঃসন্দেহে, তিনি কথা ও অনুশীলনেব মাধ্যমেই তা দেবেন এবং ছাত্র যদি তাতে সঠিক সাডা দেয বুঝতে হবে যে সে নিয়মটিকে অনুধাবণ কবেছে।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এই বিশেষ সাড়াটি যেন একটি বিশেষ ফর্ম-অব-লাইফ ও ভাষায় বিধৃত থাকে।

(মুখ ছাড়া যেমন মুখের অভিব্যক্তি হয় না) অনুধাবনও প্রেক্ষাপট ব্যতীত হয় না। (চিন্তা প্রবাহের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক)। ('আর এফ এম' ৭-৪৭)[২০] নিয়ম বা রুল শেখার প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন উক্ত মন্তব্যটি করেছেন। শিক্ষক যখন ছাত্রকে কোনো বিষয় শেখান তিনি অবশ্যই বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন - কিন্তু এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে তিনি কোনো সংজ্ঞা দিচ্ছেন না। ব্যাখ্যা দেওয়া মানে সংজ্ঞা দেওয়া নয়। অর্থাৎ ব্যাখ্যার মাধ্যমে শিক্ষক আবশ্যিক এবং পর্যাপ্ত শর্ত নির্ধারণ করছেন না। আবার ছাত্র যখন কোনো শব্দের বা বাক্যের অর্থ বোঝে তখন ছাত্রের বোঝা বা আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং ব্যাপারটিকে মানসিক ক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না, ছাত্রের প্রয়োগের মধ্যে তার 'বোঝা' ব্যাপারটি প্রতিফলিত হবে। তবে এখানে অবশ্যই মনে রাখতে হবে আচরণবাদীদের মত তিনি মানসিক ক্রিয়াকে দৈহিক প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করছেন না। কারণ আচরণবাদীরা যখন মানসিক ক্রিয়াকে দৈহিক ক্রিয়ায় পর্যবসিত করতে চাইছেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে আবশ্যিক এবং পর্যাপ্ত শর্ত দেবার চেষ্টা করেছেন।[২১]

দর্শন বলতে হ্বিটগেনস্টাইন বিমূর্ত মননক্রিয়া বোঝেন নি। পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ ছাড়া শুধুই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার প্রবণতা তিনি বর্জন করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে জগৎকে পরিবর্তন করার দায় দার্শনিকের নয় - দার্শনিক জগৎকে বোঝার বা জানার চেষ্টা করবেন। সেইজন্যই পূর্ব ধারণার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়াতে ছিল তাঁর আপত্তি। যদি পূর্ব ধারণার ভিত্তিতে কোনো ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তাহলে বৈকল্পিক ব্যাখ্যা দেবার অবকাশ থাকবে এবং কোন্ ব্যাখ্যাটি সঠিক তা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেবে। পরিণামে সমস্যার সমাধান না হয়ে সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়। সেই কারণেই মনে হয় হ্বিটগেনস্টাইন পর্যাপ্ত এবং আবশ্যিক শর্ত অন্বেষণের চেষ্টা না করে লৌকিক ব্যবহার দেখে অর্থ বোঝার চেষ্টা করেছেন।

'অন সার্টেনিটি' এবং 'রিমার্কস অন দ্য ফাউণ্ডেশন অব ম্যাথ্‌ম্যাটিক্‌স' - এই দুটি গ্রন্থ ছাড়া 'রিমার্কস অন দ্য ফিলজফি অব সাইকলজি' গ্রন্থেও যাপন প্রেক্ষাপটের উল্লেখ করেছেন। যদিও সরাসরি এই ধারণার উল্লেখ তিনি সেখানে করেন নি তবুও তাঁর লেখা পড়লে মনে হয় ঐ অংশে হ্বিটগেনস্টাইন যাপন-প্রেক্ষাপট বা ফর্ম অব লাইফের কথাই বলছেন। তাহলে দেখা যাক্ তিনি কী লিখেছেন।

[আট]

যাপন-প্রেক্ষাপট হল প্রমাণাতীত

যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না, সঠিকভাবে বললে যাকে ব্যাখ্যা করা যায় না, তা খোঁজার

পরিবর্তে ঘটনা এই যে আমবা কোনো একভাবে কাজ কবি, যেমন, কোনো কাজের শাস্তি দিই, কোনো সম্ভাব্য পরিস্থিতি বা স্টেট অব এ্যাফেয়ার্সকে প্রতিষ্ঠিত করি, ইত্যাদি, আদেশ করি, গণনা কবি, বঙের বর্ণনা দি অন্যের অনুভবে আগ্রহ প্রকাশ কবি। কানো প্রশ্ন ছাডাই গ্রহণ করতে হয়, যা প্রদত্ত তা হল ফ্যাক্টস অব লিভিং ('আব পি. এস' ১-৬৩০)[২২] এই অংশে হুইটগেনস্টাইন-এব বক্তব্য হল আমরা কোনো একভাবে কাজ কবি, কোনো কাজেব শাস্তি দিতে, কোনো ঘটনাকে ব্যাখ্যা কবার জন্য যুক্তি দিয়ে থাকি। অন্যের অনুভবে আগ্রহ প্রকাশ কবি - প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যাব পবিবর্তে যাপনের প্রেক্ষাপটে ব্যবহারকে বর্ণনা করি মাত্র। যাপনেব প্রেক্ষাপট এখানে এক পরিমণ্ডল যাকে হুইটগেনস্টাইন বলছেন প্রদত্ত। আমাদেব সব ক্রিযাকর্মই এব মধ্যে বিধৃত। আলোচ্য অংশে দেখা যাচ্ছে হুইটগেনস্টাইন নতুন কোনো বক্তব্যকে উপস্থাপন কবছেন না, 'ইনভেস্টিগেশনস'-এব দ্বিতীয় ভাগেব ২২৬ পৃষ্ঠাব উদ্ধৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে আমবা আগেই দেখেছি হুইটগেনস্টাইন প্রদত্ত বা গিভন্ বলতে ঠিক কি বুঝেছেন। যাপনেব প্রেক্ষাপটে সববকম প্রযোগ বা ব্যবহাব কবা হয অথচ যাপনেব প্রেক্ষাপটকে ফিবে আবাব প্রমাণ কবাব জন্য যুক্তিব প্রয়োজন নেই। বিস্তাবিত ভাবে জানাব জন্য পাঠককে ঐ অংশটি আব একবাব পড়তে অনুবোধ কবছি।

প্রতিটি অংশ পর্যালোচনায তাহলে দেখা যাচ্ছে হুইটগেনস্টাইন-এব পববর্তী পর্যায়েব দর্শনে যাপনেব প্রেক্ষাপট মুখ্য এবং মৌলিক স্থান অধিকাব কবছে।[২৩] হুইটগেনস্টাইন-এব মতে, আমাদেব সব ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্খা, সমগ্র ভাষা-ব্যবহাব, শিক্ষণ-প্রক্রিয়া, গণনা ক্রিয়া যাপনেব পবিমণ্ডলে ঘটে থাকে। প্রতিটি প্রসঙ্গে আলোচনায তিনি যাপন-প্রেক্ষাপটেব প্রভাবকে বোঝাতে চেযেছেন। কিন্তু লক্ষনীয় বিষয হল, যাপন-প্রেক্ষাপটেব গুরুত্ব স্বীকাব কবে ভাষাব পবিবর্তনশীলতা তাঁব কাছে একমাত্র বিকল্প বলে মনে হয নি। ভাষাব স্থায়িত্বকে তিনি স্বীকাব কবেছেন, যদিও ভাষাব স্থায়িত্ব তাঁব কাছে প্রচলিত দর্শনেব ফাউন্ডেশন্ নয। প্রচলিত দর্শনে যখন ফাউন্ডেশনেব কথা বলা হয, ধবে নেওযা হয যে, ফাউন্ডেশন্ অচল, অনড অপবিবর্তনীয কিছু। ফাউন্ডেশনেব এই ধাবণাকে হুইটগেনস্টাইন বর্জন কবেছেন। 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ মূলতঃ হুইটগেনস্টাইন দেখাতে চেযেছেন আমবা কীভাবে একে অপবকে বুঝি। তিনি দেখেছেন কোনো এক যাপনেব প্রেক্ষাপটে আমবা ভাষা বুঝে থাকি। কোনো সামান্য ধর্মেব উপস্থিতিব জন্য একজন অন্যজনকে বুঝি না, ব্যবহাব দেখে ভাষা বুঝি। ভাষা বোঝার জন্য আবশ্যিক এবং পর্যাপ্ত শর্ত অনুসন্ধানেব অর্থাৎ সামান্য ধর্ম খোঁজাব প্রযোজন নেই এবং এখানেই যাপন-প্রেক্ষাপট বা ফর্ম অব লাইফেব প্রাসঙ্গিকতা। যাপন-প্রেক্ষাপটেব চিবকালীন স্থাযিত্ব নেই ঠিকই। কিন্তু একধবণেব স্থাযিত্ব বযেছে যা আমাদেব ভাষা-ব্যবহাবেব ভি ও হিসেবে কাজ কবে কাবণ, আমাদেব সববকম ব্যবহাব এবই মধ্যে ঘটে এবং ব্যবহাব অর্থপূর্ণ হয। যাপন-প্রেক্ষাপট আমাদেব সমগ্র জীবন-যাপনে বিধৃত হযে থাকার ফলে একে আব নতুন কবে প্রতিষ্ঠা কবাব কোনো অর্থ হয না। যাপন-প্রেক্ষাপট কোনো যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্ত নয ববং যাপনেব প্রেক্ষাপটে আমাদেব সব যুক্তি ক্রিযাশীল।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনাব ওপব নির্ভব কবে যাপন প্রেক্ষাপটেব দুটি বৈশিষ্ট্যেব উল্লেখ কবা যেতে পাবে।[২৪] প্রথমতঃ যাপন-প্রেক্ষাপট হল একধবণের সামাজিক পরিকাঠামো বা কনভেন্‌শন্‌। কোনো এক সামাজিক পবিকাঠামোব মধ্যে কোন্‌ একভাবে শব্দ প্রয়োগ কবা হয় এবং প্রয়োগটিকে স্বাভাবিক এবং যথাযথ বলে মনে কবা হয়। আমাদেব ভাষা-ব্যবহাব খানিকটা চুক্তিব মত, আমরা ঠিক করি কোনো পদেব অর্থ কী হবে বা ভাষার কোন্‌ ব্যবহাব বৈধ এবং কোন্‌ ব্যবহাব অবৈধ হবে। ভাষায চুক্তিব ভূমিকা বোঝানোর জন্য 'কনভেনশন্‌' শব্দটি ব্যবহার কবেছেন। চুক্তিব প্রসঙ্গ উঠলেই কেউ প্রশ্ন কবতে পারেন চুক্তি বলতে হ্বিটগেনস্টাইন ঠিক কী বুঝেছেন? চুক্তি বলতে তিনি কি কৃত্তিম-বোঝাপডাকে বুঝেছেন? আমাব দৃষ্টিতে হ্বিটগেনস্টাইন চুক্তিকে বহিবঙ্গেব বোঝাপডা বা কৃত্রিম-বোঝাপডা হিসেবে দেখেন নি, তাঁব মতে, কোনো এক ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে আমবা ভাষা প্রয়োগ কবি, আমাদেব সব চিন্তা-ভাবনা এবই মধ্যে আবর্তিত হয। এখন ইতিহাস যদি পবিবর্তিত হয, প্রয়োগও পবিবর্তিত হতে পাবে। কিন্তু যথেচ্ছভাবে বিকল্প নির্মানেব বা চুক্তি পত্তনেব সুযোগ আমাদেব নেই। ভাষায় একধরনেব স্থিবতা বা ঋজুতা বয়েছে। তাসত্ত্বেও প্রাকৃতিক নিযমের নিয়ন্ত্রনেব মত যাপনেব প্রেক্ষাপট আমাদেব প্রযোগকে নিয়ন্ত্রণ কবে না। আমবা যে যাপন করে থাকি তাব থেকে ভিন্ন যাপন হতেই পাবে কিন্তু এই পবিবর্তনেব নিয়ামক হল ইতিহাস। যাপন-প্রেক্ষাপটেব এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কবে কোনো কোনো দার্শনিক স্বাভাবিক সামাজিক কাঠামো বা ন্যাচাবাল্‌ কনভেনশন্‌ শব্দটি প্রয়োগ করাব পক্ষপাতী।[২৫]

যাপন-প্রেক্ষাপটের অপব একটি বৈশিষ্ট্য হল এটি আবোহমূলক সামান্যীকবণেব ফল নয। যাপন-প্রেক্ষাপটেব ধারণা শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণেব মাধ্যমে পাওয়া যায না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেব ক্ষেত্রে দেখা যায় বৈজ্ঞানিক কোনো প্রকল্প গঠন কবেন, প্রকল্পেব ব্যাখ্যা খোঁজেন, বিভিন্ন পবীক্ষা-নিবীক্ষাব পব সিদ্ধান্তে উপনীত হন। কিন্তু যাপনেব প্রেক্ষাপট প্রকল্প নয, বা ভাষা-ব্যবহাবেব মধ্যে হ্বিটগেনস্টাইন প্রকল্পেব ব্যাখ্যা খোঁজেনও নি। তিনি দেখানোব চেষ্টা কবেছেন সব বৈজ্ঞানিক প্রকল্প, ব্যাখ্যা, পর্যবেক্ষণ এবং পবীক্ষণ যাপনেব প্রেক্ষাপটে ঘটে। যাপন-প্রেক্ষাপটকে অতিক্রম কবে বা একে বাদ দিযে কোনো ব্যাখ্যাই সম্ভব নয়।[২৬]

এখানে কাবো মনে প্রশ্ন জাগতে পাবে হ্বিটগেনস্টাইন সব প্রযোগকে যাপন-প্রেক্ষাপটেব নিবিখে বুঝতে বলেছেন কিন্তু যাপন-প্রেক্ষাপটেব অস্তিত্বেব স্বপক্ষে কোনো প্রমাণ দিযেছেন কি? যাপনেব প্রেক্ষাপটেব অস্তিত্ব জানব কীভাবে? প্রশ্নেব পব প্রশ্ন প্রমাণেব পব প্রমাণ চওয়াব পালা অনন্তকাল ধবে চলতে পারে না, কোনো একজায়গায় এসে থামতে হয - এই পর্যায়ে পৌঁছে আবাব ব্যাখ্যা খোঁজার পবিবর্তে হ্বিটগেনস্টাইন যাপনকেই দেখছেন। সব প্রযোগই যাপনেব প্রেক্ষাপটে ঘটেছে এই প্রেক্ষাপটেব অস্তিত্বের স্বপক্ষে প্রমাণ চাওযা নিবর্থক।

যাপন-প্রেক্ষাপটের ধাবণা হ্বিটগেনস্টাইন দার্শনিক আলোচনাব এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে পেশ করেছেন। প্রশ্নেব পব প্রশ্নের পর্ব শেষ হলেও দার্শনিক না থেমে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা অন্বেষণ কবেন। হ্বিটগেনস্টাইন দার্শনিকদেব এই ধরণেব প্রচেষ্টাকে সমালোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন নতুন কোনো ব্যাখ্যা দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। ব্যবহারকে দেখা প্রয়োজন। হ্বিটগেনস্টাইন-এর যুক্তি হল কেউ যদি প্রশ্নেব পর প্রশ্ন করতেই থাকেন তিনি নিশ্চিতভাবে অনবস্থাব সম্মুখীন হবেন এবং অনবস্থা থেকে বাঁচার জন্য ব্যাখ্যা দিলে অবশ্যই প্রযোগকে অতিক্রম করে ব্যাখ্যা দেবেন। কিন্তু প্রয়োগকে অতিক্রম করে আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা দেওযার প্রচেষ্টাকে সমর্থন কবা যায় না।

যাপনেব প্রেক্ষাপট প্রয়োগেব মধ্য দিযেই প্রকাশ পায, এব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য পুনরায কোনো প্রমাণেব প্রযোজন নেই। হ্বিটগেনস্টাইন যখন বলছেন ব্যাখ্যা চেয়ো না, বর্ণনা করো - তাঁব উদ্দেশ্য হল এটা দেখানো যে যাপনেব প্রেক্ষাপট প্রমাণসাপেক্ষ, আবিষ্কার সাপেক্ষ বিষয নয়। যখন আমাদেব প্রয়োগটাই দেখা দবকাব আমবা বৃথাই ব্যাখ্যা খুঁজে চলি।[২৭] দার্শনিকের কাজ কোনো আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা দেওয়া নয - তিনি যাপনেব প্রেক্ষাপটটিকে চিনবেন এই মাত্র। যাপনেব প্রেক্ষাপট ভাষাব ভিত্তি - প্রাণস্বৰূপ - একে চিনলে সব সমস্যা নির্মূল হয়ে যায়। সমুদ্রেব গভীবতর দেশে পৌঁছেও কাবো মনে হতে পাবে, আবও গভীবতব তলদেশ বুঝি আছে - খুঁজলেই পাওয়া যাবে। কিন্তু দীর্ঘ পবিক্রমাব পবেও দার্শনিক দেখেন যেখানে ছিলেন সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন। এটা দার্শনিকদেব একধরণের বোগ যে তাঁরা প্রশ্নেব পর প্রশ্ন কবতেই থাকেন, কোথায থামতে হবে জানেন না, জিজ্ঞাসাব নিবসন আর হয় না।[২৮]

মেনে নেওয়া গেল দার্শনিকেবা অযথা আধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় নিজেদেব সন্তুষ্ট কবতে চান এবং এই কাবণে আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা খোঁজেন। কিন্তু যাপনেব প্রেক্ষাপট যদি প্রয়োগই হয় তাহলে হ্বিটগেনস্টাইন কি প্রয়োগ বলতে যুক্তিকে বর্জন করে, বুদ্ধিকে বর্জন কবে, প্রয়োগকে বুঝছেন? যাপনের প্রেক্ষাপট কি তাহলে আপেক্ষিকতাব নামান্তর হচ্ছে না? হ্বিটগেনস্টাইন, প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই যাপনেব প্রেক্ষাপট প্রকাশিত - একথা বলেছেন - একথা বলাব মধ্য দিয়ে বুদ্ধিবর্জিত প্রয়োগকে কখনই বোঝাতে চাননি।[২৯] তিনি দেখেছেন প্রয়োগকে লক্ষ্য কবা ছাড়া আব কোনো গত্যন্তর নেই। বেড-রক স্তরে কোন্ শব্দের অর্থ কী হবে ব্যবহাবই তা নির্ধাবণ কবে। হ্বিটগেনস্টাইন বিশদ বিশ্লেষণ কবে দেখেছেন এই স্তবে ব্যবহাবই অর্থেব নির্ধাবক হয। ব্যাখ্যা আর হয় না বলে ব্যাখ্যা তিনি দিচ্ছেন না। যাপন-প্রেক্ষাপটেব প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দেওয়াব ফলে হ্বিটগেনস্টাইন ভাষাকে আপেক্ষিক কবে তোলেন নি। কমিউন্যাল্ প্র্যাক্টিস্ বা গোষ্ঠীবযাপনের ধাবণাব দ্বারা আপেক্ষিকতার সমস্যাকে এড়িযে গিযেছেন তিনি। তাঁব মতে, গোষ্ঠীযাপনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো ব্যক্তি সরাসবি শব্দেব অর্থ বোঝে - অনুমান প্রক্রিয়াব মাধ্যমে বোঝা ব্যাপারটি সম্পন্ন হয় না। কোনো যাপন-প্রেক্ষাপটে অংশগ্রহণ করে ব্যক্তি প্রয়োগকে আত্মস্থ কবে। এর ফলে ব্যক্তি কোনো শব্দেব অর্থ সবাসবি বুঝতে পাবে।

যাপনের প্রেক্ষাপট আমাদের সমগ্র জীবন-যাপনে বিধৃত হয়ে থাকার ফলে একে আবার যুক্তি দিয়ে প্রমাণের প্রচেষ্টা অর্থহীন।

টীকা

১ দ্রষ্টব্য, 'ট্র্যাকটেটস' ৬.৩১

২. দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' ৯২

৩ দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' ১২৫, ১২৬

৪ দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' ৬৫, ৬৬

৫ দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' ১৯

'ইনভেস্টিগেশনস' এর অনুবাদে যেখানে আক্ষরিক অনুবাদের ফলে বক্তব্যটি দুর্বোধ্য মনে হতে পারে সেখানে ভাবানুবাদ করে বক্তব্যটি প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছি। পাঠকের বক্তব্য অনুধাবণে যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেজন্য ইংরেজী অনুবাদগুলি এই সঙ্গে তুলে দিচ্ছি। It is easy to imagine a language consisting only of orders and reports in battle . And to imagine a language means to imagine a form of life

৬ দ্রষ্টব্য ' " Forms of life" in Wittgenstein's Philosophical Investigations', J F M Hunter in *Essays on Wittgenstein*, (ed) E.D Klemke, University of Illinois Press Urbana, 1971, পৃঃ ২৪৬, এই অংশটির ভাবানুবাদ করা হয়েছে সেই কারণে উদ্ধৃতিটি তুলে দেওয়া হল। '. to imagine a language the words are not enough, one need to imagine something more than this a form of life . a language may be described by describing the circumstances in which it is used and the actions with which the words are interwoven, it seems safe enough to conclude that either these actions and circumstances, or these together with the words with which they are interwoven (and probably the latter) are what a form of life is'

৭. দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' পৃঃ ২২৩

৮. দ্রষ্টব্য, 'Form of Life in Wittgenstein's Later Work', Newton Garver, in *Dialectica*, Vol 44, 1990, পৃঃ ১৮৩, 'I cannot understand the words without seeing how it fits into the life of the speaker, and I cannot do that without knowing what general form of life the speaker has'

৯ দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' § ২৩, 'Here the term "Language-*game*" is meant to bring into prominence the fact that the *speaking* of languge is part of an activity, or of a form of life'

১০. দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' ৬৫, ৬৬

১১ দ্রষ্টব্য, *Scepticism Rules and Language* G.P Baker & P M S Hacker, Basil Blackwell, Oxford, 1985 পৃঃ ১৩৩

১২ দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' ৬৭

১৩ দ্রষ্টব্য, *Wittgenstein*, Anthony Kenny, Penguin Books Ltd., Harmondsworth,

1986, পৃঃ ১৭২, 'A Table or a signpost is perhaps more naturally thought of as an expression of a rule than as a rule itself : but in Wittgenstein's view the way to study the nature of rules is to study expressions of rules'

১৪. দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' § ২৪১ ' "So you are saying that human agreement decides what is true and what is false"? — It is what human beings *say* that is true and false, and they agree in the *language* they use That is not agreement in opinions but in form of life'.

১৫ দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' ২২৪, ২৪১-৪২, ৪২৯, ৫৩৮ এবং ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশের পৃঃ ২২৬-২২৭

১৬. দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস' পৃষ্ঠা ১৭৪ 'Can only those hope who can talk ? Only those who have mastered the use of a language. That is to say the phenomena of hope are modes of this complicated form of life'.

১৭ দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস', পৃঃ ২২৬, It is no doubt true that you could not calculate with certein sorts of paper and ink, if, that is, they were subject to certein queer changes — but still the fact that they changed could in turn only be got from memory and comparison with other means of calculation And how are these tested in their turn ? What has to be accepted, the given, is — so one could say *—forms of life'*.

১৮ দ্রষ্টব্য, 'অন সারটেন্‌টি' ৩৫৮, 'Now I would like to regard this certainty, not as something akin to hastiness or superficiality, but as a form of life'

১৯ দ্রষ্টব্য, 'অন সাবটেন্‌টি' ৩৫৯, 'But that means I want to conceive it as something beyond being justified or unjustified; as it were, as something animal'

২০ দ্রষ্টব্য, 'রিমার্কস অন দ্য ফাউণ্ডেশনস্ অব ম্যাথ্‌ম্যাটিক্স' ৭-৪৭, 'But how then does the teacher interpret the rule for the pupil ? (For he is certainly supposed to give it a particular interpretation) — Well, how but by means of words and training? And if the pupil reacts to it thus and thus; he possesses the rule inwardly

But this is important, namely that this reaction, which is our guarantee of understanding, presupposes as a surrounding particular circumstances, particular forms of life and speech. (As there is no such thing as facial expression without a face)

'This is our important movement of thought '

২১ দ্রষ্টব্য, 'ইনভেস্টিগেশনস ৩০৭, ৩০৮

২২ দ্রষ্টব্য, 'রিমার্কস অন দ্য ফিলজফি অব সাইকলজি' ১-৬৩০, 'Instead of the unanalysable specific, indefinable the fact that we act in such and such ways, e g , punish certain actions, *establish* the state of affairs thus and so, give *orders*, render accounts, describe colours, take an interest in other's feelings. What has to be accepted, the given— it might be said — are facts of living '

২৩ যদিও যাপন-প্রেক্ষাপট বা ফর্ম অব লাইফের প্রয়োগগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে

হ্বিটগেনস্টাইন-এর দর্শনে উক্ত ধারনাটি মুখ্য এবং মৌলিক তাসত্ত্বেও সাম্প্রতিককালে ই এফ টম্পকিন্‌স যাপন-প্রেক্ষাপট সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এক বিরুদ্ধ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি মনে করেন না যে হ্বিটগেনস্টাইন-এব দর্শনে যাপন-প্রেক্ষাপটেব ধাবণা একটি মুখ্য এবং মৌলিক ধাবণা। টম্পকিন্‌স তাঁর প্রবন্ধে অনুবাদের বৈধতাসংক্রান্ত প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁব মতে, হ্বিটগেনস্টাইন-বিশেষজ্ঞরা যাপন-প্রেক্ষাপটের ধাবণাকে মুখ্য এবং মৌলিক প্রতিপন্ন করার জন্য অসংখ্য যুক্তিব অবতারনা করেছেন এবং এই যুক্তি উপস্থাপনাব ব্যাপারে তাঁরা ইংরেজী অনুবাদের ওপব নির্ভরশীল থেকেছেন। টম্পকিনস্‌ দাবি করেছেন ইংরেজী অনুবাদে হ্বিটগেনস্টাইন-এর অভিপ্রায প্রতিফলিত হয় নি। ফর্ম অব লাইফ শব্দটি হ্বিটগেনস্টাইন নিজে চয়ন করেন নি, প্রয়োগও করেন নি - শব্দটি জার্মানি শব্দ 'ল্যাবেন্সফর্মের' ভাষান্তর এবং দুটি কথা একই অর্থ বহন করে না।

টম্পকিন্‌স এর মতে হ্বিটগেনস্টাইন লৌকিক ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, কোনো শব্দকে জানা মানে তাব প্রয়োগকে জানা। দর্শনকে অধিবিদ্যার কবল থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যাপন-প্রেক্ষাপট বা ফর্ম অব লাইফের সমস্যা দেখা দেয যদি ভাষা আব তাব কাজ না করে। ফর্ম বা আকারের ধারণা ভাষাবহির্ভূত কিছুর নির্দেশক - এবং ফর্ম সংক্রান্ত আলোচনা বিস্তাবিতভাবে তিনি 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে করেছেন। ফর্ম এব ধারণা 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ আবোপ করলে আধিবিদ্যক আলোচনাকে স্বীকার করে নিতে হবে যা হ্বিটগেনস্টাইন-এব আদৌ অভিপ্রেত নয়।

টম্পকিন্‌সের ব্যাখ্যা যদি সঠিক হয় তাহলে আমাদের ফর্ম অব লাইফকে মুখ্য এবং মৌলিক প্রতিপাদনেব প্রচেষ্টা সর্বাংশে নিবর্থক হবে। এবিষয়ে যাঁবাই আমাদেব সংগে সহমত পোষণ কববেন প্রত্যেকের গবেষণাই ব্যর্থ। আমি মনে করি, টম্পকিন্‌সের ব্যাখ্যা এই অর্থে প্রশংসনীয যে তিনি মনে কবিয়ে দিয়েছেন দার্শনিক আলোচনাব মনন যদি অপরীক্ষিত থাকে তাহলে অপরীক্ষিত তথ্যেব ভিত্তিতে দার্শনিক অনুসন্ধান ব্যর্থ হয়ে যেতে পাবে। তাঁব নির্দেশিত পথে কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্ত কবলে সেই সিদ্ধান্ত অবশ্যই জোবালো হবে। কিন্তু টম্পকিন্‌সেব যুক্তি উপস্থাপনেব পদ্ধতিকে সমর্থন কবলেও তাঁব সিদ্ধান্তকে আমবা গ্রহণ কবতে পাবি না। একথা আমি স্বীকাব কবি যে হ্বিটগেনস্টাইন-এব দর্শন জানা/বোঝাব ব্যাপারে আমি মূল জার্মান গ্রন্থ অনুসবণ কবিনি - সম্পূর্ণভাবেই ইংবেজী অনুবাদের ওপব নির্ভবশীল থেকেছি। তাসত্ত্বেও আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলতে পারি গ্রন্থটির অনুবাদক জার্মান এবং ইংবেজী উভয় ভাষায়ই অভিজ্ঞ জি ই এম অ্যানস্‌কম্ব - বেশিবভাগ দার্শনিকই ইংবেজী অনুবাদ অনুসবণ করে হ্বিটগেনস্টাইন-এব দর্শনকে বুঝেছেন। এযাবৎকাল এই অনুবাদ অনুসবণ কবা হয়েছে - এখনও হচ্ছে টম্পকিনস ছাড়া আজ পর্যন্ত কেউই অনুবাদেব বৈধতা সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলেন নি। যদি ভবিষ্যতে বেশিবভাগ দার্শনিক অনুবাদেব বৈধতায সংশয প্রকাশ কবেন তাহলে আমাদেব সিদ্ধান্ত সংশোধনের কথা ভাবব।

টম্পকিন্‌সেব সিদ্ধান্ত গ্রহণ না কবার আব একটা মুখ্য কাবণ হল কোনো দার্শনিকই ফর্মকে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে যেভাবে বুঝেছেন 'ইনভেস্টিগেশনস'-এ সেভাবে বোঝেন নি। এই প্রবন্ধে আমি কখনই 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থের অনুসবণে ফর্ম অব লাইফ বা যাপন-প্রেক্ষাপটকে বোঝাবার চেষ্টা করি নি। টম্পকিন্‌স বোধ হয হ্বিটগেনস্টাইন এব বক্তব্যেব মূল সুবটিই ধবতে পারেন নি। ইনভেস্টিগেশনস' গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন মোটেই দার্শনিক সমস্যা সমাধানেব চেষ্টা করেন নি। ব্যবহার পর্যবেক্ষণ কবে সমস্যাটি নির্মূল বা ডিজলভ্‌ কবার চেষ্টা কবেছেন মাত্র। সুতবাং ফর্ম অব লাইফের ধাবণাকে কেনই বা আধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় ব্যবহার করবেন। এই প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন-এব বক্তব্যকে উল্লেখ করেও আত্মপক্ষ সমর্থন কবা যেতে পাবে, ব্যবহাব দেখে কোনো শব্দের অর্থ নির্ধাবণ করতে হবে। 'ফর্ম অব লাইফ সমগ্র ইনভেস্টিগেশনস-এব পবিপ্রেক্ষিতে বেখে বুঝলে বিভ্রান্ত হবার সম্ভবনা থাকবে না। সেই কাবণে 'ফর্ম অব লাইফ

স্বনির্দেশক কূটাভাস ঃ হ্বিটগেনস্টাইন-এর দৃষ্টিতে

মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়

দার্শনিক জগতে যুক্তিবিদ্যা অধিবিদ্যা, ভাষাদর্শনে অবদানেব জন্য লুডহ্বিগ্ হ্বিটগেনস্টাইন-এব নাম সর্বজনবিদিত। কূটাভাস সম্পর্কে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্যজনকভাবে তাঁব দর্শনেব এই দিকটি অধিকাংশ পাঠক এবং ভাষ্যকাবেব দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অনেকেই তাঁব এই আলোচনা সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা কবে গেছেন। কিন্তু হ্বিট্গেনস্টাইন-এব বচনা মনোযোগ সহকাবে পড়লে দেখা যায় যে বহু শতক ধরে চলে আসা এই দার্শনিক সমস্যাটি এই জার্মান দার্শনিকের দৃষ্টিবহির্ভূত ত ছিল না, ববং তাঁর নানা বচনায় বাবংবার নানাভাবে এই প্রসঙ্গ উঠেছে এবং তিনি তাঁব স্বতন্ত্র উপাযে এই সমস্যাটি সমাধান কবাব চেষ্টাও করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হ্বিটগেনস্টাইন-এব সামগ্রিক দর্শনের ক্ষেত্রে যে বকম পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুটি পর্যাযেব মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিব পার্থক্য লক্ষ্য কবা যায, তেমনি কূটাভাসেব আলোচনার ক্ষেত্রেও এই দুই পর্যায়েব পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্ববর্তী পর্যায়েব আলোচনার জন্য আমবা 'ট্র্যাকটেটস - লজিকো - ফিলসফিকাস' গ্রন্থটি অবলম্বন করব; পববর্তী পর্য্যায়েব আলোচনার জন্য 'লেকচাবস অন দ্য ফাউন্ডেশনস অব ম্যাথেমেটিকস', 'বিমার্কস অন দ্য ফাউন্ডেশনস অব ম্যাথেমেটিকস' এবং 'ফিলসফিক্যাল গ্রামাব' গ্রন্থগুলিব উপব মূলতঃ নির্ভব কবব।

[এক]

কূটাভাস প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন-এর মত আলোচনা করার পূর্বে কূটাভাস কাকে বলে একটু বুঝে নেওয়া যাক। কোনো একটি বচনকে সত্য বা মিথ্যা বলে ধবে নিলে যদি যৌক্তিক নিয়ম যথাযথভাবে অনুসবণ করে তার বিরোধী বচনে উপনীত হওয়া যায, তাকেই কূটাভাস বলে। আমবা জানি 'ক' যদি একটি বচন হয় তাহলে 'ক' হয় সত্য অথবা মিথ্যা হবে। যদি 'ক' বচনটি সত্য বলে ধবে নেওয়া হয়, তাহলে কূটাভাসের ক্ষেত্রে যক্তিবিজ্ঞানেব নিয়ম প্রযোগ কবে আমরা 'ক মিথ্যা' এই বচনে উপনীত হব। অনুরূপভাবে 'ক মিথ্যা' এই বচনটি ধরে নিয়ে কূটাভাসের স্থলে যুক্তিবিজ্ঞানসম্মত নিয়ম প্রয়োগ করে 'ক সত্য' এই বচনে উপনীত হব। অর্থাৎ 'ক' যদি সত্য হয় তবে 'ক' মিথ্যা হবে, আবাব 'ক' যদি মিথ্যা হয় তবে 'ক' সত্য হবে। এক কথায় 'ক' সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই - এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়, এবং এই সিদ্ধান্ত স্ববিরোধী। এ ধরনের স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত দার্শনিকদেব বিশেষভাবে ভাবায়। যুক্তিবিজ্ঞানের উপর আমাদের আস্থা অপাব। ফলে যুক্তিবিজ্ঞানেব নিয়মাবলী মানা সত্ত্বেও স্ববিরোধ উৎপন্ন হলে সেই স্ববিবোধ নিবসন কবা বা ব্যাখ্যা কবা একান্ত প্রযোজন।

কূটাভাস নানা আকারে নানাভাবে দার্শনিক আলোচনায় উপস্থাপিত হয়। এদেব মধ্যে বহুল আলোচিত হল 'মিথ্যাবাদী কূটাভাস' (লায়ার প্যারাডক্স্)। ধরা যাক একজন মিথ্যাবাদীর কথা। মিথ্যাবাদী হওয়ায় সে কখনও সত্য কথা বলতে পারে না। যদি সেই ব্যক্তি কোনো একটি সময়ে বলে যে 'আমি এখন যা বলছি তা সবই মিথ্যা' এবং ঐ সময়ে সে এই কথাটি ছাড়া অন্য কোনো কথা না বলে, তাহলে প্রশ্ন হবে তার এই উক্তিব মর্য্যাদা কী - এই উক্তিটি সত্য না মিথ্যা? যেহেতু ঐ নির্দিষ্ট সময়ে সে ঐ কথাটি ছাড়া অন্য কোনো কথা বলে নি, তাই 'আমি এখন যা বলছি' বলতে তাঁর উচ্চারিত ঐ বচনটিকেই নির্দেশ করা হবে, অন্য কোনো বচন নয়। যেহেতু লোকটি মিথ্যাবাদী তাই তার এই বাক্যটি মিথ্যা হবে অথচ ঐ লোকটি স্বীকারই করছে যে 'আমি এখন যা বলছি তা সবই মিথ্যা'। তার অর্থ হল যে লোকটি মিথ্যা বাক্যকে মিথ্যা হিসেবেই স্বীকার করেছে। ফলে বলতে হয় যে লোকটি এক্ষেত্রে সত্য কথাই বলেছে বা তাব ঐ বচনটি সত্য। এখন যদি লোকটিব ঐ বচনটিকে সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে কী হয় দেখা যাক। একটি বচন তখনই সত্য হয়, যখন অবস্থা যা বাক্যে যদি সেই কথাই বলা হয়। সুতরাং 'আমি এখন যা বলছি তা সবই মিথ্যা' সত্য হবে যদি লোকটি এখন যা বলছে তা সবই মিথ্যা হয় এবং যেহেতু লোকটি একমাত্র এই বাক্যটিই বলেছে ফলে এই বাক্যটিই মিথ্যা হবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে 'আমি এখন যা বলছি তা সবই মিথ্যা' এই বচনটি সত্য এবং মিথ্যা উভয়ই, ফলে এটি কূটাভাসেব স্থল। এই কূটাভাসকে স্বনির্দেশক বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কারণ এখানে বাক্যটি নিজেকে নির্দেশ কবছে বা বাক্যের বক্তব্য বিষয় বাক্যটি নিজেই, অন্য কিছু নয়।

যুক্তিবিজ্ঞানেব ক্ষেত্রেও এই ধবণেব 'স্বনির্দেশক কূটাভাস' নানা আকারে দেখা যায়। যেমন রাসেল শ্রেণী ও তাব সদস্যদেব অবলম্বন করে 'শ্রেণী সংক্রান্ত কূটাভাস' (প্যারাডক্স্ অব ক্লাস) বচনা কবেন। এই কূটাভাসটি বুঝে নেওযা যাক। গণিতে বা যুক্তিবিজ্ঞানে কোনো শ্রেণীকে তাব সদস্য দিয়ে ব্যক্ত করা হয়। যেমন ক = {১,২,৩} - এখানে 'ক' এই শ্রেণীটি একটি বিশেষ শ্রেণী যাব সদস্য হল ক্রমিক সংখ্যার প্রথম তিনটি। শ্রেণীর সদস্য যেমন কোনো ব্যক্তি হতে পাবে, তেমনি আবার অন্য শ্রেণীও হতে পারে। দ্বিতীয় ধরণের শ্রেণী সদস্য বিশিষ্ট শ্রেণীকে কেন্দ্র কবেই বাসেলেব কূটাভাসটি বচিত। ধরা যাক -

ক = {খ, গ, ঘ;}   গ = {২, গ}

খ = {১, ২, ৩}   ঘ = {ক, ঘ}

ক এব সদস্যরা নিজেরা এককেটি শ্রেণী। এই শ্রেণী-সদস্যগুলিকে আবার নিজেদের অন্তর্ভুক্ত সদস্যেব পবিপ্রেক্ষিতে দুটি ভাগে ভাগ করা যায - সেই সমস্ত শ্রেণী যাদের সদস্যেব মধ্যে সেই শ্রেণীটি নিজে বর্তমান, আব সেই সমস্ত শ্রেণী যাদের সদস্য হল অন্য কিছু। প্রথম ধরণেব শ্রেণীকে 'ম' বলে চিহ্নিত কবলাম আর দ্বিতীয় ধরণের শ্রেণী 'ন' ধবা হল। তাহলে ন = { ঘ, গ } এবং ম = { খ, ক }। এখন সমস্যা হল 'ন' শ্রেণীর সদস্য নিয়ে। 'ন'-কে কি 'ন' শ্রেণীব সদস্য বলা যায? 'ন' শ্রেণীব বৈশিষ্ট্য যেভাবে বর্ণনা কবা হযেছে তাতে

দেখা যাচ্ছে যে 'ন' কখনও 'ন' ব সদস্য হতে পারে না। শ্রেণী এবং সদস্যেব জন্য নির্দিষ্ট চিহ্নেব সাহায্যে এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ কবা যেতে পাবে -

$\propto \in ন \leftrightarrow \propto \notin \propto$

যেহেতু '$\propto$' একটি অনির্দিষ্ট সাধাবণ নাম, তাই তার পরিবর্তে 'ন' এই নামটি বসালে ব্যাপারটা দাঁড়ায় -

$ন \in ন \leftrightarrow ন \notin ন$

যা স্ববিবোধী। ফ্রেগের যৌক্তিক তন্ত্রের মধ্যে এই স্ববিরোধিতা রাসেলই সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন এবং তাঁব নামানুসারে এই কূটাভাসটি 'রাসেলীয কূটাভাস' নামে পবিচিত।

এ ধবণের কূটাভাস যে কেবল গণিত বা যুক্তিবিজ্ঞানেব স্থলে দেখা দেয তা নয়, দর্শনেব অন্যান্য শাখায়ও এর দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব। যেমন ১৯০৮ সালে প্রকাশিত রচনায জার্মান চিন্তাবিদ কুর্ট গ্রেলিং শব্দার্থতত্ত্বেব প্রসঙ্গে শব্দ ও তাব অর্থকে কেন্দ্র করে অনুরূপ কূটাভাস প্রদর্শন কবেন।

বিধেযগুলি যদি আমরা বিশ্লেষণ কবি তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে কিছু বিধেয় আছে যা নিজেব সম্বন্ধে সত্য, যেমন 'বাংলা' বিধেয়টি নিজেব সম্বন্ধে প্রযোজ্য; অনুরূপভাবে 'ছোট', 'বৃহদাকার', ইত্যাদি বিধেয়গুলি অন্যদের সম্বন্ধে যেমন সত্য নিজের সম্বন্ধেও তেমনি সত্য। কিন্তু এছাড়া আরও অনেক বিধেয় আছে যা অন্যেব সম্বন্ধে প্রযোজ্য হলেও নিজের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয - যেমন 'লম্বা' এই বিধেয়টি লম্বা নয়, বা 'জার্মান' এই বিধেয়টি জার্মান ভাষাব নয, ইত্যাদি। এইভাবে প্রয়োগের ভিত্তিতে আমরা বিধেয়কে দুটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত কবতে পাবি - সমনির্দেশক (অটোলজিকাল) এবং অসমনির্দেশক (হেটেবলজিকাল)। এখন প্রশ্ন হল 'অসমনির্দেশক' এই বিধেয়টি অসমনির্দেশক কিনা? যদি বলা হয যে এটি অসমনির্দেশক তাহলে তাব অর্থ হয যে 'অসমনির্দেশক' বিধেযটি নিজ ভিন্ন অন্য বস্তুকে বিশেষিত কবে। কিন্তু আত্ম ভিন্ন অন্য বস্তুকে বিশেষিত কবার অর্থই ত অসমনির্দেশক হওয়া। সেক্ষেত্রে অসমনির্দেশক বিধেয়টি সমনির্দেশক হয়ে পডেছে। আবার যদি বলা হয় যে এটি অসমনির্দেশক নয় তাহলেও কিন্তু সমস্যাব সমাধান হয় না। কাবণ অসমনির্দেশক নয় বলাব অর্থ হল সমনির্দেশক হওযা। 'অসমনির্দেশক' বিধেয়টি সমনির্দেশক তখনই হতে পারে যদি সেটি নিজে অসমনির্দেশক হয। সুতবাং 'অসমনির্দেশক' বিধেযক সমনির্দেশক হয়। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে 'অসমনির্দেশক' বিধেয়কে সমনির্দেশক বললেও অসমনির্দেশক হয, আবার অসমনির্দেশক বললে সমনির্দেশক বলতে হয়। ফলে এক্ষেত্রেও আমবা মিথ্যাবাদীব অনুরূপ এক ধবণের আত্মনির্দেশক কূটাভাস দেখতে পাই।

'ট্র্যাকটেটাস' গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টাইন আত্মনির্দেশক কূটাভাসের একটি রূপ নিয়েই আলোচনা কবেছেন যেখানে একটি অপেক্ষক অপর একটি অপেক্ষকের যুক্তি (আরগুমেন্ট) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। যৌক্তিক এই কূটাভাস ছাডা অন্য কোনো শব্দার্থতাত্ত্বিক কূটাভাস তিনি

আলোচনা করেন নি এমন কি এই সমস্ত কূটাভাসের কোনো উল্লেখও তাঁর পূর্ববর্তী পর্য্যায়ে নেই। অথচ পরবর্তী পর্য্যায়েব 'রিমার্কস' বা 'ফিলসফিক্যাল ইনভেস্টিগেশনস' বা 'লেকচারস,' ইত্যাদি রচনায় যৌক্তিক কূটাভাসের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য শব্দার্থতাত্ত্বিক কূটাভাস-ও সমান গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে। এব কারণ এটাই হতে পারে যে 'ট্র্যাকটেটাস্' গ্রন্থে তাঁর মূল বিবেচ্য ছিল আদর্শ ভাষা বা কৃত্রিম ভাষা (আইডিযাল ল্যাঙ্গুয়েজ)। সত্যিই তিনি আদর্শ ভাষা নিযে ব্যস্ত ছিলেন কি না সেই প্রশ্ন এখানে আলোচনা করাব অবকাশ নেই। শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে আদর্শ ভাষা বলতে তিনি প্রাকৃতিক ভাষার (ন্যাচারাল ল্যাঙগুয়েজ) প্রকৃত স্বরূপ (এসেন্সিয়াল ফর্ম) বোঝাতে চেয়েছেন, যেখানে কোনো প্রতীকেব ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি - একটি প্রতীকের একটি নির্দিষ্ট প্রয়োগ স্বীকাব করা হয। কিন্তু 'ফিলজফিক্যাল গ্রামার' বা 'রিমার্কস' বা 'লেকচাবস,' ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁর মূল প্রতিপাদ্য হল সাধারণ দৈনন্দিনের ভাষা (অবডিনারি ল্যাঙগুয়েজ) যেখানে একই প্রতীকের একাধিক ব্যবহার থাকা সম্ভব। আমবা এই সমস্ত ব্যবহার সম্বন্ধে সর্বদা যেহেতু সচেতন থাকতে পাবি না, তাই প্রচলিত ব্যবহারটিকেই এর একমাত্র ব্যবহাব বা প্রয়োগ বলে মনে করি। এই ধরণের ভাষাতাত্ত্বিক কাঠামোতেই শব্দার্থতাত্ত্বিক কূটাভাসগুলি দেখা যায়। তাই পরবর্তী যুগের রচনায় এই কূটাভাসগুলিব আলোচনা বর্তমান, অথচ পূর্ববর্তী পর্যাযের রচনায় নেই।

[দুই]

এই বিভাগে আমবা পূর্ববর্তী পর্যায়েব হ্বিটগেনস্টাইন-এর মতবাদ নিযে আলোচনা করব। প্রাথমিক পর্যায় বা পূর্ববর্তী পর্যায় হ্বিটগেনস্টাইন চিন্তন নিযে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি তাঁব ট্র্যাক্‌টেটস্ গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন যে তিনি চিন্তনের বিস্তৃতি বা চিন্তনের সীমাবদ্ধতা না বলে চিন্তনেব ভাষায় অভিব্যক্তিব সীমাবদ্ধতা নিযে আলোচনা করতে চান।[১] মনে রাখতে হবে তাঁব মতে ভাষায় যা প্রকাশ কবা যায় তা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা যায় আর যা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ কবা যায় না তা করার চেষ্টাও কবা উচিত নয়।

এই প্রাথমিক লক্ষ্যের অংশ হিসেবে স্বাভাবিকভাবে তিনি দার্শনিক বিভ্রান্তির উৎস অনুসন্ধান কবেছেন। তিনি মনে করেন যে একই শব্দেব নানা অর্থে প্রযোগই বিভ্রান্তির অন্যতম হেতু - ভাষায দ্ব্যর্থতাই দার্শনিক সমস্যাব উৎস এবং এই দ্ব্যর্থতা দুভাবে হতে পাবে -

(ক) একই শব্দ প্রয়োগ করা হচ্ছে কিন্তু শব্দগুলিব তাৎপর্য ভিন্ন।

এবং

(খ) শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু ভাষায় তাদের প্রয়োগ একই রকমভাবে হচ্ছে!

প্রথমক্ষেত্রে দ্ব্যর্থতা শব্দটিব ব্যাপারে আর দ্বিতীয ক্ষেত্রে শব্দের প্রয়োগের ব্যাপার। প্রথম প্রকারের দ্ব্যর্থতার উদাহরণ - কী সন্দেশ আনলে? কেউ যদি কোনো মিষ্টির দোকান থেকে ফেবে তখন তাকে এই প্রশ্ন কবলে 'সন্দেশ' এই শব্দেব অর্থ হবে মিষ্টান্ন কিন্তু কোনো

রাজনৈতিক শিবিরে কোনো গুপ্তসংবাদ নিয়ে কোনো চর যদি প্রবেশ করে, তাকে এই একই প্রশ্ন করা হলে তার অর্থ হবে 'সংবাদ'। একই 'সন্দেশ' শব্দ উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও তার তাৎপর্য দুটি স্থানে পৃথক পৃথক হয়ে যাচ্ছে।

১-একটি মৌলিক সংখ্যা

১-এক অলস সংখ্যা

এই বচন দুটিতে কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের দ্ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ এখানে শব্দগুলি ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু ভাষায় তাদের প্রয়োগ অনুরূপভাবে হচ্ছে। 'মৌলিক' পদটি '১' সংখ্যা সম্বন্ধে যেভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে 'অলস' পদটিকেও সেই একই রকমভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। বচন দুটির আকার একইরকম - উভয়ক্ষেত্রে বচনটি উদ্দেশ্য বিধেয় আকারের, উভয়ক্ষেত্রেই বিধেয়, উদ্দেশ্য একটি সংখ্যার সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। আকারগত সাদৃশ্য থাকলেও বচনদুটির তাৎপর্য ভিন্ন - একটি ক্ষেত্রে বচনটি সত্য অপরক্ষেত্রে বচনটি সম্পূর্ণ অর্থহীন। এইভাবে যদি ভাষা বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে যে কোথাও কোথাও সাদৃশ্য শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে কোথাও বা প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতে এবং এই আপাত সাদৃশ্য আমাদের অনেক সময়ই বচনের প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়: ফলে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি এবং নানা দার্শনিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে দার্শনিক সমস্যার মূলে অনেক সময়ই ভাষাতাত্ত্বিক বিভ্রান্তি বর্তমান থাকে।[২]

সমস্যার উৎস যদি ভাষাতাত্ত্বিক বিভ্রান্তি হয় তাহলে সমস্যা সমাধানের উপায় হল এই বিভ্রান্তি দূর করা। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যে ভাষা ব্যবহার করি, দার্শনিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'প্রাকৃতিক ভাষা' (ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ), তা কিন্তু আমাদের এই সমাধানের কাজে সাহায্য করে না। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে কৃত্রিম, প্রতীকী ভাষার (সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ) যেখানে প্রত্যেকটি প্রতীক (সাইন) একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সংকেত (সিম্বল) এবং ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্যবোধক বচনের পৃথক পৃথক আকার সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রতীকী ভাষা যৌক্তিক নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত - প্রচলিত ভাষাগত ব্যাকরণের নিয়মের দ্বারা চালিত নয়।[৩]

এখানে লক্ষণীয় যে যদিও আমাদের ভাষায় প্রতীক ও সংকেত একই জিনিসকে বোঝায় হিটগেনস্টাইন-এর দর্শনে কিন্তু এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা হয়। প্রতীক বলতে সংকেতের ইন্দ্রিয়গম্য বাহ্য আকার (অর্থাৎ যা দেখা যায় বা যা শোনা যায় বা যা স্পর্শ করা যায়) বোঝানো হয়েছে। 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে হিটগেনস্টাইন স্পষ্ট বলেছেন - 'সংকেতের দৃশ্যমান আকার হল প্রতীক'[৬]। 'প্রতীকের অর্থপূর্ণ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যা বোঝা যায় তাই সংকেত'।[২] সুতরাং ভাষায় যদি কোনো প্রতীকের ব্যবহার না থাকে তাহলে বুঝতে হবে ঐ প্রতীকের অনুরূপ বা উপযুক্ত কোনো সংকেত নেই। এক কথায় বলা যায় প্রতীকের অর্থ হল সংকেত। যেকোনো প্রতীক কোনো না কোনো সংকেতের প্রতীক। এই সংকেতগুলি

কিন্তু কখনই ভাষায প্রকাশ কবা যায না - ভাষায় যা প্রকাশিত হয় তা ঐ প্রতীক।[৬] সহজ কথায়, বাক্যেব অর্থ বা বিষয কখনই কোনো ভাষায বলা যাবে না। যা বলা হয তা হল প্রতীক আব এই প্রতীক থেকেই অর্থকে বা সংকেতকে দেখে নিতে হয়। সেই অর্থেই বলা যায় যে বচন তাব অর্থকে দেখিয়ে দেয়।[৭]

প্রতীক ও সংকেতের এই পার্থক্যেব সাহায্যে হুইটগেনস্টাইন বার্ট্রান্ড রাসেল প্রণীত শ্রেণীসংক্রান্ত কূটাভাস সমাধানের চেষ্টা কবেন। এই ধবণের কূটাভাস সমাধান কবাব জন্য বাসেল নিজে একটি নতুন নীতির প্রয়োগ করেন যা 'আবর্ত চক্রক নীতি' (ভিশাস সার্কল প্রিন্সিপল) নামে পবিচিত। এই নীতির সাহায্যে যে কোনো ধবণেব অবৈধ সমগ্র (ইল্লেজিটিমেট টোট্যালিটি) বর্জন কবা সম্ভব। আবর্ত চক্রক নীতিব মূল বক্তব্য - যে প্রতীকেব দ্বারা কোনো সমগ্র প্রকাশ কবা হয, তা কখনই সেই সমগ্রেব অংশ হতে পাবে না। যদি কোনো একটি শ্রেণী এমন হয যে তাব সদস্যকে ঐ সমগ্র শ্রেণীব পবিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হয়, তাহলে সেই শ্রেণীকে কখনই একটি সমগ্র শ্রেণী বলা যাবে না।[৮] ধরা যাক C এমন একটি শ্রেণী, তাব সদস্য A, B ও C এই তিনটি শ্রেণী। অর্থাৎ $C = \{A, B, C\}$ সেক্ষেত্রে C শ্রেণীকে কখনই আমাদেব পক্ষে বোঝা সম্ভব নয। কাবণ, যেকোনো শ্রেণীকেই তার সদস্যেব মাধ্যমে বুঝতে হয়। সে দিক থেকে C শ্রেণীকে বুঝতে হলে তাব সদস্য A, B, C কে আগে বুঝতে হয়। কিন্তু যখনই আমবা এই সদস্যগুলি বুঝতে যাই, তখনই আবাব সমগ্র শ্রেণীব বুদ্ধি আবশ্যক হয়ে পড়ে। ফলে আমবা এক ধবণেব চক্রেব মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ি। এই চক্রকেই বাসেল 'আবর্তচক্র' বলে মনে কবেছেন এবং তাব থেকে নিষ্কৃতি পাবাব উপায হিসেবে তাঁব প্রকারতত্ত্ব (থিওবি অব টাইপ) প্রবর্তন কবেন। যদি আমাদেব আবর্ত চক্রক দোষ (ভিশাস সার্কল ফ্যালাসি) পবিহাব কবতে হয় তাহলে শ্রেণী, শ্রেণীবিশিষ্ট শ্রেণী, শ্রেণীবিশিষ্ট-শ্রেণীবিশিষ্ট শ্রেণী, - ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য কবতে হয। কখনও কখনও এই বিভাগ শ্রেণী বিষয়ক না হয়ে বস্তু ও তাব ধর্ম বিষয়কও হতে পাবে। সেক্ষেত্রে বিভাগটি হবে বস্তু, বস্তুব ধর্ম, বস্তুব ধর্মেব ধর্ম, বস্তুব ধর্মেব ধর্মেব ধর্ম, ইত্যাদি। এই বিভাগীকবণের মূল বক্তব্য হল যে কোনো প্রকাবেব বিশেষ ধর্ম, ঐ প্রকাবেব উপব প্রযোজ্য হবে না, প্রযোজ্য হবে ঐ প্রকাবেব অন্তর্গত শ্রেণীব অন্যান্য প্রকাবেব উপব। যেমন বস্তু ও তাব ধর্ম, অথবা শ্রেণী ও সদস্য সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকাবেব, তাই বস্তু বিষযক কোনো বক্তব্য, তাব ধর্ম বিষয়ক বক্তব্য হতে সম্পূর্ণ পৃথক হতে বাধ্য।

বাসেলেব এই প্রকাবতত্ত্ব দার্শনিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি কবলেও হুইটগেনস্টাইন মনে কবেন যে, যে আকাবে এই মতবাদ ব্যক্ত হযেছে তা যথার্থ নয। - 'এটা বলা যেতে পাবে যে বাসেল অবশ্যই ভুল কবেছেন, কাবণ প্রতীকেব নিযমাবলী বর্ণনা কবাব জন্য তাঁকে প্রতীকেব অর্থ উল্লেখ করতে হয়েছে'।[৯] আমরা আগেই বলেছি যে হুইটগেনস্টাইন মনে কবেন যে প্রতীক কখনই তাব অর্থকে ব্যক্ত করতে পারে না। প্রতীকেব অর্থ প্রতীকেব সাহায্যে প্রদর্শিত হয মাত্র। ব্যক্ত করা ও প্রদর্শন করার মধ্যে এই যে পার্থক্য তা বাসেল-এব মতবাদে

বক্ষিত হয় নি। রাসেল-এর প্রকারতত্ত্বে বলা হয়েছে যে কোনো বচন কখনও নিজের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে পারে না। কিন্তু এই বক্তব্যটি একটি বচনেব দ্বারাই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি বচন বলছে যে কোনো বচন কখনও নিজেব সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে পারে না। বচন নিজেই তার অর্থকে ব্যক্ত করায় বচন ও তার বিষয়েব ভেদ রক্ষিত হচ্ছে না। বচন ও তার বিষয় এতই আলাদা যে কোনো বচন নিজেকে কখনও বিষয় কবতে পারে না। সোজা কথায় আত্মনির্দেশক বচন সম্ভব না হওয়ায় বচন, সেই বচন বিষয়ক বচন, সেই-বচন-বিষয়ক-বচন বিষয়ক বচন, ইত্যাদির মধ্যে ক্রমোচ্চ শ্রেণীবিভাগ করাব কোনো প্রয়োজন হয় না।

একই সিদ্ধান্ত হ্বিটগেনস্টাইন অন্য ভাষায় ব্যক্ত করেন - কোনো বচন কখনই নিজেব সম্বন্ধে কিছু উক্তি করতে পাবে না, কাবণ বচনের প্রতীক (প্রপোজিশন্যাল সাইন) কখনই নিজেব বিষয়ে বক্তব্য রাখতে পারে না। এবং এই বক্তব্যটিই প্রকাবতত্ত্বেব মূল প্রতিপাদ্য।[১০]

আত্মনির্দেশক বচন পরিহার হ্বিটগেনস্টাইন-এর কূটাভাস সংক্রান্ত মতবাদের মুখ্য বিষয়। প্রাসঙ্গিকভাবে আমবা 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থের প্রথম অংশেব কিছু আলোচনাব উল্লেখ কবতে পারি। প্রথম পর্বে তিনি তথ্যবিষযক চিত্র, যৌক্তিক ক্ষেত্রে বর্তমান তথ্য বিষয়ক চিত্র এবং যেসমস্ত চিত্র বাস্তবেব প্রতিকৃতি - ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা কবেছেন। সেক্ষেত্রও তিনি মনে কবেন যে চিত্রও তথ্য, কিন্তু সেটি যৌক্তিক তথ্য। যেকোনো চিত্র বিভিন্ন উপাদানের বিন্যাস, এবং এই বিন্যাসও আকাব। এই আকাবেব সম্ভাবনাকে চিত্রেব প্রতিকৃতিগত আকাব (বিপ্রেজেন্টেশন্যাল ফর্ম অব দ্য পিক্‌চার) বলা যায়। যেকোনো চিত্রই সেই বাস্তব পরিস্থিতিব চিত্র হয, যে বাস্তবেব আকাব ঐ চিত্রে আছে। কিন্তু কোনো চিত্রই, হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন, নিজেব চিত্রিত আকাবকে প্রকাশ কবতে পারে না চিত্রিত আকাব তুলে ধরে মাত্র। চিত্র যেমন তাব আকাবকে প্রকাশ করে না - তার আকাব ঐ চিত্রেব মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে, ঠিক সেইভাবে কোনো বচন কখনই নিজেকে প্রকাশ কবে না - বক্তব্য প্রকাশ কবে মাত্র। বক্তব্য প্রকাশেব মধ্য দিয়ে তাব নিজের আকাব ফুটে ওঠে। অর্থাৎ বচন ও বচনের বক্তব্যবিষয় সর্বদা পৃথক। এই বিষযে হ্বিটগেনস্টাইন বাসেল-এব সংগে সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু রাসেল-এব সংগে তাঁব পার্থক্য এই যে, রাসেল মনে কবেন যে এই পার্থক্য অন্য কোনো বচনেব দ্বাবা প্রকাশ কবা যায়, কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেন যে এই পার্থক্য প্রকাশেব জন্য অন্য কোনো বচন বা ভাষা প্রযোগেব প্রযোজন নেই - এই পার্থক্য বচনেব আকাব থেকেই ফুটে ওঠে। পরবর্তী পর্যায়ে এই কথাই তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন - কোনো বচন কখনই নিজেব অন্তর্ভূক্ত হতে পাবে না। প্রকাবতত্ত্বেব এটাই প্রকৃত তাৎপর্য।[১১]

যুক্তিবিজ্ঞান এবং গণিতের ক্ষেত্রে আত্মনির্দেশক কূটাভাসেব উপস্থিতিই বাসেলকে প্রকারতত্ত্বে উপনীত হতে উদ্বুদ্ধ করে। হ্বিটগেনস্টাইন মনে করেন যে এই সমস্ত সমাধানেব জন্য এই বকমভাবে প্রকারতত্ত্ব স্বীকার কবার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। তিনি অপেক্ষকের উদাহবণ দিয়ে এই সমাধান বর্ণনা করেছেন। একটি অপেক্ষক যে তার নিজেব যুক্তি হতে

পাবে না, তার কারণই হল যে অপেক্ষকের প্রতীকেব মধ্যে ইতিপূর্বেই যুক্তিব আদি রূপটি নিহিত আছে এবং প্রতীক কখনও নিজেকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারে না। ধরা যাক গাণিতিক অপেক্ষক F (fx) তার নিজেরই যুক্তি হিসেবে গণ্য হল। সেক্ষেত্রে যে বচনটি পাই তা হবে F (F (fx))। এখানে অবশ্যই বন্ধনীর বাইরের 'F' এবং বন্ধনীর আভ্যন্তরীণ 'F' সম্পূর্ণ ভিন্নার্থক। কারণ, বাইরেব অপেক্ষক যে 'F' তার আকাব ∅ (fx) এবং আভ্যন্তরীণ অপেক্ষক হিসেবে যে 'F' আছে তার আকার Ψ (∅ (fX))। 'F' এই অক্ষরটিই কেবল উভয় অপেক্ষকের মধ্যে বর্তমান। এবং আমরা একথাও জানি যে কোনো অক্ষর স্বততঃই কোনো কিছুকে বোঝাতে পাবে না।

এই ব্যাপারটি সহজে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আমরা 'F (fX)' এই অপেক্ষকটিকে অন্য ভাবে লিখি (∃∅) [F(∅U). ∅U = FU]। সুতরাং সহজেই রাসেলীয় কূটাভাসের সমাধান সম্ভব।[১১]

হ্বিটগেনস্টাইন-এর এই সমাধানটি ব্যাখ্যা কবা যাক। দেখা যাচ্ছে যে কূটাভাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে হ্বিটগেনস্টাইন অপেক্ষক সংক্রান্ত অপেক্ষকের কথা বলেছেন। তিনি মনে কবেন যে যদি কোনো অপেক্ষক তার নিজের যুক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাহলে তার আকাব হবে F (F (fx))। কিন্তু এই ধরণের ব্যবহার ব্যাপক বিভ্রান্তিব মূল। যেমন মনে হতে পাবে যে যেহেতু একই অক্ষর অপেক্ষক ও যুক্তি উভয়ের জন্য ব্যবহাব করা হয়েছে তাই অপেক্ষক ও যুক্তি এক এবং অভিন্ন। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই অবশ্য ধরা পড়ে যে অপেক্ষক এবং যুক্তি এক আকার বিশিষ্ট নয়। যুক্তিব আকাব হল ∅ (fx) অথচ অপেক্ষকেব আকাব Ψ (∅ (fx))। এই ধবণের বিভ্রান্তি দূব করার জন্য হ্বিটগেনস্টাইন একটি সাধারণ নিয়ম প্রণযন কবেন - একই চিহ্ন একই সময একাধিক বিষযকে ব্যক্ত করতে পাবে না।

কূটাভাস বিষযে হ্বিটগেনস্টাইন-এব সমাধান দুটি নীতির উপব নির্ভবশীল এবং এই নীতি দুটি একই সমাধানের দুটি দিক - (১) বিভিন্ন প্রতীক সংক্রান্ত নিয়ম - আমবা একই প্রতীক দুটি ভিন্ন সংকেতেব জন্য অথবা একই সংকেতের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করতে পাবি না। এই নিয়মটি কূটাভাস সমাধানেব পক্ষে পর্যাপ্ত শর্ত।

সাধারণভাবে যে সমস্ত প্রয়োগ থেকে স্ববিরোধিতা পাওযা যায়, সেগুলিব আকার -

$\varnothing \in \varnothing$; ∅, ∅ - এব একটি সদস্য

অথবা

$\propto (\propto)$; ∝, ∝ এব একটি যুক্তি।

প্রথম নিয়মেব সাহায্যে এই উভয প্রযোগকেই অযথার্থ প্রতিপন্ন কবা যায়। প্রথম দৃষ্টান্তে ∅ কে শ্রেণী ও সদস্য এই দুটির জন্যই ব্যবহার কবা হয়েছে। যেহেতু শ্রেণী ও সদস্য দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের জিনিস, তাই উভযকে বোঝাতে কখনও একই প্রতীক ব্যবহার করা যায় না। অনুরূপভাবে ∝ (∝) এই দৃষ্টান্তে ∝ যুক্তি ও অপেক্ষক উভয়েরই প্রতীক

হিসেবে ব্যবহৃত। কিন্তু যুক্তি ও অপেক্ষক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হওয়ায় একই প্রতীক প্রযোগ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে হ্বিটগেন্স্টাইন-এর প্রথম নিয়মানুযায়ী $\emptyset \in \emptyset$ বা $\emptyset \notin \emptyset$, $\propto(\propto)$ বা $\sim\propto(\propto)$, ইত্যাদি কোনো প্রয়োগই স্বীকাব কবা যায় না।

(২) আত্মনির্দেশ বর্জন সংক্রান্ত নিয়ম - আত্মনির্দেশ বর্জন কবে হ্বিটগেনস্টাইন আসলে দেখাতে চেয়েছেন যে কোনো সংকেতই তার নিজেব যৌক্তিক অপেক্ষক (লজিকাল ফাংশন) বা যৌক্তিক মূল্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে কূটাভাস প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন যা বলেছেন তার থেকে এটা পরিষ্কাব যে F (F (fx)) জাতীয় ব্যবহারের ক্ষেত্রে যুক্তি এবং অপেক্ষকেব মধ্যে স্তরগত পার্থক্য (লেভেল ডিস্টিংশন্) আছে এটা স্বীকাব করতে হয়। অনুরূপ পার্থক্য গুণ ও গুণের আধাব দ্রব্যের মধ্যেও স্বীকার্য্য। যদি তাই হয় তাহলে আত্মনির্দেশ কখনই সম্ভব হবে না। বাসেল-এর মত তিনিও মনে করেন যে কোনো প্রতীক কখনও নিজেব প্রতীক হতে পারে না - কোনো বচন কখনই নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না। এটাই প্রকারতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বাসেল-এব সংগে হ্বিটগেনস্টাইন এই ব্যাপাবে সম্পূর্ণ একমত হলেও বাসেল-এব সংগে তাঁব পার্থক্য এখানেই যে তিনি মনে করেন যে এই স্তবগত পার্থকা 'ব্যক্ত' করার কোনো প্রযোজন নেই, এই পার্থক্য 'প্রদর্শিত' হয় (শোন্)।

ব্যক্ত করা ও প্রদর্শন কবার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয করাই হ্বিটগেনস্টাইন-এব দর্শনেব অভিনবত্ব এবং এই পার্থক্যেব সাহায্যে তিনি কূটাভস সমাধানেব চেষ্টা কবেছেন। এই পার্থক্য দ্বারা বস্তুবিষয়ক ভাসা (অবজেক্ট ল্যাঙ্গুয়েজ) এবং পরাভাষাব (মেটাল্যাঙ্গুযেজ) মধ্যস্থিত পার্থক্য প্রকাশ করা সম্ভব। বস্তুবিষয়ক ভাষার বাক্যগুলি ব্যক্ত কবা যায কিন্তু পবাভাষাব বাক্যগুলি প্রদর্শিত হয়। সুতবাং উপযুক্ত প্রতীক বাবহারেব দ্বাবা কী ব্যক্ত হচ্ছে আর কী প্রদর্শিত হচ্ছে তা বোঝা সম্ভব। অর্থাৎ কূটাভাস সমাধানের জন্য কোনো প্রকাবতত্ত্ব অবলম্বন কবার প্রয়োজন নেই। স্তরভেদ স্বীকাব করতে হয়, কিন্তু সেই স্তরভেদ ভাষাগত (লিঙ্গুযিস্টিক) অথবা বাক্যপ্রকবণ (সিন্ট্যাকটিক্) পর্যাযেব, অর্থগত স্তরে নয়। রাসেল-এর স্তবভেদ অর্থগত স্তরে—এখানেই বাসেল ও হ্বিটগেনস্টাইন-এব মূল প্রভেদ।

[তিন]

পববর্তী পর্য্যায়েব বিশেষ করে তাঁব 'বিমার্কস অন দ্য ফাউন্ডেশন অব ম্যাথেমেটিকস' এবং 'লেকচাবস অন দ্য ফাউন্ডেশন অব ম্যাথেমেটিকস' গ্রন্থদ্বয়ে কূটাভাস বিষয়ক তাঁব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পবিবর্তিত হয়েছে। তিনি নিজেই 'বিমার্কস' গ্রন্থেব একজায়গায় বলেছেন, 'আমাব লক্ষ্য হল বিরুদ্ধতা ও সংগতি সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির পবিবর্তন কবা।' বিরুদ্ধতা সম্পর্কিত এই দৃষ্টিভঙ্গিব পবিবর্তন, তাঁর ভাষাবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গিব পবিবর্তনেব সংগে সম্পৃক্ত। 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে হ্বিটগেনস্টইন কৃত্রিম ভাষা বা আদর্শ ভাষাব পক্ষপাতি। পববর্তী পর্যায়ে এই মত সম্পূর্ণ পরিবর্তন কবে তিনি সাধারণ লৌকিক ভাষাব সমর্থন কবেন। এবং এই

লৌকিক ভাষা তাঁব কাছে এক ধবণেব খেলা। খেলা যেমন নানাভাবে খেলা যায়, তেমনি ভাষাও নানাভাবে ব্যবহাব কবা যেতে পারে। তাই একথা কখনই বলা যায় না যে অর্থ হল একটা নির্দিষ্ট বিষয় যা অনাদিকাল থেকে একইভাবে শব্দেব সংগে যুক্ত। ববং আমরাই প্রয়োগ অনুসারে শব্দে অর্থ আরোপ কবে থাকি। প্রয়োগ বহির্ভূতভাবে কোনো শব্দে কোনো অর্থ আবোপ কবা যায না এবং প্রয়োগ যেহেতু প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তবে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাই সঙ্গে সঙ্গে প্রতীকের অর্থও পরিবর্তিত হয। ফিলসফিক্যাল 'ইনভেষ্টিগেশনস' গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন যে, 'শব্দেব অর্থ হল ভাষায় তার প্রয়োগ'।[১৫] ভাষায় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে শব্দেব অর্থ নিরূপিত হয়।

চিন্তন এবং যুক্তিশাস্ত্র সম্পর্কেও তাঁর অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেযেছে। সাবেকী আকারবাদী (ট্র্যাডিশন্যাল্ ফবম্যাল্ লজিশিযান্) মতানুসারে এটা বিশ্বাস করা হত যে চিন্তন ভাষাব মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয এবং যুক্তিশাস্ত্র হচ্ছে চিন্তনেব আদর্শ নিদর্শন। তাই যেকোনো যুক্তিশাস্ত্রকেই স্বযংসম্পূর্ণ, সঙ্গতিসম্পন্ন ও দৃঢভিত্তিক (সাউন্ড) হওয়া প্রযোজন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁবা এমন এক আদর্শ ভাষাব অনুসন্ধানী ছিলেন যেখানে প্রত্যেকটি শব্দ একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে বোঝাবাব জন্য ব্যবহৃত হবে। এই ধবনেব মত পূর্ববর্তী পর্য্যায়ে 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থেও পাওয়া যায। কিন্তু পববর্তী পর্যাযেব 'ফিলসফিক্যাল গ্রামার' বা 'লেকচাবস' বা 'রিমার্কস', ইত্যাদি গ্রন্থে এই মত আপাতভাবে পবিত্যক্ত হযেছে এবং একধরণের প্রয়োগবাদী (এ্যাপ্লিকেশন্যাল্) মতবাদ গৃহীত হযেছে। যেহেতু অর্থ বিশেষ ধবণেব 'জীবন-গত-আকার' (ফর্ম অব লাইফ) উপব নির্ভবশীল, তাই যা কোনো একটি বিশেষ কাঠামোয অসঙ্গত, বিরুদ্ধ বা কূটাভাস সম্বলিত বলে মনে হয়, অন্য কোনো কাঠামোয় সেটাই অর্থপূর্ণ, সংগতিসম্পন্নরূপে দেখান সম্ভব।

কূটাভাস মাত্রই আমাদেব কাছে বিস্ময়কর বলে বোধ হয়। এই বিস্ময়বোধ কিন্তু আমাদের অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাত। আমরা কখনই একটি শব্দ বা অভিব্যক্তিব সমস্ত প্রয়োগ জানতে পাবি না, বিশেষ কযেকটি প্রয়োগ নিয়েই ব্যাপৃত থাকি। এবং সেই জন্যই এই সমস্ত কূটাভাস বা বাক্‌ছল, ইত্যাদি দেখা যায়। স্পষ্টভাবে বললে বলতে হয যে কূটাভাস আমাদেব ভাষা প্রয়োগেব অসম্পূর্ণ পবিমন্ডল (ইন্‌কমপ্লিট্ সাবাউন্ডিং) ঘিবেই গডে ওঠে। যদি আমবা এই পরিমন্ডলকে সম্পূর্ণ কবে তুলতে পাবি অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রযোগেব উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে পারি তাহলে, যা একসময কূটাভাস সম্বলিত বলে বোধ হযেছিল তাকে আব কূটাভাসী, বিস্ময়জনক বলে বোধ হবে না।[১৬]

এই অসম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থাকাব দরুণ কূটাভাসকে সাধাবণভাবে অপ্রয়োজনীয় নিবর্থক বলে বোধ হয, কারণ এখানে আগে যা বলা হয়েছে তাই আবাব অস্বীকাব কবা হচ্ছে। ফলে কোনোভাবেই আর জ্ঞানের প্রসাব ঘটছে না। প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে হ্বিটগেনস্টাইন দেখানোব চেষ্টা করেছেন যে কূটাভাস সম্পর্কিত এই ধারণা সবসময় ঠিক নয় - অনেক ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধতার কার্যকারিতা থাকে। যেমন, বিরুদ্ধতাকে মনে কবা যেতে

পারে ঈশ্বরের এক নির্দেশ - একভাবে কাজ কবাব নির্দেশ, বিচাব কবাব নয়। আবাব কোনো কোনো বিরুদ্ধতা আমাদেব বিস্ময় উদ্রেক করে এবং আমবা একধরণেব অনিশ্চযতায় ভুগি। এই ধরণেব বিস্ময উদ্রেক করা বা অনিশ্চযতাব বোধ উৎপন্ন কবা, ভাষারূপ ক্রীড়ায় হয়ত বা বিরুদ্ধতার উদ্দেশ্য। তাই বিরুদ্ধতা সর্বদাই উদ্দেশ্যবিবর্জিত একথা বলা যায় কী করে?

এখানে আমবা হ্বিটগেনস্টাইন-এব পদ্ধতিব প্রয়োগ দেখতে পাচ্ছি। অভিব্যক্তিব[৭] অর্থ নির্দ্ধাবণ করাব সময় এটা ধবে নেওয়া কখনোই ঠিক হবে না যে অভিব্যক্তিব কেবলমাত্র একটাই প্রয়োগ আছে অথবা আদৌ কোনো প্রয়োগই নেই। সব সময় অভিব্যক্তির ব্যবহার লক্ষ্য কবতে হবে এবং সেই ব্যবহাব দ্বাবাই অভিব্যক্তিব অর্থ নিরূপণ করতে হবে। বিরুদ্ধতাব ক্ষেত্রেও সেই একই রীতি প্রযোজ্য। 'ক এবং ক নয়' আকাবেব বাক্য দেখলেই পূর্বতসিদ্ধভাবে এটা ধবে নেওয়া ঠিক নয় যে তা অর্থহীন - এই আকাবেব বাক্যকে আমবা যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রযোগ কবি সেই প্রয়োগগুলিও আমাদেব ভালোভাবে লক্ষ্য কবতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে হ্বিটগেনস্টাইন-এর এই মত পববর্তী সময়ে স্ট্রসন তাঁব 'ইন্ট্রোডাকশান টু লজিক্যাল থিওবী' গ্রন্থেও কাজে লাগিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে 'ক এবং ক নয়' সাধাবণভাবে অসংগতিব আকার হিসেবে মনে কবা হলেও উপযুক্ত যুক্তির সাহায্যে দেখানো যেতে পাবে যে এই আকাব সর্বদা অসঙ্গতিব জনক হয না। যেমন, ধবা যাক একই ব্যক্তি নিজেব সম্বন্ধে একই সময দুটি কথা বলেছেন - 'আমি পাঁচফুট লম্বা আব আমি পাঁচফুট লম্বা নই'। আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি কথা বলে লোকটি অসঙ্গত কথা বলেছেন বলে মনে হয়। কিন্তু এমন যদি হয় যে লোকটি তাঁব কন্ঠনালীর (ভোকাল কর্ড) ব্যায়ামেব জন্য এই দুটো বাক্য বলেছেন তাহলে কোনো অর্থহীনতাব প্রশ্ন ওঠে না। অনুরূপভাবে এমন যদি হয় যে লোকটি 'আমি' এই কথাটি কীভাবে ব্যবহাব কবতে হয় তাই শেখাতে চাইছেন তাহলেও তাব বাক্যদ্বযেব মধ্যে যে আপাত অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয় তাকে দূব কবা সম্ভব। সুতবাং মূল বক্তব্য এটাই যে সমস্ত অসঙ্গতির দোষগুণ, বিশেষ কী উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহাব করা হচ্ছে তাব উপব নির্ভবশীল।

বিরুদ্ধতা আবার সবসময যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত থাকে তা নয়। কোনো কোনো বিরুদ্ধতা প্রাথমিকভাবে গোপন থাকে অথচ পবে প্রকাশিত হয়। এই ধবণেব বিরুদ্ধতাকে হ্বিটগেনস্টাইন 'গুপ্ত বিবোধিতা' (হিডন্ কন্ট্রাডিকশান্) বলে অভিহিত কবেছেন। 'গুপ্ত' এই বিশেষণেব দ্বাবা তিনি এটাই বোঝাতে চেযেছেন যে যা বর্তমানে পবিলক্ষিত হয নি কিন্তু পববর্তী সময় পবিলক্ষিত হতে পাবে। 'লেকচারস' গ্রন্থে তিনি 'গুপ্ত' এই বিশেষণেব দুটি অর্থেব মধ্যে পার্থক্য কবেছেন : (১) বিরুদ্ধতা খুঁজে বাব কবাব একটা পদ্ধতি আছে কিন্তু বর্তমানে সেই পদ্ধতি প্রয়োগ কবা যায় নি, সেজন্য বলা যায় বিরুদ্ধতা গুপ্ত। এই অর্থে যেকোনো গাণিতিক প্রক্রিযায় মানকে প্রাথমিক ভাবে গুপ্ত বলা যায়। যেমন, ৯৮ X ৩৮ এই গুণফলেব মান গুপ্ত যতক্ষণ না এই গুণফল বার করা হচ্ছে। (২) বিরুদ্ধতা ব্যাপাবটি সম্পূর্ণ অস্পষ্ট। কোনো তন্ত্রে **বিরুদ্ধতা আছে** কিনা, তা দেখাব চেষ্টা কবা হচ্ছে। প্রথম

অর্থের সংগে দ্বিতীয় অর্থের পার্থক্য এই যে প্রথম অর্থে 'গুপ্ত' বলতে বোঝানো হয়েছে যা বর্তমানে অজ্ঞাত ঠিকই কিন্তু পদ্ধতি যেহেতু জানা তাই তা প্রকাশ করতে অসুবিধে নেই। কিন্তু দ্বিতীয় অর্থে গুপ্ত বলতে বোঝানো হয়েছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অর্থাৎ তার অস্তিত্ব আদৌ আছে কিনা তাই নিশ্চিত নয়; সুতরাং তা জানা বা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। 'গুপ্ত' কথার এই দুটি অর্থের মধ্যে হ্বিটগেনস্টাইন প্রথম অর্থটি গ্রহণ করার পক্ষপাতী।

এই গুপ্ত বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে সকলেই আতঙ্কগ্রস্থ থাকেন। কারণ সকলেই একে মনে করেন এক ধরণের লুকানো বীজানু যা কোনো পরীক্ষায় ধরা না পড়লেও বড় কোনো অসুখের ইঙ্গিতবাহী। হ্বিটগেনস্টাইন এই মত স্বীকার করেন না। তিনি কখনোই মনে করেন না যে বিরুদ্ধতা এক ধরণের বীজানু। 'ফিলসফিক্যাল গ্রামার' গ্রন্থে তিনি এই ধরণের বিরুদ্ধতার উৎস হিসাবে ভাষা ব্যবহারের নিয়মাবলীর অবৈধ প্রয়োগকে দায়ী করেছেন। যেহেতু আমাদের ভাষার নিয়মাবলী দ্ব্যর্থক এবং অনেকাংশেই অস্পষ্ট, তাই এই সমস্ত বিরুদ্ধতা দেখা যায়। যদি এই নিয়মগুলিকে স্পষ্ট ও সুসংহত করা যায় তাহলে বিরুদ্ধতার সম্ভবনা কমিয়ে আনা সম্ভব - 'যদি পরবর্তী কোনো সময় বিরুদ্ধতা আবিষ্কৃত হয়, তার অর্থ হল বর্তমানে নিয়মগুলি স্পষ্ট বা দ্ব্যর্থহীন নয়। সুতরাং বিরুদ্ধতা থাকা কোনো ব্যাপার নয়, কারণ আমাদের নিয়মগুলি সাজালে আমরা এর হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারি।

যে তন্ত্রে ব্যাকরণের নিয়মগুলি সু-স্পষ্ট সেখানে গুপ্ত বিরুদ্ধতার কোনো স্থান নেই। কারণ এই নিয়মগুলিই বিরুদ্ধতাকে আবিষ্কার করবে। বিরুদ্ধতা গুপ্ত হতে পারে এই অর্থে যে তা নিয়মাবলীর আলো আঁধার ভরা কোণে বর্তমান, যেখানে ব্যাকরণ সুসংহত নয়। সেইজন্য এই ধরণের গুপ্ত বিরুদ্ধতা কোনো ব্যাপার নয়, কারণ, যদি ব্যাকরণ সুসংহত হয় – নিয়মগুলি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় তাহলে এই বিরুদ্ধতা পরিহার করা সম্ভব।'[৩১]

একথা ঠিকই যে যদি নিয়মগুলি পরিবর্তন করা যায় অথবা নিয়মগুলিকে অন্যভাবে সাজানো যায় তাহলেই একটি তন্ত্রে বিরুদ্ধতা দূর করা সম্ভব। কিন্তু সমস্যা থেকেই যায়, কোনো তন্ত্রে বিরুদ্ধতা আগে দৃশ্য না হয়ে পরে কোনো সময় যদি আবিষ্কৃত হয় তাহলে সেই তন্ত্রের অবস্থা কী হবে? ঐ বিরুদ্ধতা থেকে যে বাক্যগুলি নিঃসৃত হয়েছে, সেগুলিকে কি ভুল বলা হবে। হ্বিটগেনস্টাইন-এর উত্তর নঞর্থক। তিনি মনে করেন যে যখন বিরুদ্ধতা আবিষ্কৃত হবে তখন তা বর্জন করতে হবে অথবা নিয়ম পরিবর্তনের প্রশ্ন আসবে। কিন্তু এই বর্জন বা নিয়মাবলীর পরিবর্তন পূর্ববর্তী কোনো নিঃসরণের উপর প্রভাব বিস্তার করবে না। এই বক্তব্য তিনি দুটি উদাহরণের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন - একটি দেশের সংবিধান সংক্রান্ত অন্যটি কারাগারের নক্‌শা সংক্রান্ত। প্রথম দৃষ্টান্তটি দেখা যাক। ধরা যাক কোনো এক দেশের সংবিধানে অসংগতিপূর্ণ নিয়ম বর্তমান। একটি নিয়ম অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি উৎসবের দিন রাষ্ট্রপতির পরের আসনে বসবেন, অন্য নিয়ম অনুসারে উপরাষ্ট্রপতি দুজন মহিলার মাঝখানে বসবেন। এই দুটি নিয়মের অসংগতি প্রাথমিকভাবে ধরা পড়ে নি, কারণ, প্রতিটি উৎসবের দিনেই উপরাষ্ট্রপতি অসুস্থতার দরুণ অনুপস্থিত থাকতেন। কিন্তু কোনো

একটি উৎসবের সময় তিনি উপস্থিত। সমস্যা হল, সেক্ষেত্রে কী করা যাবে? হ্বিটগেনস্টাইনেব বক্তব্য - আমাদের এই অসঙ্গতি থেকে অব্যাহতি পাওযা উচিত অবশ্যই। কিন্তু তাব অর্থ কখনোই এটা হতে পাবে না যে আগে যা করে আসা হয়েছে তা সবই ভুল। অথবা এমন হতেই পারে যে দ্বিতীয় নিয়মটিব কথা খেযাল না কবে সর্বদাই প্রথম নিয়ম অনুসাবে কাজ কবা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এ বিরুদ্ধতা কোনো ক্ষতি কববে না। যখন কোনো বিরুদ্ধতা বা অসংগতি দেখা দেবে তখন তা পরিহার কবার জন্য সময়ও পাওয়া যায়। তাই আগে থেকেই বিরুদ্ধতা সম্পর্কে আতংকগ্রস্ত হবার কোনো হেতু নেই।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে হ্বিটগেনস্টাইন এমন একটি কয়েদখানাব কল্পনা কবাব কথা বলেছেন যার মূল উদ্দেশ্য হল সমস্ত কযেদীদের পরস্পবেব থেকে পৃথক বাখা। ঘর অলিন্দগুলি এমনভাবে নির্মিত যে প্রত্যেকটি কযেদী একটি নির্দিষ্ট অলিন্দ ধবে চলাফেবা কবতে পাবে এবং ঘবে উপস্থিত হতে পাবে, কিন্তু কখনোই দুজন কয়েদীব সাক্ষাৎ হবে না। অথচ অলিন্দগুলি এমনই যে সমকোণে এসে দুটি অলিন্দ পবস্পবেব সংগে মেশে, এবং ফলে অলিন্দ থেকে অন্য অলিন্দ দিযে অন্য কযেদীব ঘবে প্রবেশ কবা যায়। অলিন্দগুলোব মধ্যে পাবস্পবিক এই যোগসাজশেব ব্যাপাবটি কযেদীদেব দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে · তাই তারা সর্বদাই অলিন্দ দিয়ে সোজা এসে ফিবে গেছে, কোনো দিকে মোড ফেবে নি। তাই কোনোদিনই কোনো অসুবিধে হয নি। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব যে অন্য কেউ কয়েদীদেব এই ব্যাপারে সচেতন কবে তুলতে পারে। সেক্ষেত্রে কী বলা হবে যে কয়েদখানার মধ্যে গন্ডগোল আছে? হ্বিটগেনস্টাইন-এর বক্তব্য, আমবা নানা কথাই বল্তে পারি - কয়েদখানা ঠিক ঠিকই কাজ কবছিল; আবার এও বলতে পাবি কয়েদখানাটি ভুল ছিল এই অর্থে যে একদিন লোকজন এটা দেখতে পেয়েছে এবং তারপব থেকে সমস্ত জিনিসেই গন্ডগোল হয়েছে, তাই কয়েদখানাটি অপ্রয়োজনীয় নিবর্থক হয়ে পড়েছে।

এই দুটি দৃষ্টান্তেব মূল বক্তব্য যে বিরুদ্ধতা গুপ্ত হলেও আতঙ্কগ্রস্ত হবার কিছু নেই। যদি কখনও বিরুদ্ধতা প্রকাশিত হয, তাহলে তখনই তা বর্জন কবা হবে। কিন্তু যতক্ষণ তা গুপ্ত থাকবে, ততক্ষণ সেটা নিয়ে চিন্তিত হবাব কিছু নেই। বিপবীতক্রমে তিনি মনে করেন যে গুপ্ত অবস্থায় বিরুদ্ধতা সোনাব মতই মূল্যবান। এমনকি যখন প্রকাশিত হয়ে পড়েছেও তখনও কোনো ক্ষতি কবতে পারে না।[১৬] যদিও হ্বিটগেনস্টাইন নিজে বিরুদ্ধতাকে কেন সোনাব মতই মূল্যবান বলে মনে কবেছেন তাব কোনো যুক্তি দেখান নি, তবুও তাঁব আলোচনাব থেকে এই মন্তব্যের সমর্থনে যুক্তি দেওযা যেতে পাবে। সোনা যেমন গুপ্ত অবস্থায জল বা অন্যান্য ভূগর্ভস্থ উপাদানকে পবিশ্রুত কবে, তেমনি বিরুদ্ধতাও গুপ্ত অবস্থায গ্রহণযোগ্য কোনো সিদ্ধান্তেব পবিবাহী হতে পাবে। কারণ, এটা খুবই সম্ভব যে, যেহেতু দুটি বচনেব মধ্যে কোনো বিরুদ্ধতা আছে তা আমাদেব জ্ঞাত নয়, তাই ঐ বচনদুটি প্রয়োগ কবে কোনো একটি স্থলে আমাদেব পক্ষে প্রযোজনীয় সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা কবা সম্ভব। সুতবাং ঐ বিরুদ্ধতা আমাদেব ঐ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাব সহাযক হল। যেহেতু পরবর্তী পর্যায়েব বচনায় হ্বিটগেনস্টাইন

পবিস্থিতি-নিরপেক্ষ কোনো সার্বজনীন সাধারণ বিরুদ্ধতাব কথা স্বীকাব করেন না, তাই অপর কোনো পবিস্থিতিতে ঐ বচনদ্বয়ের মধ্যে বিরুদ্ধতা আবিষ্কৃত হলেও সেই আবিষ্কার পূর্ববর্তী পবিস্থিতিব সিদ্ধান্ত উপনয়নেব পবিপন্থী হতে পারে না। সুতরাং পূর্ববর্তী-পরিস্থিতিতে বিরুদ্ধতাব ভূমিকা সোনার মতই মূল্যবান।

সাধাবণভাবে বিরুদ্ধতাকে যেকোনো যৌক্তিকতন্ত্রের (লজিক্যাল সিস্টেম) পবিপ্রেক্ষিতে ভ্রান্তিজনক, আপত্তিকর বলে মনে করা হয, কারণ প্রচলিত যৌক্তিক নিয়মানুসারে বিরুদ্ধতা থেকে যে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব । অর্থাৎ যদি আমরা 'ক. ~ ক' এই আকারেব কোনো বাক্য পাই তবে তাকে যুক্তিবাক্য হিসেবে গ্রহণ করে তার থেকে যেকোনো সিদ্ধান্ত 'খ' অনায়াসে উপনয়ন করা যায়।

১. ক ~ ক /∴ খ
২ ক
৩ ~ক ক
৪ ~ক
৫. ক v খ
৬ খ

হিটগেনস্টাইন কিন্তু এই মতবাদের সমর্থক নন। অন্য ক্ষেত্রেব মত এক্ষেত্রেও তাঁব বক্তব্য যে এইসব স্থলে আমাদেব এমন নিযম করতে হবে যে আমরা বিরুদ্ধতাকে চিনে নিতে পারি এবং তাদেব অপ্রয়োজনীয় বলে অভিহিত কবতে পাবি। ফলে ঐ বিরুদ্ধতা খেকে কোনো সিদ্ধান্ত অনুসরণ কবতে পাবে না।

সোজা কথায় বলতে গেলে বলতে হয যে হিটগেনস্টাইন মনে করেন না যে বিরুদ্ধতা একটি স্থায়ী অবস্থা, যাব বিশেষ একটা আকাব আছে। ববং সমস্ত ক্ষেত্রেই বিরুদ্ধতাকে আমাদের জীবনগত আকারেব (ফর্ম অব লাইফ) সংগে যুক্ত কবে দেখতে হবে। যেহেতু আমাদের জীবনগত আকার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন বকম, তাই বিরুদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের মনোভাবও পরিবর্তিত হওয়া উচিত। যেমন, কোনো এক তন্ত্রে যদি দেখা যায় যে বিরুদ্ধতা আকাঙ্খিত ফল প্রদান কবছে, তাহলে সেই তন্ত্রের পবিপ্রেক্ষিতে বিরুদ্ধতাকে কখনোই ক্ষতিকব বলা যায না বা সেই বিরুদ্ধতা বর্জনেব জন্য কোনো চেষ্টা কবা উচিত নয। অন্যদিকে যদি দেখা যায যে কোনো তন্ত্রে বিরুদ্ধতা আকাঙ্খিত বা অভীষ্ট সিদ্ধান্তের বিবোধী কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত কবছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এমন নিযম কবতে হবে যাতে বিরুদ্ধতা ঐ ধবণেব কোনো ফলশ্রুতি (কন্‌সিকোয়েন্স) উৎপন্ন না করতে পাবে। তাই বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে হিটগেনস্টাইন-এব নিজের বক্তব্য হল - 'বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে দুটি কথা বলাব দরকাব আছে। প্রথমত, কোনো বিরুদ্ধতাকে কখনই স্বতঃ মিথ্যা বলে অভিহিত করতে পারা যায় না। দ্বিতীয়ত, যদি সম্ভাবনা থাকে যে ব্যক্তি ঐ বিরুদ্ধতার পথে গিয়ে বিভ্রান্ত

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে, তাহলে ব্যক্তিকে সচেতন করে দিতে হবে যে বিরুদ্ধতা থেকে কখনো যেন অগ্রসব না হন।[২০]

[চার]

বিরুদ্ধতা সম্পর্কিত এই আলোচনার পটভূমিকায় 'আত্ম নির্দেশক' কূটাভাস প্রসঙ্গে হ্বিটগেনস্টাইন-এর পরবর্তী পর্য্যায়ের মত আলোচনা করা যাক্। প্রথম বিভাগে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরবর্তী যুগের রচনায় তিনি নিছক যৌক্তিক ক্ষেত্রে আত্মনির্দেশক কূটাভাসের দৃষ্টান্ত নিয়ে ক্ষান্ত থাকেন নি, অন্যত্র এই কূটাভাসের রূপগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই কূটাভাসের সবচেয়ে প্রচলিত রূপ হল মিথ্যাবাদের কূটাভাস। এই মিথ্যাবাদের কূটাভাসকে দুভাবে উপস্থাপিত কবা হয় - এপিমেনাইডিয়ান আকার এবং ইউবুলাইডিয়ান আকার। প্রথম আকার অনুযায়ী, এপিমেনাইডিস নামক একজন ক্রেটান (ক্রিট দেশীয় ব্যক্তি) বলেছেন যে সমস্ত ক্রেটানরাই মিথ্যাবাদী। আর দ্বিতীয় আকার হল - এখন আমি যা বলছি সবই মিথ্যা। হ্বিটগেনস্টাইন যখন মিথ্যাবাদের কূটাভাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, সর্বদাই তিনি দ্বিতীয় রূপটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এমনকি 'জেট্টেল' গ্রন্থে তিনি 'মিথ্যাবাদী ক্রেটান' বলে উল্লেখ করলেও ইউবুলাইডিয়ান আকারটিই আলোচনা করেছেন। তাঁর এই পছন্দেব পবিপ্রেক্ষিতে কোনো কারণ তিনি নিজে না দেখালেও আমাদেব মনে হয় হয় বিরুদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ এই পছন্দের হেতু। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কূটাভাসই কিন্তু বিরুদ্ধতাব আলোচনার প্রসঙ্গক্রমেই উল্লিখিত ও আলোচিত হয়েছে। এপিমেনাইডিয়ান আকাবেব মধ্যে আমবা কোনো বিরুদ্ধতা খুঁজে পাই না। এপিমেনাইডিয়ান আকাবে নিছক এইটুকুই বলা হযে থাকে যে -

(১) একজন ক্রেটান, এপিমেনাইডিস, বলেন যে সমস্ত ক্রেটানেবা মিথ্যাবাদী। যেহেতু এপিমেনাইডিস নিজে একজন ক্রেটান, তাই তার কথা থেকে এটাই নিঃসৃত হয যে তাব নিজেব বাক্যটিও বক্তব্য পবিসবেব অন্তর্ভূক্ত অর্থাৎ—

(২) এপিমেনাইডিসেব এই বচনটি মিথ্যা

একথা বলাব মানে

(৩) 'সমস্ত ক্রেটান কথিত বচন মিথ্যা' হয মিথ্যা। অথাৎ

(৪) কোনো কোনো ক্রেটান কথিত বচন সত্য।

যেহেতু এপিমেনাইডিসেব নাম আগে (১) নং বাক্যে উল্লেখ কবা হযে গেছে তাই যুক্তি বিজ্ঞানের নিযম অনুসরণ করে (৪) নং বাক্যকে আর এপিমেনাইডিসেব নাম দিয়ে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে না। তাই (১) নং বচন অদ্ভুত, কৌতুহলোদ্দীপক হলেও একে স্ববিবোধী বলা সঙ্গত হবে না। এই বচন অদ্ভুত, কাবণ, বচনটি স্বীকার করলে এর ফলশ্রুতি হিসেবে যা নিঃসৃত হয় তাকে নিজের বক্তব্যের পরিপন্থী বলে মানতে হয। অর্থাৎ এখানে যে বিরুদ্ধতা

আমরা পাচ্ছি তা সরাসরি 'ক ক-নয়' আকারের নয় - এখানে বিরুদ্ধতা হল বক্তব্যবিষয় কেন্দ্রিক, যদি কোনো ব্যক্তি এমন বাক্য প্রয়োগ করেন যে তার নিজের উক্তিটি ঐ বাক্যের বক্তব্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন নয়, তাহলে তার বক্তব্যের মধ্যে এক ধরনের বিরুদ্ধতা অনুভব করা যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ভর্তৃহরি তাঁর বাক্যপদীয় গ্রন্থে এই ধরণের বাক্য প্রয়োগের উদ্দেশ্যের পরিপন্থী বলে মনে করছেন। স্বাভাবিকভাবে বলা যায় এই ধরণের বিরুদ্ধতা উদ্দেশ্যে-প্রণোদিত বিরোধিতা (ইনটেনশন্যাল্) এবং এর আলোচনার ক্ষেত্র মনোবিজ্ঞান। হ্বিটগেনস্টাইন যখন কূটাভাস নিয়ে আলোচনা করেন তখন তিনি বিরুদ্ধতার প্রকাশ হিসেবেই কূটাভাসের উল্লেখ করেন - অর্থাৎ স্পষ্ট বিরুদ্ধতা তাঁর আলোচ্য বিষয়। এপিমেনাইডিয়ান আকারের মধ্যে না হলেও ইউবুলাইডিয়ান আকার যদি গ্রহণ করা হয়, তবে একটি বচনের থেকে তার বিরুদ্ধ বচনে উপনীত হওয়া যায়।

স্পষ্টভাবে বিরুদ্ধতায় উপনীত না করলেও এপিমেনাইডিয়ান কূটাভাসের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। কোনো বচন যদি নিজের সম্বন্ধে মিথ্যাত্ব আরোপ করে তাহলে আমরা সর্বদা একটা অদ্ভুত পরিস্থিতির সম্মুখীন হই। একথাই এপিমেনাইডিস-এর বক্তব্য থেকে ফুটে উঠেছে এবং এই অদ্ভুত পরিস্থিতিই ক্ষেত্রবিশেষে বিরুদ্ধতায় রূপান্তরিত হয়, যেমন, - ইউবুলাইডিয়ান আকার বা বিরুদ্ধতায় রূপান্তরিত গ্রেলিং এর আকার, ইত্যাদি। অর্থাৎ মিথ্যাবাদের কূটাভাস যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। 'এই সমস্ত কূটাভাস চিত্তাকর্ষক কারণ এগুলি দীর্ঘদিন ধরে লোককে ভাবিয়ে তুলেছে এবং একই সাথে এগুলি ইঙ্গিত করে কী ভাবে চিন্তা উদ্দীপক সমস্যা নিছক ভাষা থেকে উৎপন্ন হয় অথবা কী কী সমস্যা আমাদের বিব্রত করে'।[২১]

মিথ্যাবাদের কূটাভাস সম্পর্কে হ্বিটগেনস্টাইন-এর অভিমত হল যখন কেউ বলেন "আমি মিথ্যা কথা বলছি সুতরাং আমি মিথ্যা বলছি না - সুতরাং আমি মিথ্যা বলছি, ইত্যাদি" - তখন তার কথার মধ্যে যদি বিরুদ্ধতা প্রকাশ পায় তাতে ক্ষতি কি? এটা কি বলা যাবে যে যেহেতু যুক্তি বিজ্ঞানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে একটি বচন থেকে তার বিরুদ্ধ বচন নিঃসৃত হয়েছে তাই এক্ষেত্রে আমাদের ভাষায় প্রয়োগ ব্যাহত হয়েছে। "আমি মিথ্যা কথা বলছি" এই বচনটি স্বয়ং অব্যবহারযোগ্য হতে পারে অথবা এই বচনভিত্তিক অনুমান অব্যবহারযোগ্য হতে পারে, কিন্তু তাই বলে এই বচন গঠন করা যাবে না বা এই অনুমান সম্ভব হবে না, একথা বলা ঠিক নয়। এটি তখন অলাভজনক প্রক্রিয়ায় পর্যবসিত হবে। এটা এমন একটা ভাষার খেলা যার সঙ্গে বৃদ্ধাঙ্গুল ধরার খেলাকে তুলনা করা যায়।[২২]

এটা সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয় যে মিথ্যা বলার বিপরীত হল সত্য কথা বলা। তাই যখন কোনো ব্যক্তি নিজের সম্বন্ধে বলেন যে 'আমি মিথ্যা কথা বলছি' তার এই কথার থেকে কূটাভাস উৎপন্ন হয়। যেহেতু তাঁর ঐ বচনটি তারই স্বীকারোক্তি, তাই যা নিঃসৃত হয় 'আমি মিথ্যা বলছি' - এটাই মিথ্যা এবং যুক্তিবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে দুটি মিথ্যার অর্থ হল সত্য। তাই বলতে হয় যে ঐ ব্যক্তি অন্ততঃ একটি সত্য কথা বলেছেন, এবং এভাবেই

কূটাভাস উৎপন্ন হয়। হ্বিটগেনস্টাইন কিন্তু অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 'আমি মিথ্যা বলছি' এই বাক্যটি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। 'আমি সর্বদা মিথ্যা কথা বলি'। ঠিক আছে কিন্তু ঐ বচনটা কি হবে? - 'ওটাও একটা মিথ্যা'। - সেক্ষেত্রে কিন্তু তুমি সবসময় মিথ্যা বলছ না। 'না এগুলো সবই, মিথ্যা'। এক্ষেত্রে অবশ্য আমরা লোকটির সম্বন্ধে বলতে পারি যে আমরা সত্য বলতে বা মিথ্যা কথা বলতে যা বুঝি, তিনি কিন্তু তা বোঝেন না। হয়ত তিনি এরকম কিছু বলতে চাইছেন - তিনি যা বলেন সবই উল্টোপুরাণ (ফ্লিকাবস্) অথবা কোনোটাই তার মনের কথা নয়, সবগুলো নিছক কথার কথা।

আবার এমনও বলা যেতে পারে যে, 'আমি সর্বদা মিথ্যা কথা বলি' এটা নিশ্চিত উক্তি (অ্যাসারশন্) নয় - এটা একটা উচ্ছ্বাস মাত্র।

'সেক্ষেত্রে এটা বলা যাবে যে যদি সে এই বাক্য বলে থাকে এবং চিন্তাসহকারে বলে থাকে, তাহলে তার এই বাক্যকে সাধারণ এমন এমন অর্থে না বুঝে, অন্য-অন্যভাবে বুঝতে হবে'।[২৩]

অর্থাৎ মিথ্যা স্বীকারোক্তিমূলক এই বাক্যটিকে তিনভাবে ব্যাখ্যা করা যায় এবং দেখান যায় যে এক্ষেত্রে কোনো কূটাভাস নেই।

(১) তিনি যা বলেছেন, তা খুব ব্যস্ততা বশতঃ বলে ফেলা। এটা একটা আনুষঙ্গিক বচন মাত্র (সাইড্ স্টেট্‌মেন্ট) এবং তিনি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য মনে নিয়ে এই কথা বলেন নি। তাই 'মিথ্যা' এই কথার উপর অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে সত্যের বিরোধী বলে মনে করে তার থেকে সত্যতা নিঃসৃত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

(২) অথবা এক্ষেত্রে তিনি কোনো আবেগ প্রকাশ করতে চাইছেন, তাই তিনি বলেছেন 'আমি সদাই মিথ্যা কথা বলি'। যেমন, যখন কোনো ব্যক্তি আবেগবশতঃ বলেন 'কী সুন্দর দৃশ্য'- তাঁর সেই কথার সত্যতা-মিথ্যাত্ব যাচাই করতে বসি না, তেমনি এই ব্যক্তির 'আমি মিথ্যা কথা বলছি' উক্তিটিও উচ্ছ্বাসমাত্র, এর সত্যমূল্য নির্দ্ধারণ করার কোনো প্রশ্ন নেই। তাই 'আমি মিথ্যা বলছি' এটাই মিথ্যা একথা বলার কোনো অর্থ হয় না।

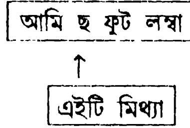
(৩) কিন্তু কেউ যদি দাবি করেন যে এই উক্তিটি তাঁর আনুষঙ্গিক বচন মাত্র নয়, তাঁর আবেগ প্রকাশক উচ্ছ্বাস মাত্র নয়, বরং তাঁর নিজের চিন্তার প্রকাশ, তাহলে সেক্ষেত্রে বলতে হয় যে, যেভাবে বাক্যটি ব্যবহার করা হয়েছে, সেইভাবে ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। অন্যভাবেও তিনি এই ভাবটি ব্যক্ত করতে পারতেন।

প্রকৃতপক্ষে 'আমি মিথ্যা বলছি' এই উক্তিটি নির্দোষ এবং কূটাভাসমূলকও নয়। আমাদের ভাষার খেলায় এই ধরণের বাক্যকে অনেক ভূমিকায় ব্যবহার করা যায়। যেমন, আগে যা বলা হয়েছে তা বর্জনের জন্য এটা বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ, বলা যায় যে কোনো পরিস্থিতিতে একজন বলতেই পারেন - 'তাঁর বয়স ৮০ বছর; আমি মিথ্যা বলছি, তাঁর বয়স আসলে ৭০ বছর'। এক্ষেত্রে 'আমি মিথ্যা বলছি' এই বাক্যটি কিন্তু ঐ ব্যক্তির নিজের পূর্বতন উক্তিকেই বোঝাতে চাইছে। তাই এই বাক্যটি অর্থহীন ত নয়ই, বরং অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। হ্বিটগেনস্টাইন

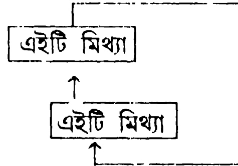
এই ধবণের ব্যবহাবকেই 'আমাদের প্রচলিত ব্যবহার' বলে মনে কবেছেন। এই সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে আমরা কোনো হেঁয়ালী খুঁজে পাই না। হেঁয়ালী তখনই দেখা দেয যখন 'আমি মিথ্যা বলছি না' এই বাক্যটি 'আমি মিথ্যা বলছি' এই বাক্যেব থেকে নিঃসৃত হয। তিনি মনে করেন যে এটা একমাত্র 'প্রয়োজনহীন ভাষাব খেলায়'ই সম্ভব। ভাষার খেলার এই প্রয়োজনহীন রূপটি আবও প্রকট হয়ে ওঠে যখন আমবা বিচার্য্য বাক্য হিসেবে 'এইটি মিথ্যা' এই ধবণেব প্রযোগকে গ্রহণ কবি। 'এইটি'-এই নির্দেশকটি যে বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে, সেই বস্তুটিকে বোঝাতেই ব্যবহাব করা হয়। যেমন -

↗*
এইটি একটি তাবা

ভাষাব ক্ষেত্রেও অনুরূপ প্রযোগ দেখা যায —



এই সমস্ত ক্ষেত্রে 'এইটি মিথ্যা এই বাক্যেব অর্থ বুঝতে আমাদেব কোনো অসুবিধে হয না। কারণ, এই ধরণেব প্রযোগের প্রাসঙ্গিকতা আমবা খুঁজে পাই। কিন্তু ধবা যাক পবিস্থিতি এমন



সেক্ষেত্রে আমবা সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। আমবা খালি একটাব থেকে অন্যটায অন্যটাব থেকে আগেরটায, এভাবে বৃত্তাকাবে ঘুবতেই থাকি এবং আমবা কোনো থামার জাযগা পাই না। এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি উৎপন্ন করা ছাড়া এই ধবণেব প্রয়োগের আব কোনো সার্থকতা থাকতে পাবে না। এবা সম্পূর্ণ প্রয়োজনবর্জিত। এই সমস্ত বাক্যগুলিকে অসম্পূর্ণ বাক্য (ওপেন্ সেন্টেন্স) হিসেবে লেখা যেতে পারে যাব বক্তব্য বা বিষয অংশটি শূন্য। অন্যান্য অসম্পূর্ণ বাক্যের ক্ষেত্রে যেমন ঐ শূন্য স্থানে উপযুক্ত পদ বা বাক্য বসিযে আমবা অর্থপূর্ণ বাক্য বা বচন গঠন কবতে পাবি , তেমনি এক্ষেত্রেও যদি আমবা উপযুক্ত কোনো বাক্যকে এব বিষযের স্থানে বসাতে পাবি, তাহলেই ঠিক ঠিক অর্থ লাভ করতে পাবব এবং তখনই বাক্যটি প্রযোজনীয হিসেবে গণ্য হবে। যদি এই ধরণের উপযুক্ত কোনো বাক্য খুঁজে পাওযা সম্ভব না হয, তাহলে বাক্যটি উদ্দেশ্যহীন বা অর্থহীন উপস্থাপনায় (প্রফিট্‌লেস্

পাব্‌ফবম্যান্স) পর্যবসিত হবে। হুইটগেনস্টাইন এই ধবণেব বাক্য ব্যবহাবকে বৃদ্ধাঙ্গুলি ধরার খেলাব সংগে তুলনা কবেছেন। আমবা বাঁ হাতেব বৃদ্ধাংগুলিকে ডানহাত দিয়ে স্পর্শ কবতে পারি। কিন্তু ডান হাতেব বৃদ্ধাঙ্গুলিকে স্পর্শ কবতে হলে আমাদেব বাঁ হাতেব আঙুল ব্যবহার কবতে হয। এইভাবে আমবা চক্রাকাবে ঘুবতে থাকি। অনুরূপভাবে, উপবেব পবিস্থিতিতে নীচেব বাক্যেব 'এইটি' বোঝাতে উপবেব বাক্যকে নির্দেশ কবতে হয়। আবাব, উপবেব বাক্যের 'এইটি' বোঝাতে নীচেব বাক্যকে নির্দেশ কবতে হয়। ফলে, সেই একই চক্রেব মধ্যে আমবা নিক্ষিপ্ত হই। 'জেট্টেল' গ্রন্থেও তিনি একই বক্তব্য প্রকাশ করেছেন - 'আমি মিথ্যা বলছি' এটার পবিবর্তে এটাও লেখা যেত 'এই বচনটি মিথ্যা'। সেক্ষেত্রে উত্তব হবে - ঠিক আছে, কিন্তু কোন্ বচনটি বোঝাতে চাওযা হচ্ছে ? - 'হ্যাঁ, এই বচনটি' - 'আমবা বুঝতে পাবছি, কিন্তু এই বচন দিযে কোন্ বচনকে উল্লেখ কবতে চাই ? - এইটাই - ভালো, কিন্তু কোন্ বচন উল্লেখ কবা হচ্ছে এর মাধ্যমে ?' ইত্যাদি, ইত্যাদি। অর্থাৎ, তিনি কী বোঝাতে চাইছেন, তা তিনি কখনোই বোঝাতে পাববেন না, যতক্ষণ না তিনি কোনো সম্পূর্ণ বচনে উপনীত হন। এখানে মূল ত্রুটি হল এই চিন্তা যে 'এই বচনটি' এই বাক্যাংশ (ফ্রেজ) তাব বিষযকে দূব থেকে নির্দেশ কবাব বদলে তাব বিষযেব বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হযেছে।[২৪]

অর্থাৎ কূটাভাস সর্বদাই বিশেষ কোনো জীবনগত আকাব (প্যার্টান অব্ লাইফ) এব সংগে যুক্ত, যাব পবিবর্তন ঘটলে ঐ যুক্তিটি বা এই বচনটি কূটাভাস হিসেবে গণ্য হবে না। অথচ যতক্ষণ ঐ বিশেষ আকাব, ঐ বিশেষ পবিস্থিতি বর্তমান থাকে ততক্ষণই কূটাভাস লোককে বিভ্রান্ত কবে। এব অন্যতম কাবণ হল যে কূটাভাস অনুমানেব যৌক্তিক নিয়মেব উপব নির্ভবশীল। যদি কেউ বলেন 'আমি মিথ্যা বলছি' তাহলে বলা হয, তাব থেকে নিঃসৃত হয যে সেই ব্যক্তি মিথ্যা বলছে না, তাব থেকেই আবাব নিঃসৃত হয় যে ঐ ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে, ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আমবা 'নিঃসৃত হওয়া' এই সম্বন্ধটিব উপব নির্ভব কবছি। সাধাবণভাবে, এই সম্বন্ধটিব অর্থ হল - 'যদি কেউ একটি বচন নিশ্চিতভাবে বলেন তাহলে তাব থেকে যে বচনটি নিঃসৃত হয, সেই বচনটিকেও আমবা নিশ্চিতভাবে বলতে সমর্থ হই।' কিন্তু এই ধবণেব 'সমর্থ হওযা' (এনটাইটেলড্) ভিন্ন ভিন্ন বিষয বোঝায় এবং সেই সমস্ত বিষযেব কোনোটিই বর্তমান পবিস্থিতিতে প্রযোজ্য হতে পাবে না। তাই প্রশ্ন ওঠে - কেন 'আমি মিথ্যা বলছি' এই বাক্য থেকে ঐ বিশেষ সিদ্ধান্তটিই নিঃসৃত হয, অন্য কিছু নয? আমবা যদি অন্য কোনো সিদ্ধান্তেব সম্ভাবনা স্বীকাব কবতে পাবি তাহলে ঐ ধরণেব কূটাভাসেব আশংকা অনেকাংশে দূব কবা সম্ভব।

এই মিথ্যাবাদেব কূটাভাসেব অনুরূপ শব্দার্থ তাত্ত্বিক কূটাভাস প্রসঙ্গে হুইটগেনস্টাইন এব বক্তব্য হল 'অসমনির্দেশক' বিধেযটি অসমনির্দেশক নয - তাই লক্ষণ অনুসাবে একে অসমনির্দেশক বলতে হয়। কিন্তু এ পর্যন্ত শুনতে বা বলতে কোনো অসুবিধে আছে বলে মনে হয না - মনে হয, এটা ঠিকই আছে। এবং এ ব্যাপাবে কোনো বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে আমবা সচেতন থাকি না। কিন্তু যদি আমরা এই বিরুদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন হই, তাহলে আমাদেব

প্রথমেই স্বীকাব কবে নিতে হবে যে 'ধ অসমনির্দেশক' এই বক্তব্যটি দুটি ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত নয়। একটি ক্ষেত্রে অসংক্ষিপ্ত উক্তি, অন্য ক্ষেত্রে উক্তিটি লক্ষণ অনুসাবে সংক্ষিপ্ত।

হিটগেনস্টাইন-এর অভিমত হল যে এই ধরণেব কূটাভাস কখনই দেখা দেবে না, যদি আমরা 'ধ অসমনির্দেশক' এবং ' "অসমনির্দেশক" অসমনির্দেশক' এই বাক্য দুটিব মধ্যে পার্থক্য কবি। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে 'অসমনির্দেশক' এই বিধেয়টির অর্থ পরিস্ফুট কবা হচ্ছে আব প্রথম ক্ষেত্রটিতে আমরা ঐ বিধেয়র সংজ্ঞাদ (ডেফিনিয়েন্স্) প্রদান কবছি। অর্থাৎ দুটি বাক্যে একই লক্ষণেব দুটি ভিন্ন ভিন্ন দিক (সংজ্ঞাদ এবং সংজ্ঞেয়) আলোচনা করছি। যেহেতু সংজ্ঞাদ এবং সংজ্ঞেয় কখনো এক বলে গণ্য করা যায় না, তাই এই ধরণের কূটাভাস কখনোই দেখা দেবে না।

কূটাভাস প্রসঙ্গে তাঁব দ্বিতীয় অভিমত হল যে কূটাভাস সর্বদাই একটা বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে দেখা দেয় যেখানে প্রত্যেকটি বাক্যকে ধবে নেওয়া হল উদ্দেশ্য-বিধেয আকাবযুক্ত নিবপেক্ষ বচন। এই আকাবেব বচনে বিধেযপদ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয। সুতবাং বিরুদ্ধতাব ক্ষেত্রে আমবা দুটি বচন পাই যেখানে একই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিধেয পদ প্রযোজ্য আবাব প্রযোজ্য নয়। কিন্তু একটি বিশেষ ধর্ম শব্দেব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কি না, তা সম্পূর্ণভাবে অভিজ্ঞতানির্ভব ব্যাপাব - তাই যদি পবিস্থিতিব পবিবর্তন হয, তবে বিধেয় প্রসঙ্গে আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গি পবিবর্তিত হবে। যেমন, আমবা এ ধবণেব এক পবিস্থিতিব কথা ভাবতে পাবি যেখানে শিশুদেব প্রথম থেকেই শেখানো হয একটি বিধেয় একই সঙ্গে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রয়োগ কবতে আবাব না করতে। যেহেতু তারা প্রথম থেকেই এই প্রক্রিয়ায অভ্যস্ত হযে যাচ্ছে, তাই এই ধবণেব বিধেয তাদেব কাছে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয় না। সুতবাং হিটগেনস্টাইন-এব অভিমত হল যে 'সমনির্দেশক', 'অসমনির্দেশক' বিধেযগুলি স্ববিবোধী নয়, কিন্তু অদ্ভুত প্রকৃতিব। এবং এই অদ্ভুত প্রকৃতিব কাবণ হল যে বর্তমানে প্রচলিত ভাষাতাত্ত্বিক পটভূমিকায এই সমস্ত বিধেয কীভাবে প্রযোগ কবতে হয সেই বিষয সম্বন্ধে আমবা অবহিত নই।[২১]

শব্দার্থতাত্ত্বিক কূটাভাসেব বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও আমরা হিটগেনস্টাইন-এব মূল দৃষ্টিভঙ্গিবই পবিচয় পাই। যেকোনো পদ আলোচনাব ক্ষেত্রে যা সবচেযে বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা হল, ঐ ধবণেব কোনো প্রয়োগ আদৌ আছে কি না। তাই কোনো পদেব অর্থ আছে কি না, শব্দটি অর্থপূর্ণ কি অর্থহীন, এই প্রশ্নেব তুলনায় শব্দটির আদৌ প্রয়োগ আছে কি না, এই প্রশ্নটি বেশি প্রয়োজনীয। যদি বাস্তব পরিস্থিতিতে কোনো প্রযোগ না থাকে তবে আমরা কাল্পনিক পবিস্থিতিতে প্রয়োগের কথা চিন্তা কবতে পারি। এবং এই সমস্ত বিকল্প পবিস্থিতিব প্রয়োগের পরিপ্রেক্ষিতেই আপাত কূটাভাসী অভিব্যক্তিব অর্থ নির্দ্ধাবণ করতে পাবি। কূটাভাস সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাখ্যা দেখা দেয় যেহেতু আমবা এই সমস্ত বিকল্প সম্ভাবনাব কথা চিন্তা না কবে সামনে থাকা দৃষ্টান্তটি নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তাঁর 'বিমার্কস' গ্রন্থে হিটগেনস্টাইন

অসমনির্দেশক বিধেয় সংক্রান্ত কূটাভাসেব যৌক্তিক আকারটিকে - '$\lambda \in \lambda \leftrightarrow \sim (\lambda \in \lambda)$' - 'একটি বিশুদ্ধ বিরোধিতা' (ট্রু-কন্ট্রাডিক্শান্) বলে বর্ণনা করেছেন। এই অদ্ভুত বিশেষণের তাৎপর্য হল যে এখানে বিরুদ্ধতা 'λ' শব্দেব নিয়মেব দ্বারা প্রমাণিত বা বলতে পারা যায় 'λ' শব্দেব নিয়মের থেকে নিঃসৃত। কিন্তু এই বিরুদ্ধতা কোনো অর্থপূর্ণ তাৎপর্যমন্ডিত বচন উৎপন্ন কবতে পাবে না, এমন কী, 'অসমনির্দেশক' এই বিধেয়টিব নিজের উপর প্রয়োগ ব্যাপারে কোনো তথ্যই প্রদান কবতে পারে না।

শব্দার্থতত্ত্বীয় কূটাভাস ছাড়াও হ্বিটগেনস্টাইন যৌক্তিক কূটাভাস নিয়েও আলোচনা করেছেন তাঁর পববর্তী পর্য্যায়ের গ্রন্থগুলিতে। শ্রেণীসংক্রান্ত কূটাভাস প্রসঙ্গে তাঁর জিজ্ঞাসা, কেন রাসেলীয় বিরুদ্ধতাকে অতিবাচনিক কিছু বলে অভিহিত কবা যাবে না, যা সমস্ত বচনের উর্দ্ধে বর্তমান থেকে উভয়দিকে দৃষ্টি বাখতে পাবে? F (F) এই বচনটিতে কোনো গ্রাহক নেই, তাই একে অতিযৌক্তিক বলে অভিহিত করা যায়, এটি এমন যে এব নিষেধই বিপরীতক্রমে এটি-কে প্রতিষ্ঠা করে। তাই এই ধরণেব বিরুদ্ধতাকে আমরা যুক্তিবিজ্ঞানেব ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে এব থেকে অন্য বচনকে নিঃসৃত করতে কি পাবি না?[১৬]

এখানে লক্ষণীয় যে হ্বিটগেনস্টাইন কূটাভাস প্রসঙ্গে আমাদেব সাধাবণমতেব সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা বলেছেন। সাধারণভাবে কূটাভাসকে আমরা সমীহ কবি, কারণ আমরা মনে কবি যে কূটাভাস সমগ্র যুক্তিবিজ্ঞানের ভিত্তিপ্রস্তবটিকে নাডিযে দিতে পাবে। কিন্তু হ্বিটগেনস্টাইন মনে কবেছেন যে কূটাভাসকেই যুক্তিবিজ্ঞানেব ভিত্তি হিসাবে দেখা যায় এবং সমগ্র যুক্তিবিজ্ঞানকে বিরুদ্ধতা থেকে নিঃসৃত বলে মনে কবতে পারি।

হ্বিটগেনস্টাইন-এব দৃষ্টিতে 'শ্রেণীসংক্রান্ত শ্রেণী' এই কথার মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যা একাই কূটাভাস উৎপন্ন করতে পাবে অথচ অনুরূপ অন্যান্য অভিব্যক্তি যেমন 'সিংহ সংক্রান্ত শ্রেণী' বা 'আপেল সংক্রান্ত শ্রেণী' পারে না। আপাতদৃষ্টিতে এই দুই ধবণেব অভিব্যক্তিব মধ্যে যে পার্থক্য ধবা পড়ে, তা হল সিংহ সংক্রান্ত শ্রেণী নিজে সিংহ নয় বা আপেল সংক্রান্ত শ্রেণী নিজে আপেল নয, অথচ শ্রেণী সংক্রান্ত শ্রেণী নিজে একটি শ্রেণী। কেউ বলতে পারেন যে সিংহ সংক্রান্ত শ্রেণী যে কোনো সিংহ নয এটা খুবই স্বাভাবিক, কাবণ 'সিংহ' এখানে সমগ্র বাক্যাংশেব একটি অংশ মাত্র, তাই 'সিংহ' এবং 'সিংহ সংক্রান্ত শ্রেণীকে' এক বলে মনে কবা টাইমটেবিলকে টেবিল বলে মনে কবার অনুরূপ হয়ে যায়। যেহেতু শ্রেণী ও সিংহ এই দুটি পদ দুটি অভিব্যক্তিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাই এক স্থলে কূটাভাস উৎপন্ন হযেছে, অন্যস্থলে হয় নি। হ্বিটগেনস্টাইন কিন্তু এই সাধাবণ বা আপাতগ্রাহ্য বিশেষত্ব স্বীকার কবতে বাজী নন। তাঁব যুক্তি হল যে এমন একটা ভাষাব কথা আমবা কল্পনা কবতে পারি যেখানে সমস্ত সিংহ মিলিয়ে একটি বৃহৎ সিংহ গঠিত হয়েছে। এই ধবণের কল্পনা কিন্তু অস্বভাবিক কিছু নয়। কাবণ, আমরা আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে যখন বলি যে ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তখন আসলে বলতে চাই ভগবান সমস্ত মানুষ সৃষ্টি কবছেন। অর্থাৎ মানুষ বলতে সমস্ত মানুষ বোঝানো হয়েছে। অনুরূপভাবে আমাদেব

ভাষায় সিংহ বলতে সমস্ত সিংহ বোঝাতে পারি। সেক্ষেত্রে সিংহেব শ্রেণী বলতে সমস্ত সিংহ সূচক সিংহ। সেক্ষেত্রে 'শ্রেণী সূচক শ্রেণী' এবং 'সিংহ সূচক সিংহ' এই দুই প্রয়োগের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকছে না। ফলতঃ, যদি প্রথমটিকে কূটাভাসী বলা হয়, তাহলে দ্বিতীয়টিকে কূটাভাসী বলতে হয়।

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে 'আমি মিথ্যা বলছি' বা 'অসম নিদের্শক' বা 'শ্রেণী সূচক শ্রেণী' - এই সমস্ত বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োগের মধ্যে এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যা কূটাভাস উৎপন্ন করতে পাবে। সমস্ত কূটাভাসই পরিস্থিতি সাপেক্ষ। এক পবিস্থিতিতে যা কূটাভাসী বলে মনে হয়, পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেললে বা বিকল্প পবিস্থিতিব কথা চিন্তা কবলে তাকে আব কূটাভাসী বলা যায় না। বিপবীতক্রমে এমন অনেক প্রযোগ আছে যা আপাতদৃষ্টিতে যথার্থ, সঠিক, কূটাভাসমূলক বলে প্রতীত হলেও, বিকল্প ভাষাতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে তাকেই কূটাভাসী বলতে হয়। সুতবাং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল কীভাবে আমবা এই ভাষাব খেলা খেলছি। তার উপব নির্ভর কবে আমবা কোন্ প্রযোগ কূটাভাসী আর কোন্ প্রয়োগ তা নয়, তা স্থিব কবতে পাবব। আমাদেব হাতে এমন কোনো নাম (লেবেল) নেই যা কোনো বাক্যের গায়ে লাগিয়ে দাবি কবতে পাবি এই বাক্যটি কূটাভাসী আব এই বাক্যটি কূটাভাসী নয। যদি আমবা আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গি প্রসাবিত, উন্মুক্ত রাখতে পাবি, তাহলে বলতে পারব যে বিরুদ্ধতা বা কূটাভাস ভীতিকর কিছু নয় - এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা এবং আমাদেব ভাষাগত কাঠামোয় মাঝে মাঝে দেখা যেতে পাবে।

পরবর্তী পর্য্যায়েব এই বচনায় তিনি কখনোই কূটাভাস নেই একথা বলছেন না। তাঁব বক্তব্য কূটাভাস বা বিরুদ্ধতা কোনোটাই ভয়াবহ, আশাংকাজনক কিছু নয। যদি যথাযথ বিশ্লেষণ কবা হয তবে কূটাভাসগুলিকেও যুক্তি বিজ্ঞানেব ভিত্তি হিসাবে প্রযোজনীয় বলে মনে কবা যায়। যে সমস্ত ক্ষেত্রে কূটাভাসগুলি ক্ষতিকর বলে মনে হয, সেখানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি হল যে, যে বাক্য দিয়ে কূটাভাসটি প্রকাশ কবা হচ্ছে তা কখনোই কূটাভাসের বিষয় হতে পাবে না। কাবণ বচনটি কূটাভাসেব প্রদর্শক, কূটাভাসেব উক্তি নয়। প্রদর্শন করা ও ব্যক্ত হওয়ার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকার জন্য কূটাভাস প্রদর্শক বাক্য ও কূটাভাসের বাক্য এই দুই এব মধ্যে পার্থক্য কবা প্রয়োজন। এইভাবে যদি প্রকাবন্তেব উপস্থাপনা কবা সম্ভব হয়, তবে আত্মনির্দেশ পরিহাব করা সম্ভব। আব আত্মনির্দেশ কূটাভাসের মূল বলে, আত্মনির্দেশ পবিত্যক্ত হলে কূটাভাসও বর্জিত হয।

[পাঁচ]

উপসংহারে উপনীত হয়ে আমাদের একথা স্বীকার কবতে হবে যে ভিটগেনস্টাইন কূটাভাস সম্পর্কে আমাদেব দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন কী ভাবে এই

কূটাভাসের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কবা যায় - এই সমস্ত বাক্যকে কী ভাবে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনেব কাজে লাগানো যায়। কিন্তু যে সমস্ত স্থলে যথার্থ কূটাভাস উৎপন্ন হয়েছে বলা হয়, সেই সমস্ত স্থলের ব্যাখ্যায় ভিটগেনস্টাইন-এব পূর্ববর্তী পর্যায় ও পরবর্তী পর্যায়ের রচনার মধ্যে পার্থক্য আছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও, এই দুই পর্যায়ের রচনাব মধ্যে এক ধরণের ধাবাবাহিকতা আছে বলে আমাদেব বিশ্বাস। পরবর্তী পর্যায়েব রচনায় তিনি বারবারই বলতে চেয়েছেন যে বিভিন্ন কূটাভাসেব মধ্যে কোনো সাদৃশ্য নেই। অর্থাৎ আমরা এমন কোনো ধর্ম খুঁজে পাই না, যাকে সমস্ত কূটাভাসেব মধ্যে সমানভাবে বিদ্যমান বলে বর্ণনা করতে পাবি। কিন্তু তিনি নিজে সমস্ত কূটাভাসকে যেভাবে বিশ্লেষণ কবেছেন তার থেকে এই মতের কোনো সমর্থন মেলে না, ববং বিপবীত মতই প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন, ক্রেটান মিথ্যাবাদীব ক্ষেত্রে তিনি দেখিয়েছেন যে 'আমি মিথ্যা বলছি না' বা 'এই বাক্যটি মিথ্যা', ইত্যাদি বাক্য থেকে তখনই কূটাভাস উৎপন্ন হয় যখন বাক্যটি নিজেই বক্তব্যবিষয়েব অর্ন্তভুক্ত হয়, অথবা যেখানে নির্দেশ পদটি নিজেই নিজেকে নির্দেশিত করে। অন্য স্থলগুলিতে যেখানে বাক্যটিব বক্তব্য বিষয় ভিন্ন কোনো বাক্য অথবা নির্দেশকটি অন্য কোনো বাক্যকে নির্দেশ করে সেক্ষেত্রে একই বাক্য ব্যবহাব কবা হলেও তাব থেকে কোনো কূটাভাস উৎপন্ন হয় না। এই বক্তব্যের পূর্ণ সমর্থন কবে একথা বলতে পাবা যায় যে ভিটগেনস্টাইন এখানে সেই আত্মনির্দেশকেই কূটাভাসেব মূল হেতু হিসেবে চিহ্নিত কবেছেন। যদি আমবা এই আত্মনির্দেশ বর্জন কবতে পাবি অর্থাৎ বাক্যটিকে তাব বক্তব্য পবিসব থেকে ভিন্ন বলে দেখাতে পাবি তাহলে এই কূটাভাস আব থাকে না। এই মতেব সমর্থন পাওয়া যায় তাঁব শ্রেণী-সূচক কূটাভাসের আলোচনায়। শ্রেণী বিষয়ক শ্রেণীব অনুরূপ করে তিনি সিংহবিষয়ক সিংহেব ধাবণা গঠন কবার কথা ভেবেছেন। শ্রেণী বিষয়ক শ্রেণীতে ব্যক্তি শ্রেণীগুলি যেমন বৃহৎ শ্রেণীর সদস্য, তেমনি এই 'সিংহ' টিকে এমনভাবে কল্পনা কবা হযেছে যাতে বিভিন্ন ব্যক্তি-সিংহ তাব সদস্য হতে পারে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে সিংহবিষযক সিংহটি একটি আত্মসদস্যবিশিষ্ট সিংহে পর্যবসিত হয এবং কূটাভাস উৎপন্ন হয। এখানে যে বিষযটি লক্ষণীয তা হল যতক্ষণ আমবা সিংহ সংক্রান্ত শ্রেণীব দৃষ্টান্ত নিযে আলোচনা কবি ততক্ষণ কোনো কূটাভাসই থাকে না, কিন্তু যে মুহূর্তে আমবা সিংহ সংক্রান্ত সিংহ নিযে আলোচনা কবছি তখনই কূটাভাস দেখা যায। এব কারণ হল যে প্রথম স্থলে শ্রেণীটি নিজে সিংহ না হওয়ায ঐ শ্রেণীর সদস্য হতে পারে না; কিন্তু দ্বিতীয স্থলে যখন আমবা সমস্ত সিংহ সম্বলিত সিংহের কথা ভাবছি তখন এই সিংহটি অন্য সিংহেব দ্বাবা নির্মিত হলেও সিংহই থেকে যায়। ফলে তাকে ঐ শ্রেণীব সদস্য বলা যায। অর্থাৎ এখানে আত্ম-সদস্যক শ্রেণীই হয়ে যাচ্ছে।

এই সমস্ত আলোচনাব পবিপ্রেক্ষিতে আমবা একটা সাধাবণ নিযম গঠন কবতে পাবি যে, যেকোনো কূটাভাস - তা যৌক্তিক বা শব্দতাত্ত্বিক - যাইহোক না কেন, আত্মনির্দেশ থেকেই উৎপন্ন হয। টীকাকারকগণ অবশ্য বলতে পারেন যে এই ব্যাখ্যা ভিটগেনস্টাইন-

এর মূলবক্তব্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে না। কারণ, হুইটগেনস্টাইন তাঁর পরবর্তী পর্যায়ের রচনায় কোথাওই সাধারণ নিয়মের কথা বলবেন না, তিনি 'পরিবারভিত্তিক সাদৃশ্য'-এর কথাই বলেন। এই ব্যাখ্যা মেনে নিলেও আমাদের বক্তব্য কিন্তু একই থাকে। সেক্ষেত্রে আমাদের বলতে হবে, যে সমস্ত বাক্য কূটাভাসের সূচক সেই সমস্ত বাক্যের পারস্পরিক সাদৃশ্য এখানেই যে তারা সবাই আত্মনির্দেশক। সুতরাং আত্মনির্দেশকই কূটাভাসের উৎপাদক। এবং এই আত্মনির্দেশ পরিহার করতে হলে স্তরগত পার্থক্য প্রদর্শন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এইভাবে যদি বিচার করা হয়, তাহলে হুইটগেনস্টাইন-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের বক্তব্য সম্পূর্ণতঃ বিপরীত একথা বলা যাবে না, বলতে হবে যে তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্যায়ের রচনা একই সূত্রে-গ্রথিত - একই সুরে বাঁধা।

টীকা

১ 'to draw a limit to thought or rather —not to thought, but to the expression of thoughts' Preface, *Tractatus*

২ In this way the most fundamental confusions are easily produced (the whole of philosophy is full of them)*Tractatus* ৩.৩২৪

৩ In order to avoid such errors we must make use of a sign-language that excludes them by not using the same sign for different symbols and by not using in a superficially similar way signs that have different modes of signification that is to say, a sign-language that is governed by logical grammar—by logical syntax

(The conceptual notation of Frege and Russell is such a language, though it is true, it fails to exclude all mistakes), *Tractatus*, ৩.৩২৫

৪ A sign is what can be perceived of a symbol *Tractatus* ৩.৩২

৫ In order to recognize a symbol by its sign we must observe how it is used with a sense, ঐ, ৩.৩২৬

৬ In logical syntax the meaning of a sign should never play a role *Tractatus* ৩.৩৩

৭ A proposition shows its sense ঐ, ৪.০০২

৮ Whatever involves all of a collection must not be one of the collection', or, conversely 'if provided a certain collection had a total it would have members only definable in terms of that total, then the said collection has no total' *Principia* পৃঃ ৩৭

৯ 'it can be seen that Russell must be wrong, because he had to mention the meaning of signs, when establishing the rules for them' *Tractatus*, ৩.৩৩১

১০ No proposition can make a statement about itself, because a propositional sign cannot be contained in itself (That is the whole of the 'Theory of Types'). *Tractatus* ৩.৩৩২

১১. A proposition cannot occur in itself That is the fundamental truth of the theory of types...' *Notes on Logic*. M. Black-এর *A Companion to Wittgenstein's Tractatus* গ্রন্থে উল্লিখিত, পৃঃ ১৪৭

১২ 'The reason why a function cannot be its own argument is that the sign for a function already contains the prototype of its argument and it cannot contain itself

For let us suppose that the function F(fx) could be its own argument in that case there would be a proposition 'F (F (fx)) in which the outer function and the inner function F must have different meanings, since the inner one has the form ∅ (fx) and the outer one has the form Ψ (∅ (fx) ∝). Only the letter 'F' is common to the two functions, but the letter signifies nothing

This immediately becomes clear if instead of 'F (Fu)' we write '(∃∅)· F (∅u) u = Fu'.

That disposes of Russell's Paradox ...' *Tractatus*, ৩.৩৩৩

১৩ My aim is to alter the attitude to contradiction and the *consistency proof Remarks* § ৮২ § ২১৩

১৪ 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থে তিনি সম্পূর্ণ লৌকিক/সাধারণ ভাষা পরিহার করেছেন কি না সেই ব্যাপারে টীকাকারদের মধ্যে মতভেদ আছে। রাসেল তাঁর ভূমিকায় স্পষ্টই মনে করেন যে হিটগেনস্টাইন এই গ্রন্থে যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ বা শুদ্ধ একটি ভাষার কথা বলেছেন যা কখনই সাধারণ, লৌকিক ভাষা হতে পারে না। অথচ পিচার মনে করেন যে পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যে সাধারণ, লৌকিক ভাষাব সমর্থন করেছেন, তার পূর্বাভাস প্রথম পর্যায়ের 'ট্র্যাকটেটস' গ্রন্থেই বর্তমান।

১৫. The meaning of a word is its use in the language *Philosophical Investigations* § ৪৩

১৬ Something surprising, a paradox is a paradox only in a particular, as it were defective surrounding. One needs to complete this surrounding in such a way that what looked like a paradox no longer seems one. *Remarks*, § ৪৩, পৃঃ ৪১০

১৭ এখানে 'অভিব্যক্তি' কথাটি বলতে শব্দ বা বাক্যাংশ উভয়ই বোঝানো হয়েছে।

১৮ If a contradiction is found later on, that means that hitherto the rules have not been clear and unambiguous So the contradiction doesn't matter, because we cannot get rid of it by enunciating a rule.

In a system with a clearly set out grammar there are no hidden contradtions because such a system must include the rule which makes the contradition discernible. A contradiction can only be hidden in the sense that it is in the higgledy-piggledy zone of the rules, in the unorganized part of the grammar, and there it doesn't matter since it can be removed by organizing the grammar. *Philosophical Grammar*, পৃঃ ৩০৫

১৯. 'as long as it's hidden I say that it's as good as gold And when it comes out in the open it can do no harm.' *Lectures*, পৃঃ ২১৯

২০. I have two things to say about this. The first is that the contradiction itself need not be called false at all And if the danger is simply that somone

might go this way unaware and get absurd results which we do not want, then the only thing is to show him which way not to proceed from a contradiction. ঐ, পৃঃ ২২২

২১. Such a contradiction is of interest only because it has tormented people, and because this shows both how tormenting problems can grow out of language, and what kind of things can torment us. *Remarks*, § ১৩, পৃ ১২০

২২. Is there contradiction that arises when somone says : 'I am lying So I am not lying — So I am lying — etc.' I mean : does it make our language less usuable if in this case, according to the ordinary rules, a proposition yields its contradictory, and vice versa? —The proposition itself is unusable and these inferences equally; but why should they not be made ? It is a profitless performance. It is a language-game with some similarity to the game of thumb-catching. ঐ, § ১২, পৃঃ ১২০

২৩. If he was saying that sentence, not thoughtlessly — then he must have meant the words in such–and–such a way, he cannot have meant them in the usual way ঐ, § ৫৮, পৃঃ ২২৫

২৪. He might have written 'This proposition is false' instead of 'I am lying' The answer would be : 'Very well, but which proposition do you mean'?— 'Well, this proposition'— 'I understand, but which is the proposition mentioned in it'? —'This one' — 'Good, and which proposition does it refer to?' and so on. Thus he would be unable to explain what he means until he passes to a complete proposition. — We may also say · The fundamental error lies in one's thinking that a phrase, e.g. 'This proposition' can as it were allude to its object (point to it from far off) without having to go proxy for if. *Zettel*, পৃঃ ১১৮-১১৯

২৫. 'Predicate which does not apply to itself.' Does this apply to itself or not? It is clear that if it does apply to itself, then it does not, and that if it does not, then it does. From this it presumably follows that it both does and does not apply to itself.

I would say, 'And why not?' If I were taught as a child that this is what I ought to say, I'd gladly say so.

What is queer about this sentence is that we don't know what on earth to do with it. *Lectures*, পৃঃ ২২২-২২৩

২৬. Why should Russell's contradiction not be conceived as something supra-propositional, something that towers above the propositions and looks in both directions like a janus head? N.B the proposition F(F) — in which $F(\xi) = \sim\xi\ (\xi)$ — contains no variables and so might hold as something supra-logical, as something unassailable, whose negation itself in turn only asserts it Might one not even begin logic with this contradiction? And as it were descend from it to propositions *Remarks*, § ৫৯, পৃঃ ২৫৬

নির্দেশিকা